সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৫ম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৫ম খন্ড

সূরা আল মায়েদা

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
মাওলানা কুতুবুল ইসলাম

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(৫ম খন্ড সূরা আল মায়েদা)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট ষ্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১বি ২কিউডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা-১২১২
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (দোত লা) দোকান নং ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭

১০ম সংস্করণ
রমদান ১৪৩১, আগস্ট ২০১০, ভাদ্র ১৪১৭

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার
সর্ব স্বত্ব ঃ প্রকাশক
বিনিময়: দুইশত টাকা

Bengali Translation of Tafseer
'Fi Zilalil Quran'
Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
5th Volume
(Surah Al Mayeda)

Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Centre: 362 Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
38/3 Computer Market (1st Floor) Stall No- 15 Bangla Bazar, Dhaka
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 1997

10th Edition
Ramadhan 1431, August 2010
Price Tk. 200 .00
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN NO-984-8490-013-2

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ্ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক–এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি ~~থেকে~~ আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন
জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে এককেবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটি সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আল মায়েদা (সংক্ষিপ্ত আলোচনা) ১৫
অনুবাদ (আয়াত ১-১১) ২৫
তাফসীর (আয়াত ১-১১) ২৯
আল্লাহর সাথে মানবজাতির চুক্তি ৩০
হালাল হারামের কতিপয় বিধান ৩১
বিদ্বেষ কিংবা প্রতিশোধ যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে ৩৪
কতিপয় হারাম জিনিসের বর্ণনা ৩৬
হারাম খেতে একান্ত মজবুর হয়ে গেলে ৩৮
'দ্বীন পরিপূর্ণ' কথাটির আসল তাৎপর্য ৩৮
যে ঈমান মানবজাতিকে মানুষের পরিণত করে ৪১
জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মানবজাতির মুক্তি ৪২
হালাল হারামের আরো কিছু বিধান ৪৪
আহলে কেতাবদের খাদ্য ও তাদের নারীদের সাথে বিয়ে প্রসংগ ৪৬
এবাদাতের মাঝে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ৪৭
ওযু ও তায়াম্মুমের বিধান ৪৮
নামায ও পবিত্রতার পর্যালোচনা ৫০
যে অংগীকার স্বয়ং আল্লাহর সাথে ৫১
আল্লাহর আইন ও মানবরচিত আইনের পার্থক্য ৫৩
অনুবাদ (আয়াত ১২-২৬) ৫৬
তাফসীর (আয়াত ১২-২৬) ৬০
আল্লাহর সাথে ইহুদীদের অংগীকার ৬১
বিশ্বাসঘাতকতা ইহুদী চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৬৩
খৃষ্টান বনাম আজকের মুসলমান ৬৪
আহলে কেতাবদের প্রতি কোরআনের আহবান ৬৬
ইসলামই বিশ্বমানবতার একমাত্র মুক্তিপথ ৬৭
বিকৃত খৃষ্টবাদের ইতিহাস ৭০
মুসলমানদের জরুরী একটি জ্ঞাতব্য বিষয় ৭৫
মুসা (আ.)-এর সাথে ইহুদীদের জঘন্য আচরণ ৭৬
অনুবাদ (আয়াত ২৭-৪০) ৮১
তাফসীর (আয়াত ২৭-৪০) ৮৪
দারুল হারব ও দারুল ইসলাম ৮৫
ইতিহাসের প্রথম নরহত্যা ৮৬
নরহত্যার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগী ৯০
কোরআনের সন্ত্রাস দমন আইন ৯২
অপরাধ প্রবণতা দমনের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া ৯৫
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান ও ভারসাম্যপূর্ণ দন্ডবিধি ৯৭
ইসলামের চুরির শাস্তি বিধান ৯৯
অনুবাদ (আয়াত ৪১-৫০) ১০৪
তাফসীর (আয়াত ৪১-৫০) ১০৭
আল্লাহর আইন দিয়ে যারা বিচার ফয়সালা করে না তারাই কাফের ১০৭
আল্লাহর আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ১১০
জাহেলী যুগ কোন নির্দিষ্ট যুগের নাম নয় ১১২
মুসলমানদের জীবনে ইহুদী স্বভাবের অনুপ্রবেশ ১১৩
রসূল (স.)-এর সাথে ইহুদীদের ধোকাবাজী ১১৬
মানবরচিত আইন ও ঈমান একসাথে চলতে পারে না ১১৮
দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা অপরিহার্য্য ১২০
স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই যাদের কাফের বলেছেন ১২২
ইসলামের কেসাস আইনই হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি ১২২
অন্যান্য আসমানী কেতাবের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি ১২৪
এখানে শৈথিল্য বা আপোষের কোনো সুযোগ নেই ১২৬
ইসলামে হক ও বাতেলের মাঝখানে থাকার কোনো অবকাশ নেই ১৩০
অনুবাদ (আয়াত ৫১-৬৬) ১৩২
তাফসীর (৫১-৬৬) ১৩৫
বিধর্মীদের ব্যাপারে অনুসৃত মূলনীতি ১৩৬
ইহুদী নাসারাদের সাথে মিত্রতা না গড়ার কঠোর নির্দেশ ১৩৮
মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল বিধর্মীরাই এক মঞ্চে ১৪০
বিধর্মীদের সাথে সখ্যতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী ১৪১
মোনাফেকরাই শুধু বিধর্মীদের সাথে মিত্রতা করে ১৪৩
ইসলামের শত্রু মিত্র ১৪৫
ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন ১৪৬
ইসলামের সাথে বাতেলের ঐক্য সম্ভব নয় ১৪৮

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির একমাত্র যোগসূত্র ১৫০
আল্লাহর নির্বাচিত দলটির বৈশিষ্ট্য ১৫২
মোমেনদের বন্ধু ও অভিভাবক কারা ১৫৪
বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ও তার কিছু শর্ত ১৫৫
বিধর্মীদের সাথে মিত্রতা প্রসংগে ১৫৭
মুসলমানরাই হচ্ছে ষড়যন্ত্রের একমাত্র শিকার ১৫৮
ষড়যন্ত্রের শিকার মুসলিম জাতি ১৬০
ইসলামের কোনো আপোষকামীতা নেই ১৬১
আল্লাহর কাছে যারা নিকৃষ্ট ১৬২
ধর্মযাযক ও পুরোহিতদের ভূমিকা ১৬৪
ইসলামের ভারসাম্যমূলক মূলনীতি ১৬৭
দুনিয়া ও আখেরাত হচ্ছে একই গন্তব্যের দুটো মানযিল ১৬৮
বিশ্বব্যাপী অশান্তির মূল কারণ ১৭২
অনুবাদ (আয়াত ৬৭-৮১) ১৭৬
তাফসীর (আয়াত ৬৭-৮১) ১৭৯
দাওয়াতের কাজে কোনো আপোষের সুযোগ নেই ১৮০
ঈমানের দাবী কখন গ্রহণযোগ্য হবে ১৮১
ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ ১৮৬
খৃষ্টবাদের ভ্রান্তি ১৮৮
কোনো মতবাদের সাথেই ইসলামের ঐক্যসম্ভব নয় ১৯১
শুধু ওয়ায নসীহত দিয়ে পাপাচার নির্মূল হবে না ১৯২
সকল সামাজিক অপরাধের উৎস ১৯৫
ইহুদীদের অবাধ্যতার কারণ ১৯৯
অনুবাদ (আয়াত ৮২-৮৬) ২০১
তাফসীর (আয়াত ৮২-৮৬) ২০২
মুসলিম জাতির আসল শত্রু ২০২
যুগে যুগে ইহুদী চক্রান্ত ২০৪
খৃষ্টানদের সাথে শত্রুতা ও মিত্রতা প্রসংগে ২০৭
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী খৃষ্টানদের যৌথ ষড়যন্ত্র ২১৩
অনুবাদ (আয়াত ৮৭-১০৮) ২১৬
তাফসীর (আয়াত ৮৭-১০৮) ২২১
বৈরাগ্যবাদ নয় ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধানই কাম্য ২২৩
কু-সংস্কার ও সামাজিক অপরাধ দমনে কোরআনের নীতি ২২৮
মাদকদ্রব্য হারামের বিভিন্ন পর্যায় ২৩১
কিছু শয়তানী কাজের চিত্র ২৩৪
সকল প্রকার মাদকদ্রব্যই হারাম ২৩৫
মাদকদ্রব্য হারামের প্রতিক্রিয়া ও প্রাসংগিক কিছু ভাবনা ২৩৭
তাকওয়ার পরিধি ২৩৯
হালাল হারামের কিছু বিধান ও আল্লাহর পরীক্ষা ২৪০
এহরাম বাধা অবস্থায় শিকারের কাফফারা ২৪৩
কাবা ও হারাম মাসের নিরাপত্তা বিধানের তাৎপর্য ২৪৫
মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী ২৪৯
বেশী বেশী প্রশ্ন করা একটি মারাত্মক বদ অভ্যাস ২৫১
শরীয়তের অতি বিশ্লেষণ করার পরিণাম ২৫৫
ইসলামের কু-সংস্কারের কোনো স্থান নেই ২৫৯
জাহেলী যুদ কোনো নির্দিষ্ট যুগের নাম নয় ২৬১
মুসলমানদের পারস্পরিক সৌহার্দ ও সামষ্টিক দায়িত্ব ২৬৪
মৃত ব্যক্তির ওছীয়ত বাস্তবায়নের সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ২৬৭
অনুবাদ (আয়াত ১০৯-১২০) ২৭১
তাফসীর (আয়াত ১০৯-১২০) ২৭৪
প্রত্যেক রসূলই তার জাতি সম্পর্কে সাক্ষ দেবেন ২৭৪
ভ্রান্ত খৃষ্টবাদ ও ঈসা (আ.)-এর সঠিক ঘটনা ২৭৬
হাওয়ারীদের ঘটনা ২৭৭
কেয়ামতের দিন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্য ২৮২

সূরা আল-মায়েদা

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন রসূল (স.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো এ দ্বারা তিনি একটি জাতি গঠন, একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, একটি সমাজ নির্মাণ, কিছু মানুষের চরিত্র ও বিবেকের লালন ও প্রশিক্ষণ করবেন। উক্ত সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, উক্ত রাষ্ট্র ও জাতির সাথে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র ও জাতির সম্পর্ক কিরূপ হবে তা নির্ধারণ এবং এই সব কিছুকে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র, কেন্দ্র ও উৎস তথা ইসলামের সাথে সংযুক্ত করবেন। ইসলামের এই প্রকৃত স্বরূপটি আল্লাহর কাছে সুপরিচিত ছিলো এবং মুসলমানরা যখন যথার্থ 'মুসলমান' ছিলো, তখন তাদের কাছেও তা সুপরিচিত ছিলো।

এ কারণেই পূর্ববর্তী তিনটি দীর্ঘ সূরার মতো এ সূরাতেও আমরা নানা রকমের আলোচ্য বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাই। এই সব কয়টি বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য, যা সফল করতেই সমগ্র কোরআন মাজিদ নাযিল হয়েছে। সেটি হলো, এমন একটি বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ গঠন করা, যার মূল কথা, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সার্বভৌম ও একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন ইলাহ ও রব। তিনিই মানুষের জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আইন, বিধান, নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের একক ও অদ্বিতীয় উৎস।

এতে আমরা আরো যে বিষয়টি দেখতে পাই তা হচ্ছে মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসকে পৌত্তলিকতার কুসংস্কার ও আহলে কেতাবের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্রকরণের চেষ্টা। সেই সাথে মুসলিম জাতিকে তাদের প্রকৃত পরিচয়, তাদের যথোচিত ভূমিকা, এই কাজ সম্পাদনের পদ্ধতি এবং এই পথে বিদ্যমান বাধা বিপত্তি, বিপদাপদ ও সমস্যাবলী এবং ইসলামের শত্রুদের পাতা ষড়যন্ত্র জালের বিবরণ। এর পাশাপাশি এতে বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন এবাদতের বিধান, যা মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের আত্মাকে পবিত্র করে এবং তাকে তার প্রতিপালকের সাথে যুক্ত করে। এতে আরো আছে সামষ্টিক জীবনের সেই সব আইন কানুন, যা তার সামাজিক আচরণ ও সম্পর্ককে সুশৃংখল হতে সাহায্য করে, রয়েছে আন্তর্জাতিক আইনের বিধি বিধান, যা অন্যদের সাথে তার সম্পর্ককে সুসমন্বিত করে, রয়েছে সেই সব আইন কানুন, যা কয়েক প্রকারের খাদ্য পানীয়কে ও বিবাহকে এবং কিছু কাজকর্ম ও নিয়মনীতিকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করে। এই সব কিছু একই সূরায় এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে, তা আল্লাহর দ্বীনকে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন এবং মুসলমানরা যখন যথার্থ মুসলমান ছিলো তখন তারা যেভাবে তাকে বুঝেছে, ঠিক সেইভাবে তুলে ধরে।

এছাড়া কোরআন এই সূরায় যেভাবে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে এবং ইতিপূর্বে সূরা 'আলে ইমরান' ও 'আন নেসাতে'ও যেভাবে আলোচনা করেছে, তা দ্বারা নিছক আনুষংগিকভাবেই যে এটা বুঝা যায় তা নয়। বরং এই দুটি সূরায় এবং কোরআনের অন্যান্য সূরায় এই বিষয়গুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে কোরআন প্রত্যক্ষভাবে ও জোর দিয়েই একথা ব্যক্ত করে যে, এই সব বিধান মিলিয়েই আল্লাহর 'দ্বীন', এই সব বিধানকে মেনে নেয়ার নামই হচ্ছে 'ঈমান' এবং এই সব বিধানের আলোকে ফয়সালা করার নামই হচ্ছে 'ইসলাম'। আর যারা এই সমস্ত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, তারা কাফের, তারা যালেম--- এবং তারা ফাসেক। এই সমস্ত বিধান অনুসারে জীবনের সকল বিষয়ে ফয়সালা না করার অর্থই হলো জাহেলিয়াতের শাসন কামনা করা, যা কোনো মোমেন মুসলমানের কাজ হতে পারে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিটাই এই সূরার সুস্পষ্ট ও আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, আর এর পাশাপাশি যে বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ওপর এই মূলনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকেও পরিশুদ্ধ করা হয়েছে।

এই সূরার আয়াতগুলোতে কিভাবে উল্লেখিত মূলনীতি দুটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে এবং কিভাবে একটির ওপর স্বাভাবিকভাবে ও যুক্তিসম্মতভাবে অপরটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা একটু সবিস্তারে আলোচনা করা সংগত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

কোরআনের আলোচনা যে মূল বক্তব্যটির ওপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছে তা হলো এই যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার-ফয়সালা ও কাজ করার নামই 'ইসলাম' এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে কিছু জিনিস হালাল ও কিছু জিনিস হারাম ঘোষণা করে যে বিধান দিয়েছেন তারই নাম 'আদ্-দ্বীন'। আর আল্লাহই একমাত্র 'ইলাহ' অর্থাৎ একচ্ছত্র মনিব, মাবুদ ও আইনদাতা ও শাসক এবং ইলাহ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে আর কেউ অংশীদার নেই, তিনি একমাত্র স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্মে তাঁর সাথে আর কেউ অংশীদার নেই এবং তিনিই সারা বিশ্বের একমাত্র মালিক ও অধিপতি, তার মালিকানায় ও আধিপত্যে আর কেউ অংশীদার নেই। তাই এ কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও অকাট্যভাবে সত্য যে, আল্লাহর অনুমোদন ও আল্লাহর বিধান ব্যতীত কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া ও বিচার ফয়সালা করা যাবে না। কেননা যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুর মালিক, একমাত্র তিনিই স্বীয় মালিকানাধীন জিনিস ও স্বীয় সৃষ্টির ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার নীতি নির্ধারণের ও বিধান দেয়ার একচ্ছত্র অধিকার ও ক্ষমতা রাখেন যা তাঁর পছন্দনীয় ও মনোপূত।

আপন মালিকানার পরিমন্ডলে আইন জারী করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। একমাত্র তাঁরই আইন চালু হবে এবং একমাত্র তাঁরই হুকুম সর্বত্র বাস্তবায়িত হতে হবে এবং অন্য কারো আনুগত্য অথবা স্বেচ্ছাচারিতা বিদ্রোহ, না-ফরমানী ও কুফরীতে পরিগণিত হবে। অন্তরে কি ধরনের বিশ্বাস স্থাপন করা সঠিক হবে, তাও একমাত্র তিনিই নির্ধারণ করার এখতিয়ার রাখেন, অনুরূপভাবে জীবন যাপনের জন্যে সঠিক পদ্ধতি কি হবে তাও তিনিই স্থির করবেন একইভাবে। তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বা মোমেন তাদেরকেই বলা যাবে, যারা তাঁর নির্ধারিত আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর মনোপূত জীবন পদ্ধতি মেনে চলে, ইসলামের অনুষ্ঠানাদি পালনের মাধ্যমে এবং তাঁরই আইন অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর এবাদাত করে, অনুষ্ঠান ও আইনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভেদাভেদ ও বৈষম্য করে না। কেননা এই দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যে আল্লাহর রাজত্বে ও তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যে ও কর্তৃত্বে আর কারো অংশীদারিত্ব নেই। যেহেতু তিনিই একমাত্র ইলাহ, একমাত্র মালিক ও মনিব এবং আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কে অবগত, তাই আল্লাহর আইন, বিধান তথা শরীয়ত অনুসারে ফয়সালা করার নামই 'আদ-দ্বীন' তথা ইসলাম। এই ইসলামই ছিলো সকল নবীর দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। এটাই আল্লাহর দ্বীন। এ ছাড়া আর কোনো দ্বীন তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ জন্যেই সূরাটির মধ্যে মাঝে মাঝেই আল্লাহর একত্বকে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সব রকমের শেরেক, ত্রিত্ববাদ এবং আল্লাহর গুণাবলীতে অন্য কারো অংশ থাকার ধারণাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ১৫ নং আয়াত থেকে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত এবং ৭২ নং আয়াত থেকে ৭৩ নং আয়াত পর্যন্ত লক্ষণীয় ....

আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইলাহ তথা সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন মাবুদ ও মনিব, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনিই একমাত্র মালিক, সুতরাং তিনিই আইন প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতা ও এখতিয়ারসম্পন্ন, হালাল হারাম নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী, এবং তাঁর রচিত আইনে ও তাঁর নির্ধারিত হালাল ও হারামে তিনিই একমাত্র পূর্ণ ও শর্তহীন আনুগত্য লাভের অধিকার ও ক্ষমতা রাখেন। অনুরূপভাবে, তিনিই একমাত্র আনুষ্ঠানিক এবাদাত ও উপাসনা লাভের যোগ্য, তাঁর বান্দারা যাবতীয় আনুষ্ঠানিক এবাদত উপাসনা একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করবে। এ সব কিছুর ব্যাপারে তিনি নিজের বান্দাদের অংগীকার গ্রহণ করেছেন। তাই বান্দাদের কাছে তিনি দাবী জানান যে, তাঁর সাথে করা এ সকল অংগীকার যেন তারা পূর্ণ করে। সেই সাথে তিনি তাদেরকে এই অংগীকার ভংগ করার পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করেন, যেমন পরিণতি বনী ইসরাইলের হয়েছিলো,

'হে মোমেনরা! তোমরা অংগীকারসমূহ পূর্ণ কর'..... (আয়াত ১)

'হে মোমেনরা ! তোমরা অবমাননা করো না আল্লাহর নিদর্শনের .....' (আয়াত ২)

'স্মরণ করো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা এবং যে অংগীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন, তার কথা........ (আয়াত ৭ ও ৮)

'আল্লাহ বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন....(আয়াত ১২, ১৩ ও ১৪)

সূরাটিতে শরীয়তের বেশ কয়েক প্রকারের আহকাম তথা বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেমন, যবাই ও শিকার করা জীবজন্তু, এহরামের অবস্থায় ও মাসজিদুল হারামে অবস্থান কালীন সময়ের কার্যকলাপ এবং বিয়ে শাদীর মধ্যে কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম, পবিত্রতা অর্জন ও নামায, ন্যায় বিচার, চুরি ডাকাতির শাস্তি, ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মদ, জুয়া, ভাগ্য গণনা, লটারী, এহরাম অবস্থায় শিকার করার কাফফারা এবং শপথ ভংগ করার কাফফারা, মৃত্যু ঘনিয়ে আসার সময় ওসীয়ত করা, রকমারি গবাদি পশু ও কেসাস সংক্রান্ত বিধান। এভাবে সূরাটিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাযিল করা শরীয়তের বিধান শেষ নবীর ওপর নাযিলকৃত বিধানের সাথে কোনো বাধা ও বিরোধ ছাড়া অবলীলাক্রমে মিলিত হয়েছে।

শরীয়তের এই সকল রকমারি বিধি বিধানের পাশাপাশি মৌলিক নির্দেশ এসেছে আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধানের আনুগত্য করার, আর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে আল্লাহর অনুমোদন ব্যতিরেকে মনগড়াভাবে কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম করার বিরুদ্ধে। অতপর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এটাই আল্লাহর সেই দ্বীন, যাকে তিনি তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্যে মনোনীত করেছেন। পূর্ণাংগ করেছেন এবং এ দ্বারা তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন। যেমন,

'হে মোমেনরা, আল্লাহর নিদর্শনের অবমাননা করো না ......

'হে মোমেনরা, আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে সব পবিত্র জিনিসকে হালাল করেছেন তা হারাম করো না এবং সীমা অতিক্রম করো না.....'

'আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো ও সাবধান থাকো.....

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম........'

সূরাটি আনুগত্য করা ও হালাল হারামের বিধান মেনে চলার কেবল নীতিগত নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছে যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান মান্য করতেই হবে এবং এ ব্যাপারে অন্য কারো বিধান মানা যাবে না। এর অন্যথা করা হলে সেটা হবে কুফরী, সেটা হবে যুলুম এবং সেটা হবে ফাসেকী কাজ। এখানে এক নাগাড়ে কঠোর আদেশমালা জারী হয়েছে। সূরার ৪১ নং আয়াত থেকে ৫০ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখুন।.....

এখানে সূরার মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সেটি এই যে, স্রষ্টা যখন একজন, মালিক মনিব যখন একজন এবং ইলাহ যখন একই জন, তখন হুকুমদাতা, বিধানদাতা, আইনদাতা ও শাসনকর্তাও সেই একই সত্ত্বা। স্বভাবতই আল্লাহর আইনই একমাত্র আইন, তাঁর বিধানই একমাত্র বিধান, তাঁর শরীয়তই একমাত্র শরীয়ত। একমাত্র আল্লাহর নাযিল করা বিধানেরই আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। একমাত্র তাঁর নাযিল করা ওহীর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী এবং এটাই ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু মানা আল্লাহর না-ফরমানী ও বিদ্রোহের শামিল এবং তা যুলুম, কুফরী ও ফাসেকী। .....এই হচ্ছে আল্লাহর সেই দ্বীনের মূলকথা, যার ওপর তিনি তার সর্বকালের সকল বান্দার অংগীকার গ্রহণ করেছেন। এই দ্বীন নিয়েই আল্লাহর সকল রসূল এসেছেন এবং মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মত ও পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতদের জন্যে এই একই দ্বীন নির্ধারিত।

'আল্লাহর দ্বীন' যে শুধুমাত্র আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা-শাসন ও নির্দেশ জারী করার নাম, সে ব্যাপারে কোনো ভিন্ন মতের অবকাশ মাত্র নেই। কেননা এই দ্বীনই আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং একমাত্র ইলাহ হওয়ার প্রতীক।

সুতরাং 'আল্লাহর দ্বীন' এবং 'আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা, শাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ জারী করা' একেবারেই অভিন্ন জিনিস এবং একটি অপরটির অনিবার্য ফলশ্রুতি। এর একটি কারণ এই যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান যে কোনো মানব রচিত বিধান, আইন, বা বিধি ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম। তবে এটি তার একমাত্র কারণ নয় এবং প্রধান কারণও নয়। একমাত্র কারণ ও প্রধান কারণ এই যে, একমাত্র আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসরণ, তদনুসারে বিচার ফয়সালা, শাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ জারী করা দ্বারাই আল্লাহকে ইলাহ বা মাবুদ হিসাবে মান্য করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইলাহ হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব। আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থে এটাই প্রকৃত ইসলাম। ইসলামের আভিধানিক অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। আর এর পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁর সর্বাত্মক, নিরংকুশ ও শর্তহীন আনুগত্য ও অনুসরণ, তাঁর সাথে অন্য কারো ইলাহত্বের দাবী নাকচ ও বাতিল করা, ইলাহহীয়াতের সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বভৌম ক্ষমতা অন্য কারো হতে পারে না– তা ঘোষণা করা এবং তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মানতে বাধ্য করার অধিকার আর কারো থাকতে পারে একথা অস্বীকার করা।

এই উভয় অর্থে পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য এটা যথেষ্ট নয় যে, মানব জাতি নিজেদের জন্যে আল্লাহর আইনের অনুরূপ আইন রচনা করে নেবে, এমনকি হুবহু আল্লাহর আইন জারী করাও যথেষ্ট নয়, যদি তাতে নিজেদের প্রতীক যুক্ত করে, যদি তাকে আল্লাহর আইন বলে ঘোষণা না দেয় এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ইলাহ হওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই নামে তা জারী না করে। কেননা একমাত্র এভাবেই বান্দার শাসন ও সার্বভৌমত্বের অধিকার পরিত্যাগ ও অস্বীকার করার শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব, অন্য কোনো ভাবে নয়। সুতরাং আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্যে

ও পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করা দোষণীয় নয় বরং তা ঈমানের অপরিহার্য্য দাবী।

বস্তুত, আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসনের এই অভিন্নতা, অনিবার্যতা ও অবিচ্ছেদ্যতাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সূরার এই উক্তিগুলোতে, 'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করে না, তারা কাফের ....যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করে না, তারা যালেম........ এবং যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করে না, তারা ফাসেক।' কারণ যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন করে না, তারা মুখে না করলেও নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারাই জানিয়ে দেয় যে, তারা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মানে না। আর বাস্তব কার্যকলাপ দ্বারা যে কথা প্রকাশ পায়, তা মুখের ভাষায় যা প্রকাশ পায়, তার চেয়ে বড় ও শক্তিশালী। এ জন্যেই কোরআন তাদেরকে কাফের, যালেম ও ফাসেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা তারা যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা শাসন ও আইন রচনার ক্ষমতা অস্বীকার করে, সেই ক্ষমতা নিজেরা হস্তগত ও প্রয়োগ করে এবং আল্লাহ অনুমোদন করেননি এমন সব আইন প্রবর্তন করে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে অমান্য করে এবং তার পরিবর্তে নিজেদেরকে ইলাহ বলে ঘোষণা করে।

সমগ্র সূরায় এই অর্থেই ইসলামকে আল্লাহর দ্বীন হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং সর্বত্র এই অর্থের ওপর ভিত্তি করেই বক্তব্য রাখা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি, জাহেলিয়াতে নিমজ্জিতদের ও কেতাবধারীদের বিকৃত ধারণা ও বিশ্বাসের বিবরণ, 'আদ-দ্বীনের' প্রকৃত মর্ম বিশ্লেষণ এবং সঠিক আকীদা বিশ্বাস অর্জন, হালাল ও হারাম সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ জানা, তা মান্য করা, ও কোনো রূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়া হুবহু আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাসনের নামই যে 'আদ দ্বীন' বা 'আল ইসলাম', তার বিবরণ এ সূরার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ ছাড়াও এর আরো কয়েকটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে। সেই বিষয়গুলো হচ্ছে, মুসলিম জাতির মর্যাদা ও অবস্থান, পৃথিবীতে তার প্রকৃত ভূমিকা, তার শত্রুদের সাথে তার নীতি ও আচরণ, তার শত্রুদের মুখোশ উন্মোচন, মুসলিম জাতি ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন, তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের বিভ্রান্তির বর্ণনা এবং মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা ও চক্রান্ত, যার বিরুদ্ধে স্বয়ং কোরআন মুসলিম জাতির পক্ষে সংগ্রামরত এবং যার বিবরণে ইতিপূর্বেকার তিনটে বড় বড় সূরা সোচ্চার।

মুসলিম জাতির কাছে যে আসমানী কেতাব রয়েছে, তা মানব জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ কেতাব। মূল আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের দিক দিয়ে তা পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবের সমর্থক হলেও সর্বশেষ কেতাব হিসাবে পূর্ববর্তী কেতাবের চেয়ে অগ্রগণ্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত যে শরীয়াত মনোনীত করেছেন, তার চূড়ান্ত দলীল এই আল কোরান। এতে পূর্ববর্তী কেতাবধারীদের শরীয়াতের যে সব বিধি বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো এই উম্মতের জন্যে আল্লাহর শরীয়াতের বিধি হিসাবে কার্যকর থাকবে। আর যে সব বিধি বাতিল করা হয়েছে, তা বাতিল, অচল ও অকার্যকর থাকবে, যদিও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া একটি কেতাবে রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করলাম।'

'তোমার ওপর আমি কেতাবকে সত্যের বাহন হিসাবে তার পূর্ববর্তী কেতাবের সমর্থক হিসাবে এবং তার চেয়ে অগ্রগণ্য হিসাবে নাযিল করেছি।'

এ জন্যে মুসলিম জাতির অবস্থান ও ভূমিকা হলো, তারা মানব জাতির অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। পৃথিবীতে কোনোরূপ বিদ্বেষ, বৈষম্য, স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়া এবং জনগণের সর্বাত্মক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই তার দায়িত্ব। অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক, অগ্রণী ও ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল মাত্রেরই এগুলো স্বভাবসুলভ দায়িত্ব হয়ে থাকে। অন্যেরা যতোই বিপথগামী, বিকারগ্রস্ত ও প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর হাতে বন্দী হোক না কেন, মুসলিম জাতিকে তা দ্বারা বিন্দু মাত্রও প্রভাবিত হওয়া চলবে না, কারো মনতুষ্টির জন্যে আল্লাহর বিধান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হওয়া বা এ দায়িত্ব পালনের বদলায় জনগণ কি ধরনের আচরণ করলো তার কোনো পরোয়া করা চলবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক তোমাদেরকে মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয়ার দরুন তাদের প্রতি বিদ্বেষবশত অন্যায় আচরণ করো না। কল্যাণ ও খোদাভীতির কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করো। যুলুম ও গুনাহর কাজে সহযোগিতা করো না.......।'

'হে মোমেনরা! তোমরা আল্লাহর জন্যে ন্যায় বিধানের সাক্ষী ও প্রতিষ্ঠাতা হয়ে যাও' .... 'তাদের মধ্যে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে ফয়সালা করে দাও ......।'

আর যেহেতু এই উম্মাত সকল নবী ও রসূলের দায়িত্বের উত্তরাধিকারী, বিশেষভাবে শেষ নবীর কাজ অব্যাহত রাখার দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত এবং আল্লাহর এই সর্বশেষ দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মানব জাতির অভিভাবক হিসাবে কাজ করা তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত, তাই যারা এই দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান ও তার প্রতি কুফরী করে এবং তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করে, তাদের সাথে তার কখনো বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত না। তার বন্ধুত্ব হবে শুধু আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে এবং যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের প্রতি সে মোটেই নমনীয় হবে না। কেননা মুসলিম উম্মাহ একটি আদর্শবাদী জাতিবর্ণ, বংশ, ভূমি ও জাহেলিয়াতের উত্তরাধিকারী ভিত্তিক জাতি নয়। সে আল্লাহর সর্বশেষ দ্বীন, আকীদা ও আদর্শের অনুসারী জাতি। এই আদর্শই তার ঐক্য ও সংহতির একমাত্র ভিত্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আজ কাফেররা হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে নয়, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত করে দিলাম ....।'

'হে মোমেনরা! ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করো না' ......

'তোমাদের বন্ধু তো শুধু আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা.........।'

'যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে, তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না........।'

'হে মোমেনরা! তোমরা নিজেদেরকে সংরক্ষণ করো। তোমরা যদি সুপথগামী হও, তবে বিপথগামীরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা ইসলামেরও শত্রু, আল্লাহর চিরসুন্দর ও চির নির্ভুল বিধানের শত্রু। তারা সত্যকে দেখতে চায় না এবং সত্যের বিরুদ্ধে তাদের মনে পুঞ্জীভূত স্থায়ী শত্রুতাকে তারা ত্যাগ করতেও ইচ্ছুক নয়। মুসলিম উম্মাহর উচিত তাদেরকে সঠিকভাবে চেনা,

আল্লাহর রসূলদের সাথে তাদের কী আচরণ ছিলো এবং শেষ নবীর সাথে ও খোদ ইসলামের সাথে তাদের কী আচরণ ছিলো, তা ভালো করে জানা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে ১২ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন ....। (আয়াত ১২ থেকে ১৪)

স্মরণ করো, যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো ..... (আয়াত ২০ থেকে ২৫)

'এই কারণেই বনী ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসসাত্মক কাজের কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো.....।' (আয়াত ৩২)

'হে রসূল, যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, তারা যেন তোমার দুঃখের কারণ না হয় ....।' (আয়াত ৪১ থেকে ৪২)

'বলো, হে আহলে কেতাব, তোমরা ....।' (আয়াত ৫৯ থেকে ৬৪)

'বলো, হে আহলে কেতাব ......। (আয়াত ৬৮ থেকে ৭১)

'বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছিলো, তারা অভিশপ্ত হয়েছিলো......। (আয়াত ৭৮ থেকে ৮২)

মুসলিম জাতির শত্রুদের মুখোশ উন্মোচনকারী এই বিবরণ, বিশেষত মোশরেক ও ইহুদী গোষ্ঠীকে প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা এবং মাঝে মাঝে মোনাফেক ও খৃষ্টানদেরও উল্লেখ থেকে আমরা এই সূরায় আলোচিত আরো একটি বিষয়ের আভাস পাই। সে বিষয়টি হচ্ছে, তৎকালীন মদীনায় অবস্থানকারী মুসলিম দলটি এবং মুসলিম জাতি তার সমগ্র ইতিহাস জুড়ে তার বিভিন্ন শত্রু শিবিরের প্রতি কিরূপ নীতি অবলম্বন করেছে। বস্তুত তাকে সব সময় প্রায় একই নীতি ও ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়েছে।

এবার সূরাটি মদীনায় মুসলমানদের জীবনের কোন্ সময়টিতে নাযিল হয়েছিলো সে সময়টির কথা আলোচনা করা যাক।

বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এই সূরা সূরা আল ফাতহের পরে নাযিল হয়েছে। আর সূরা আল ফাত্‌হ সম্পর্কে এ কথা সুবিদিত যে, তা ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়াতে নাযিল হয়েছিলো। এ সব রেওয়ায়াতের কোনো কোনোটাতে একথাও বলা হয়েছে যে, সূরার তৃতীয় আয়াত ব্যতীত সমগ্র সূরা এক সাথেই নাযিল হয়েছে। 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম.....' উক্তি সম্বলিত তৃতীয় আয়াতটি ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়েছিলো।

কিন্তু রসূল (স.)-এর জীবনেতিহাস ও তাঁর জীবদ্দশায় সংঘটিত ঘটনাবলীর সাথে মিলিয়ে সূরাটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, সমগ্র সূরা, সূরাটি আল-ফাত্‌হ তথা হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে নাযিল হয়েছে বলে কথিত বর্ণনাটিতো সঠিক নয়ই, উপরন্তু বদরের যুদ্ধের সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনা থেকে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, এই সূরার বনী ইসরাইল ও

হযরত মূসা সংক্রান্ত আয়াতগুলো ২য় হিজরীতে সংঘটিত বদরের যুদ্ধের আগে মুসলমানদের কাছে পরিচিত ছিলো। এক বর্ণনা মতে হযরত সা'দ বিন মায়ায এবং অপর বর্ণনা মতে হযরত মিকদাদ বিন আমর রসূল (স.)-কে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রসূল। আমরা কোনো অবস্থাতেই আপনাকে সেই কথা বলবো না, যা মূসা (আ.)-এর সংগীরা মূসা (আ.)-কে বলেছিলো, হে মূসা, আপনি ও আপনার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে রইলাম। আমরা বরং বলবো, আপনি ও আপনার প্রতিপালক যুদ্ধ করতে এগিয়ে যান, আমরা আপনাদের উভয়ের সাথে আছি।'

সূরার বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন থেকে এও জানা যায় যে, এই সূরার ইহুদীদের সম্পর্কে মন্তব্য সম্বলিত আয়াত ক'টি যখন নাযিল হয়, তখন মদীনায়, এমনকি মুসলমানদের ওপরও ইহুদীদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো। প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো বলেই তাদের মুখোশ খুলে দেয়া ও ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্যে এই বিবরণ নাযিল হওয়া আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু খন্দক যুদ্ধের পর বনু কুরায়যা অবরোধের ঘটনার ফলশ্রুতিতে সেই প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হয়। তিনটি শক্তিশালী ইহুদী গোত্র বনু নযীর, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকার অস্তিত্ব থেকে মদীনা মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং হোদায়বিয়ার পর এমন কিছু ঘটেনি, যাতে তাদের প্রতি এতো গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তা ছাড়া তাদের মুসলিম বিরোধী চক্রান্ত ও কোরায়শদের সাথে যোগসাজশ ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর তাদের সাথে মুসলমানদের সমঝোতা ও আপোসের আর কোনো অবকাশ ছিলো না। কাজেই রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহর এই উক্তিটি, 'মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত, তাদের দিক থেকে তুমি অনবরতই একটা না একটা চক্রান্তের খবর পেতে থাকবে। কাজেই তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও' অবশ্যই হোদায়বিয়ার পূর্ববর্তী কোনো সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে যে আয়াতে ইহুদীদের আনীত বিবাদের মীমাংসা করে দেয়া অথবা তা এড়িয়ে যাওয়ার মধ্য থেকে যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে আয়াতও ওই সময়ের পূর্বে নাযিল হওয়ার কথা।

এ সব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে এই মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হয় যে, সূরা মায়েদার প্রথম দিককার অংশটি এবং তার পরবর্তী কিছু কিছু অংশ সূরা আল ফাতহের পর নাযিল হয়েছে, আর কিছু কিছু অংশ নাযিল হয়েছে তারও আগে। পক্ষান্তরে 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' এই ঘোষণা সম্বলিত তৃতীয় আয়াতটি যে এর অনেক পরে দশম হিজরীতে নাযিল হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি এ আয়াতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে কোরআনের সর্বশেষ আয়াত। মোদ্দা কথা এই যে, সমগ্র সূরা মায়েদা এক সাথে নাযিল হয়নি এবং যে বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা আন নেসার ভূমিকায় আমি যেমন বলেছি, তেমনি এখানেও বলছি যে, কোরআন মুসলমানদের পক্ষে তাদের ও তাদের আদর্শের শত্রুদের, বিশেষত ইহুদী ও মোশরেকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই চালিয়েছে, সেই সাথে মোমেনদের মনমগযে ইসলামের সঠিক ধারণা ও চেতনা বদ্ধমূল করেছে এবং আইন প্রণয়ন ও নির্দেশাবলী জারী করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করেছে।

এ সূরায় ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলো সংহত করার ব্যাপারে যে কাজ করা হয়েছে তা এই যে, তাওহীদ বিশ্বাসকে সর্ব প্রকারের কলুষ ও আবিলতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে,

'আদদ্বীন' এর মর্ম ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আদ দ্বীন অর্থ হলো জীবন যাপনের পথ, পদ্ধতি ও প্রণালী। একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন পদ্ধতি অনুসারে বিচার ফয়সালা করা, শাসন করা ও জীবনের সকল ব্যাপারে শুধু আল্লাহর কাছ থেকেই কর্মের উপায় ও পন্থা অনুসন্ধান ও গ্রহণ করাই হচ্ছে ঈমান ও ইসলাম। এ ছাড়া আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের দাবী পূর্ণ বাস্তবায়িত হতে পারে না। বস্তুত, তাওহীদ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ বা খোদার যাবতীয় গুণ বৈশিষ্ট্যসহ ইলাহ বা খোদা মেনে নেয়া। আর ইলাহের অন্যতম গুণ বৈশিষ্ট্য হলো সার্বভৌমত্ব, মানুষের জন্যে আইন ও জীবন বিধান রচনা করা এবং মানুষকে আল্লাহর আনুষ্ঠানিক এবাদতে নিয়োজিত করা। আমি আগেই বলেছি যে, আলোচ্য সূরা এই বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে।

আমার উপরোক্ত আলোচনায় পূর্ববর্তী বড় সূরাত্রয়ের সাথে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরার অনেকটা মিল পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যেকটি সূরার আলোচনার ধারা, বর্ণনাভংগি, প্রেক্ষাপট ও আবহ স্বতন্ত্র। ফলে প্রতিটি সূরার এক একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

এ সূরার বর্ণনাভংগির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, এতে সব কিছু কঠোর ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আকারে ঘোষিত হয়েছে, চাই তা শরীয়তের হুকুম ও বিধিসমূহের বেলায়ই হোক কিংবা নির্দেশাবলী ও তাত্ত্বিক বক্তব্যের বেলায়ই হোক। আইন ও বিধির ক্ষেত্রে তো এ ধরনের কঠোর ভাষা প্রয়োগই স্বাভাবিক। কিন্তু নির্দেশ ও তত্ত্বের আলোচনায় অন্যান্য সূরায় উদার ভাষা ব্যবহৃত হলেও এ সূরায় ব্যবহৃত হয়েছে কড়া ভাষা। সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

সূরার এই সার্বিক ভূমিকা শেষ করার আগে এর তৃতীয় আয়াতের বক্তব্য নিয়ে কিছু আলোচনা না করে পারছি না। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের জন্যে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে সানন্দে মনোনীত করলাম।'

এ উক্তি একদিকে যেমন মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে এবং তাদের সকল সম্পর্ক-বন্ধন ও স্বার্থের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত চূড়ান্ত বিধানের দিক নির্দেশনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিশ্বাসগত, এবাদতগত ও আইনগত সকল খুঁটিনাটি বিষয়সহ সমগ্র ইসলামের চিরস্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। এতে আর কখনো কোনো পরিবর্তন বা রদবদলের অবকাশ নেই। কেননা ইসলাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তার ভেতরে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই। এর ভেতরে কোনো পরিবর্তন বা সংশোধনের অর্থ দাঁড়ায় গোটা ইসলামকে অস্বীকার করা। কেননা এ দ্বারা আল্লাহর ঘোষিত ইসলামের পরিপূর্ণতা অস্বীকৃত হয়। আর এই অস্বীকৃতি যে সুস্পষ্ট কুফরী, তাতে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। আর ইসলামকে পুরোপুরিভাবে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধান গ্রহণ করা সম্পর্কে কিছু বলাই নিষ্প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং এই সূরায় এ বক্তব্য দিয়েছেন।

এ আয়াতটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, ইসলাম সর্বকালের চিরস্থায়ী জীবন ব্যবস্থা। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম। এটি সর্বকালের জন্যে আল্লাহর মনোনীত আইন, বিধান বা শরীয়ত। এক এক যুগের জন্যে এক এক ধর্ম এবং এক এক শরীয়ত নয়, বরং সর্বকালের জন্যে এটাই একমাত্র শরীয়ত। এটা সর্বশেষ, চূড়ান্ত ও পূর্ণাংগ বিধান। এতে যদি কেউ পরিবর্তন ও সংশোধন আনতে চায়, তবে তার উচিত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করা। কেননা ইসলাম অপরিবর্তনীয়। আর যদি সে অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করে, তবে তাও

গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করে, তার সে ধর্ম কখনো গ্রাহ্য হবে না।' আকীদা বিশ্বাস, এবাদত উপাসনা ও যাবতীয় দৈনন্দিন কার্যকলাপের বিস্তারিত বিধান সম্বলিত এই খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা জীবনের সকল তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং এর কোনো মূলনীতিকে বা ক্ষুদ্র বিধিকে লংঘন না করে জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করার পূর্ণ অনুমতি ও নিশ্চয়তা দান করবে। কেননা ইসলাম এ উদ্দেশ্যেই এসেছে এবং এ কারণেই তা গোটা মানব জাতির সর্বশেষ জীবন বিধান।

এই খোদায়ী বিধানের আওতায় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করার অর্থ এটা নয় যে, এর কোনো মূলনীতি বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধি থেকে জীবন বিচ্ছিন্ন বা উপেক্ষিত থাকবে। এর অর্থ এই যে, এই বিধান স্বভাবতই জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত রাখে এবং তার কোনো মূলনীতি বা বিধি লংঘন না করেই উন্নতির পথ সুগম করে। এ বিধান রচনা করার সময় এই উন্নতি ও অগ্রগতিকে নিশ্চিত করেই তা রচনা করা হয়েছিলো। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন এটিকে তার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রূপ দিয়ে রচনা করেন এবং তাকে পূর্ণতা দান ও মানব জাতির দ্বীন হিসাবে মনোনীত করার ঘোষণা দেন, তখন তাঁর অজানা ছিলো না যে, ভবিষ্যতে মানুষের কত নতুন নতুন চাহিদা ও প্রয়োজন দেখা দেবে। সেই সব চাহিদা ও প্রয়োজনের দাবী কত বেশী ও রকমারি হবে এবং দুনিয়ার কত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হবে। এ সব যখন আল্লাহর অজানা ছিলো না, তখন তাঁর রচিত বিধানে এ সমস্ত উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যবস্থা এবং এ সমস্ত চাহিদা ও প্রয়োজনের দাবী পূরণের নিশ্চয়তা থাকা স্বভাবতই অবধারিত ও অনিবার্য ছিলো। যে ব্যক্তি মনে করে যে, ইসলামে পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগিতর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই এবং পার্থিব চাহিদা ও প্রয়োজনের দাবী পূরণের নিশ্চয়তা নেই, সে আসলে স্বয়ং আল্লাহরই যোগ্যতা, ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।

সূরার আলোচ্য বিষয়ের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এখানেই শেষ করছি এবং এরপর আমরা বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করছি।

সূরা আল মায়েদা

আয়াত ১২০ রুকু ১৬

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا

يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا

الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ

رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ

وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমরা ওয়াদাসমূহ পূরণ করো (মনে রেখো); তোমাদের জন্যে চার পা'বিশিষ্ট পোষা জন্তু হালাল করা হয়েছে, তবে সেসব জন্তু ছাড়া, যা (বিবরণসহ একটু পরেই) তোমাদের পড়ে শোনানো হচ্ছে, এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় কিন্তু (এসব হালাল জন্তু) শিকার করা বৈধ মনে করো না; (হাঁ) আল্লাহ তায়ালা যা চান সে আদেশই তিনি জারি করেন। ২. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অসম্মান করো না, সম্মানিত মাসগুলোকেও (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) কখনো হালাল বানিয়ে নিয়ো না, (আল্লাহর নামে) উৎসর্গীকৃত জন্তুসমূহ ও যেসব জন্তুর গলায় (উৎসর্গের চিহ্ন হিসাবে) পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর পবিত্র (কাবা) ঘরের দিকে রওনা দিয়েছে (তাদের তোমরা অসম্মান করো না), তোমরা যখন এহরামমুক্ত হবে তখন তোমরা শিকার করতে পারো, (বিশেষ) কোনো একটি সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ, (এমন বিদ্বেষ যার কারণে) তারা তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পবিত্র মাসজিদে আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো, যেন তোমাদের (কোনো রকম) সীমালংঘন করতে প্ররোচিত না করে, তোমরা (শুধু) নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারেই একে অপরের সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অপরের সহযোগিতা করো না, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো,

اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (২) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ

وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ

وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا

بِالْأَزْلَامِ ط ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ط اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا

تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ط فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ

لِّإِثْمٍ لا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (৩) يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ

الطَّيِّبٰتُ لا وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ

اللّٰهُ ز فَكُلُوْا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ص وَاتَّقُوا

কেননা আল্লাহ তায়ালা (পাপের) দন্ডদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর! ৩. মৃত জন্তু, রক্ত, শুয়োরের গোশ্‌ত ও যে জন্তু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, (তা সবই) তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিংয়ের আঘাতে মরা, হিংস্র জন্তুর খাওয়া জন্তুও (তোমাদের জন্যে হারাম), তবে তোমরা তা যদি (জীবিত অবস্থায় পেয়ে) যবাই করে থাকো (তাহলে তা হারাম নয়)। পূজার বেদীতে বলি দেয়া জন্তুও হারাম, (লটারি কিংবা) জুয়ার তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করা (হারাম), এর সব কয়টাই হচ্ছে বড়ো (বড়ো) গুনাহের কাজ, আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন (নির্মূল করা) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো; আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনের ব্যবস্থা হিসাবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম; (হারামের ব্যাপারে মনে রেখো,) যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম খেতে) বাধ্য হয়, কিন্তু (ইচ্ছা করে) সে কোনো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়তে না চায় (তার ব্যাপারটা আলাদা), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৪. তারা তোমার কাছ থেকে জানতে চায় কোন্ কোন্ জিনিস তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে? তুমি (তাদের) বলো, সব ধরনের পাক-সাফ বস্তুই (তোমাদের জন্যে) হালাল করা হয়েছে এবং সেসব শিকারী (জন্তু ও পাখীর) ধরে আনা (জন্তু এবং পাখী)-ও তোমরা খাও, যাদের তোমরা (শিকার করার নিয়ম) শিক্ষা দিয়েছো, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, (তবে) এর ওপর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার নাম নেবে,

اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ؗ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ
يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ؗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا

তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ৫. আজ তোমাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিস হালাল করা হলো; যাদের ওপর আল্লাহর কেতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের খাবারও তোমাদের জন্যে হালাল, আবার তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্যে হালাল, (চরিত্রের) সংরক্ষিত দুর্গে অবস্থানকারী মোমেন নারী ও তোমাদের আগে যাদের কেতাব দেয়া হয়েছিলো, যখন তোমরা (তাদের) মোহরানা আদায় করে দেবে, সেসব (আহলে কেতাব) সতী সাধ্বী নারীরাও (তখন তোমাদের জন্যে হালাল হয়ে যাবে), তোমরা (থাকবে চরিত্রের) রক্ষক হয়ে, কামনা চরিতার্থ করে কিংবা গোপন অভিসারী (উপপত্নী) বানিয়ে নয়; যে কেউই ঈমান অস্বীকার করবে, তার (জীবনের) সব কর্মই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের দিনে সে হবে (চরমভাবে) ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।

রুকু ২

৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াবে–তোমরা তোমাদের (পুরো) মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দুটো গোড়ালি পর্যন্ত (ধুয়ে নেবে,) কখনো যদি (এমন বেশী) নাপাক হয়ে যাও (যাতে গোসল করা ফরয হয়ে যায়), তাহলে (গোসল করে ভালোভাবে) পবিত্র হয়ে নেবে, যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো কিংবা তোমরা যদি সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা যদি নারী সম্ভোগ করে থাকো (তাহলে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো), আর যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ؕ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑥ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ۙ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا ؕ اعْدِلُوا ۛ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ⑧ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑩

দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও, (আর তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে, সেই পবিত্র) মাটি দিয়ে তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা কখনো (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে) তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পাক-সাফ করে দিতে এবং (এভাবেই) তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিতে চান, যাতে করে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো। ৭. তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ তোমরা স্মরণ করো এবং তোমাদের কাছ থেকে যে পাকা প্রতিশ্রুতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন (সে কথাও ভুলে যেয়ো না), যখন তোমরা (তাঁর সাথে অংগীকার করে) বলেছিলে (হে আমাদের মালিক), আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং (তা) মেনে নিলাম, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। ৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর জন্যে (সত্য ও) ন্যায়ের ওপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, (মনে রাখবে, বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর ফলে) তোমরা ন্যায় ও ইনসাফ (-এর পথ) থেকে সরে আসবে; তোমরা ইনসাফ করো, কারণ এ (কাজ)-টি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে চলার অধিক নিকটতর; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে (এই বলে) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যে), তাদের জন্যে (তাঁর কাছে বিশেষ) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে। ১০. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারা সবাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝١١

১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করো, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সে হাত তোমাদের ওপর (আক্রমণ করা) থেকে সংযত করে দিলেন, অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, মোমেনদের তো আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত।

তাফসীর

আয়াত ১-১১

'হে মোমেনরা, তোমরা অংগীকার ও চুক্তিগুলো পালন করো.....' (আয়াত - ১)

এ কথা সুবিদিত যে, দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্যে কিছু নিয়ম ও বিধি অত্যাবশ্যক। মানুষ কিভাবে তার ব্যক্তিগত জীবন যাপন করবে, অর্থাৎ তার মন, প্রবৃত্তি বা বিবেকের সাথে কেমন আচরণ করবে, কিভাবে তার ইচ্ছাগুলোকে পূরণ বা নিয়ন্ত্রণ করবে, কিভাবেই বা সে তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মানুষ, জীবজন্তু ও বস্তুসমূহের সাথে আচরণ করবে, মানুষদের মধ্যে যারা নিকটাত্মীয় বা দূরবর্তী আত্মীয়, গোত্র-গোষ্ঠী, সমাজ ও জাতি, শত্রু ও বন্ধু, প্রাণীদের মধ্যে যারা তার অধীন এবং যারা অধীন নয় এবং বস্তুসমূহ, যা এ বিশাল বিশ্বে তার চার পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, এই সবের সাথে সে কিভাবে আচরণ করবে, অতপর তার প্রতিপালক প্রভুর সাথে, যিনি সমগ্র জীবনের উৎস ও ভিত্তি, তাঁর সাথেই বা কিভাবে আচরণ করবে এবং কিভাবে সম্পর্ক রক্ষা করবে– এই সব প্রশ্নের জবাব একটাই: এ সবের জন্যে তার কিছু নিয়ম-নীতি, আইন ও বিধির প্রয়োজন।

ইসলাম মানুষকে এই সব নিয়ম ও বিধিই দিয়ে থাকে। মানুষের জীবনে সে এই সব নিয়ম ও বিধি বাস্তবায়িত করে, এগুলোকে সুস্পষ্ট ভাষায় ও বিশুদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করে, এর সবগুলোকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে এবং এর সম্মান ও আনুগত্য নিশ্চিত করে। ফলে কেউ এগুলোকে লংঘন করে না ও বিদ্রূপ করে না। এ বিধানে যা কিছু নির্দেশ রয়েছে, তা নিছক নিত্য পরিবর্তনশীল প্রবৃত্তির খেয়ালখুশির জন্যে নয় এবং কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি বা প্রজন্মের জন্যেও নয় যে, তারা তাদের স্বার্থে ইসলামের বিধিসমূহ লংঘন করবে। এ বিধান স্বয়ং আল্লাহর রচিত বিধান। আর আল্লাহর রচিত বিধান বলেই তা সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে কল্যাণকর, যদিও তা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি বা প্রজন্মের কাছে কল্যাণকর মনে নাও হতে পারে। কেননা মানুষের কিসে কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ, সেটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন, মানুষ জানে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে সিদ্ধান্ত নেন, তা মানুষের নিজের সিদ্ধান্তের চেয়ে উত্তম। মহান আল্লাহর প্রতি মানুষের অন্ততপক্ষে এতোটুকু ভক্তি-শ্রদ্ধা, আদব ও আনুগত্যবোধ থাকা চাই যে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে যা নির্বাচন করেন, তাকে সে নিজের নির্বাচিত জিনিসের চেয়ে উত্তম মনে করবে। অবশ্য প্রকৃত আদব তো এই যে, আল্লাহর নির্বাচনের সামনে সে নিজের জন্যে কোনো কিছু নির্বাচনই করবে না। আল্লাহর নির্বাচনকে সে সর্বান্তকরণে, সানন্দে ও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে এবং তার সামনে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করবে।

ইসলামের এই সব নিয়ম ও বিধিকেই আল্লাহ তায়ালা 'চুক্তি ও অংগীকার' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহর সাথে মানবজাতির চুক্তি

অংগীকার ও চুক্তি পালনের আদেশের মধ্য দিয়ে সূরার সূচনা, অতপর একে একে যবাই করা জন্তু, খাদ্যপানীয় ও বিয়েশাদীর ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের বর্ণনা, এবাদত ও শরীয়ত সংক্রান্ত বহুসংখ্যক বিধির বিবরণ দান, বিশুদ্ধ আকীদার বর্ণনা, দাসত্ব ও প্রভুত্বের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা, বিভিন্ন জাতির সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের ধরন, আল্লাহর আনুগত্য, ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্যদান ও মানব জাতির অভিভাবকত্ব গ্রহণে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কেতাবের ওপর অগ্রগণ্য কোরআনের সাহায্য গ্রহণ, আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন, আল্লাহর নাযিল করা বিধানের অংশ বিশেষ সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি থেকে সতর্ক হওয়া এবং ব্যক্তিগত পছন্দ, স্বজনপ্রীতি, গোষ্ঠীপ্রীতি ও গোষ্ঠীবিদ্বেষবশত ন্যায় বিচারে ব্যর্থতা থেকে সতর্ক হওয়া ইত্যাদির নির্দেশ প্রদান বিশেষ তাৎপর্যবহ। সূরাটি এভাবে শুরু হয়ে ক্রমাগত এই সব নির্দেশের বর্ণনা দেয়া থেকে বুঝা যায় যে, 'উকূদ' তথা চুক্তি ও অংগীকারের যে প্রাথমিক অর্থ এ শব্দটি শোনার সাথে সাথে মাথায় আসে, এর প্রকৃত অর্থ তার চেয়ে অনেক ব্যাপক। এ থেকে বুঝা যায় যে, চুক্তি ও অংগীকারের অর্থ আল্লাহর রচিত জীবন বিধান ইসলামের প্রতিটি বিধি। তন্মধ্যে সর্ব প্রথম হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, আল্লাহর ইলাহ হওয়ার তাৎপর্য কি তা জানা ও বুঝা, মানুষের আল্লাহর বান্দা হওয়ার দাবী কি তা জানা ও পূরণ করা। এই মৌলিক অংগীকার থেকে সকল অংগীকার ও সকল বিধির উৎপত্তি।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অংগীকার হলো, আল্লাহ তায়ালা যে একমাত্র ইলাহ, রব ও অভিভাবক তা মেনে নেয়ার অংগীকার, পরিপূর্ণ দাসত্বের স্বীকৃতি দানের দাবী মানার অংগীকার এবং আল্লাহর আইন ও নির্দেশাবলীর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও তার সামনে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণের অংগীকার, এই সমস্ত অংগীকার আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ.)-এর কাছ থেকে ঠিক সেই সময়ই গ্রহণ করেছিলেন, যখন তাঁকে পৃথিবীর খেলাফত অর্পণ করছিলেন। এই খেলাফত কোন কোন শর্তে অর্পণ করছিলেন, তা এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

'আমি বললাম, তোমরা সকলে জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতপর যদি তোমাদের কাছে আমার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ আসে, তাহলে যারা আমার নির্দেশ পালন করবে, তাদের আর কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা কোনো দুর্ভাবনায় পড়বে না। আর যারা তা অমান্য করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তারা হবে দোযখবাসী এবং তারা সেখানে চিরদিন বাস করবে।'

অতএব, এই খেলাফত আল্লাহর সেই সব নির্দেশ পালনের শর্তাধীন, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের ওপর তাঁর কেতাবের মধ্য দিয়ে অবতীর্ণ করেছেন। এই শর্ত অমান্য করলে তা হবে খেলাফত ও অর্পিত মালিকানা চুক্তি লংঘনের শামিল। আর যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধানের পরিপন্থী প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গন্য হয়, তাই এই লংঘনের পরিণামেও খেলাফত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং তা আর নতুন করে শুদ্ধিকরণের যোগ্যও থাকবে না। এমনকি, আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি পালন করতে ইচ্ছুক এমন প্রত্যেক মোমেনের জন্যেও এ ধরনের বাতিল চুক্তি প্রত্যাখ্যান করা, স্বীকার না করা এবং এর ভিত্তিতে কোনো লেনদেনকে গ্রাহ্য না করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় সে আল্লাহর সাথে করা চুক্তি লংঘনের দায়ে দোষী হবে।

পরবর্তীকালে আদম (আ.)-এর সন্তানরা যখন তাদের পিতার ঔরসে অবস্থান গ্রহণ করেছে, তখন এই চুক্তি পুনসম্পাদিত হয়েছে। এ বিষয়টি সূরা আ'রাফে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে,

'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন, তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা স্বীকারোক্তি দিচ্ছি।'

এ স্বীকারোক্তি গ্রহণের উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন তোমরা যেন বলতে না পারো যে, আমরা তো এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। কিংবা তোমরা......... (আয়াত ১৭২, ১৭৩) বস্তুত এ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে গৃহীত দ্বিতীয় অংগীকার। এ অংগীকার সম্পর্কে আল্লাহর বর্ণনা এই যে, তিনি আদম সন্তানদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সেই সময়েই এ অংগীকার গ্রহণ করেন, যখন তারা পিতার পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলো। এখানে আমাদের এরূপ প্রশ্ন করার কোনো অবকাশ ও অধিকার নেই যে, এটা কিভাবে গ্রহণ করা হলো? কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অন্য সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন। প্রতিটি সৃষ্টির জীবনকালের কোন স্তরে কিভাবে তার সাথে কথা বলেন এবং কিভাবে তাকে অংগীকারে আবদ্ধ করেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন। তিনি যখন বলছেন যে, তিনি তাদের কাছ থেকে এই মর্মে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন যে, তিনি তাদের প্রতিপালক, তখন আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে যে, এটা নিশ্চয়ই সংঘটিত হয়েছিলো, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন। এরপর তারা যদি তাদের স্বীকারোক্তি ও অংগীকার রক্ষা না করে, তাহলে তারা অংগীকার ভংগকারী হিসাবে চিহ্নিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা যে দিন বনী ইসরাইলের মাথার ওপর পাহাড়কে ছায়ার মতো ঝুলিয়ে ধরেছিলেন এবং তারা ভেবেছিলো যে, পাহাড়টা তাদের ওপর পতিত হবে, সেদিনও তাদের কাছ থেকে তাঁর আদেশ পালনের ওয়াদা নিয়েছিলেন। (সূরা আরাফ, আয়াত ১৭১) আলোচ্য সূরার পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, সেই ওয়াদাও তারা পালন করেনি এবং প্রত্যেক ওয়াদা ভংগকারী আল্লাহর কাছ থেকে যে রকম শাস্তি পেয়ে থাকে, সে রকম শাস্তি তারাও পেয়েছিলো।

আর যারা মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর ঈমান এনেছে, তারা তাঁর হাতে হাত দিয়ে আল্লাহর সাথে এই মর্মে সাধারণ অংগীকার করেছিলো যে, আমাদেরকে যে আদেশই দেয়া হোক, চাই তা ভালো লাগুক বা না লাগুক, চাই তা আমাদের স্বার্থের ও আত্মসম্মানের পরিপন্থী হোক, সর্বাবস্থায় আমরা তা শুনবো ও পালন করবো এবং কোনো অবস্থায় আদেশ প্রদানকারীর সাথে বিবাদ করবো না।

এই সাধারণ অংগীকারের পর কেউ কেউ কিছু বিশেষ অংগীকারেও আবদ্ধ হন। উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় আকাবার চুক্তি– যার ভিত্তিতে রসূল (স.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন- আনসারদের প্রতিনিধিদের সাথে সম্পাদিত হয়েছিলো। আর হোদায়বিয়াতে 'বাইয়াতুর রিযওয়ান' নামক একটি চুক্তি একটি গাছের নিচে সম্পাদিত হয়েছিলো।

হালাল হারামের কতিপয় বিধান

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহর দাসত্বের চুক্তির ওপরই অন্য সমস্ত চুক্তি ও অংগীকারের ভিত্তি, চাই তা আল্লাহর কোনো বিশেষ আদেশ বা নিষেধ সংক্রান্ত শরীয়তের বিধির সাথে সংশ্লিষ্ট হোক অথবা শরীয়তের আওতাধীন মানুষের পারস্পরিক কোনো চুক্তি হোক। এই সকল চুক্তি যথাযথভাবে পালন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মোমেন হিসাবেই এটা তাদের কর্তব্য। ঈমান নামক গুণাটিই তাদের ওপর প্রতিটি শরীয়তসম্মত চুক্তি ও অংগীকার পালনে বাধ্য ও উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্যে আল্লাহর এ নির্দেশ,

'হে মোমেনরা, তোমরা অংগীকারসমূহ পালন করো।' অতপর এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে। (আয়াত ১, ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য)

যবাইকৃত জন্তু, রকমারি খাদ্য, স্থান ও সময়ের মধ্য থেকে কতককে হালাল ও কতককে হারাম করার যে ঘোষণা এই সূরায় দেয়া হয়েছে, তার প্রত্যেকটি এক একটি চুক্তি ও অংগীকার। এসব চুক্তির ভিত্তি প্রাথমিকভাবে সম্পাদিত ঈমানের চুক্তি ও অংগীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, তাদের ঈমানী চুক্তি ও অংগীকার স্বয়ং দাবী জানায় যে, একমাত্র আল্লাহর করা হালাল ও হারামকে যেন তারা মেনে নেয় এবং অন্য কারো ঘোষিত হালাল ও হারামের অনুকরণ ও অনুসরণ না করে। এ কারণেই শুরুতে হে মোমেনরা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অতপর হালাল ও হারামের বিবরণ দেয়া শুরু হয়েছে,

'তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে.... '

অর্থাৎ অন্য কারো পক্ষ থেকে নয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে এই হালাল ঘোষণা তথা তাঁর এই অনুমোদনক্রমেই তোমাদের জন্যে যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তু হালাল হয়েছে, কেবল অচিরেই যে সব জন্তুকে হারাম ঘোষণা করা হবে তা ছাড়া হালাল ঘোষিত চতুষ্পদ জন্তু যবাই করা হোক বা শিকার হিসাবে ধৃত ও নিহত হোক, উভয় অবস্থাতেই হালাল। আর যেগুলোকে হারাম করা হয়েছে তার কতকগুলো নির্দিষ্ট সময় অথবা নির্দিষ্ট স্থানের জন্যে হারাম আর কতকগুলো স্থান ও কাল নির্বিশেষে সর্বতোভাবে হারাম। উল্লেখিত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে গৃহপালিত উট, গরু ও ছাগল-ভেড়া ছাড়া বুনো জন্তুও অন্তর্ভুক্ত। যেমন বুনো গরু, বুনো গাধা ও হরিণ। এরপর এই সাধারণ হালাল থেকে যেগুলোকে ব্যতিক্রমী ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে। এই সব ব্যতিক্রমের মধ্যে সর্ব প্রথম হচ্ছে এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা।

'তবে এহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হালাল করে নিয়ো না।'

এখানে প্রথমত শিকার করার কাজটিকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা হজ্জ ও উমরার জন্যে যে এহরাম বাঁধা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত জীবনোপকরণ ও অভ্যাসগত জীবন যাপন পদ্ধতি থেকে নিজেকে বিরত রাখার নাম এবং আল্লাহর পবিত্র ঘরে থাকা অবস্থায় আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক মনোনিবেশ করনের নাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই ঘরকে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে তৈরী করেছেন। তাই এই গৃহে ও তার চত্বরে যে কোনো প্রাণীর দিকে হাত বাড়ানো থেকে নিবৃত্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। এটা প্রকৃতপক্ষে মানব মনের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় এক সংযম। এই সংযম অবলম্বনের মাধ্যমে জীবনদাতা মহান আল্লাহকে জানানো হয় যে, পৃথীবীর সকল প্রাণী নিজেদের জীবন রক্ষার প্রেরণায় পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে প্রত্যেক প্রাণী নিজের জীবনের নিরাপত্তাও লাভ করেছে এবং অন্যের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছে। এই সংযম ও বিরতির মাধ্যমে মানুষের সেই অর্থনৈতিক চাহিদাসমূহের বোঝা হালকা হয়, যার জন্যে তাকে পশু পাখি শিকার করা ও খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। আর এভাবে সে সাময়িকভাবে হলেও জীবনের প্রচলিত আদত অভ্যাস ও রীতি প্রথার ঊর্ধে উঠে যায় এবং এক পূত পবিত্র উচ্চ মার্গে উন্নীত হয়।

এরপর এই সাধারণ হালালকরণের বিধি থেকে কিছু জিনিসের ব্যতিক্রমের বিবরণ দেয়ার আগে এই চুক্তিকে বৃহত্তর চুক্তির সাথে এবং মোমেনদেরকে সেই বৃহত্তর চুক্তির উৎস মহান আল্লাহর সাথে যুক্ত করা হয়েছে এই বলে,

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই ফয়সালা করেন।'

অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁর সিদ্ধান্ত মুখাপেক্ষীহীন, সার্বভৌম ও নিরংকুশ,এবং আপন ইচ্ছা অনুযায়ী তিনিই এককভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাঁর সিদ্ধান্তের পর আর কেউ সিদ্ধান্ত নিতে বা তাঁর সিদ্ধান্তকে রদ করতে পারে না। আপন ইচ্ছা মতো যে কোনো জিনিসকে হালাল করা ও হারাম করার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

অতপর আল্লাহ মোমেনদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন যেন তারা আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালাল করে না নেয়,

'হে মোমেনরা! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর, নিষিদ্ধ মাসের, কোরবানীর জন্যে কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করো না। তবে তোমরা এহরামমুক্ত হবার পর শিকার করতে পারো।'

এখানে 'আল্লাহর নিদর্শনাবলী'র নিকটতম যে অর্থটি মানসপটে প্রতিভাত হয়, তা হচ্ছে হজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী এবং হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এহরাম বাঁধে, তার ওপর কা'বায় প্রেরিত পশু কোরবানীর মাধ্যমে হজ্জ সমাপন পর্যন্ত যে সব বিধি নিষেধ আরোপিত থাকে, সেগুলো। এহরাম অবস্থায় হজ্জ বা ওমরা আদায়কারীর এসব বিধিনিষেধ লংঘন করা চলবে না। কেননা তাতে স্বয়ং আল্লাহর আরোপিত বিধি নিষেধেরই অবমাননা করা হবে, যিনি এগুলো জারী করেছেন। কোরআনের আয়াতে এই বিধি নিষেধকে যে আল্লাহর সাথে সম্বোধনযুক্ত করা হয়েছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরা এবং এগুলো লংঘন করা থেকে সতর্ক করা।

নিষিদ্ধ মাস দ্বারা নিষিদ্ধ সব কয়টি মাসকেই বুঝানো হয়েছে। এগুলো হচ্ছে রজব, যুলকা'দা, যুলহিজ্জাহ ও মোহাররম। আল্লাহ তায়ালা এই মাসগুলোতে যুদ্ধ ও মারামারি, সংঘাত সংঘর্ষ, দাংগা হাংগামা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ করেছেন। ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবরাও নিষিদ্ধ মাস হিসাবে এগুলোর পবিত্রতা ও মর্যাদা বজায় রেখেছিলো। তবে তারা নিজেদের খেয়ালখুশী মতো এগুলোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। তাদের ধর্মযাজকদের বা প্রভাবশালী গোত্রনেতাদের কথামতো তারা এ সব মাসকে বিলম্বিত করে বছর থেকে বছরান্তরে স্থানান্তরিত করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ তায়ালা এই সব মাসের পবিত্রতা পুনপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই পবিত্রতাকে আল্লাহ কর্তৃক আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকেই কার্যকর আল্লাহর আদেশের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করেন। সূরা তাওবায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারো। আল্লাহ তায়ালা যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছে। এই বারো মাসের মধ্যে চারটে নিষিদ্ধ মাস। এ হচ্ছে স্থিতিশীল বিধান।'

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন যে, কাফেররা যে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে ইচ্ছামত বিলম্বিত করে, সেটা তাদের কুফরীতে বাড়াবাড়ির শামিল। মুসলমানদের ওপর কোনো আগ্রাসনের ঘটনা না ঘটলে আল্লাহর এই আদেশের ভিত্তিতেই তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকবে। তারা আগ্রাসনের শিকার হলে আগ্রাসনের সমুচিত জবাব দেয়ার অধিকার তাদের থাকবে। যারা আগ্রাসন চালায়, তারা নিজেরা নিষিদ্ধ মাসকে মান্য করবে না, অথচ নিষিদ্ধ মাসকে মান্য করার জন্যে মুসলমানদেরকে নসীহত করবে আর তার আড়ালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকবে এবং নিষিদ্ধ মাসের ওজুহাত তুলে প্রতিশোধের হাত থেকে বেঁচে যাবে– এটা মুসলমানরা

চলতে দিতে পারে না। নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি, সেটা আল্লাহ সূরা বাকারায় বর্ণনা করেছেন।

'আল-হাদ্য়ু' বলতে বোঝায় সেই যবাইযোগ্য জন্তু, যাকে হজ্জ বা ওমরাকারী হজ্জ বা ওমরার শেষ পর্যায়ে কোরবানী করার মাধ্যমে হজ্জ ও ওমরার কাজ সম্পন্ন করে। এটি একটি উট, গরু, ছাগল বা ভেড়া হতে পারে। এই জন্তুর অবমাননা করো না- এ কথার অর্থ হলো হজ্জ বা ওমরা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা যবাই করো না, হজ্জের ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট কোরবানীর দিন ছাড়া অন্য কোনো সময় যবাই করো না। ওমরার ক্ষেত্রে তা ওমরার শেষে ব্যতীত যবাই করো না এবং এই পশুর গোশ্ত, চামড়া ও পশমকে নিজে আদৌ ব্যবহার না করে পুরোপুরিভাবে দরিদ্রদেরকে দান করে দাও।

আর 'আল-কালায়িদ' বলতে বুঝায় সেই সব জন্তুকে, যাদের ঘাড়ের ওপর তার মালিকরা একটি চিহ্ন বা প্রতীক ঝুলিয়ে ছেড়ে দেয়। এই প্রতীক দ্বারা জন্তুগুলো যে মান্নতের জন্তু, তা বুঝা যায়। চিহ্ন ঝুলানোর পর জন্তুটিকে বিচরণের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়। অতপর নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে তাকে কোরবানী করা হয়। হজ্জ বা ওমরার কোরবানী করার জন্যে এক ধরনের জন্তুকে ঘাড়ে চিহ্ন ঝুলিয়েও কোরবানীর সময় পর্যন্ত মুক্ত রাখা হয়। এই সব চিহ্নিত জন্তুকে চিহ্ন ঝুলানোর পর নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে যবাই করা যাবে না। 'আল কালায়িদের' সংজ্ঞা সম্পর্কে কেউ কেউ এও বলেছেন যে, কিছু লোক শত্রুর আক্রমণ, প্রতিশোধ বা অন্য কোনো ধরনের আশংকা থেকে নিরাপদে থাকার জন্যে হারাম শরীফের কোনো গাছের অংশবিশেষ নিজের দেহের সাথে ঝুলিয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতো। কেউ তাদের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্যে হাতও বাড়াতো না। এই সমস্ত লোককেও 'আল-কালায়িদ' বলা হতো। যারা শেষোক্ত সংজ্ঞা দেন, তারা বলেন যে, সূরা তাওবার আয়াত 'মোশরেকরা অপবিত্র, তারা যেন মসজিদুল হারামের ধারে কাছেও না যায়' এবং সূরা নিসার আয়াত 'তাদেরকে যেখানে পাও ধরো ও হত্যা করো' নাযিল হবার পর এই সমস্ত লোকের নিরাপত্তা দানের বিধান বাতিল হয়ে গিয়েছিলো। তবে আল কালায়িদের প্রথমোক্ত সংজ্ঞাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ মান্নতের চিহ্ন ঝুলানো জন্তুকেই আল কালায়িদ বলা হয়। আর মান্নত ও কোরবানীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার কারণেই আল কালায়িদকে আল হাদ্য়ের পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে যারা কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে সফরে বেরিয়ে পড়ে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে, তাদেরকেও তিনি নিরাপদ ও সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন, চাই তারা হজ্জের উদ্দেশ্যেই সফর করুক অথবা ব্যবসা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে। কা'বা শরীফের সন্নিহিত হারাম শরীফে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেছেন।

অতপর এহরামের সময় শেষ হয়ে গেলে হারাম শরীফের বাইরে শিকার করা যাবে- হারাম শরীফের সীমার ভেতরে নয়।

বিদ্বেষ কিংবা প্রতিশোধ যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন তোমরা এহরামমুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পারো।' কা'বা শরীফের সন্নিহিত এলাকা হারাম শরীফকে আল্লাহ তায়ালা 'নিরাপদ এলাকা বানিয়েছেন, যেমন চারটে নিষিদ্ধ মাসকে বানিয়েছেন 'নিরাপদ সময়'। ওই এলাকায় মানুষ, পশু, পাখী, গাছপালা যে কোনো রকম আঘাত বা আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ হচ্ছে সেই চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ শান্তি- যা মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার কল্যাণে কা'বা শরীফের চারপাশে সব সময় এবং বৎসরে চার মাস সারা মুসলিম বিশ্বে বিরাজ করে। প্রত্যেক মানুষ এই অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তার

স্বাদ পেতে পারে যদি এর শর্ত পূরণ করে। মানুষকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং নিজের সমগ্র জীবনে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সুযোগ দানের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এই শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান দিয়েছেন।

এই নিরাপত্তার পরিবেশে ও নিরাপদ স্থানের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে অংগীকারে আবদ্ধ মোমেনদেরকে আহবান জানিয়েছেন অংগীকার পূরণের এবং সমগ্র জাতির অভিভাবক হিসাবে ভূমিকা পালনের যে দায়িত্ব তাদের অর্পণ করেছেন তা সকল স্বার্থপরতা, স্বজনপ্রীতি, সংকীর্ণতা ও বৈষম্যের উর্ধে উঠে পালন করার জন্যে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির বছর এবং তার পূর্বে মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয়ার প্রতিশোধ-স্পৃহায় কোরায়শদের ওপর যেন আক্রমণ না চালায়। ক্রমাগত মক্কায় যেতে বাধা দিয়ে দিয়ে কোরায়শরা যদিও মোমেনদের মনে অনেক ক্রোধ, কষ্ট, বেদনা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত করে তুলেছিলো, তথাপি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না । কেননা এ সমস্ত ক্ষোভ ও বেদনার সাথে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য তার মর্যাদা ও ভূমিকার সাথে সংশ্লিষ্ট।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘তোমাদেরকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনো সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।’

এটা নিসন্দেহে আত্মসংযম ও হৃদয়ের ঔদার্যের সর্বোচ্চ স্তর। তবে যে জাতিকে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শক হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার এই স্তরে উন্নীত হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

মানব জাতির সাক্ষী হওয়া, নেতা হওয়া ও অভিভাবক হওয়ার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে এই স্তরে উন্নীত হওয়া মুসলমানদের অপরিহার্য্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই কর্তব্যের খাতিরে মোমেনদেরকে তাদের অতীতের দুঃখ কষ্ট ভুলে না যেয়ে উপায় থাকে না। ভুলে গিয়ে মানব জাতির সামনে ইসলামী চরিত্রের ও মহত্ত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়। আর এভাবেই তারা ইসলামের পক্ষে চমৎকার সাক্ষ্য দিতে পারে এবং মানব জাতিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও তার ভালোবাসায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারে।

এটা একটা বিরাট দায়িত্ব। তবে এর জন্যে ইসলাম মানুষের ওপর সাধ্যাতীত কোনো কাজ চাপিয়ে দেয় না। সে স্বীকার করে যে, মানুষের রাগ হওয়া ও অসন্তোষ প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। তবে রাগের বশে ও বিদ্বেষের বশে কারো ক্ষতি সাধন তথা কারো ওপর আগ্রাসন চালানোর অধিকার তার নেই। অতপর মুসলিম উম্মার জন্যে সৎকাজে ও খোদাভীতিতে পরস্পরের সহযোগিতা করা এবং গুনাহর কাজ ও বাড়া বাড়িতে সহযোগিতা না করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাকে ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আত্মসম্বরণ ও ক্রোধ সংযমের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং খোদাভীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মহত্ত্ব ও মহানুভবতা প্রদর্শন করতে পারে।

আল্লাহর বিধানের আলোকে যে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ইসলাম চালু করেছে, তা আরবদের মনমানসে আত্মসংযম ও খোদাভীতির ন্যায় শক্তিশালী গুণাবলী ও মহৎ চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো। অথচ ইসলামের পূর্বে তারা ছিলো এসব গুণাবলী থেকে অনেক দূরে। আরবদের প্রচলিত রীতি ও প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য ছিলো, ‘তোমার ভাই, যালেমই হোক বা মযলুমই হোক,

সর্বাবস্থায় তাকে সাহায্য করো।' এটি ছিলো জাহেলিয়াতের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির শ্লোগান। তাদের দৃষ্টিতে গুনাহ ও আগ্রাসনের সহযোগিতা করাই ছিলো সৎকাজ ও খোদাভীতির কাজে সহযোগিতা করার চেয়ে অগ্রগণ্য। সত্যের পরিবর্তে বাতিলের সাহায্যের জন্যেই মৈত্রী গড়ে উঠতো। সত্যের পক্ষকে সাহায্য করার জন্যে মৈত্রী গড়ে উঠতো কদাচিত। যে সমাজে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক থাকে না এবং যে সমাজের চরিত্র ও ঐতিহ্য আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর নির্ধারিত মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত হয় না, সে সমাজে এটাই স্বাভাবিক। সে সমাজের সাধারণ মনোভাব উল্লেখিত প্রবাদ বাক্যটির মধ্য দিয়েই সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় যে 'তোমার ভাই যালেম হোক কি মযলুম হোক, তার পক্ষ সমর্থন করো।' এই নীতির পক্ষেই বক্তব্য রেখেছেন জনৈক জাহেলী কবি একটু ভিন্ন ভাষায়,

'আমি সর্বাবস্থায় যুদ্ধের পক্ষে, তা যদি ন্যায়ের পক্ষে হয় তবে আমি ন্যায়পন্থী আর যদি অন্যায়ের পক্ষে হয় তবে আমি অন্যায়পন্থী।'

অতপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটলো। এলো আল্লাহর বিধান। মোমেনদেরকে দিল মহান নির্দেশ,

'তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোনো সম্পদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনো সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে।..........'

ইসলাম এসেছিলো মানুষের মনকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করতে, মানুষের চরিত্র ও মূল্যবোধকে আল্লাহর মানদন্ড অনুসারে গড়ে তুলতে, আরব জাতিকে ও সমগ্র মানব জাতিকে জাহেলিয়াতের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির আবিলতামুক্ত করতে এবং ব্যক্তিগত গোত্রীয় ও পারিবারিক অহমবোধ থেকে মুক্ত হয়ে বন্ধু ও শত্রুর সাথে ন্যায়ভিত্তিক আচরণ শেখাতে।

ইসলামের এই মহৎ শিক্ষার প্রভাবে আরব উপদ্বীপের মানুষ নবজন্ম লাভ করলো। তারা আল্লাহর চরিত্রের অনুকরণে নিজেদের চরিত্র গড়ে তুললো। এভাবে শুধু আরবে নয়, সারা বিশ্বে এক নতুন মানুষের জন্ম হলো। আরবে ও সারা পৃথিবীতে ইসলামের পূর্বে অন্ধ বিদ্বেষপরায়ণ এক জাহেলী সভ্যতা বিরাজ করতো। সে সভ্যতার শ্লোগান ছিলো, তোমার ভাই ন্যায় করুক আর অন্যায় করুক, সে তোমার ভাই, তাকে সাহায্য করো।'

জাহেলিয়াতের গভীর আবর্ত আর ইসলামের সুউচ্চ চূড়ার মাঝে বিশাল ব্যবধান। সে ব্যবধান জাহেলিয়াতের উক্তি, 'তোমার ভাই ন্যায় করুক আর অন্যায় করুক, তার পক্ষ নাও ও তার সাহায্য করো' এবং মহান আল্লাহর উক্তি, 'তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎ কাজে ও খোদাভীতিতে সহযোগিতা করো....' এই দুই উক্তির মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত, উভয় উক্তির মাঝে আকাশ পাতালের ব্যবধান রয়েছে।

কতিপয় হারাম জিনিষের বর্ণনা

চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে হালাল ঘোষণা করার পর এ বিধানের ব্যতিক্রমের বিবরণ দেয়া হচ্ছে,

'তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃতদেহ, রক্ত, শুকরের গোশ্‌ত .....' (আয়াত ৩)

মৃতদেহ, রক্ত ও শুকরের গোশত সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা এবং মানবীয় জ্ঞানের চৌহদ্দীর ভেতরে এই নিষেধাজ্ঞার যেটুকু যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়, তার বিবরণ ইতিপূর্বে সূরা বাকারার একই বিষয় সম্বলিত আয়াতের তাফসীরে তুলে ধরা হয়েছে। (যিলাল, ১ম খন্ড, আয়াত ১৭৩ দ্রষ্টব্য) মানবীয় জ্ঞানে এই নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হোক বা না হোক, মহান আল্লাহ তায়ালা নিজের নির্ভুল জ্ঞান অনুসারে এ কথা অকাট্যভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এই

সব খাদ্য মোটেই পবিত্র নয়। আল্লাহর এই ঘোষণাই যথেষ্ট। তিনি নোংরা ও অপবিত্র জিনিস এবং কোনো না কোনো দিক দিয়ে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর জিনিস ছাড়া আর কিছুই নিষিদ্ধ করেন না। এই ক্ষতিকর জিনিসকে মানুষ ক্ষতিকর বলে জানুক বা না জানুক, তাতে কিছুই এসে যায় না। প্রশ্ন এই যে, মানুষ কি তার জন্যে যা কিছু ক্ষতিকর ও উপকারী, তার সবই জেনে ফেলেছে?

আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে যবাই করা কিংবা আদৌ কারো নাম না নিয়ে যবাই করা জন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, এ খাদ্যটি মূলত ঈমানের পরিপন্থী। ঈমান হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মেনে নেয়ার নাম। এর আরেক নাম তাওহীদ। আর তাওহীদ বিশ্বাসের প্রথম দাবী এই যে, প্রত্যেকটি কাজের শুরুতে এবং প্রতিটি কাজের ইচ্ছা করা ও সংকল্প গ্রহণ করার সময় আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি তৎপরতা আল্লাহর নাম উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হতে হবে। সুতরাং আল্লাহর নাম ছাড়া অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যে কাজ সম্পন্ন হয় বা যে জিনিস তৈরী হয়, তা হারাম। কেননা তার ভিত্তিই ঈমানের বিরোধিতা তথা বেঈমানীর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা ঈমান থেকে উৎপন্ন নয়। কাজেই তা এদিক দিয়ে একটা নোংরা ও অপবিত্র জিনিস এবং মৃতদেহ, রক্ত ও শূকরের গোশত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নোংরা ও অপবিত্র জিনিসগুলোর সমান। আর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা জন্তু, কাঠ, পাথর প্রভৃতির আঘাতে মরা জন্তু, উচ্চস্থান থেকে, পাহাড় থেকে নীচে বা কুয়ার ভেতরে পড়ে মরা জন্তু, অন্য কোনো পশুর গুঁতো বা খুরের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে কোনো হিংস্র পশুর খাওয়া তথা শিকারে পরিণত হয়ে মরা জন্তু, এই সবই এক এক ধরনের মৃতদেহ, যখন এগুলোর মধ্যে প্রাণ থাকতে থাকতে যবাই করা সম্ভব হয় না।

'তবে তোমরা যা যবাই করতে পেরেছো তা ছাড়া।'

এই শ্রেণীটি সম্পর্কে স্বতন্ত্র বিধি থাকার ব্যাপারে যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে, সে জন্যে একে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে একাধিক ফেকাহ শাস্ত্রীয় মতামত রয়েছে এবং বিশেষত, যবাই সংক্রান্ত বিধি ও কখন কোন্ পশুকে যবাই করা জন্তু ধরা যাবে, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যে জন্তু এমন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, যা তাকে দ্রুত বা অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাকে যবাই করা হলেও তা হালাল হবে না বলে একটি মত রয়েছে। অন্য মতে এ ধরনের জন্তুকে প্রাণ থাকতে থাকতে যবাই করা হলে তা হালাল হবে, চাই আঘাত যে ধরনেরই হোক না কেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে সংশ্লিষ্ট ফেকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

'নুসুব' তথা কা'বার মূর্তিসমূহের বেদীর ওপর যবাই করা জন্তুও হারাম। এমনকি তাতে যদি আল্লাহর নাম নেয়া হয় তবুও হারাম। কেননা এতে শেরেকের মনোভাব জড়িত থাকে। কা'বা ছাড়া যে কোন মূর্তিপূজার বেদীতেই যবাই করা হোক, তা হারাম হবে। উল্লেখ্য যে, জাহেলিয়াতের যুগে মোশরেকরা কাবা শরীফের কাছে পশু বলি দিতো এবং তার রক্ত দিয়ে কাবা শরীফকে ধৌত করতো।

আর সর্বশেষে এসেছে জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়ের প্রসংগ। জাহেলি যুগে আরবরা তিনটে, মতান্তরে সাতটা তীর দিয়ে কোনো কাজ করবে, না বর্জন করবে, সে ব্যাপারে মত স্থির করতো। এই তীরগুলো দিয়ে তারা জুয়াও খেলতো। এর মাধ্যমে একটা উটের ভাগ-বাটোয়ারা করা হতো। প্রত্যেক জুয়াড়ির জন্যে একটা তীর থাকতো। অতপর সেই তীর ঘোরানো হতো। যখন কারো তীর বের হতো, তখন সে ওই উট থেকে তীরের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে অংশ পেতো। আল্লাহ তায়ালা এই তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণের গোটা প্রথাটাই হারাম করে দিলেন। কেননা এটা এক ধরনের জুয়া। আল্লাহ তায়ালা এই পন্থায় বন্টনকৃত গোশতকেও হারাম করে দিলেন।

হারাম খেতে একান্ত মজবুর হয়ে গেলে—

'তবে কেউ পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কেবল ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতো ক্ষুধার্ত হয় যে, কিছু না খেলে মারা যাওয়ার আশংকা অনুভব করে, সে এই সব হারাম জিনিস খেতে পারে। তবে এ জন্যে শর্ত এই যে, সে গুনাহর কাজ করতে এবং হারাম খেতে ইচ্ছুক হবে না। এই অনন্যোপায় অবস্থায় সে কী পরিমাণে খেতে পারবে, তা নিয়ে ফেকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, শুধু জীবন বাঁচানো যায় এতোটুকু খেতে পারবে। কেউ বলেন, তৃপ্ত হয়ে খেতে পারবে। কেউ বলেন, খাদ্যের অভাবের আশংকা করলে কিছু খাদ্য পুঁজি করেও রাখতে পারবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণে আমি যাচ্ছি না। শুধু এতোটুকু বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, ইসলাম মানুষের জন্যে সহজে জীবন ধারণের ব্যবস্থা রেখেছে এবং অস্বাভাবিক ও জরুরী অবস্থায় সংকট এড়িয়ে চলা যায় এমন বিধান দিয়েছে। আর সর্বক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত নিয়ত এবং আল্লাহর প্রতি সমর্পিত আল্লাহভীতি ও সংযমের ওপর নির্ভর করেছে। যে ব্যক্তি কোনো পাপের বাসনা ও নিয়ত ছাড়াই নিছক বাধ্য হয়ে হারাম খাদ্য খায়, তার কোনো গুনাহ এবং কোন শাস্তি হবে না।

'আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

'দ্বীন পরিপূর্ণ' কথাটির আসল তাৎপর্য

হারাম খাদ্য সংক্রান্ত বিধি নিয়ে আলোচনার পর এ আয়াতের মাঝখানে অবস্থিত আল্লাহর অপর একটি উক্তি নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করতে চাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করলাম।'

আয়াতের এ অংশটুকু কোরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া অংশ। এতে রেসালাতের পরিপূর্ণতা ও আল্লাহর নেয়ামতের সম্পূর্ণতা ঘোষণা করা হয়। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হযরত ওমর (রা.) এ আয়াত শুনে অনুভব করেছিলেন যে, পৃথিবীতে রসূল (স.)-এর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। কেননা তিনি তাঁর আমানত তথা রেসালাতের দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করেছেন। এখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজ বাকী নেই। তাঁর মন আঁচ করতে পেরেছিলো যে বিচ্ছেদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই তিনি কেঁদে ফেলে ছিলেন।

কতিপয় যবাই করা জন্তুকে হালাল ও কতিপয় জন্তুকে হারাম ঘোষণা সম্বলিত আয়াতের মাঝখানে এই গুরুত্বপূর্ণ কথা কয়টি বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে এই সূরার উদ্দেশ্য কী কী তা আমি বর্ণনা করেছি। তারই প্রেক্ষাপটে একথাগুলো বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য কী হতে পারে? এর একটি তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর শরীয়ত একটি অবিভাজ্য একক ও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান। এতে আকীদা বিশ্বাস, মতাদর্শ ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত সংক্রান্ত যা কিছু আছে, হালাল ও হারাম সংক্রান্ত যা কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে যেসব বিধি ব্যবস্থা রয়েছে, তার সব কিছুর সমন্বয়েই এই দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা গঠিত এবং এই গোটা জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, তিনি একে পূর্ণাংগ করে দিয়েছেন, এই দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থাই সেই নেয়ামত, যাকে তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন বলে মোমেনদেরকে জানিয়েছেন। এই দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থায় আকীদা বিশ্বাস ও মতাদর্শ সংক্রান্ত যা কিছু বক্তব্য রয়েছে, আনুষ্ঠানিক এবাদাত সম্পর্কে যা কিছু বিধি রয়েছে, হালাল হারাম সম্পর্কে যা কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে,

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে যা কিছু পথ-নির্দেশ রয়েছে, সে সবের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা প্রভেদ নেই। এই সব কিছু মিলেই আল্লাহর সেই বিধান গঠিত, যা আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে মনোনীত করেছেন। এই বিধানের কোনো একটি অংশকেও অমান্য করা গোটা বিধানকে অমান্য করা, অস্বীকার করা ও পরিত্যাগ করার শামিল।

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, আল্লাহর রচিত এই বিধানের কোন একটি জিনিসও অস্বীকার করা বা তাকে মানব রচিত বিধান দ্বারা পরিবর্তিত করা স্পষ্টতই আল্লাহর একক ও একমাত্র আইনদাতা ও সার্বভৌম মালিক, মনিব তথা ইলাহসুলভ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা ও তাকে কোনো মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করার শামিল। এটা পৃথিবীতে আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বকে খর্ব করার অপচেষ্টা এবং তাঁর ইলাহসুলভ আধিপত্যের বৃহত্তম বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমত্বকে মানুষ কর্তৃক দাবী করার মাধ্যমে স্বয়ং ইলাহ বা খোদার আসনে আসীন হবার পর্যায়ভুক্ত। এর সুস্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তা থেকে কার্যত বেরিয়ে যাওয়া।

'আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেছে ....'

অর্থাৎ তারা এই দ্বীনকে তথা ইসলামকে বা এর অংশ বিশেষকে অচল ও বাতিল করে দিতে পারবে বা বিকৃত করতে পারবে– এ ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা স্থির করেছেন যে, ইসলাম চিরদিন টিকে থাকবে এবং পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসাবেই টিকে থাকবে। ইসলামের শত্রুরা কখনো কখনো কোথাও কোথাও মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে পেরেছে বটে, তবে ইসলামকে পরাজিত বা তার ক্ষতি করতে পারেনি। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা অটুট ও অক্ষতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে, তা ধ্বংসও হয়নি, বিকৃতও হয়নি। যদিও ইসলামের শত্রুরা একে বিকৃত করার জন্যে সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে জোরদার চেষ্টা চালিয়েছে এবং স্বয়ং মুসলমানরাও কোনো কোনো যুগে ইসলামের জ্ঞানার্জনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এমন অন্তত একটি দল সব সময় বহাল রেখেছেন, যারা আল্লাহর এই দ্বীনকে জানে, অনুসরণ করে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সংগ্রাম করে, অক্ষত ও অটুট রাখে এবং পরবর্তী দলের কাছে তাকে হস্তান্তর করে। এভাবেই আল্লাহর এই দ্বীন সম্পর্কে কাফেরদের হতাশ হওয়ার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে।

'কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো।'

কেননা কাফেররা কখনো ইসলামের ক্ষতি করতে পারবে না। মুসলমানদেরকেও তারা ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তবে মুসলমানরা স্বয়ং তা থেকে বিচ্যুত হতে পারে। ফলে তারা ইসলামের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসাবে বহাল থাকে না। ইসলামের দাবী পূরণ ও তার প্রতি দায়িত্ব পালন করে না এবং নিজেদের জীবনে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত করে না।

প্রাথমিকভাবে এ নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা মদীনার মুসলিম জামায়াতকে দিলেও এটা শুধু সেই প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা সর্বকালের সকল স্থানের মুসলমানদের জন্যে প্রযোজ্য। ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে যারা গ্রহণ করে নিয়েছে, সেই মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাংগ করে দিলাম ....।'

এই আয়াত নাযিল হবার দিন অর্থাৎ বিদায় হজ্জের দিন এই দ্বীনকে আল্লাহর পূর্ণাংগ করে দেয়ার অর্থ এই যে, এতে আর কেউ কিছু সংযোজন করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের ওপর তার এই শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিয়ে এই পূর্ণাংগ বিধান ইসলাম মনোনীত করলেন এরপর যে ব্যক্তি একে গোটা জীবনের একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করবে না, সে আল্লাহর মনোনীত বিধানকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করবে।

প্রত্যেক মোমেনের জন্যে এই তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যটিতে বহু মূল্যবান তত্ত্ব গভীর অর্থই নির্দেশাবলী এবং বহু দায়িত্ব ও কর্তব্যের সংকেত রয়েছে।

প্রথমত, তাকে ভেবে দেখতে হয় দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার বক্তব্যটি নিয়ে। এ বক্তব্যটি নিয়ে ভাবতে গিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ রসূল ও বিশ্ব নবী মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত বিশাল ও দীর্ঘ ঈমানী কাফেলা ও নবীগণের মিছিল। এই কাফেলার দিকে তাকিয়ে সে কী দেখতে পায়? দেখতে পায় যে, এই হেদায়াত ও আলোর মিছিলে শেষ নবীর পূর্বে আগত প্রত্যেক নবী তাঁর নিজ জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর নবুওত কোনো একটি নির্দিষ্ট যুগ, নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠী ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও পরিবেশের জন্যে এসেছিলো। তাই সেই সব নবুওত সংশ্লিষ্ট যুগ, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে নিজেকে সমন্বিত করে নিতো। যদিও প্রত্যেক নবী এক আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নেয়ার ও আনুগত্য করার আহবান জানাতেন, কেননা সকলেই একই দ্বীন তথা ইসলামেরই আহবায়ক ছিলেন, কিন্তু নির্দিষ্ট যুগ, সমাজ, পরিবেশ ও স্থানের সাথে সামঞ্জস্যশীল বাস্তব জীবনের জন্যে তাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র শরীয়ত তথা আইন ও বিধান থাকতো।

সবার শেষে যখন আল্লাহ তায়ালা চাইলেন যে, গোটা মানব জাতির কাছে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিধান বা শরীয়ত পাঠাবেন এবং কোনো সীমিত ও বিশেষ স্থান, কাল, পরিস্থিতি বা জাতির জন্যে নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্যে পাঠাবেন, তখন তিনি অনাগত কালের সমগ্র মানব জাতির কাছে তার শেষ নবীকে পাঠালেন। তিনি স্থান কাল ও পরিবেশের উর্ধে উঠে কেবল মানুষকে সম্বোধন করলেন ও আল্লাহর বিধান দিলেন। তিনি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে সম্বোধন করলেন, যা অপরিবর্তনীয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহর স্বভাবের ওপরই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যার কোন পরিবর্তন নেই। এ হচ্ছে চিরস্থায়ী ও অটুট বিধান। এই শেষ নবীর মাধ্যমে তিনি এমন এক শরীয়ত দিলেন, যা মানব জাতির সকল দিক ও সকল তৎপরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রযোজ্য। এ শরীয়ত তার জন্যে এমন মৌলিক বিধি ও নীতিমালা দিলো, যা সকল পরিবর্তনশীল অবস্থা ও স্থান-কালের সাথে সংগতিপূর্ণ। আবার তাকে এমন খুঁটিনাটি বিধিও দিলো, যা স্থান ও কালের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না। এভাবে সামগ্রিকভাবে এই শরীয়ত মানুষের কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে সকল চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের উপযুক্ত মৌলিক ও বিস্তারিত বিধান দিলো, যাতে তা চিরস্থায়ী হয় এবং উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। তাই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে বললেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ....'

অর্থাৎ তিনি ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস, নীতিমালা ও খুঁটিনাটি বিধান সব কিছুকেই এক সাথে পূর্ণতা দান করলেন। এটাই দ্বীন, এটাই ইসলাম। মোমেনের এ কথা কল্পনা করারও অবকাশ রাখা হয়নি যে, এতে কোনো অসম্পূর্ণতা রয়েছে, যার পূর্ণতা দেয়া হবে এবং কোনো কিছু সংযোজন করা যাবে কিংবা কোনো সাময়িক বা আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যাকে সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। এমনটি ভাবলে সে মোমেন থাকবে না এবং আল্লাহর মনোনীত বিধানের গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে না।

যে যামানায় কোরআন নাযিল হয়েছে, সেই যামানার শরীয়ত আসলে সকল যুগ যামানার শরীয়ত। কোনো নির্দিষ্ট জাতির, গোষ্ঠীর বা প্রজন্মের জন্যে কিংবা কোন বিশেষ স্থানের জন্যে নয়, যেমন পূর্বেকার যুগে নবী ও রসূলগণ নির্দিষ্ট যুগ ও স্থানের জন্যে শরীয়ত নিয়ে আসতেন।

বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি যে সব বিধান ইসলামের রয়েছে, তা যেমন আছে তেমনই থাকবে। আর মৌলিক বিধানগুলোর অধীন কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ জীবন যাপন করবে এবং এর আওতায়

জীবনে পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হতে থাকবে। এগুলোকে অস্বীকার করা ঈমান পরিত্যাগ করার শামিল হবে।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে তার স্রষ্টাই সবচেয়ে ভালো জানে ও চিনে, তাই তিনিই তার জন্যে এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। এই দ্বীনের আওতাধীন রয়েছে এর বিস্তারিত বিধান তথা শরীয়ত। কাজেই একথা বলা যাবে না যে, অতীতের শরীয়ত আজকের জন্যে প্রযোজ্য নয়। একথা শুধু সেই ব্যক্তি বলতে পারে যে নিজেকে আল্লাহর চেয়ে বেশী জ্ঞানী মনে করে এবং মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে আল্লাহর চেয়েও বেশী বিজ্ঞ বলে দাবী করে।

যে ঈমান মানবজাতিকে মানুষে পরিণত করে

দ্বিতীয় পর্যায়ে মোমেনের যে জিনিসটা ভেবে দেখা উচিত তা হচ্ছে, ইসলামকে পূর্ণ করার মাধ্যমে মোমেনদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত কিভাবে পূর্ণ করা হলো। বস্তুত এটি হচ্ছে এক বিরাট ও বিশাল নেয়ামত। এই নেয়ামতই প্রকৃতপক্ষে মানুষকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করে এবং মানুষ হিসাবে তার জন্ম, বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন করে। বস্তুত, ইসলাম মানুষের কাছে যেভাবে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে, সেইভাবে যতোক্ষণ সে আল্লাহকে না চিনবে, যেভাবে তার কাছে বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচয় তুলে ধরেছে, সেইভাবে তাকে না চিনবে, যেভাবে এই বিশ্ব প্রকৃতিতে তার অবস্থান ও ভূমিকা চিহ্নিত করেছে, সেইভাবে তা উপলব্ধি না করবে, ততক্ষণ প্রকৃত মানুষ হিসাবে তার অস্তিত্ব বহাল হবে না। অনুরূপভাবে, মানুষ যতোক্ষণ একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার মাধ্যমে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত না হবে এবং একমাত্র আল্লাহর রচিত আইন ও বিধানের আনুগত্য করার মাধ্যমে ও সকল মানব রচিত আইনকে ও মানুষের সার্বভৌম কর্তৃত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা না করবে, ততোক্ষণ মানুষ হিসাবে তার অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য হবে না।

এই সকল মহান তত্ত্ব ও তথ্যের যে বিবরণ ইসলাম দিয়েছে, তা জানাই মানুষের 'মানুষ' হিসাবে জন্মের সূচনা। এ সব কথা না জানলে মানুষকে একটা 'প্রাণী' হিসাবে কিংবা অসম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে নয়। আর এই দুই ধরনের মানুষের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান।

মানুষকে এই সব তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করার মাধ্যমেই তার মনুষ্যত্বকে পূর্ণতা দান করা সম্ভব। মানুষকে আল্লাহ, ফেরেশতা, কেতাব, রসূল ও আখেরাতে বিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে পারলেই তাকে পশুর স্তর থেকে মানুষের স্তরে উন্নীত করা যায়। পশু তো শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসকেই অনুভব করে। কিন্তু মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত উভয় জিনিসকেই উপলব্ধি করে। সে দৃশ্য জগত ও অদৃশ্য জগত উভয়কে চিনে। জড় জগত ও আধ্যাত্মিক জগত উভয়কে জানে এবং নিজেকে নিছক পশুসুলভ সীমিত ও সংকীর্ণ অনুভূতি থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। ইসলাম মানুষকে তাওহীদে বিশ্বাসী বানানোর মাধ্যমে প্রকৃত ও পূর্ণাংগ মানুষে পরিণত করে। এভাবে সে তাকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দাসত্বে উন্নীত করে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সকল সৃষ্টির সাথে তার সমতা, স্বাধীনতা ও মহত্ত্ব প্রমাণ করে। সে তখন একমাত্র আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্য করে, একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই জীবনের নিয়ম, নীতি ও বিধান গ্রহণ করে, একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করে এবং একমাত্র তাঁকেই ভয় করে। তাকে একমাত্র খোদায়ী বিধানের অনুগত বানিয়েই ইসলাম মানুষকে কল্যাণমুখী, গঠনমুখী ও উন্নয়নমুখী করে গড়ে তোলে এবং পাশবিক নীচতা ও হীনতার উর্ধে উন্নীত করে।

যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মর্ম বোঝে না এবং তার পরিণাম কি জানে না, সে বুঝবে না আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কত বড় নেয়ামত এবং তার যথাযথ মূল্যায়নও সে করতে পারবে না।

জাহেলিয়াত হচ্ছে সেই জীবন বিধান, যা আল্লাহ তায়ালা রচনা করেননি। জাহেলিয়াত কি, তার পরিণতি কি, চিন্তায়, বিশ্বাসে ও বাস্তব জীবনে তা কিরূপ বিপর্যয় ঘটায়, তা যে ব্যক্তি জানে, সেই বোঝে ইসলাম কতো বড় নেয়ামত। জাহেলী মতাদর্শে কি সাংঘাতিক বিভ্রান্তি ও গোমরাহী ডেকে আনে, সে-ই জানে ঈমান কতো বড় নেয়ামত, সেই এই নেয়ামতের স্বাদ পায়। জাহেলী জীবন ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা ও চরম ভাবধারার বিষয় যারা অবহিত, তারাই বোঝে ইসলামের অধীন জীবন যাপন কতো বড় নেয়ামত।

যে আরব জাতিকে এই কোরআন প্রথম সম্বোধন করেছিলো, তারা এই কথাগুলোর সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতো। কেননা এ কথাগুলোর মর্ম তাদের বাস্তব জীবনে বিদ্যমান ছিলো। কোরআনের সমকালীন প্রজন্ম ছিলো এই জাহেলিয়াতের প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। জাহেলিয়াতের মতাদর্শ, সমাজ ব্যবস্থা, সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিলো। এ অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের পক্ষে আল্লাহর এই দ্বীনের তাৎপর্য, তার উপকারিতা ও কল্যাণকরিতা উপলব্ধি করা সহজ ছিলো।

জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মানবজাতির মুক্তি

ইসলাম আরবদেরকে জাহেলিয়াতের চরম অধপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলো। মূর্তিপূজা, ফেরেশতা পূজা, জিনপরি ও ভূত প্রেতের পূজা, নক্ষত্রপূজা ও পূর্ব পুরুষের পূজার ন্যায় বহু কুসংস্কার ও বিকৃত আকীদা বিশ্বাস থেকে উদ্ধার করেছিলো। সে তাদেরকে তাওহীদের সর্বোচ্চ চূড়ায় উন্নীত করতে চেয়েছিলো, যেখানে একমাত্র সর্বশক্তিমান, সর্বজয়ী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বোচ্চ, পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারক, সকলের নিকটতম ও দোয়া কবুলকারী একক খোদার প্রতি ঈমান এনেই পৌঁছা যায়। সেই মহান আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। তিনি ছাড়া আর সবাই তার বান্দা ও দাস। এ জন্যেই ইসলাম যেদিন তাদেরকে অলীক ধ্যান ধারণা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেছে, সেই দিন ধর্মযাজকদের আধিপত্য ও রাষ্ট্রের আধিপত্য থেকেও মুক্ত করেছে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও ইসলাম আরবদেরকে এক করুণ ও দুঃসহ অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলো। শ্রেণী বৈষম্য, খারাপ রীতিপ্রথা এবং ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালীদের একনায়কসুলভ আচরণ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলো। (আরবদের সামাজিক জীবন গণতন্ত্রসম্মত ছিলো এই মর্মে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা সঠিক নয়।)

সমগ্র আরব উপদ্বীপের জাহেলিয়াত যুগের শাসকদের ভাষায় শাসিতদের ওপর যুলুম অত্যাচার চালানোর ক্ষমতা ছিলো সম্মান ও মর্যাদার সমার্থক। কবি নাজাশী জনৈক গোত্রপতিকে শুধু এজন্যে দুর্বল বলে সমালোচনা করেছিলেন যে,

‘তার গোত্র কারো অংগীকার ভংগ করে না
মানুষের ওপর এক তিল পরিমাণও যুলুম করে না।’

শুধু লাঠির জোরে হাজার ইবনুল হারিস বনু আসাদকে গোলামে পরিণত করে আরবের রাজা হয়েছিলো। আর তাদের কবি উবাইদ ইবনুল আরবাস তাকে এই বলে তোষামোদ করেন,

‘তোমাকে কেয়ামত পর্যন্ত তাদের রাজা আর তাদেরকে গোলাম বানানো হয়েছে। সুশ্রী উটকে যেমন নাকে দড়ি দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করানো হয়েছে, তেমনি তাদেরকেও বশ্যতা স্বীকার করানো হয়েছে।’

উমার ইবন হিন্দ যখন জনগণকে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতে বাধ্য করলো এবং গোত্রপতিদের সব মায়েরা তার বাড়ীতে ঝি-গিরি করতে নারায হলে তাদেরকে কঠোরভাবে শাসিয়ে দিল, এরপর সে আরবের রাজা হয়ে গেলো।

নুমান ইবনুল মুনযিরও সীমাহীন অত্যাচার করতে করতে আরবের রাজা হয়ে গেলো। সে সপ্তাহের একদিনকে এ জন্যে নির্ধারিত করেছিলো যে, সেই দিন তার কাছে যেই আসবে, তাকেই বিপুল পরিমাণ বখশিস দেবে, চাই সে যতোই বেয়াদবী করুক বা অশিষ্টাচারী হোক। আর একদিনকে এজন্যে নির্দিষ্ট করে করে রেখেছিলো যে, সেই দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সামনে যেই আসবে সে তাকেই হত্যা করবে।

কুলাইব ওয়ায়েলের প্রতাপ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, যেখানেই তার কোনো শিকার পছন্দ হতো, সেখানে সে তার ছোট কুকুরটিকে পাঠিয়ে দিতো। আর এ জন্যেই কুলাইব নামে খ্যাত হয়ে গেছে (কুলাইব অর্থ ছোট কুকুর)। ফলে ওই এলাকার কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে কেউ কাছে আসতে সাহস পেতো না। সে ঘোষণা করে দিয়েছিলো যে, 'ওয়াদী আউফ' অঞ্চলে (তার শাসনাধীন এলাকার নাম) কোনো স্বাধীন লোক থাকতে পারবে না। কেননা সে মনে করতো, তার প্রতিবেশীদের কেউ স্বাধীনভাবে বসবাস করলে তার মর্যাদাহানি ঘটে। তাই সে এলাকার সকল স্বাধীন মানুষকে নিজের গোলাম মনে করতো। (হাকায়েকুল ইসলাম ওয়া আবাতিলু খুসুমিহী, অধ্যাপক আল আক্কাদ, ১৫০-১৫১)

ইসলাম সামাজিক রীতিপ্রথা, ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও সামাজিক সম্পর্ক-বন্ধনের ক্ষেত্রেও চরম শোচনীয় অবস্থা থেকে আরবদেরকে উদ্ধার করেছিলো। নিষ্কৃতি দিয়েছিলো এমন এক পরিবেশ থেকে, যেখানে মেয়ে শিশুকে জ্যান্ত মাটি-চাপা দিয়ে হত্যা করা হতো, নারীকে করা হতো নিত্য নির্যাতনের শিকার, যেখানে সেখানে বসতো মদ ও জুয়ার আসর, যৌন উচ্ছৃংখলতা, নরনারীর অবাধ মেলামেশা ও নির্লজ্জ বিচরণ ছিলো নিত্যকার ব্যাপার, অথচ নারীকে চরম অবমাননাকর জীবন যাপন করতে হতো, প্রতিশোধমূলক হত্যাকান্ড, ডাকাতি, রাহাজানি ও লুণ্ঠন চলতো নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে, অপরদিকে কোনো বহিরাগত আগ্রাসন প্রতিরোধে জনগণ ঐক্যের অভাব ও কৌশলগত দুর্বলতার কারণে নিরূপায় হয়ে পড়তো, যেমনটি হয়েছিলো ইয়েমেনের হাবশী বাহিনী কর্তৃক কা'বা শরীফের ওপর আক্রমণের বছর। যে সব গোত্র পরস্পরের ওপর ভয়ংকর আক্রোশ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করতো, তারাও এই বিদেশী হানাদারদের সামনে হয়ে পড়লো একেবারেই হতাশ ও অসহায়।

এই আরবদের মধ্য থেকেই ইসলাম এমন এক সুসভ্য ও উন্নত জাতি গড়ে তুললো, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের হীনতা থেকে শুধু নিজেরাই মুক্ত হলো না, বরং গোটা বিশ্ব মানবতাকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিলো, আর তাও মাত্র একই প্রজন্মে। জাহেলিয়াতের নীচতা ও হীনতা আর ইসলামের মহত্ব উভয়টিই তারা জেনেছিলো ও প্রত্যক্ষ করেছিলো। জাহেলিয়াত কী আর ইসলাম কী, তা তারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলো। এজন্যে আল্লাহর 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' এই উক্তির প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করেছিলো।

এ আয়াতে তৃতীয় যে বিষয়টি মোমেনকে চিন্তা ভাবনার আহবান জানায় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ কথাটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে গেলেই মোমেন দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী ও সহানুভূতিশীল, তাকে বিশেষভাবে ভালোবাসেন ও তার প্রতি সন্তুষ্ট। তাই তার জন্যে নিজের পছন্দসই জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন।

এই তাৎপর্যবহ উক্তি মুসলিম জাতির ঘাড়ে একটা গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে। সেই গুরু দায়িত্বটা পালন করলে আল্লাহর এই বিরাট নেয়ামতের শোকর আদায়ে কিছুটা শক্তি ব্যয় করা হয় মাত্র। এ দ্বারা এই নেয়ামত দানকারী মহান আল্লাহকে চেনা যায়, তাঁর প্রতি বান্দার কর্তব্য কী তা

জানা যায়, অতপর তা পালনে সাধ্যমত কাজ করা যায় এবং কোনো ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার জন্যে ক্ষমা চাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামের এই অমূল্য নেয়ামত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদের যে উপকার করেছেন, মহান আল্লাহকে তার প্রতিদান মুসলিম জাতির পক্ষে তার সর্বকালের সকল প্রজন্ম মিলে চেষ্টা করলেও দেয়া সম্ভব নয়।

মুসলিম জাতিকে যে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের ন্যায় এই অমূল্য নেয়ামতটি প্রদান করেছেন, তার সর্ব প্রথম দাবী এই যে, এই নেয়ামতের গুরুত্ব ও বিরাটত্ব যেন তারা অনুধাবন করে। অতপর আল্লাহর মনোনীত এই দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার ওপর তার অবিচল থাকা উচিত। নচেত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে জিনিসকে তার জন্যে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ঈমান আনা তথা তাকে গ্রহণ করার পর পুনরায় তাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে, অন্য কোনো মতবাদ গ্রহণ করার মতো বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হতে পারে না। সেটা হবে চরম দুর্ভাগ্যজনক অপরাধ। এ অপরাধ কখনো বিনা শাস্তিতে যেতে পারে না এবং আল্লাহর মনোনীত জিনিসকে অগ্রাহ্যকারী কখনো মুক্তি পাওয়ার আশা করতে পারে না। যারা ইসলামকে কখনো নিজেদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেনি, কিংবা যারা ইসলামকে জেনেছে, অতপর তা ত্যাগ করেছে এবং নিজেদের জন্যে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ছাড়া অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কখনো ছাড়বেন না এবং অবকাশও দেবেন না। তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন এবং তারা তার উপযুক্তও বটে।

হালাল হারামের আরো কিছু বিধান

এ পর্যায়ে এতোটুকু আলোচনা করেই আমরা পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় মনোযোগ দিচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ওরা জিজ্ঞাসা করে যে, তাদের জন্যে কী কী বৈধ করা হয়েছে ...' (আয়াত ৪ ও ৫)

মোমেনদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা যে, তাদের জন্যে কী কী জিনিস হালাল বা বৈধ করা হয়েছে, আল্লাহর এই প্রিয় দলটির বিশেষ মানসিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে, যারা আল্লাহর প্রথম সম্বোধনের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো। এ জিজ্ঞাসা থেকে বুঝা যায় যে, জাহেলি যুগের প্রতিটি জিনিস নিয়ে তাদের মন খুঁতখুঁত করতো এবং প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের চিন্তায় তাদের মন সব সময় বিভোর থাকতো। তাদের মন সর্বদা এই ভয়ে অস্থির থাকতো যে, যে কাজটি তারা করেছে বা করতে যাচ্ছে, তা আল্লাহ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন কিনা। ইসলাম তাদের কার্যকলাপকে পছন্দ করে কিনা এবং বৈধ বলে স্বীকার করে কিনা, তা নিয়ে তারা সব সময় চিন্তিত থাকতো।

এই যুগের ইতিহাস অধ্যয়নকারী মাত্রেই তৎকালীন মুসলিম মানসে ইসলাম কতো গভীর পরিবর্তন এনেছিলো, তা উপলব্ধি করতে পারে। মুসলিম মন মানসকে সে এমন প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছিলো যে, জাহেলিয়াতের সকল মলিনতা তা থেকে ঝরে গিয়েছিলো। যে মুসলমানদেরকে সে জাহেলিয়াতের নোংরা আঁস্তাকুড় থেকে তুলে পবিত্রতা ও মহত্ত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাতে চেয়েছিলো, তাদেরকে সে এই ধারণা দিয়েছিলো যে, তাদেরকে নবজন্ম লাভ করতে হবে। তাদেরকে কতো বড় নেয়ামত দান করা হয়েছে, তাদের জীবনে কী আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং কতো উচ্চে তাদেরকে তোলা হয়েছে, তাও তাদেরকে বুঝানো হয়েছিলো। এ জন্যে এই খোদায়ী জীবন ব্যবস্থার সাথে নিজেদের জীবনকে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে এবং এর বিন্দুমাত্রও বিরোধিতা না করতে তারা ছিলো কৃতসংকল্প। এই গভীর অনুভূতি ও প্রবল ঝাঁকুনির ফলেই তারা জাহেলী যুগের প্রতিটি কর্মকান্ড ও রীতিনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছিলো। এ জন্যেই হারাম বা নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর বিবরণ সম্বলিত আয়াত শোনার অব্যবহিত পরই তারা জিজ্ঞাসা

করেছিলো যে, তাদের জন্যে কী কী জিনিস হালাল করা হয়েছে। কেননা তারা কোনো জিনিসের বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তা স্পর্শ করা এবং তার ধারে কাছেও যাওয়া পছন্দ করতো না।

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে,

'বলো, তোমাদের জন্যে সকল পবিত্র জিনিস হালাল করা হয়েছে। ......'

এ জবাবটা গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণের দাবী রাখে। মুসলমানদেরকে এতে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে কোনো পবিত্র জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হয়নি এবং কোনো পবিত্র জিনিস খেতে নিষেধ করা হয়নি। সকল পবিত্র জিনিস তাদের জন্যে হালাল এবং নোংরা ও অপবিত্র জিনিস ছাড়া আর কিছু হারাম নয়। বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা যে সব জিনিসকে হারাম করেছেন, হয় সে সব জিনিস খেতে মানুষের সুস্থ রুচি ও বিবেক এমনিতেই ঘৃণা বোধ করে, যেমন মদ, মৃতদেহ, রক্ত ও শূকরের গোশ্‌ত, অথবা কেবলমাত্র ঈমানদার ব্যক্তি ঘৃণা বোধ করে, যেমন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা জন্তু বা মূর্তিপূজার বেদিতে যবাই করা জন্তু বা তীর নিক্ষেপ পূর্বক ভাগ্য নির্ধারণ করা জন্তুর গোশত। বস্তুত শেষোক্তটি এক ধরনের জুয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

পবিত্র জিনিস হিসাবে আরো একটা জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে প্রশিক্ষিত পশু বা পাখি দ্বারা শিকার ধরা জন্তু। বাজ পাখি, শকুন, চিল, শিকারী কুকুর, বাঘ বা সিংহ ইত্যাদিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিকার করানো যেতে পারে।

এ ধরনের প্রাণীর শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার শর্ত এই যে, শিকার ধরার পর উক্ত শিকারী জন্তু নিজে তা খাবে না, বরং তার মালিকের জন্যে রেখে দেবে। অবশ্য মালিক যদি উপস্থিত না থাকে এবং সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার কথা স্বতন্ত্র। অন্যথায় শিকার ধরেই শিকারী জন্তু বা পাখি নিজেই যদি তা খায়, তা হলে প্রমাণিত হবে যে, সে প্রশিক্ষিত নয় এবং সে তার মালিকের জন্যে নয়, বরং নিজের জন্যে শিকার ধরেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সে যদি শিকারের বেশীর ভাগ মালিকের জন্যে রেখেও দেয় এবং তাকে যদি জীবিতও এনে দেয়, কিন্তু খানিকটা নিজে খেয়ে নিয়েছে, তবে তা যবাই করলেও হালাল হবে না।

এ সব প্রশিক্ষিত শিকারী জন্তুও যে আল্লাহর নেয়ামত, সে কথাও আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দানের কৌশল তাদেরকে আল্লাহ তায়ালাই শিখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এই সব শিকারী জন্তুকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দানের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়েছেন। এটা কোরআনের শিক্ষাদানের একটা নমুনা। একটি মুহূর্তের জন্যেও সে শিক্ষাদানের সুযোগ বা প্রসংগ হাতছাড়া করে না। প্রতি মুহূর্তে মানুষের মনে সে এই অনুভূতি জাগ্রত করতে থাকে যে, সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা দিয়ে থাকেন, মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টি যাই করুক, যাই অর্জন করুক, সব কিছুর কৃতিত্ব আল্লাহর। তাই মোমেন বুঝতে পারে যে, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়। সব কিছুতে সে আল্লাহর অস্তিত্বকে সক্রিয় দেখতে পায় এবং এভাবেই সে যথার্থ 'রব্বানী' বা আল্লাহওয়ালা হতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, শিকারী জন্তুকে শিকার ধরতে ছাড়ার সময় যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। কেননা সে তার দাঁত বা নখর দ্বারা তাকে মেরেও ফেলতে পারে। তেমন হলে সেটা যবাই করার পর্যায়ভুক্ত হবে। যেহেতু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিতে হয়। তাই সে একইভাবে শিকারী জন্তুকে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নিলে তা যবাই করার পর্যায়ভুক্ত হবে।

আয়াতের শেষে পুনরায় আল্লাহকে ভয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং তিনি যে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এই খোদাভীতি ও হিসাব সচেতনতার সাথে সকল

হালাল হারামের বিধানকে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা মোমেনের জীবনের সকল কাজ ও সকল নিয়ত একেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে থাকে। ফলে তার গোটা জীবনই হয়ে ওঠে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্টতা, তাঁর প্রতাপ ও পরাক্রম সম্পর্কে সচেতনতা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করার নামান্তর।

'আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী'।'

আহলে কেতাবদের খাদ্য ও তাদের নারীদের সাথে বিয়ে প্রসংগ

৪র্থ আয়াতের ন্যায় ৫ম আয়াতেও হালাল হারামের বিধান অব্যাহত রয়েছে। প্রথমে খাদ্য সংক্রান্ত ও তারপর বিয়ে শাদী সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়েছে।

'আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র খাদ্যসমূহ হালাল করা হলো। ....'

এভাবে হালাল খাদ্যের আরো কয়েকটি শ্রেণীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। আমরা আগে যে কথা বলে এসেছি, এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। নতুন নতুন খাদ্য তালিকার মধ্যে মূলনীতি একটাই, পবিত্র জিনিস হওয়া চাই।

এখানে এসে আমরা দেখতে পাই, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম সমাজে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক তথা চুক্তিবদ্ধ আহলে কেতাবের প্রতি ইসলাম কতো উদারতা ও মহানুভবতার আচরণ করেছে।

ইসলাম তাদেরকে শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দেয় না, বরং মুসলিম সমাজের সাথে সামাজিক অংশীদারী, প্রীতি ভালোবাসা, সৌজন্যে ও মেলামেশার একটা সুযোগও তাদেরকে দেয়। তাই তাদের তৈরী খাবার মুসলমানদের জন্যে এবং মুসলমানদের তৈরী খাবার তাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছে, যাতে খানাপিনা, মেহমানদারী, আদর আপ্যায়ন ও আসা যাওয়া চলতে থাকে এবং গোটা সমাজে প্রীতি ও উদারতার পরিবেশ বিরাজ করে। অনুরূপভাবে, তাদের মধ্যে যে সব সতী সাধ্বী সম্ভ্রান্ত রমণী রয়েছে, তাদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিয়ে বৈধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সতী সাধ্বী মুসলিম রমনীদের সাথেই তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা এমন উচ্চ পর্যায়ের উদারতা ও মহানুভবতা, যা ইসলামের অনুসারীরা ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো ধর্মের অনুসারীরা উপলব্ধি করতে পারে না। ক্যাথলিক খৃষ্টানরা অর্থোডক্স বা প্রোটেস্ট্যান্ট কিংবা মারুনী খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করা সংগত মনে করে না। আর যে ব্যক্তি এটা করে, তাকে তারা ধর্মচ্যুত মনে করে।

এভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, যার একটা বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলার মতো ঔদার্য রয়েছে। এতে আহলে কেতাব ও মুসলমানদের মধ্যে এবং একই ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে আচার ব্যবহার ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে কোনো ভেদ-বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা নেই। তবে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতার স্তর ও সহযোগিতার ধরনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতার বিধান আছে বটে এবং সে সম্পর্কেও এই সূরায় আলোচনা আসছে।

আয়াতের পরবর্তী অংশে দেখানো হয়েছে যে, আহলে কেতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) ভুক্ত সতী সাধ্বী রমণীকে বিয়ে করার জন্যে অবিকল সেই শর্তাবলীই প্রযোজ্য, যা মুসলিম সতী সাধ্বী মহিলার বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা হচ্ছে,

'যখন তাদেরকে তোমরা তাদের মোহরানা দিয়ে দেবে এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরাও সতীত্ব বজায় রাখবে, নিছক ব্যভিচার করে বেড়ানো এবং নিছক এক সাথে বসবাস করার উদ্দেশ্যে নয়।'

অর্থাৎ তোমরা শরীয়তসম্মতভাবে বিয়ে করে এমন নির্মল দাম্পত্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মোহরানা দেবে, যা দ্বারা পুরুষ তার স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করে। এ জন্যে নয় যে, এই অর্থ কেবল সাময়িক বা স্থায়ীভাবে কারো সাথে একত্র বসবাসের পথ উন্মুক্ত করবে। 'মোসাফেহীন' শব্দটি

'সেফাহ' থেকে গঠিত, যার অর্থ হলো, যে কোনো পুরুষের সাথে সাময়িকভাবে মিলিত হওয়া তথা ব্যভিচার করা, আর 'মোত্তাখিযী আখদান' অর্থ বিয়ে ছাড়া একত্রে বসবাসকারী নারী পুরুষ। আরবের জাহেলী যুগে এই দুই ধরনের নর নারীর মিলনের প্রথা চালু ছিলো এবং তা স্বীকৃত ছিলো। পরে ইসলাম এসে সমাজকে এই নোংরা প্রথা থেকে পবিত্র করে।

আয়াতের শেষাংশের মন্তব্যে রয়েছে কঠোর সতর্কবাণী,

'আর যে ব্যক্তি ঈমানকে মিথ্যা প্রমাণিত করে, তার সকল সৎ কাজ বাতিল হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

শরীয়তের উল্লেখিত বিধিসমূহ ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোকে নিখুঁতভাবে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করাই ঈমানের দাবী বা ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করার উপায়। যে ব্যক্তি এটা করতে ব্যর্থ হয়, সে তার ঈমানকে মিথ্যা প্রমাণিত করে, অস্বীকার করে এবং তাকে চাপা দেয়। আর ঈমানকে যে মিথ্যা প্রমাণিত করে, তার সৎকাজ বাতিল হয়ে যায় এবং তা গৃহীত হয় না। 'হাবেতা' শব্দটি 'হুবুত' থেকে এসেছে, যার শাব্দিক অর্থ হলো বিষাক্ত ঘাস খেয়ে মরে যাওয়া পশুর মরদেহ স্ফীত হওয়া। বাতিল হয়ে যাওয়া সৎকাজের যথার্থ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ আয়াতে। কোনো সৎ কাজ যতটুকু করা হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার কারণে তা বিষাক্ত ঘাস খেয়ে মরা জন্তুর মতোই ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে তার আর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। আর আখেরাতের ক্ষতি তো দুনিয়ায় সৎকাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়েও ভয়ংকর পরিণতি। লক্ষণীয় যে, এই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে খাদ্য ও বিয়ের হালাল হারাম সংক্রান্ত একটি বিধির উপসংহার। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ছোট হোক, বড় হোক, ইসলামের প্রতিটি বিধিই অকাট্য এবং তার লংঘন কুফরীর শামিল। যে ব্যক্তি তা লংঘন করবে, তার সৎ কাজও গৃহীত হবে না।

এবাদাতের মাঝে দেহ ও আত্মার সমন্বয়

খাদ্য ও নারী সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি বর্ণনা করার পর নামায এবং নামাযের জন্যে পবিত্রতা অর্জন সংক্রান্ত বিধি আলোচিত হচ্ছে,

'হে মোমেনরা! তোমরা যখন নামায পড়ার প্রস্তুতি নেবে, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত করবে এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ......' (আয়াত ৬)

খাদ্য ও বিয়ে শাদী সংক্রান্ত হালাল হারামের বিধির পাশাপাশি নামায ও পবিত্রতার বিষয়ে আলোচনা এবং শিকার করা, ইহরাম ও মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা দানকারীদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত আলোচনা বা বিষয়টি এমনি এমনি শুরু হয়ে যায়নি। বিষয়টি সূরার পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অপ্রাসংগিকও নয়, বরং কোরআনের আলোচনার ধারাবাহিকতায় তাকে যথাস্থানেই এবং অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথেই আনা হয়েছে।

প্রথমত, পবিত্র খাবার ও পবিত্র হালাল নারীর বিবরণের সাথে এটি আরেকটি পবিত্র জিনিসের সংযোজন। সে জিনিসটি হচ্ছে নির্ভেজালভাবে আত্মার উপভোগ্য একটি পবিত্র এবাদাত, নামায। এ জিনিসটিতে মোমেনের মন এমন স্বাদ পায়, যা আর কোনো জিনিসে পায় না। পবিত্র দেহ ও নিবিষ্ট মন নিয়ে বান্দা আল্লাহর সাথে মিলিত হয় নামাযে। তাই খাদ্য ও বিয়ের ন্যায় দুটো জৈবিক ভোগের সামগ্রীর উল্লেখ করার পর কোরআন আত্মার ভোগের সামগ্রী পবিত্রতা ও নামাযের বিবরণ দিতে চেয়েছে, যাতে মানুষের ইহকালীন জীবনের যাবতীয় পবিত্র ভোগ্য সামগ্রীর বিবরণ সম্পূর্ণ হয়, যাতে তার 'মনুষ্যোচিত' সত্ত্বা পূর্ণতা লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, পবিত্রতা ও নামাযের বিধিসমূহ এই সূরায় আলোচিত অন্যান্য বিধি বা আহকাম যথা খাদ্য ও বিয়ে, ইহরাম বা ইহরামমুক্ত অবস্থায় শিকার করা এবং যুদ্ধ ও শান্তির অবস্থায় মানুষের সাথে আচরণ সংক্রান্ত বিধির মতোই। এ সবই আল্লাহর এবাদাত ও আল্লাহর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। তাই পরবর্তী যুগে রচিত ফেকাহ শাস্ত্রে 'এবাদাত' ও 'মোয়ামালাত' ইত্যাদি পরিভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় হিসাবে বিন্যস্ত হলেও আসলে এগুলোর ভেতরে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর মূল বিধানে এবং ইসলামী শরীয়তের মূল কাঠামোতে এই সমস্ত বিভক্তির অবকাশ নেই। এবাদাত ও মোয়ামালাত বলে অভিহিত সব বিধির সমন্বয়ে আল্লাহর দ্বীন, শরীয়ত ও বিধান গঠিত। আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে এর কোনোটি অপরটির চেয়ে অগ্রগণ্য ও পশ্চাতগণ্য নয়। বরং এ দুয়ের ভেতরে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যে, একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্বই টিকতে পারে না। মুসলমানদের জীবনে এই উভয় অংশ বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত একথা বলা যাবে না যে, ইসলাম বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এর সব কটিই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার 'চুক্তির' অন্তর্ভুক্ত এবং এর প্রত্যেকটিই যথাযথভাবে মেনে চলার জন্যে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, এর সব ক'টিই 'এবাদাত', যাকে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে থাকে এবং তার তা করা উচিত বটে। আর এর সব কটি যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমেই একজন মুসলমান নিজেকে আল্লাহর বান্দা রূপে স্বীকারোক্তি দেয় ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ইসলামে পৃথক কোনো 'এবাদাত' নেই এবং পৃথক কোনো 'মোয়ামালাত' নেই। এসব পরিভাষা শুধু ফেকাহ শাস্ত্রীয় পুস্তকাদি প্রণয়নের সময় অধ্যায় বিন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। নচেত 'এবাদাত' ও 'মোয়ামালাত' এই উভয় জিনিসই আসলে পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর 'এবাদাত' আল্লাহর নির্ধারিত 'ফরযও' এবং আল্লাহর সাথে সম্পাদিত 'চুক্তিও'। এর একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা আসলে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে, তাকেই খন্ডিত করার শামিল।

ওযু ও তায়াম্মুমের বিধান

কোরআনের বর্ণনায় যে ধারাবিন্যাস অবলম্বন করা হয়েছে, তা আসলে এই বিষয়টি বুঝানোর জন্যেই করা হয়েছে। আর এই পথ ধরেই সূরায় ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বিধির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

'হে মোমেনরা! তোমরা যখন নামায পড়ার প্রস্তুতি নাও .....'

নামায হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা, তাঁর সামনে দন্ডায়মান হওয়া, তাঁর কাছে দোয়া করা বা চাওয়া এবং অন্তরের ঐকান্তিক আকুতি পেশ করার নাম। এমন একটি কাজের জন্যে শারীরিক পবিত্রতা ও মানসিক একাগ্রতার মাধ্যমে প্রস্তুতি নেয়া অপরিহার্য। এই প্রস্তুতি হিসাবেই ওযুর বিধান প্রবর্তিত হয়েছে বলে আমার ধারণা। অবশ্য প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই জানেন। এ আয়াতে উক্ত ওযুর ফরয কাজসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যথা মুখমন্ডল ধোয়া, কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধোয়া, মাথা মোসেহ করা এবং দুই পা গিরে পর্যন্ত ধোয়া। এই ফরযগুলোকে ঘিরে সামান্য কিছু ফেক্হী মতপার্থক্য দেখা যায়। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতভেদটি ঘটেছে এই ফরযগুলো যে ধারাবাহিকতায় কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক সেই ধারাবাহিকতা অনুসারেই পালন করা জরুরী, না ধারাবাহিকতা ওলটপালট হলেও চলবে, তাই নিয়ে। এ ক্ষেত্রে উক্ত দুটো মতই প্রচলিত রয়েছে। ওযুর এ নির্দেশ 'হাদাসে আসগর' অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ছোট নাপাকী দূর করার জন্যে দেয়া হয়েছে, (যা পেশাব, পায়খানা ইত্যাদির কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে)। আর 'জানাবাত' তথা

'হাদাসে আকবর' অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বড় নাপাকীর ক্ষেত্রে, যা স্ত্রী-সহবাস বা স্বপ্নদোষ ইত্যাদি জনিত বীর্যপাতের দরুন সংঘটিত হয়ে থাকে, গোসল করা জরুরী।

ওযু ও গোসলের ফরযগুলো বর্ণনা করার পর তায়াম্মুমের বিধান বর্ণনা করা শুরু হয়েছে। তায়াম্মুম যে যে অবস্থায় করতে হয় তা হলো,

অপবিত্র মানুষটি আদৌ পানির নাগাল পেলো না।

অপবিত্র মানুষটি এমন অসুস্থ যে, পানি দিয়ে ওযু বা গোসল করলে তার কষ্ট হয়।

অপবিত্র মানুষটি প্রবাসে আছে।

'তোমাদের কেউ 'গায়েত' থেকে এসেছে', এ উক্তি দ্বারা ক্ষুদ্রতর নাপাকীর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। 'গায়েত' বলা হয় নিচু ভূমিকে, যেখানে গিয়ে আরবরা পেশাব-পায়খানা করতো। 'গায়েত থেকে আসা' দ্বারা পেশাব বা পায়খানা করা বুঝানো হয়েছে।

'অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ে থাকলে ....' এই উক্তি দ্বারা বৃহত্তর নাপাকীকে বুঝানো হয়েছে। এই সূক্ষ্ম ইংগিত সহবাস বুঝানোর জন্যে যথেষ্ট।

এসব পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি ছোট বা বড় যে ধরনের নাপাকীতেই লিপ্ত হোক না কেন, এমতাবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম না করে নামাযের উদ্যোগ নিতে পারবে না। পবিত্র মাটি দিয়ে তাকে তায়াম্মুম করতে হবে। সে মাটি জীব-জন্তুর গায়ে বা দেয়ালে লেগে থাকা ধুলো হলেও চলবে। ওই মাটির ওপর হাত চাপড়াতে হবে-তারপর হাতে লাগা ধুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে, অতপর ওই দুই হাত দিয়ে মুখ মলতে হবে, অতপর পুনরায় কনুই পর্যন্ত দু'হাত মলতে হবে। মুখ ও হাত মলার জন্যে কারো কারো মতে পৃথক পৃথকভাবে দু'বার মাটিতে হাত চাপড়াতে হবে, আবার কারো কারো মতে একবার চাপড়ালেই চলবে।

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ে থাকলে' কথাটার ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, শুধু মেলামেশাই যথেষ্ট, কেউ বলেন, যৌন সংগম জরুরী।

আবার শুধু মেলামেশার ব্যাপারেও মতভেদ আছে। কেউ বলেন, কামভাব সহকারে মেলামেশা সংঘটিত হওয়া চাই, আবার কেউ বলেন, কামভাব ছাড়া মেলামেশা করলেও নাপাক হয়ে যাবে এবং পানির অভাবে তায়াম্মুম করতে হবে। অনুরূপভাবে, শুধুমাত্র রোগ হলেই তায়াম্মুম করা যাবে, না পানি ব্যবহারে কষ্ট হয় এমন রোগ হতে হবে, তা নিয়েও দু'রকম মত রয়েছে।

আপাতত রোগ বালাই নেই, কিন্তু ঠান্ডা পানি ব্যবহারে রোগ ও কষ্ট হওয়ার আশংকা আছে, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা যাবে কিনা? অধিকাংশের মতে, যাবে। আয়াতের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে,

'আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বরং তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান'

আমি আগেই বলেছি যে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে পবিত্রতা অর্জন জরুরী। ওযু ও গোসলে শারীরিক ও আত্মিক উভয় দিক দিয়েই পূর্ণাংগ পবিত্রতা অর্জিত হয়ে থাকে। তায়াম্মুমে কেবল আত্মিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। তবে পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে তায়াম্মুমই পূর্ণাংগ পবিত্রতা অর্জনের জন্যে যথেষ্ট হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কষ্ট দিতে চান না। তাঁর আসল উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে পবিত্র করা, পবিত্রতা উপহার দেয়া এবং আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায়ে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে তাদের নেয়ামত বহুগুণ বর্ধিত হয়। বস্তুত এই সহজ ও সরল ব্যবস্থায়ই রয়েছে আল্লাহর দ্বীনের উদারতা, মহানুভবতা ও বাস্তবমুখিতা।

নামায ও পবিত্রতার পর্যালোচনা

'বরং তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ...'

এই উক্তিতে ওযু, গোসল ও তায়াম্মুমের যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে আমরা এই মহাসত্যের সন্ধান পাই যে, ইসলাম তার আনুষ্ঠানিক এবাদাত ও দৈনন্দিন জীবনের আইন বিধির মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠা করে। ওযু ও গোসল তার দৃষ্টিতে নিছক দেহের পবিত্রতা অর্জনের নাম নয়। তা যদি হতো, তাহলে এ যুগের দার্শনিকরা বলতো যে, প্রাচীন আরবদের মতো এসব কর্মকান্ডের আশ্রয় নেয়ার আমাদের কোনো দরকার নেই। আমরা প্রচলিত সুসভ্য রীতি অনুসারে গোসল করি এবং আমাদের অংগ-প্রত্যংগ পরিষ্কার করে থাকি। আসলে ওযু ও গোসল হচ্ছে একই কাজের মাধ্যমে শরীর ও আত্মা তথা মনের পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টার নাম। আর একই এবাদতের মধ্য দিয়ে মোমেন তার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করে। এখানে আত্মিক পবিত্রতার দিকটি অধিকতর প্রবল। কেননা পানি ব্যবহার করা যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তায়াম্মুমের বিধান দেয়া হয়েছে, যা এই প্রবলতর দিকটিকেই অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। অথচ এ সব সত্তেও ইসলাম একই স্থায়ী আইন ও বিধি দ্বারা সব রকমের অবস্থা, পরিস্থিতি ও পরিবেশের মোকাবেলা করে থাকে এবং সর্বাবস্থায় কোনো না কোনো উপায় এবং কোনো না কোনো অর্থে তার নিগূঢ় ও প্রাজ্ঞ উদ্দেশ্যকে সফল করে এবং সেই নিগূঢ় ও প্রাজ্ঞ উদ্দেশ্য কোনো অবস্থাতেই বিফল হয় না বা পাল্টে যায় না।

সুতরাং ইসলামী আকীদা ও আদর্শ সম্পর্কে না জেনে, কোনো দিক-নির্দেশনা না পেয়ে এবং কোনো তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ছাড়াই নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কোনো মতামত বা মন্তব্য প্রকাশ না করে এই আকীদা ও আদর্শের নিগূঢ় তত্ত্ব জানা ও বুঝার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। আর আমাদের জানা ও না জানা উভয় বিষয়েই আল্লাহর প্রতি আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।(১) ওযু বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যখন ক্ষতিকর বা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন নামাযের জন্যে তায়াম্মুমের যে বিধান রয়েছে, সে সংক্রান্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা খোদ নামাযের ব্যাপারে একটা চমৎকার তত্ত্ব জানতে পারি। সেটি এই যে, ইসলামী বিধান নামায কায়েমের ব্যাপারে আপোষহীন এবং এর পথে সকল বাধা দূর করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং তায়াম্মুমের বিধান এবং শত্রুর আক্রমণ ভীতির সময়ে নামায পড়া, (সালাতুল খাওফ) রোগকালীন শুয়ে-বসে ও ইশারায় হলেও সাধ্যমত নামায পড়া ইত্যাকার বিভিন্ন বিধি থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম সর্বাবস্থায় নামায কায়েমে বদ্ধপরিকর।এ থেকে বুঝা যায়, মানুষের মনকে আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যে ইসলাম তার প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে নামাযকে কতো বেশী গুরুত্ব দেয় এবং তার ওপর কতো বেশী নির্ভর করে। নামাযের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাত ও আল্লাহর সামনে তার উপস্থিতিকে সে এ ক্ষেত্রে এতো গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ও কার্যকরী ব্যবস্থা রূপে গণ্য করে যে, কোনো কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও এই সাক্ষাত ও উপস্থিতির কাজটি অবহেলিত বা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হোক, তা সে হতে দিতে রাযী নয়। কেননা নামায মানুষের মনে বিনয় ও নম্রতার উদ্রেক করে এবং আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের উদ্দীপনা ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ ৭ নং আয়াতে আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনের বিধি ও তার পূর্বে বর্ণিত বিধিসমূহের উপসংহার হিসাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ মোমেনদের ঈমান আনার তাওফীক দিয়ে এক মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাদের কাছ থেকে

আনুগত্যের যে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, যে অংগীকারের মাধ্যমে তারা ইসলামে প্রবেশ করেছে, তা পালন করা তাদের কর্তব্য। এই সাথে আল্লাহকে ভয় করার অপরিহার্যতাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তিনি যে তাদের মনের কথা জানেন, সে সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে,

৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো এবং তোমাদের কাছ থেকে যে অংগীকার গ্রহণ করেছেন তাকে ..... '

আমি আগেই বলেছি যে, কোরআনের প্রথম শ্রোতারা খুব ভালোভাবেই বুঝতো আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ইসলামের আকারে কতো বড়ো দুর্লভ নেয়ামত দিয়েছেন। কেননা তারা তাদের সত্ত্বায়, তাদের জীবনে, তাদের সমাজে এবং আশপাশের গোটা মানব জাতির মধ্যে তাদের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বে ইসলামের অবদান অনুভব করতো। তাই এই নেয়ামতের প্রতি একটি ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট মনে হয়েছে। কারণ এই ইংগিতই তাদের মন ও দৃষ্টির সামনে তাদের বাস্তব জীবনে উপস্থিত একটি বিরাট সত্যকে তুলে ধরেছিলো।

অনুরূপভাবে, আনুগত্যের যে অংগীকার আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তার প্রতি ইংগিত করাই তাদের সুপরিচিত একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। এ ইংগিত তাদের মনে আল্লাহর ভীতি সঞ্চার এবং তারা যে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো। বস্তুত মোমেনের অনুভূতিতে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাকওয়া তথা আল্লাহর উপস্থিতি এবং তার হৃদয়ের গোপন ধ্যান ধারণাগুলোর ওপরও তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন এই বলে যে,

'আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ বুকের ভেতরে পুঞ্জীভূত সব কিছু জানেন।'

এখানে 'বুকে পুঞ্জীভূত সব কিছু' (যাতুস্ সূদর) দ্বারা হৃদয়ে পুঞ্জীভূত যাবতীয় চিন্তা ভাবনা, আবেগ ও ধ্যান ধারণাকে বুঝানো হয়েছে, যা গুপ্ত হওয়া সত্তেও আল্লাহর কাছে প্রকাশিত ও সুবিদিত। এই উক্তিটি কোরআনে অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

যে অংগীকার স্বয়ং আল্লাহর সাথে

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর কাছ থেকে আর যে যে বিষয়ে অংগীকার নিয়েছেন, তার অন্যতম হচ্ছে মানব জাতির প্রতি তাঁর অভিভাবকসুলভ ভূমিকা ন্যায়সংগতভাবে পালন। এ ক্ষেত্রে এমন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা কোনো বিদ্বেষ ও ভালোবাসাকে এবং আত্মীয়তা, স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিরেট ন্যায় ও সত্যকে আপোষহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ন্যায় বিচারকে প্রভাবিত ও ব্যাহত করে এমন সমস্ত উপকরণ ও ভাবাবেগকে উপেক্ষা করে এবং আল্লাহর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, অব্যর্থ প্রহরা ও মানুষের অন্তরের অব্যক্ত ধ্যান ধারণা সম্পর্কেও তাঁর অবহিত থাকার কথা স্মরণে রেখে সততা ও ইনসাফ কায়েম করতে হবে। এই কথাটাই আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী ৮ নং আয়াতে বলেছেন,

'হে মোমেনরা, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকবে....'

ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন যে, যারা তাদেরকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো, তাদের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহা বশত তাদের ওপর যেন তারা আক্রমণ না চালায় বা তাদের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম না করে। ওই নিষেধাজ্ঞাটি ছিলো ইসলামের আত্মসম্বরণ ও মহানুভবতার চরম পরাকাষ্ঠার প্রতীক, যা সে মোমেনদেরকে শিক্ষা

দিয়েছিলো। আর এখন এ আয়াতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, প্রতিশোধপরায়ণতা যেন তাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। এটা আগেরটার চেয়েও উন্নততর, মহত্তর এবং অধিকতর কষ্টকর কাজ। এটা সীমা অতিক্রম না করা ও তা থেকে নিবৃত্ত থাকার চেয়েও উচ্চতর স্তরের একটা কাজ। যাকে সে ঘৃণা করে ও যার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, এখানে তার প্রতিও ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমটা ছিলো অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর। কেননা ওটা নেতিবাচক কাজ, বা সীমাতিক্রম বা বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকলেই সম্পন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কাজটা অধিকতর কষ্টকর। কেননা ওটা একটা ইতিবাচক ব্যবস্থা, যা মানুষকে তার ঘোর অপ্রিয় লোকদের প্রতিও সুবিচার করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এই উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে যে কষ্ট ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, সে কথা উপলব্ধি করেই সে এমন ব্যবস্থা দিয়েছে, যাতে কাজটা সহজ হয়ে যায়। তাই কোরআন বলছে,

'হে মোমেনরা! তোমরা আল্লাহর জন্যে সাক্ষী হয়ে যাও। ....'

আয়াতের শেষাংশেও আবার সেই ব্যবস্থা দিয়েছে, যা এটাকে সহজ করে দেয়,

'আর আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতিটি কাজের খবর রাখেন।'

মানুষ যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে না তোলে, সব কিছুকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তৎপর না হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরের গোপন চিন্তাকে পর্যন্ত দেখেন ও জানেন এই বিশ্বাসের বশে তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত না থাকে, ততোক্ষণ সে প্রতিশোধস্পৃহার উর্ধে উঠে ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায় বিচার করার মতো এই উচ্চতর নৈতিক স্তরে উন্নীত হতে কখনোই সক্ষম হয় না। পৃথিবীর আর কোনো রকমের বিচার বিবেচনা ও চিন্তা ভাবনা মানুষের মনকে এতো উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে ও বহাল রাখতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তৎপর হওয়া এবং তাঁর সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া অন্য কোনো রকমের চিন্তা ভাবনা ও বিচার বিবেচনা তার মনকে এতো উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে পারে না। আল্লাহর এই দ্বীন ছাড়া পৃথিবীর আর আর আদর্শ বা জীবন ব্যবস্থা প্রচন্ডতম ক্রোধভাজন ও বিদ্বেষভাজন শত্রুর প্রতি এমন পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর এই দ্বীনই মোমেনদেরকে আহ্বান জানায় শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করতে এবং যাবতীয় স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে তার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়তে। ইসলামের এই সব বৈশিষ্ট্যের কারণেই তা সারা বিশ্বের মানব জাতির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র ধর্মের মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলামই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির জন্যে ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা দেয় এবং মুসলমানদের ওপর ন্যায় বিচার ফরয করে দেয়। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তারা যতোই ঘৃণা বিদ্বেষ বা শত্রুতামূলক আচরণ পাক না কেন, তাদের ওপর সর্বাবস্থায় জনসাধারণের প্রতি সুবিচার করা ফরয। আর এই ফরযের ব্যাপারে তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে অন্য কারো কাছে নয়। সমগ্র মানব জাতির অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে মুসলিম উম্মাতের ওপর এই সুবিচার করাটা অবশ্য কর্তব্য, চাই তাতে তার যতো কষ্টই হোক না কেন। মুসলিম উম্মাত যখন ইসলামের ওপর বহাল ছিলো, তখন সে এই তত্ত্বাবধায়ক সুলভ দায়িত্ব ঠিক মতোই পালন করেছে। এটা তার জীবনে নিছক উপদেশের পর্যায়ে ছিলো না, কিংবা একটা শুধু মহৎ দৃষ্টান্তের পর্যায়েও ছিলো না। এটা ছিলো তার নিত্যকার দিনের একটা বাস্তব ঘটনা, যার সমতুল্য ঘটনা মানব জাতি ওই সময়টার আগেও প্রত্যক্ষ করেনি, পরেও

করেনি। ইসলামের স্বর্ণজ্জ্বল দিনগুলোতে ছাড়া এ দৃষ্টান্ত আর কখনো স্থাপিত হতে দেখা যায়নি। ইতিহাসে এ সংক্রান্ত যে সব দৃষ্টান্ত সংরক্ষিত হয়েছে, তার সংখ্যা প্রচুর। সে সব দৃষ্টান্ত এই মর্মে জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেয় যে, সততা, খোদাভীতি ও ন্যায়বিচারের এই দায়িত্ব ও কর্তব্য মুসলিম উম্মাহর জীবনে একটা দৈনন্দিন ও বাস্তব ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিলো। এটা কোনো আকাশ কুসুম কল্পনা ছিলো না, কিংবা কারো কোনো ব্যক্তিগত নমুনাও ছিলো না। এটা ছিলো এমন এক স্বাভাবিক জীবনধারা, যার কোনো ব্যতিক্রম জনগণের চোখে পড়তো না।

আল্লাহর আইন ও মানবরচিত আইনের পার্থক্য

আমরা যখন সর্বকালের ও সকল দেশের জাহেলিয়াতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, চাই তা নতুন বা পুরানো ধরনের জাহেলিয়াতই হোক না কেন, বুঝতে পারি যে, মানুষের জন্যে আল্লাহর রচিত জীবন ব্যবস্থা ও মানুষের জন্যে মানুষের রচিত জীবন ব্যবস্থায় কেমন আকাশ পাতাল ব্যবধান, আর এই দুই ধরনের জীবন ব্যবস্থা মানুষের জীবনে ও মন-মগযে যে প্রভাব বিস্তার করে, তাতে কত দুরতিক্রম্য পার্থক্য বিদ্যমান।

মানুষ বিভিন্ন রকমের মতবাদের কথা শোনে, জানে এবং সেগুলোকে স্বাগত জানায়। কিন্তু মতবাদ এক জিনিস, আর বাস্তব ময়দানে তার বাস্তবায়ন আর এক জিনিস। মানুষের রচিত এই সব মতবাদের বাস্তবায়িত না হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেননা মানুষকে কিছু মতবাদের দাওয়াত দেওয়াটাই বড় কথা নয়। বরং কে দাওয়াত দিচ্ছে এটাই বড় কথা। দাওয়াত যার কাছ থেকে আসছে, সে কেমন এবং মানুষের বিবেকের ওপর এই দাওয়াতের আবেদন ও প্রভাব কতোখানি, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর এই সমস্ত মতবাদের বাস্তবায়নের জন্যে মানুষ যে সাধনা ও পরিশ্রম করে তার ফলাফল নিয়ে যে জগতে সে প্রত্যাবর্তন করে সেটাই আসল প্রতিপাদ্য বিষয়। ইসলাম যে নীতিমালার দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়, তার গুরুত্ব ও মর্যাদা শুধু এই কারণে যে, তার পেছনে মহান আল্লাহর অনুমোদনের প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং যখন কেউ কোনো বক্তব্য রাখে, তখন দেখতে হবে কোন্ যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে সে ওই বক্তব্য রাখলো এবং শ্রোতাদের বিবেক ও মনকে দখল করার মতো কী যুক্তি ও প্রমাণ তার কাছে রয়েছে। আর এই নীতিমালাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা সাধনা করে যখন মানুষ আল্লাহর কাছে পৌছবে, তখন সে কী প্রতিদান পাবে, সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ন্যায় বিচার, পবিত্রতা, উদারতা, মহত্ত্ব, মহানুভবতা, প্রীতি-ভালোবাসা, ত্যাগ ও কোরবানী প্রভৃতির আহ্বান তো অনেকেই জানায়। কিন্তু সে সব আহ্বান মানুষের বিবেককে নাড়া বা ঝাঁকুনি দেয় না এবং অন্তরে বদ্ধমূল হয় না। কেননা এসব আহ্বান যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এমন কোনো প্রমাণ এর পেছনে নেই। বস্তুত, যে কেউ একটা বক্তব্য উপস্থাপন করলেই তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় না। বক্তব্যের গুরুত্ব নির্ণীত হয় তার মূল বক্তা কে, সেই অনুসারে।

মানুষ যখন নিজেরই মতো আরেকজন বা একাধিক জনের কাছ থেকে কোনো মহৎ নীতিকথা, আদর্শের বুলি বা শ্লোগান শোনে এবং তা যে আল্লাহর বাণী বা নীতি, সে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ বা সনদ তার পশ্চাতে থাকে না, তখন তার কী প্রভাব ওই শ্রোতাদের ওপর পড়তে পারে? তারা স্বভাবতই বুঝে নেয় যে, এগুলো তাদেরই মতো মানুষদের নির্দেশাবলী, যারা অন্য যে কোনো মানুষের মতোই অজ্ঞতা, অক্ষমতা, ভুলত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনার গোলাম ও তদ্রূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই এরূপ উপলব্ধির ভিত্তিতেই মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও মনমেযাজ তাদেরকে গ্রহণ করে থাকে। তাই এসব আহ্বান ও নির্দেশ তাদের স্বভাব প্রকৃতি ও

মনমগযের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই তাদের সত্তায় না আসে কোনো কাঁপুনি, ঝাঁকুনি বা শিহরণ, আর না পড়ে তাদের জীবনে ওই আহ্বানের কোনো ছাপ বা প্রভাব। পড়লেও তা হয়ে থাকে ক্ষীণতম ও দুর্বলতম ছাপ।

তা ছাড়া ইসলামের ব্যাপারে এই সমস্ত আহ্বান বা উপদেশ বাস্তব কার্যকলাপের সাথে মিলিত হয়েই পূর্ণতা লাভ করে থাকে। এগুলোকে নিছক শূন্যে নিক্ষেপ করা হয় না। ইসলাম যখন কেবলমাত্র উপদেশ সর্বস্ব ও শ্লোগান সর্বস্ব হয়ে যায়, তখন তার উপদেশ বাস্তবায়িত হয় না। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা আজকাল সর্বত্র অহরহ দেখছি। ইসলামী বিধান অনুসারে সমগ্র মানব জীবনের জন্যে একটা শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ ধরনের একটি শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনেই ইসলাম তার আদর্শ নীতিমালা ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করতে সক্ষম। এমন বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবেশে তাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম, যেখানে কথা ও কাজ, পরস্পরের পরিপূরক হয়ে বিরাজ করে। ইসলামী পরিভাষায় 'দ্বীন' বা ধর্ম বলতে একেই বুঝায়। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে ধর্মের অর্থ এটা নয়। যে ধর্ম একটা রাষ্ট্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, সেই ধর্মই সমগ্র জীবনের তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

যে সময় এই দ্বীন বা ধর্ম এই অর্থে মুসলিম জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হয়েছিলো, সেদিন সে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জাতির আসন অলংকৃত করতে পেরেছিলো এবং আরবের জাহেলিয়াতের ন্যায় আজকের আধুনিক সকল জাহেলিয়াতের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব আজও অম্লান রয়েছে। কিন্তু দ্বীন বা ধর্ম যখন কেবল মাসজিদের মেম্বর থেকে উপদেশ বিতরণে ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, সেদিন থেকে মানব জীবনে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপের কোনো অস্তিত্ব থাকলো না।

যে মোমেনরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর পছন্দনীয় কাজে লিপ্ত থাকে, মানব জাতির তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনে সাহসী ও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে এবং আল্লাহর সাথে করা প্রতিশ্রুতি পালন করে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান ও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা যে অপরিহার্য এবং এই সব সৎকর্মশীল মোমেনের প্রতিদান কাফের ও অবাধ্যদের প্রতিদান থেকে পৃথক না হয়ে যে পারে না, সে কথাই পরবর্তী দুটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'আল্লাহ সৎকর্মশীল মোমেনদের জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্যে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার রয়েছে ...' (আয়াত নং ৯ ও ১০)

বস্তুত এখানে সেই সব সৎকর্মশীল মোমেনের প্রতিদানের কথাই বলা হয়েছে। যাদের মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুনিয়ার জীবনে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষের প্রবৃত্তির গোলামী ইসলামের শত্রুতা ও বিদ্বেষের ফলে তাদেরকে দুনিয়ায় যে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা আখেরাতের এই পুরস্কার ও প্রতিদানের সামনে নিতান্তই তুচ্ছ। এই প্রতিদান প্রদানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এমন নিখুঁত সুবিচার করবেন, যা সৎকর্মশীলদের কর্মফল ও দুষ্কৃতকারীদের কর্মফলে আকাশ পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি করবে।

আল্লাহর এই প্রতিদান ও সুবিচারের প্রতি যাতে মোমেনদের আস্থা অবিচল থাকে এবং সকল পার্থিব স্বার্থের আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তারা কাজ করতে পারে, সে জন্যেই এ আয়াত দুটিতে তাদের পরকালে প্রাপ্য প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যদিও কিছু কিছু মোমেনের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এতো বেশী থাকে যে, তাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির

নিশ্চয়তা দিলে এবং আল্লাহ তায়ালা তার ওয়াদা পূরণ করবে এ আশ্বাস দিলে তাতেই তারা খুশী হয়ে যায়, তথাপি ইসলাম যেহেতু সর্বস্তরের মানুষের জীবন বিধান, সে তাদের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আর মানুষের যে ক্ষমা ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং কাফেরদের প্রতিদান জানার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রয়োজনের কথা আল্লাহ তায়ালা জানেন, তাই এখানে প্রতিদানের বিবরণ দিয়ে তার এই স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারীদের অপতৎপরতায় তার ক্ষোভ নিরসন করা হয়েছে। বিশেষত যাদের কাছ থেকে কষ্ট ও নির্যাতন পোহাতে হয়েছে, তাদের সাথেও যখন ন্যায় বিচার করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তখন তাদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া অত্যাবশ্যক ছিলো। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি কী এবং তার দাবি ও চাহিদা কী, সে কথা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, আর তাই তার যাতে কল্যাণ হয়, সেই ব্যবস্থাই তিনি করে থাকেন। সর্বোপরি, মনে রাখতে হবে যে, ক্ষমা ও প্রতিদান মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিরই আলামত এবং এর স্বাদ বেহেশতের নেয়ামতের স্বাদের চেয়েও অনেক বেশী।

পরবর্তী আয়াতেও মুসলিম সমাজে ন্যায়বিচার ও মহানুভবতার প্রেরণা উজ্জীবিত করা এবং শত্রুতা ও প্রতিশোধস্পৃহা প্রশমিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এক সময় হোদায়বিয়াতে বা অন্যান্য স্থানে তাদের ওপর মোশরেকদের আক্রমণের দুরভিসন্ধি নস্যাত করে দিয়ে বিরাট অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন,

'হে মোমেনরা, আল্লাহর সেই নেয়ামতকে স্মরণ করো ......' (আয়াত ১১)

এ আয়াতে মোশরেকদের কোন ষড়যন্ত্রের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, তা নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মতটি এই যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মোশরেকদের যে দলটি সন্ধি ভংগ করে আকস্মিকভাবে রসূল (স.)-এর ওপর আক্রমণ চালাতে চেয়েছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের হাতে বন্দী করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই দলটির কথাই এখানে বলা হয়েছে। (সূরা আল- ফাতহে ২৬শ পারায় আমি এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।)

ঘটনা যেটাই হোক, এখানে তার শিক্ষাটাই প্রতিপাদ্য। শিক্ষাটা এই যে, মোমেনদের মনে সেই সম্প্রদায়টির বিরুদ্ধে বিদ্যমান আক্রোশ ও বিদ্বেষ যেন দূরীভূত হয় এবং তারা যেন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়। কেননা তারা দেখতেই পাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের রক্ষক। এই প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততাই তাদের মধ্যে ঔদার্য, মহত্ত্ব, ন্যায়বিচারপ্রীতি ও আত্মসংযম সৃষ্টি করতে পারে। যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রক্ষা করে চলেছেন ও আক্রমণ প্রতিহত করছেন, তাঁর সাথে অংগীকার পালনে ব্যর্থ হতে মুসলমানদের লজ্জা বোধ করা উচিত।

এখানে কোরআনের বর্ণনাভংগির প্রতি একটু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

'যখন একটি দল তোমাদের প্রতি হাত বাড়াতে উদ্যত হলো, কিন্তু আল্লাহ তাদের হাতকে তোমাদের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখলেন।'

অর্থাৎ কোনো এক স্থানে কোনো একটি দল তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে উদ্যত হলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের আক্রমণের কবল থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, আক্রমণ চালাতে উদ্যত হলো বলার পরিবর্তে হাত বাড়াতে উদ্যত হলো বলা কতো বেশী তাৎপর্যবহ ও উদ্দীপনাময়। কোরআনের বর্ণনাভংগির এটাই একটা বৈশিষ্ট্য।

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ

بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱۲﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا

قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳﴾ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى

اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ص فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

রুকু ৩

১২. আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদের (কাছ থেকে আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করলেন, অতপর আমি (এ কাজের জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার নিযুক্ত করলাম; আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, আমার রসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং (দ্বীনের কাজে যদি) তোমরা তাদের সাহায্য- সহযোগিতা করো, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মোচন করে দেবো এবং তোমাদের আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, এরপর যদি কোনো ব্যক্তি (আল্লাহকে) অস্বীকার করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। ১৩. (অতপর) তাদের সেই অংগীকার ভংগ করার কারণে আমি তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি (তাদের চরিত্রই ছিলো), তারা (আল্লাহর) কালামকে তার নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকৃত করে দিতো, (হেদায়াতের) যা কিছু তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো তার অধিকাংশ কথাই তারা ভুলে গেলো; প্রতিনিয়ত তুমি তাদের দেখতে পাবে, তাদের সামান্য একটি অংশ ছাড়া অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর সাথে) বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে, অতএব তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, (যথাসম্ভব) তুমি তাদের (সংস্রব) এড়িয়ে চলো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকামী মানুষদের ভালোবাসেন। ১৪. আমি তো তাদের কাছ থেকেও (আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম, যারা বলে, আমরা খৃস্টান (সম্প্রদায়ের লোক), অতপর এরাও (সে অংগীকার সম্পর্কিত) অধিকাংশ কথা ভুলে গেলো, যা তাদের স্মরণ করানো হয়েছিলো, সুতরাং আমিও তাদের

وَالْبَغْضَاءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (١٤)
يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ
مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ (١٥)
يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ
إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٦) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۚ
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٧) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ أَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ

(পরস্পরের) মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত (এক স্থায়ী) শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিলাম; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের বলে দেবেন (দুনিয়ার জীবনে) তারা যা কিছু উদ্ভাবন করতো। ১৫. হে আহলে কেতাবরা, তোমাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) রসূল এসেছে, (আগের) কেতাবের যা কিছু তোমরা এতোদিন গোপন করে রেখেছিলে তার বহু কিছুই সে তোমাদের বলে দিচ্ছে, আবার অনেক কিছু সে এড়িয়েও যাচ্ছে; তোমাদের কাছে (এখন) তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা এবং সুস্পষ্ট কেতাবও এসে হাযির হয়েছে। ১৬. যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এই কেতাব দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বাতলে দেন, অতপর তিনি তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনেন, আর (এভাবেই) তাদের তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ; (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি মারইয়াম পুত্র মাসীহ, তার মা ও গোটা বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু আছে সব কিছুও ধ্বংস করে দিতে চান, এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এদের রক্ষা করতে পারে? এই আকাশমালা, ভূমন্ডল ও এর মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব (এককভাবে) আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান। ১৮. ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র; তুমি (তাদের) বলো, তাহলে

وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ
يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ
جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ
لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم
مُّلُوكًا ۖ وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟
ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ

তিনি কেন তোমাদের গুনাহের জন্যে তোমাদের দন্ড প্রদান করবেন; (মূলত) তোমরা (সবাই হচ্ছো আল্লাহর) সৃষ্টি করা (কতিপয়) মানুষ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন আবার যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি প্রদান করেন; আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুর একক মালিকানা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট), সবকিছুকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে। ১৯. হে আহলে কেতাবরা, রসূলদের আগমন ধারার ওপরই আমার (পক্ষ থেকে) তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছে, সে তোমাদের জন্যে (আমার কথাগুলো) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে, যাতে করে তোমরা (বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে) একথা বলতে না পারো যে, (কই) আমাদের কাছে (জান্নাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী (হিসেবে) কেউ তো আগমন করেনি, (আজ সত্যি সত্যিই) তোমাদের কাছে সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী (একজন রসূল) এসে গেছে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

রুকু ৪

২০. (স্মরণ করো,) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর যে নেয়ামত নাযিল করেছেন তা তোমরা স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের (এ যমীনের) শাসনকর্তা বানিয়েছেন, এছাড়াও তিনি তোমাদের এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যা (এ) বিশ্বজগতে (এর আগে) তিনি আর কাউকে দান করেননি। ২১. হে আমার জাতি, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র ভূখন্ড লিখে রেখেছেন তোমরা তাতে প্রবেশ করো এবং (এ অগ্রাভিযানে) কখনো পশ্চাদপসরণ করো না; তারপরও তোমরা

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ق وَاِنَّا لَنْ
نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ
رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ
فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾
قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ
فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ
فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ
سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

যদি ফিরে আসো তাহলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২২. তারা বললো, হে মূসা (আমরা কিভাবে সেই জনপদে প্রবেশ করবো), সেখানে (তো) এক দোর্দন্ড প্রতাপশালী সম্প্রদায় রয়েছে, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না এলে আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আমরা (অবশ্যই) প্রবেশ করবো। ২৩. যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করছিলো, তাদের (এমন) দুজন লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছিলেন, (এগিয়ে এসে) বললো, তোমরা (সদর) দরজা দিয়েই তাদের (জনপদে) প্রবেশ করো, আর (একবার) সেখানে প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) মোমেন হও তাহলে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো। ২৪. তারা (আরো) বললো, হে মূসা, সেই (শক্তিশালী) লোকেরা যতোক্ষণ (পর্যন্ত) সেখানে থাকবে, ততোক্ষণ আমরা কোনো অবস্থায়ই সেখানে প্রবেশ করবো না, তুমিই (বরং) যাও, তুমি ও তোমার মালিক উভয়ে মিলে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম। ২৫. (তাদের কথা শুনে) মূসা বললো, হে (আমার) মালিক (তুমি তো জানো), আমার নিজের এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারো ওপর আমার আধিপত্য চলে না, অতএব আমাদের মাঝে ও এই নাফরমান লোকদের মাঝে তুমি মীমাংসা করে দাও। ২৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ, তাই হবে, আগামী) চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে (জনপদ) তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো, (এ সময়ে) তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াবে; সুতরাং তুমি এই না-ফরমান লোকদের ওপর কখনো দুঃখ করো না।

তাফসীর

আয়াত-১২-২৬

পূর্ববর্তী অংশে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে তার সাথে করা অংগীকার এবং এই অংগীকারের মাধ্যমে করা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা এই অংগীকার পালন করে এবং তা ভংগ না করে। আর বর্তমান অংশটি পুরোপুরিভাবে আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের অংগীকার ভংগ ও তার পরিণামে তাদের ওপর যে শাস্তি নেমে আসে, তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যেন তারা এই অপকর্মের পুনরাবৃত্তি না করে। কেননা আল্লাহর নীতি কখনো পরিবর্তিত হয় না এবং তাতে তিনি কাউকে খাতির করেন না। অপরদিকে এখানে আহলে কেতাবের মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন ও তা প্রতিহত করা হয়েছে, যা তারা নিজেদের ধর্মের আনুগত্যের নামে করতো। অথচ আসলে ইতিপূর্বেই তারা আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর সাথে অংগীকার ভংগ করে এসেছে।

এই অংশে হযরত মূসার জাতির সাথে আল্লাহর সেই চুক্তির পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা তাদেরকে মিসরের অবমাননাকর জীবন থেকে মুক্ত করার সময় সম্পাদন করেছিলেন। অতপর তারা সেই চুক্তি কিভাবে লংঘন করে, এই লংঘনের পরিণামে তাদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে আসে, আল্লাহর হেদায়াত ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে তারা যে বঞ্চনা ও অভিশাপের শিকার হয়, যারা নিজেদেরকে খৃষ্টান বলে দাবী করতো তারা কিভাবে আল্লাহর সাথে করা চুক্তি লংঘন করে, তার পরিণামে তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করা ও উপদলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে যে শাস্তি তাদেরকে দেয়া হয়েছে, অতপর ইহুদীদের জন্যে যে পবিত্র ভূমি বরাদ্দ করা হলো এবং তাতে প্রবেশ করার জন্যে আল্লাহর সাথে যে অংগীকার করে তারা চরম কাপুরুষতার সাথে তা লংঘন ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো এবং মূসাকে বললো যে, ‘তুমি ও তোমার রব গিয়ে লড়াই করো, আমরা এখানে বসে রইলাম। এ সবের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সূরার এই অংশে আহলে কেতাবের দেয়া অংগীকার ও তার সাথে তাদের আচরণ, এই অংগীকার ভংগ করার কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানদের আকীদা বিশ্বাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি, আল্লাহর একত্ব ও শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার অংগীকার ভংগ করার ফলে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ এবং তাদের জাতীয় ঐক্যে ফাটল ও বাধ্যতামূলক দেশান্তর ইত্যাদির কবলে পতিত হওয়ার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ অংশে তাদেরকে নতুন করে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যেন তারা আল্লাহর শেষ নবীর কাছে আগত হেদায়াত ও সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনে। তাদেরকে বলা হয়েছে.যে, যেহেতু তোমাদের কাছে একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা রসূল এসে নতুন করে তোমাদের নবীদের নিয়ে আসা একই হেদায়াতের বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাই তোমাদের এই ওযর পেশ করার অবকাশ নেই যে, আমাদের রসূলরা অনেক আগে এসে গেছেন, নতুন করে কোনো রসূল আসেননি, তাই আমরা ভুলে গেছি।

এই দাওয়াতের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যুগে যুগে সকল নবী ও সকল জাতির কাছে আল্লাহর যে দ্বীন এসেছে, তা মূলত একই জিনিস এবং তিনি তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে সব সময় একই অংগীকার গ্রহণ করতেন যে, তারা যেন এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও আনুগত্য করে, তাঁর রসূলদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে, তাদেরকে সর্ব প্রকারে সহযোগিতা দান করে, তাদের মধ্যে বৈষম্য না করে, নামায কায়েম, যাকাত প্রদান এবং আল্লাহর দেয়া রেযেক থেকে আল্লাহর পথে দান করে। বস্তুত, আল্লাহর সাথে করা উক্ত অংগীকারই মানুষকে নির্ভুল এবাদাতের পন্থা, নির্ভুল আকীদা বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতির নির্দেশনা দেয়।

আল্লাহর সাথে ইহুদীদের অংগীকার

এবার সূরার এ অংশে বর্ণিত উল্লিখিত তত্ত্বসমূহের পর্যালোচনা একে একে শুরু করা যাক সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার মাধ্যমেঃ

'আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলের অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন.... তারা কী কাজ করতো তা তাদেরকে আল্লাহ অচিরেই জানিয়ে দেবেন।' (আয়াত ১২, ১৩ ও ১৪)

বস্তুত বনী ইসরাইলের কাছ থেকে গৃহীত আল্লাহর অংগীকার ছিলো দ্বিপাক্ষিক অংগীকার, যা ছিলো সুনির্দিষ্ট শর্তের আওতাধীন। এখানে কোরআনের বর্ণনায় সুস্পষ্ট ভাষায় সেই অংগীকার ও তার শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে অংগীকারে আবদ্ধ হওয়া ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখের অব্যবহিত পরেই। এই অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো বনী ইসরাইলের ১২টি শাখার প্রধানদের কাছ থেকে। তারা ছিলো হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ১২ জন পৌত্র। ইয়াকুব (আ.)-এরই আর এক নাম ছিলো ইসরাইল।

অংগীকারের ভাষা ছিলো এই,

'আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথে থাকবো যদি তোমরা নামায কায়েম করো .... '

'আমি তোমাদের সাথে থাকবো' এটা একটা বিরাট প্রতিশ্রুতি। যার বা যাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা থাকেন, তার বা তাদের বিরুদ্ধে কেউ থাকতে পারে না। যদিও বা থাকে, সে কখনো বিপথগামী হতে পারে না। কেননা আল্লাহর সাহায্য তাকে সুপথ প্রদর্শন করে এবং তা তার জন্যে যথেষ্ট। যার সাথে আল্লাহ তায়ালা থাকে, সে কখনো দুর্ভাবনা ও দুর্ভাগ্যের শিকার হতে পারে না। আল্লাহর নৈকট্য তাকে আশ্বস্ত করে ও সমৃদ্ধিশালী করে। এক কথায় বলা যায়, যে আল্লাহর সাহায্য পায়, সে সর্ব প্রকারের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা পায়, সফলকাম হয় এবং কোনো প্রত্যাশাই তার অতৃপ্ত ও অপূর্ণ থাকে না।

তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাহচর্যকে নিছক কাকতালীয়, প্রিয়জনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শর্তহীন ও উপলক্ষহীনভাবে পাওয়া যায় এমন কোনো ব্যক্তিগত সমান বানাননি, বরং এ হচ্ছে একটা চুক্তি, যা শর্তযুক্ত।

এর পয়লা শর্ত হলো নামায কায়েম করা– শুধু নামায পড়া নয়। নামায কায়েম করার অর্থ নামাযকে তার সেই সব মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা, যা বান্দা ও তার মনিবের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এমন একটা সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত উপাদান তৈরী করে যা মানুষকে আল্লাহর বিধানের অনুসারী বানায় এবং অশ্লীলতা ও দুষ্কৃতি রোধ করে। কেননা অশ্লীলতা ও দুষ্কৃতি নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা বোধ হয়।

এর দ্বিতীয় শর্ত হলো যাকাত দেয়া। সকল জীবিকা যে আল্লাহর দেয়া, যাবতীয় ধন সম্পদের মূল মালিক যে আল্লাহ তায়ালা, মানুষ যে এ সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র এবং এই সম্পদের ব্যয় ও ব্যবহারে সে যে আল্লাহর দেয়া বিধি ও শর্ত মেনে চলতে বাধ্য, তার স্বীকৃতি হিসাবেই যাকাত দিতে হয়। যাকাত দেয়ার আর একটা উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। এই সামাজিক নিরাপত্তাই ইসলামী নীতিমালার ভিত্তি। যাকাত অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিকে এমন বিধি-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে, যার ফলে সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকার সুযোগ পায় না। গুটিকয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকার কারণে অর্থনীতিতে সর্বব্যাপী অচলাবস্থা নেমে আসে এবং সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী পণ্য কিনতে ও ভোগ করতে অক্ষম হয়ে পড়ায় উৎপাদনের

গতি রুদ্ধ অথবা শ্লথ হয়ে পড়ে। এর ফলে জনগোষ্ঠীর একাংশ বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, অপরাংশ দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জরিত হয় এবং তৃতীয় একটি অংশ সমাজে ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের সয়লাব। যাকাত ও আল্লাহপ্রদত্ত অর্থনৈতিক বিধান এই সবক'টি অন্যায় ও ক্ষতিকর জিনিস রোধ করতে সক্ষম।

তৃতীয় শর্ত আল্লাহর নবী রসূলদের ওপর ঈমান আনা। অর্থাৎ সকল রসূলের ওপর ঈমান আনতে হবে। তাদের মধ্যে তারতম্য ও বৈষম্য করা চলবে না। কেননা তারা সকলেই আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর দ্বীন বহন করে নিয়ে এসেছেন। তাদের একজনকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা সকলকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার শামিল এবং যে আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে পাঠিয়েছেন, সেই আল্লাহকেও অবিশ্বাস করার নামান্তর।

আর শুধু রসূলদের ওপর নেতিবাচক ঈমান আনাও যথেষ্ট নয়, বরং তাদেরকে ইতিবাচক ও সক্রিয় সাহায্যও করতে হবে। যে দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন এবং যে কাজের জন্যে তাঁরা নিজেদের গোটা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে তাঁদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতাও করতে হবে। আল্লাহর দ্বীনের ওপর ঈমান আনার অন্যতম দাবী এই যে, মোমেন যে আদর্শের ওপর ঈমান আনলো তাকে বিজয়ী করতে তথা পৃথিবীতে ও মানুষের জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হবে। কেননা আল্লাহর দ্বীন নিছক আকীদা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো মতবাদ বা ধ্যানধারণা নয় কিংবা নিছক আনুষ্ঠানিক এবাদাত উপাসনাও নয়। বরঞ্চ তা হচ্ছে জীবনের জন্যে একটা বাস্তব ও কার্যকর আইন, বিধান এবং জনজীবনকে পরিচালনাকারী একটা প্রতিষ্ঠান ও শাসন কাঠামো। এ ধরনের আইন বিধান ও শাসন ব্যবস্থা নিজের বাস্তবায়নের জন্যে এবং বাস্তবায়িত হবার পর সংরক্ষণের জন্যে জনসাধারণের সাহায্য, সমর্থন, সহযোগিতা, চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামের মুখাপেক্ষী। এই বিধানে যারা বিশ্বাসী, তারা যদি এই সাহায্য সহযোগিতা ও সংগ্রাম না করে, তাহলে তাদের নিজ অংগীকার পালন করা হবে না।

যাকাতের পর আরেকটা কর্তব্য থেকে যায় সাধারণ দান। এটিকে আল্লাহ তায়ালা 'করয' বা ঋণ নামে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং দুনিয়ার যাবতীয় সহায় সম্পদের আসল মালিক ও দাতা। অথচ এই সম্পদ যাকে দান করেন, সে যখন তার কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তখন তিনি নিজের অনুগ্রহ ও করুণার বশে এই ব্যয়কে 'আল্লাহকে দেয়া ঋণ' বলে অভিহিত করেন।

এই কয়টি ছিলো শর্ত। এই শর্তগুলো পালিত হলে কী হবে, সেটা বলা হয়েছে আয়াতের শেষ ভাগে। বলা হয়েছে যে, এই শর্তগুলো পূর্ণ করা হলে মোমেনের দুটো প্রতিদান প্রাপ্য হবে। একটি হচ্ছে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া এবং অপরটি জান্নাত লাভ।

গুনাহ মাফ হওয়াটা বান্দার জন্যে একটা বিরাট পুরস্কার। কেননা সে যতো ভালো কাজই করুক, কিছু না কিছু ভুলক্রটি ও গুনাহ তার দ্বারা সংঘটিত হওয়া অবধারিত। এটা তার দুর্বলতা অক্ষমতা ও অসম্পূর্ণতা। তাই গুনাহ মাফ করে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করে থাকেন এবং তার দুর্বলতার ক্ষতি পূরণ করে থাকেন।

আর নিচ দিয়ে ঝর্ণা বয়ে যাওয়া জান্নাত আল্লাহর বিশেষ দান। মানুষ কেবল নিজের সৎ কর্মের বলে জান্নাত পেতে পারে না। এ জন্যে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রয়োজন। তবে সাধ্যমত সৎকাজ করার চেষ্টা ও সাধনা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তিতে সহায়ক হয়ে থাকে।

এই অংগীকারের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে আরো একটা হুশিয়ারী। তা হচ্ছে,

'এর পরও তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে।'

কেননা হেদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া, চুক্তি সম্পাদিত হওয়া এবং পরিণাম ও ফলাফল জানার পর যে ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয় ও কুফরী করে, তার আর সুপথে ফিরে আসার সুযোগ থাকতে পারে না।

বিশ্বাসঘাতকতা ইহুদী চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ

বনী ইসরাইলের এই সব নেতা ও সরদারের সাথে আল্লাহর চুক্তি ও অংগীকার ছিলো গোটা বনী ইসরাইলের সাথে সম্পাদিত চুক্তি। এ চুক্তি তারা সবাই মেনেও নিয়েছিলো। ফলে ওই সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী ও অংগীকারকারী রূপে পরিগণিত হয়েছিলো। আর তাদের দ্বারা যে জাতি গঠিত হয়েছিলো, সেই জাতিও ছিলো এই চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ।

কিন্তু বনী ইসরাইল এই চুক্তির সাথে কী আচরণ করেছিলো?

তারা চুক্তি ভংগ করেছিলো। তাদের নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলো। তাদের মধ্যকার শেষ নবী হযরত ঈসা (আ,)-কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলো। তাদের কেতাব তাওরাতকে বিকৃত করেছিলো। নিজেদের শরীয়তের বিধানকে তারা ভুলে গিয়েছিলো এবং তা বাস্তবায়িত করেনি। শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে তারা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। তাঁর সাথে সম্পাদিত চুক্তিগুলো লংঘন করেছিলো। এর ফলে তারা আল্লাহর হেদায়াতের পথ থেকে বিতাড়িত হয়। তাদের মন এতো শক্ত হয়ে যায় যে, তারা নবীর হেদায়াতের বাণী গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়ে। একথাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ১৩ নং আয়াতে,

'তাদের সম্পাদিত চুক্তি ভংগের কারণে আমি তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছি.........'

আল্লাহর এ উক্তি অকাট্য সত্য। এগুলো ইহুদীদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। হেদায়াতের সঠিক পথ এড়িয়ে বিভ্রান্তির বাঁকা পথে চলার জন্মগত প্রবণতার মধ্য দিয়ে তাদের কপালের অভিশাপের চিহ্ন ফুটে ওঠে। ভীতি ও আশংকা দেখা দিলে এবং স্বার্থ বিপন্ন হলে তারা কোমল ও সৌহার্দপূর্ণ কথাবার্তা বলার প্রতারণাময় কৌশল যতোই রপ্ত করুক, প্রকৃতপক্ষে তাদের অমানবিক আচরণ থেকে তাদের চরম নিষ্ঠুরতা ও পাষন্ডতাই প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া কথাকে বিকৃত করা তাদের মজ্জাগত বদ স্বভাব। এই বদ স্বভাবটি তারা প্রথমত, তাদের কেতাব তাওরাতকে বিকৃত করার মাধ্যমে প্রদর্শন করেছে। ওই কেতাবের যে মূল রূপ হযরত মূসার ওপর নাযিল হয়েছিলো, তাকে তারা অনেকখানি পাল্টে ফেলে। কখনো এই কেতাবে তারা এমন বহু কথা সংযোজন করেছে, যা দ্বারা তাদের বিকৃত ও খারাপ উদ্দেশ্যগুলোর পক্ষে জালিয়াতির মাধ্যমে পরিবর্তিত আল্লাহর কেতাবের সমর্থন ও অনুমোদন প্রমাণ করা যায়। আবার কখনো অবশিষ্ট মূল বক্তব্যকে আপন আপন স্বার্থ, প্রবৃত্তির খায়েশ ও অসদুদ্দেশ্যের সমর্থনে অপব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃত করতো। কখনো আবার ইচ্ছাকৃতভাবে এর শরীয়তী বিধিসমূহকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে সমাজে ও রাষ্ট্রে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে দিতো। কেননা সমাজে ও রাষ্ট্রে ওগুলো বাস্তবায়িত করলে তাদেরকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে বাধ্য হতে হতো।

'তুমি তাদের দিক থেকে অনবরতই একটা না একটা বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারবে ....'।

এখানে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এ উক্তিটিতে মদীনার মুসলিম সমাজে ইহুদী গোষ্ঠীর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। রসূল (স.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কোনো চেষ্টা

থেকেই তারা বিরত থাকতো না। বিশ্বাসঘাতকতা ছিলো তাদের চিরাচরিত স্বভাব। শুধু মদীনায় রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায়ই নয়, বরং আরবের সর্বত্র সব সময়ই তারা বিশ্বাসঘাতকসুলভ আচরণ করতো। যদিও একমাত্র মুসলিম সমাজই তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলো, তাদেরকে যুলুম থেকে রক্ষা করেছিলো, তাদের সাথে সদাচরণ করেছিলো এবং পরম সুখে জীবন যাপনের সুযোগ করে দিয়েছিলো, কিন্তু তারা রসূল (স.)-এর আমলেই শুধু নয়, বরং গোটা ইতিহাস জুড়েই মুসলমানদের সাথে সাপ, বিচ্ছু, শেয়াল ও বাঘের মতো আচরণ করেছে। ধোকা ও বিশ্বাসঘাতকতা তারা সব সময় গোপন করে রাখতো। মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে নাজেহাল করা সম্ভব না হলে তাদের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাততো, তাদের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করতো এবং সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। সুযোগ পাওয়া মাত্রই নিষ্ঠুরতম কায়দায় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং কোনো রকমের রাখ ঢাক বা বিচার বিবেচনা করতো না। আল্লাহ তায়ালা একথাও বলেছেন যে, তাদের অধিকাংশেরই স্বভাব এ রকম। প্রাচীন কাল থেকে আল্লাহর অংগীকার ভংগ করতে করতে এটা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে।

আয়াতটিতে ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা খুবই তাৎপর্যবহ। বলা হয়েছে যে,

'তোমরা অনবরতই একটা না একটা বিশ্বাসঘাত কতা তাদের দিক থেকে পাবে।'

বিশেষ্য বাদ দিয়ে শুধু বিশেষণ 'খায়িনা' শব্দটির ব্যবহার দ্বারা তাদের স্বভাব-প্রকৃতির এমন একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে, কথা, কাজ, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টি সব কিছুতেই তারা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতো। এরূপ সর্বাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা নিয়েই তারা রসূল (স.) ও মুসলমানদের সাথে মেলামেশা ও আচরণ করতো।

যেহেতু কোরআন মুসলিম জাতির চিরন্তন পথপ্রদর্শক, তাই সে তাদের কাছে তাদের শত্রুদের মুখোশ উন্মোচন করে এবং আল্লাহর হেদায়াতকারীদের সাথে তাদের চিরাচরিত আচরণ ও তাদের ঐতিহাসিক স্বভাব চরিত্র তুলে ধরে। এই জাতি যদি সব সময় কোরআনের কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ নিতো, তার নির্দেশ মেনে চলতো এবং তার বিধান নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতো, তাহলে তাদের শত্রুরা একদিনের জন্যেও তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারতো না। কিন্তু তারাও আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ও অংগীকার ভংগ করে কোরআনকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। ফলে যুগে যুগে তাদেরকে বহু বিপর্যয়ের শিকার হতে হয়েছে। কোরআনের বিধানকে অবহেলা করার পর কোরআনকে তাবীয তদবীরে যতোই ব্যবহার করুক, তাতে তারা বিপদ মুসিবত থেকে উদ্ধার পায়নি।

খৃষ্টান বনাম আজকের মুসলমান

আল্লাহর সাথে করা চুক্তি ভংগ করার পর বনী ইসরাইলের কপালে যে অভিসম্পাত, হেদায়াত থেকে বঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা এবং আল্লাহর কেতাবের বিকৃতি সাধনের মতো ভয়ংকর পরিণাম জুটেছে, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে সাবধান করে দিতে চেয়েছেন যে, তারাও যেন আল্লাহর সাথে অনুরূপ চুক্তি ভংগ করার পর বনী ইসরাইলের কপালে যে অভিসম্পাত, হেদায়াত থেকে বঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা এবং আল্লাহর কেতাবের বিকৃতি সাধনের মতো ভয়ংকর পরিণাম জুটেছে, তারাও যেন আল্লাহর সাথে অনুরূপ চুক্তি ভংগ করে

অনুরূপ পরিণতির শিকার না হয়। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ এই হুশিয়ারীতে কর্ণপাত না করে যখন বিপথগামী হয়েছে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে বিশ্ব নেতৃত্বের পদমর্যাদা ও দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছেন এবং তাকে একটা তুচ্ছ ও অবহেলিত জাতিতে পর্যবসিত করেছেন। যদি কখনো সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ও তাঁর সাথে করা অংগীকার পালন করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে বিশ্ব নেতৃত্ব এ মানব জাতির সাক্ষী ও অভিভাবক হবার সুযোগ পুনরায় দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নচেত আজ সে যেমন অবহেলিত আছে, আগামী কালও তেমনই থেকে যাবে। আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না। যে সময় এ আয়াত নাযিল হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে,

'কাজেই তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ সদাচারীদেরকে ভালোবাসেন।'

বস্তুত, তাদের অপকর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করা সদাচারই বটে! তবে পরবর্তীকালে এই ক্ষমার আর অবকাশ থাকেনি। তখন তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং আরো পরে গোটা আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দিয়েছিলেন। এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হয়েছিলো।

আল্লাহ তায়ালা ১৪ নং আয়াতে খৃষ্টানদের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তারাও আল্লাহর সাথে অংগীকার করে তা ভংগ করেছিলো এবং এর পরিণামও ভোগ করেছিলো।

আয়াতের বর্ণনাভংগিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর তাদের থেকেও, যারা বলেছিলো যে, আমরা সাহায্যকারী' (অর্থাৎ হযরত ঈসার)

অর্থাৎ তারা শুধু মুখে মুখেই এ দাবি করেছে, বাস্তবে তাদের জীবনে তা কার্যকরী করেনি। এই চুক্তি ও অংগীকারের ভিত্তি ছিলো আল্লাহর একত্ব। খৃষ্টানদের ঐতিহাসিক বিপথগামিতার সূচনাই ঘটেছিলো এই ভিত্তিকে ধসিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে। আর এটাই হলো আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়া চুক্তির সেই অংশ, যাকে তারা ভুলে গেছে বলে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আর এই ভুলে যাওয়ার কারণেই তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নিত্যনতুন গোমরাহী এবং নিত্যনতুন কোন্দল ও দলাদলি। খৃষ্টানদের মধ্যে সৃষ্ট প্রাচীন ও আধুনিক উপদলের সংখ্যা প্রায় অগণিত। (পরবর্তীতে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে) আর এ সব উপদলের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণার সম্পর্ক বিরাজ করবে বলে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জানিয়েছেন। আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি তারা লংঘন করেছিলো এবং এর একাংশ ভুলে গিয়েছিলো বলেই তাদের এই পরিণতি। আর আখেরাতের শাস্তি তো রয়েছেই। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন এবং তদনুসারে প্রতিফল দেবেন।

ইতিহাসের প্রাচীন ও আধুনিক যুগে খৃষ্টানদের মধ্যে এতো বেশি উপদলীয় সংঘাত ও সংঘর্ষ হয়েছে এবং তাদের একে অপরের হাতে স্বধর্মীদের এতো বেশি রক্তপাত হয়েছে, যা অন্য কারো সাথে তাদের যুগ যুগকাল ধরে সংঘটিত যুদ্ধ বিগ্রহেও হয়নি। এসব সংঘাত সংঘর্ষ, আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত ধর্মীয় মতভেদের কারণেই ঘটে থাকুক, ধর্মীয় রাষ্ট্র সংক্রান্ত মতভেদের কারণেই ঘটুক অথবা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতভেদের কারণেই ঘটুক, তা যুগ যুগ কাল ধরে অব্যাহত থেকেছে। কখনো প্রশমিত হয়নি এবং কেয়ামত পর্যন্তও প্রশমিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা সকল সত্যবাদীর মধ্যে সেরা সত্যবাদী। তিনিই এ কথা বলেছেন। তিনি এও বলেছেন

যে, খৃষ্টানরা আল্লাহর সাথে করা চুক্তি লংঘন ও তার সেই অংশটি ভুলে যাওয়া তথা অবহেলা করার কারণে তাদের মধ্যে এসব সংঘাত সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিলো। এই চুক্তির প্রথম দফাই হলো আল্লাহর একত্বের ঘোষণা সম্বলিত। হযরত ঈসার ইন্তেকালের কিছুকাল পরেই তারা এই একত্ববাদের নীতি থেকে সরে গিয়েছিলো। এর অনেক কারণ ছিলো, যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার অবকাশ এখানে নেই। (১)

আহলে কেতাবদের প্রতি কোরআনের আহ্বান

ইহুদী ও খৃষ্টান জাতি কর্তৃক আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘনের বিবরণ দেয়ার পর ১৫-১৯ আয়াতসমূহে ইহুদী ও খৃষ্টান নির্বিশেষে সমগ্র আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানো হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, শেষ নবী যেমন নিরক্ষর আরবদের জন্যে এবং গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে এসেছেন, তেমনি তাদের জন্যেও এসেছেন। শেষ নবীর অনুসরণের আদেশ তাদেরকেও দেয়া হয়েছে এবং এটা তাদের আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তিরই একটি অংশ। এখানে এ কথাও বলা হয়েছে এই শেষনবী তাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর কেতাব তাওরাত ও ইনজীলের এমন বহু কথা প্রকাশ করে দিতে এসেছেন, যা তারা গোপন করতো। ওই কেতাবকে তাদের ওপর নাযিল করে তা সংরক্ষণের অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো। কিন্তু সেই অংগীকার তারা ভংগ করেছিলো। শেষনবী তাদের কেতাবের গোপন করা বহু জিনিস প্রকাশ করেন, আর বহু কিছু প্রকাশ করা থেকে বিরতও থাকেন। কেননা নতুন শরীয়তের জন্যে ওইগুলোর আর কোনো প্রয়োজন ছিলো না। এ আয়াত কয়টিতে তাদের কিছু আকীদাগত বিভ্রান্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে, যা শোধরানোর জন্যে শেষনবীর আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন খৃষ্টানরা বলতে আরম্ভ করলো,

'মারইয়ামের পুত্র ঈসা মসীহই আল্লাহ তায়ালা।' আর ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই বলতো, আমরা আল্লাহর সন্তান সন্ততি। ... আয়াত কয়টির উপসংহার টানা হয়েছে এই হুশিয়ারী দিয়ে যে, যেহেতু শেষ নবীর মাধ্যমে সব কিছু খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে, তাই এরপর তাদের আর কোনো ওযর আপত্তি পেশ করার সুযোগ থাকবে না এবং এই খোঁড়া ওজুহাত চলবে না যে, আমাদের কাছে দীর্ঘদিন কোনো নবী রসূল না আসার দরুন আমরা ভুলে গিয়েছিলাম এবং তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলাম। ১৫-১৯ নং আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে আহলে কেতাব! তোমাদের কাছে আমার রসূল এসে গেছে ....'

আসলে আহলে কেতাবের কাছে এ জিনিসটা বড়ই অপছন্দনীয় ছিলো যে, তাদের কাছে এমন একজন নবী এসে ইসলামের দাওয়াত দেবেন, যিনি তাদের বংশধর নন, বরং যে নিরক্ষর। আরবদের ওপর তারা সব সময় নিজেদের শিক্ষাদীক্ষার বদৌলতে আধিপত্য ফলিয়ে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন এই নিরক্ষরদেরই সম্মানিত করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাদের মধ্য থেকে শেষ নবীকে পাঠালেন, যিনি সমগ্র মানব জাতির নবী হলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে এই নিরক্ষর জাতিকে এতো শিক্ষিত করে তুললেন যে, তারাই হয়ে গেলো বিশ্বের সবচেয়ে জ্ঞানী জাতি। সবচেয়ে উন্নত ও উৎকৃষ্ট আকীদা ও আদর্শের ধারক বাহক জাতি। সবচেয়ে নিখুঁত ও নিষ্কলুষ জীবন ব্যবস্থা সম্পন্ন জাতি, সবচেয়ে উত্তম আইন-কানুনের অধিকারী

---

(১) অধ্যাপক শেখ আবু যুহরা রচিত গ্রন্থ 'মোহদারাতুল ফিন্ নাসরানিয়া' এবং ফী যিলালিল কোরআনের সূরা আলে ইমরানের তাফসীর দেখুন।

জাতি এবং সবচেয়ে মহৎ সমাজ ও সবচেয়ে সৎ নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন জাতি। এই সবই ছিলো তাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ। তাদের জন্যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হিসাবে এই দ্বীনকে মনোনীত করেছিলেন। এই নেয়ামত না হলে অতো বড় নিরক্ষর ও মুর্খ জাতির পক্ষে সারা বিশ্বের নেতা ও অভিভাবক হওয়া সম্ভব হতো না। এই দ্বীন তথা ইসলাম ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো জিনিস এমন ছিলো না এবং আজও পর্যন্ত হয়নি, যা তারা বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পারে।

আহলে কেতাবের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত আল্লাহর এই উদাত্ত আহবানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.) আনীত ইসলামের প্রতি তারাও আমন্ত্রিত এবং তিনি আরব ও গোটা বিশ্বের সাথে সাথে আহলে কেতাবেরও নবী। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকেই যে তিনি রসূল হয় এসেছেন, তাঁর রেসালাত যে কেবল আরবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আহলে কেতাবের জন্যেও, সে কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে এ সব আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘হে আহলে কেতাব! তোমাদের কাছে আমার রসূল এসে গেছে, যে তোমাদের কেতাবের সেই সব অংশ প্রকাশ করে দেয়, যা তোমরা গোপন করে রাখতে, আর বহুলাংশ প্রকাশ করে না.......’।

অর্থাৎ তিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত নবী। তোমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর কেতাবের যে সব অংশ গোপন করতে তা প্রকাশ করা ও ব্যাখ্যা তাঁর দায়িত্ব। এই গোপন করার কাজটি ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে করতো। খৃষ্টানরা তো আল্লাহর দ্বীনের সর্ব প্রধান ভিত্তি তাওহীদ বা একত্ববাদকেই লুকিয়ে ফেললো। আর ইহুদীরা শরীয়তের বহু বিধি লুকিয়ে ফেললো। যেমন ব্যাভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার শাস্তি ও সূদ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধকরণ, উভয় জাতি যে সব জিনিসকে গোপন করেছিলো, তার মধ্যে রয়েছে নিরক্ষর নবীকে পাঠানোর খবর, যা তাওরাত ও ইনজীলে লিখিতভাবে বিদ্যমান ছিলো। অবশ্য রসূল (স.) তাদের গোপন করা বা বিকৃত করা অনেক জিনিসকে যথাযথভাবে বহালও রেখেছেন। কেননা সে সব জিনিস সম্পর্কে তাঁর আনীত শরীয়তে নতুন কিছু ছিলো না। আল্লাহর রীতি এই যে, তিনি পূর্ববর্তী নবীদের কেতাব ও শরীয়তের সেই সব হুকুম বা বিধি রহিত করেন, যার কোনো কার্যকারিতা ও উপকারিতা মানব সমাজে অবশিষ্ট ছিলো না। সে সব বিধি সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠীর ওপর সাময়িকভাবে প্রযোজ্য ও কার্যকর ছিলো। পরে যখন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণাংগ ও চিরন্তন বিধান এলো, তখন আর কোনো বিধিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের প্রয়োজন রইলো না কিংবা রহিতকরণেরও অবকাশ রইলো না।

ইসলামই বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তিপথ

আয়াতের শেষাংশে ও ১৬ নং আয়াতে বর্ণনা করা হচ্ছে শেষ নবী আনীত দ্বীনের বৈশিষ্ট্য, মানব জীবনে তার ভূমিকা ও প্রভাব,

‘তোমাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে এসে গেছে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। এ দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুরসণ করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন তাঁরই অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে নির্ভুল পথ দেখান।’

আল্লাহর কেতাব কোরআনকে এবং আল্লাহর বিধান ইসলামকে ‘নূর’ তথা ‘আলো’ নামে আখ্যায়িত করে উভয়ের যে বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি তুলে ধরেছে, তার চেয়ে সঠিক, নির্ভুল সত্য বৈশিষ্ট্য আর কিছু হতে পারে না।

মোমেন এ সত্যকে উপলব্ধি করে তার হৃদয়ে, তার সত্ত্বায়, তার জীবনে, তার দৃষ্টিতে এবং মানুষ, বস্তু ও ঘটনাবলীর মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে যথার্থ ঈমান বদ্ধমূল হওয়া মাত্রই মোমেন এই নূর বা আলোকে চিনতে পারে। কেননা এই আলোতে তার গোটা সত্ত্বা আলোকিত হয়ে যায় এবং তার সামনে সব কিছু উজ্জ্বল ও নিখুঁত হয়ে যায়। তার সত্ত্বায় ও অন্তরাত্মায় মাটির সৃষ্ট যে আবীলতা ও অন্ধকার, রক্ত ও মাংসজনিত যে মলিনতা ও অস্বচ্ছতা এবং রিপুর তাড়না ও কামনা বাসনা জনিত যে হিংস্রতা বিরাজ করে, তা সবই এই আলোর পরশে পরিষ্কার হয়ে যায়। ভারত্ব হালকা হয়, অন্ধকার আলোকে পরিণত হয়। মলিনতা পরিষ্কার হয় এবং হিংস্রতা ভদ্রতায় পরিবর্তিত হয়। এই আলোর বন্যায় দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, পদক্ষেপের দোদুল্যমানতা, গতির জড়তা ও পথের অস্পষ্টতা সবই দূরীভূত হয়ে যায়। লক্ষ্য সুষ্ঠুতর হয়, যাত্রাপথ নিখুঁত ও মসৃণতর হয় এবং পথিকের দৃঢ়তা সুসংহত হয়। এই আলোকময় গ্রন্থের নির্দেশনার কল্যাণে।

'আলো ও স্পষ্ট গ্রন্থ'। একই জিনিসের অর্থাৎ রসূল (স.) আনীত বিধানের বিশেষণ ও গুণ।

'এর দ্বারা আল্লাহ সেই সব মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।'

আল্লাহ তায়ালা যে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন, সেই ইসলামেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। সুতরাং 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে,' এ কথার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি ইসলামের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তায়ালা যেমন ইসলামকে তাঁর জন্যে মনোনীত করেছেন, তেমনি সেও নিজের জন্যে ইসলামকে মনোনীত করে, তাকেই আল্লাহ শান্তির পথে পরিচালিত করেন।

উপরোক্ত উক্তিটি যে যথার্থও অকাট্য সত্য, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসবে। বস্তুত ইসলামই যে মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'শান্তি' এনে দিতে পারে, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্যক্তির শান্তি, দলের শান্তি, বিশ্বের শান্তি, বিবেকের শান্তি, বুদ্ধির শান্তি, অংগ-প্রত্যংগের শান্তি, গৃহ ও পরিবারের শান্তি, জাতি ও সমাজের শান্তি, সমগ্র বিশ্ব মানবের শান্তি, জীবন ও জগতের মাঝে শান্তি, জীবন ও জগতের প্রভু আল্লাহর সাথে শান্তি-মোটকথা সার্বিক ও সর্বাত্মক শান্তি একমাত্র ইসলামের অনুসরণেই সম্ভব। এমন অনাবিল সার্বিক ও সর্বাত্মক শান্তি মানব জাতি ইসলামে, ইসলামের আইনে ও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত সমাজে এবং রাষ্ট্রে ছাড়া আর কোথাও কখনো পায়নি এবং কখনো পাবে না।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনোনীত এই দ্বীন দ্বারা যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে জীবনের উল্লেখিত সব কয়টি ক্ষেত্রে শান্তির পথে পরিচালিত করে থাকেন। তবে এই বিষয়টির গুরুত্ব ও গভীরতা একমাত্র তারাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারে, যারা প্রাচীন বা আধুনিক জাহেলিয়াতের অধীন যুদ্ধের বিড়ম্বনা ভোগ করেছে, যারা জাহেলী আকীদা বিশ্বাসের দরুন মন মগযে ও বিবেকে পুঞ্জীভূত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা ভোগ করেছে এবং জাহেলী আইন কানুন, বিধি-ব্যবস্থা ও শাসন ও শোষণের যাতনা ভোগ করেছে।

কোরআনের এই কথাগুলো যাদেরকে প্রথম বলা হয়েছিলো, তারা তাদের জাহেলিয়াতকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে এই শান্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করতো। কেননা তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি দ্বারাই জাহেলিয়াত ও ইসলাম উভয়েরই স্বাদ উপলব্ধি করে।

আজকে যখন নবযুগের জাহেলিয়াত সমকালীন মানব জাতিকে হাজারো রকমের যুলুম শোষণে নিষ্পেষিত করছে এবং বিবেকে ও সমাজে যুগ যুগ কাল ধরে নানা রকমের যুদ্ধবিগ্রহ

চালিয়ে যাচ্ছে, তখন ইসলামের এই শান্তির আহবান আমাদেরকে সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। আমরা যারা ইসলামের এই অনাবিল শান্তির ভুবনে আমাদের ইতিহাসের কিছুকাল অতিবাহিত করেছি, অতপর আমাদের অন্তরাত্মাকে, আমাদের স্বভাব চরিত্রকে এবং আমাদের জাতি ও সমাজকে বিধ্বস্তকারী জাহেলিয়াতের বর্বরোচিত যুদ্ধবিগ্রহের কোলে আশ্রয় নিয়েছি, তাদের জন্যে ইসলামের এই শান্তির অমিয় বাণী অনুধাবন করা খুবই জরুরী। কেননা আল্লাহ তায়ালা যে শান্তি ও নিরাপত্তার ভুবন আমাদের জন্যে প্রস্তুত ও বরাদ্দ করেছেন, সেখানে আমরা তাঁর মনোনীত পথ অনুসরণ করে এখনো প্রবেশ করতে পারি।

এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ইসলাম আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে অথচ আমরা জাহেলিয়াতের যুলুম শোষণে পিষ্ট হচ্ছি এবং ইসলামের শান্তির দ্বার আমাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও জাহেলিয়াতের যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি ভোগ করছি। একটা উৎকৃষ্টতর জিনিসকে পরিত্যাগ করে নিকৃষ্টতর জিনিসকে বেছে নেয়ার মতো এমন অলাভজনক ও ক্ষতিকর ব্যবসা আর কি হতে পারে? হেদায়াতকে বর্জন করে গোমরাহীকে বেছে নেয়া এবং শান্তির ওপর যুদ্ধকে অগ্রাধিকার দেয়ার মত এমন কান্ডজ্ঞানহীন কাজ আর কী হতে পারে?

জাহেলিয়াতের চাপিয়ে দেয়া ধ্বংসযজ্ঞ ও রকমারি যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মানব জাতিকে আমরাও রক্ষা করতে সক্ষম। তবে সে জন্যে প্রথমে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। নিজেদেরই আগে ইসলামের শান্তির ছায়ায় আশ্রয় নিতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ ও তাঁর মনোনীত দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই আমরা সেই দলে শামিল হতে পারবো, যাদেরকে আল্লাহ শান্তির পথ প্রদর্শন করেন।

'তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান .....।

'অন্ধকার' দ্বারা জাহেলিয়াতকে বুঝানো হয়েছে। জাহেলিয়াত এক সর্বাত্মক অন্ধকার। সন্দেহ, কুসংস্কার, অলীক কল্পনা, ভিত্তিহীন ধ্যান ধারণা, প্রবৃত্তির খেয়াল খুশি ও ঝোঁক, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা, হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্ছিন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা, অবিশ্বাস, মূল্যবোধ ও বিধিনিষেধের অস্থিরতা ও অস্থিতি এ সবই এক এক ধরনের অন্ধকার এবং জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্য। আর 'নূর' বা আলো হচ্ছে বিবেক, বুদ্ধি, অন্তরাত্মা, জীবন ও কর্মের সেই স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ও আলোকময় অবস্থা, যার কথা আমি একটু আগেই বললাম।

'এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।'

মুসতাকীম বলতে বুঝানো হয়েছে, সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ সেই পথ যা মানুষের প্রকৃতি ও তাকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মবিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্ব প্রকৃতি ও তাকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে এতে তথ্য, দৃষ্টিভংগি ও উদ্দেশ্যের কোনো গোঁজামিল নেই।

যে আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার স্বভাব প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বজগত ও তার নিয়মবিধিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তার জন্যে এই সঠিক, নির্ভুল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন বিধান তথা ইসলামকে রচনা ও মনোনীত করেছেন। সুতরাং এই সঠিক বিধান যে তাদেরকে সঠিক পথেই পরিচালিত করতে পারে, সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অক্ষম, অজ্ঞ ও মরণশীল মানুষের রচিত কোনো বিধান তাদেরকে এইপথে পরিচালিত করে না।

আল্লাহর কথা অকাট্য সত্য। বিশ্ব জগতের কারো মুখাপেক্ষী নন তিনি। কেউ সুপথে চলুক বা বিপথে তাতে তার কিছু এসে যায় না। তবে তিনি তাদের প্রতি দয়ালু ও অনুকম্পাশীল।

বিকৃত খৃষ্টবাদের ইতিহাস

ইসলামের একত্ববাদই হচ্ছে সঠিক পথ। আর ঈসা মসীহকে আল্লাহ মনে করা কুফরী ও ভ্রান্ত পথ। আর ইহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর বংশধর ও বন্ধুবান্ধব একথাও ভিত্তিহীন ও প্রমাণহীন। উক্ত দুটো কথাই আহলে কেতাবের কথা এবং তাওহীদের পরিপন্থী কথা। এই ভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যেই শেষ নবী এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা বলেছে যে, মরিয়ম তনয় মসীহই আল্লাহ, তারা কুফরী করেছে, (আয়াত নং ১৬)

যে তাওহীদ নিয়ে প্রত্যেক নবী এসেছেন, হযরত ঈসাও (আ.) সেই একই তাওহীদ নিয়ে এসেছেন। প্রত্যেক রসূলই আল্লাহর নির্ভেজাল দাসত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই সুস্পষ্ট তাওহীদের আকীদা পরবর্তীকালে পৌত্তলিকেরা খৃষ্টধর্মে প্রবেশের কারণে বিকৃত হয়েছে। তারা পৌত্তলিকতাকে তাওহীদের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত করেছে যে, একটাকে অন্যটা থেকে আলাদা করার কোনোই অবকাশ থাকেনি।

এই সব বিকৃতি রাতারাতি আসেনি। এগুলো এসেছে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে। বিভিন্ন সময়ে খৃষ্টীয় সম্মেলনগুলো একের পর এক হযরত ঈসার প্রচারিত তাওহীদকে বিকৃত করতে করতে এমন পর্যায়ে এনে ফেলেছে যে, তা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়।

হযরত ঈসা (আ.)-এর পর তার শিষ্য ও অনুসারীদের মধ্যে তাওহীদ বিশ্বাস অক্ষুণ্ন ছিলো। ইনজীল বা বাইবেল নামে লিপিবদ্ধ গ্রন্থসমূহের অন্যতম বার্নাবাসের বাইবেলে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত রসূল (আল্লাহর পুত্র নয়) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরপর তাদের মধ্যে মতভেদ সংঘটিত হয়েছে। কেউ বলেছে যে, ঈসা (আ.) অন্যান্য রসূলের মতো একজন রসূল। কেউ বলেছে যে, রসূল ঠিকই, তবে আল্লাহর সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কেউ বলেছে যে, তিনি আল্লাহর ছেলে। কারণ তিনি কোনো পিতা ছাড়াই জন্মেছেন, তবে তিনি আল্লাহর সৃষ্টি। অপর কেউ কেউ বলেছে যে, তিনি আল্লাহর ছেলে। তিনি সৃষ্টি নন, বরং আল্লাহর মতোই অবিনশ্বর সত্ত্বা।

এই সব মতভেদের নিষ্পত্তির জন্যে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে ৪৮ হাজার খৃষ্টীয় ধর্মযাজকের উপস্থিতিতে 'নিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট খৃষ্টীয় ঐতিহাসিক ইবনুল বিতরীক বলেন,

'এই সব ধর্মযাজক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন, ঈসা মসীহ ও তার মা উভয়ে আল্লাহর অতিরিক্ত দু'জন ইলাহ বা উপাস্য। এই মতের ধারকদেরকে বলা হয় 'বরবরানী' বা রোমিটিক গোষ্ঠী। আবার কেউ কেউ বলেন, পিতা (আল্লাহ) থেকে পুত্র মসীহের জন্মলাভ আগুনের একটি শিখা আর একটি শিখার প্রজ্বলনের মতো। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি বিচ্ছিন্ন হলে প্রথমটির কিছুই কমে না। এটা হলো 'সাব্লিয়াস' তার অনুসারীদের অভিমত। কেউ কেউ বলেন, মরিয়ম তাকে নয় মাস গর্ভে ধারণ করেননি। পানি যেমন ছাদের নল দিয়ে বেয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি তার গর্ভ দিয়ে বেয়ে পড়েছেন। কেননা আল্লাহর কালেমা বা বাণী মারিয়ামের কান দিয়ে প্রবেশ করেছে এবং তাৎক্ষণাত সন্তান নির্গমনের নির্ধারিত স্থান দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে। এটা 'আলিয়াম' ও তার অনুসারীদের অভিমত। কেউ কেউ বলতেন, মসীহ একজন মানুষ বটে, তবে তিনি অতি প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক উৎস থেকে সৃষ্ট, যেমন আমাদের মধ্যকার প্রতিটি মানুষের মূল সত্ত্বা অনুরূপ আধ্যাত্মিক বা অতি প্রাকৃতিক উৎস থেকে সৃষ্ট। পুত্রের সূচনা হয়েছে মারিয়াম থেকে। তবে তাকে বাছাই করা হয়েছে এজন্যে যেন তিনি মূল মানবীয় সত্ত্বার জন্যে নির্ভেজালভাবে নির্দিষ্ট হন। আল্লাহর অনুগ্রহ তার সাথে যুক্ত হয়েছে এবং আল্লাহর প্রীতি ও ইচ্ছা

সহকারে তার অভ্যন্তরে স্থান গ্রহণ করেছে। এ কারণেই তাকে 'আল্লাহর পুত্র' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনেকে আবার এও বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা একক অনাদি সত্ত্বা, তাকে তিন নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই মতের লোকেরা 'কলেমা' ও রূহুল 'কুদুস'-এ বিশ্বাস করে না। আন্তাকিয়ার যাজক 'পলস শামনাতী' ও তার অনুসারীরা এই মতাবলম্বী। এদেরকে 'বলিকানী'ও বলা হয়। কেউ কেউ বলতো, ইলাহ মূলত তিনজন: সালেহ, (কল্যাণের ইলাহ) তালেহ (অকল্যাণের ইলাহ) এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী 'আদল' (অর্থাৎ মধ্যমপন্থী ও ন্যায় বিচারক ইলাহ) অভিশপ্ত 'মিরকিউন' ও তার অনুগামীরা এই মত পোষণ করতো তার অনুসারীরা দাবী করতো যে, মিরকিউনই হাওয়ারীদের (হযরত ঈসার সাহাবীদের) প্রধান, পিটারস নয়। কেউ কেউ সরাসরি বলতো যে, ঈসা মসীহ স্বয়ং একজন ইলাহ। 'দ্বত পলস' ও তিনশো আঠারো জন আর্চ বিশপের অভিমত এটাই। (মুহাযারাতুন ফিন্ নাসরানিয়া, অধ্যাপক আবু যুহরা)।

রোম সম্রাট কনষ্টানটাইন পৌত্তিলিকতা থেকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু খৃস্টধর্মের 'ক-খ'ও জানতেন না। সেই কনস্টানটাইন উপরোক্ত শেষ মতটি গ্রহণ করেন, নিজের সাংগোপাংগদেরকে বিরোধীদের ওপর লেলিয়ে দেন এবং অন্য সকল ধর্মমতের অনুসারীদেরকে, বিশেষত যারা আল্লাহর একত্বে ও ঈসার মানবত্বে বিশ্বাস করতো, তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন।

'তারীখুল উম্মাতিল ্কিবতিয়া'(কিবতী জাতির ইতিহাস) নামক গ্রন্থের লেখক সম্রাট কনষ্টান্টাইনের উক্ত অভিমত নিম্নরূপ উদ্ধৃত করেছেন,

'পবিত্র সংস্থা ও গীর্জা ঘোষণা করছে যে, কোনো এক সময়ে আল্লাহর পুত্র ছিলো না, কিংবা জন্মগ্রহণের পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিলো না, কিংবা তাকে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিংবা আল্লাহর পুত্র আল্লাহর ঔরস ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা উৎস থেকে জন্ম লাভ করেছে, কিংবা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিংবা তার ভেতরে পরিবর্তন আসে বা পরিবর্তনশীল যুগের প্রভাব তার ওপর পতিত হয়- এ সব কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।'

তবে এই ঘোষণা দ্বারা 'আরিয়ূসের' অনুসারী তাওহীদপন্থীদেরকে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তাওহীদপন্থীরা কনষ্টান্টিনোপল, আন্তাকিয়া, বাবেল, আলেকজান্দ্রিয়া ও মিসরে আধিপত্য বিস্তার করে ও বিজয়ী হয়।

এরপর নতুন এক বিতর্কের উদ্ভব হয়, 'রূহুল কুদুস' তথা পবিত্র আত্মাকে কেন্দ্র করে। কেউ বললো, রূহুল কুদুস একজন ইলাহ বা উপাস্য। আবার অন্যরা বললো, ইলাহ নয়। এ বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্যে 'প্রথম কনষ্টান্টিনোপল একাডেমী' ৩৮১ খৃষ্টাব্দে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা আলেকজান্দ্রিয়ার আর্চ বিশপের উক্তির ভিত্তিতে বিতরিকের পুত্র নিম্নরূপ উদ্ধৃত করেন,

'আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ ছিমুছাউস বলেছেন, রূহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে রূহুল্লাহ বা আল্লাহর আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নয়, আর আল্লাহর আত্মা আল্লাহর জীবন ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই আমরা যখন বলি, যে, পবিত্র আত্মা একটি সৃষ্টি, তখন আমাদের এ কথাই বলা হয় যে, আল্লাহর জীবন একটা সৃষ্টি। আর যখন বলি যে, আল্লাহর জীবন একটি সৃষ্টি, তখন আমরা এটাই দাবি করি যে, আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব সত্ত্বা নয়। আর যখন দাবি করি যে, আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব নয়, তখন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তার ওপর অভিসম্পাত অনিবার্য।'

এই সম্মেলনে এটাও স্থির হয় যে, পবিত্র আত্মা বা 'রূহুল কুদুস' একজন ইলাহ, ঠিক যেমন নিক সম্মেলনে ঈসা মসীহকে ইলাহ স্থির করা হয়। এভাবে আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন সত্ত্বাকে ইলাহ বা খোদা বলে স্থির করা হয়।

এরপর পুনরায় বিতর্ক দেখা দেয় হযরত ঈসা মসীহের সত্ত্বার মধ্যে খোদায়ী স্বভাব ও মানবীয় স্বভাবের সমাবেশ নিয়ে। কনষ্টান্টিনোপলের বিশপ নাসতূরের মতে ঈসা মসীহের মধ্যে একটি খোদায়ী সত্ত্বা ছিলো, যা তদীয় পিতা আল্লাহ তায়ালা থেকে জাত, আর একটি মানবীয় সত্ত্বা ছিলো, যা মারইয়ামের গর্ভজাত হওয়ার কারণে উদ্ভূত। ঈসা মসীহের সত্ত্বার মধ্যে যে মানবীয় সত্ত্বা ছিলো মারইয়াম তারই জননী, খোদায়ী সত্ত্বার নয়। জনগণের মধ্যে আবির্ভূত ও জনগণকে সম্বোধনকারী ঈসা মসীহ সম্পর্কে নাসতূর ইবনুল বিতরিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

'নিজেকে মসীহ বলে অভিহিতকারী এই মানুষটি ভালোবাসার সূত্রে পুত্রের সাথে একীভূত। তাকে যে আল্লাহ ও আল্লাহর পুত্র বলা হয়, সেটা আক্ষরিক অর্থে বলা হয় না, বরং তাকে প্রদত্ত প্রতিভার জন্যে বলা হয়।

তারপর আবার বলেন,

'নাসতুরের মত এই যে, আমাদের প্রভু ইয়াসু মসীহ কোনো স্বয়ম্ভূ খোদা নন, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকতে ভূষিত অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুপ্রাণিত এমন একজন মানুষ, যিনি কোনো ভুল বা খারাপ কাজ করেন না।'

রোম, আলেকজান্দ্রিয়া ও আনতাকিয়ার বিশপরা নাসতূরের উক্ত মতের বিরোধিতা করেন এবং চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠানে একমত হন। ফলে আফসুস নগরীতে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় ইবনুল বিতরিকের ভাষায় তা হলো,

'কুমারী মারিয়াম আল্লাহর মাতা। মসীহ যথার্থই একজন ইলাহ এবং এমন একজন মানুষ, যার দু'টি স্বভাব একই সত্ত্বায় মিলিত হয়েছে।' তারা নাসতুরের ওপর অভিশাপ পাঠান।

এরপর আলেকজান্দ্রিয়ার গীর্জা নতুন এক মত উদ্ভাবন করে এবং সে জন্যে দ্বিতীয় আফসোস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থির করা হয় যে,

'মসীহ একটি একক ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে খোদায়ী সত্ত্বা ও মানবীয় সত্ত্বা একীভূত হয়ে গেছে।'

তবে এই মত মানা হয়নি। তীব্র মতবিরোধ অব্যাহত থাকে। এরপর আলকিদোনিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৪৫১ খৃষ্টাব্দে এবং তাতে স্থির করা হয় যে,

'ঈসা মসীহের দুটি ব্যক্তিত্ব রয়েছে, একটি নয়। খোদায়ী ব্যক্তিত্ব মানবীয় ব্যক্তিত্ব, তবে উভয়টি স্বতন্ত্র। কিন্তু মসীহের মধ্যে উভয়ে মিলিত হয়েছে।' অতপর তারা দ্বিতীয় আফসুস সম্মেলনকে ধিক্কার জানায়।

মিসরীয়রা এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। তৎকালীন মিসরীয়দের অনুসৃত মনোফিসীয় খৃষ্টবাদ এবং রোম সম্রাটের অনুসৃত মালুকানী খৃষ্টবাদের অনুসারীদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে। সূরা আলে ইমরানের শুরুতে আমি স্যার টি.ও. আরনল্ডের পুস্তক ' ইসলামের দিকে আহবান' থেকে এ সংক্রান্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি।

হযরত ঈসা (আ.)-এর তথাকথিত ইলাহত্ব সংক্রান্ত বিকৃত ধ্যানধারণা ও তার কারণে তাদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, সে সম্পর্কে উপরে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরলাম। এ বিষয়ে আপাতত এটুকুই যথেষ্ট মনে করছি।

এই বিরোধে সঠিক মত তুলে ধরার জন্যে আল্লাহর সর্বশেষ নবীকে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে এই সূরায় দুটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'যারা বলেছে যে, মারইয়ামের পুত্র মসীহই আল্লাহ, তারা নিশ্চয়ই কাফের হয়ে গেছে ......' এবং 'যারা বলেছে যে, মরিয়মের পুত্র মসীহ তিন খোদার তৃতীয় জন, তারা অবশ্যই কাফের হয়ে গেছে।' .....

আল্লাহ তায়ালা এখানে বিবেকবুদ্ধি, স্বভাব ও বাস্তবতা এই তিনটির আলোকেই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন,

'হে নবী! তুমি বলো, আল্লাহ দি মারইয়ামের পুত্র মসীহকে তার জননীকে এবং সমগ্র পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে আল্লাহকে তা থেকে কে ঠেকাতে পারে?' (আয়াত-১৭)

এখানে আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর স্বভাব, তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর ক্ষমতা ও প্রতাপের সাথে হযরত ঈসার সত্ত্বা, তার জননীর সত্ত্বা এবং অন্য যে কারো সত্ত্বার পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর সত্ত্বা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর ইচ্ছা অপ্রতিরোধ্য এবং ক্ষমতা অতুলনীয় এবং তিনি ঈসা মসীহকে, তাঁর মাতাকে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে ধ্বংস করে ফেলতে চাইলেও কারো কিছু করার সাধ্য নেই।

আল্লাহ তায়ালা সব জিনিসের মালিক এবং সব জিনিসের স্রষ্টা। আর স্রষ্টা সব সময় স্রষ্টাই, কখনো সৃষ্টি নয়। তিনি ছাড়া সব কিছুই মাখলুক বা সৃষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর একচ্ছত্র মালিকানা শুধু আল্লাহর। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

অনুরূপভাবে পরবর্তী আয়াতেও ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আহলে কেতাবের একটি গোষ্ঠীর ভ্রান্ত ও বিকৃত ধ্যান ধারণা, আকীদা বিশ্বাস, বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার নিরসন করা হয়েছে। দাসত্ব ও ইলাহত্ব কী জিনিস, তার ব্যাখায় ইসলামী আকীদার প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে এবং উক্ত উভয় জিনিসের মধ্যে পরিপূর্ণ পার্থক্য কোনো জোড়াতালি না দিয়েই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলেছে, যে, আমরাই আল্লাহর সন্তান-সন্ততি এবং তাঁর প্রিয়জন। .... (আয়াত ১৮)

এর অর্থ দাড়াচ্ছে এই যে, তারা কোনো না কোনো পর্যায়ে আল্লাহকে পিতার আসনে বসিয়েছে। এটা শারীরিক পিতৃত্ব যদি নাও হয়, তবে অন্তত আত্মিক পিতৃত্ব অবশ্যই। কিন্তু যে রকমের পিতৃত্বই হোক, তা অবশ্যই একত্ববাদের পরিপন্থী এবং দাসত্ব ও উলুহিয়াতের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তারও পরিপন্থী। এ ব্যবধানকে স্বীকার না করে কোনো চিন্তা বাস্তব জীবন যাপনের কোনো পন্থা ও পদ্ধতি সঠিক হতে পারে না। এ ব্যবধানকে মেনে নিলেই বান্দারা একটা নির্দিষ্ট সত্ত্বার আনুগত্য ও উপাসনায় মনোনিবেশ করতে পারে এবং তার কাছ থেকে জীবনের আইন, বিধান ও মূল্যবোধ গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত বিষয়টি শুধু আকীদাগত বিভ্রান্তির সাথেই জড়িত নয়, বরং এই বিভ্রান্তি গোটা জীবনের সম্ভাব্য বিনাশ ও ধ্বংসের সাথেও জড়িত।

ইহুদী ও খৃষ্টানরা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন আখ্যায়িত করে এই দাবিও করতো যে, তাদেরকে তাদের গুনাহর কারণে শাস্তি দেয়া হবে না এবং তারা দোযখে প্রবেশ করলেও সেখানে অল্প কয়েকদিন মাত্র থাকবে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর ন্যায়বিচার নিজস্ব গতিতে চলে না, বরং তিনি তাঁর বান্দাদের একটি দলের সাথে স্বজনপ্রীতিমূলক আচরণ করেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার শান্তি শৃংখলা বিনষ্ট করার অবাধ সুযোগ দেন, অতপর একই অপরাধের দায়ে

অন্যদেরকে যে শাস্তি দেন, তাদেরকে তা দেন না। এরূপ ধারণা বিশ্বাস ও বিভ্রান্তির দরুন পৃথিবীতে যে কি সাংঘাতিক অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

এই বিকৃত চিন্তার ওপর ইসলাম চূড়ান্ত আঘাত হেনে তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে এমন এক নির্ভেজাল আকীদা প্রতিষ্ঠিত করে যাতে কোনো বিকৃতি দেখা দিতে না পারে এবং আল্লাহর আপোষহীন ন্যায়বিচারের ভাবমূর্তি যাতে অক্ষুণ্ন থাকে। ইসলাম এই আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার সফল ব্যবস্থা করেছে এবং উক্ত অন্যায় দাবীকে খন্ডন করেছে এই বলে,

'হে নবী, তুমি বলো যে, তা হলে তিনি তোমাদের গুনাহর জন্যে তোমাদেরকে কেন শাস্তি দেবেন? বরং তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ মাত্র। তিনি যাকে যাকে চান মাফ করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন।'

এ উক্তি দ্বারা ঈমান ও আকীদার প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে এবং আল্লাহর যে কোনো সন্তান নেই, তা অকাট্যভাবে বলা হয়েছে, বরং তারা সাধারণ মানুষ মাত্র। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারক। ক্ষমা ও শাস্তির নীতি তাঁর কাছে এক ও অপরিবর্তনীয়। তিনি সুনির্দিষ্ট কারণে শাস্তিদান ও সুনির্দিষ্ট কারণে ক্ষমা করার ব্যাপারে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, কেউ তার সন্তান বা প্রিয়জন বলে দুর্বল নন।

অতপর পুনরায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর মালিক এবং সব কিছু তার কাছেই ফিরে যাবে।

এখান থেকে বুঝানো হয়েছে যে, মালিক আর দাস কখনো সমান হয় না। মালিকের সত্ত্বা স্বাধীন, ইচ্ছা শক্তি স্বাধীন এবং সবাই তাঁর বশীভূত ও তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত।

এই আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আহলে কেতাবকে পুনরায় সম্বোধন করে তাদের ভ্রান্ত যুক্তি ও মতকে খন্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'হে আহলে কেতাব! তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে রসূলদের আগমনে কিছুটা বিরতির পর ....'। (আয়াত ১৯)

এ উক্তি দ্বারা তাদের এই ওজুহাতের সুযোগ রহিত করা হয়েছে যে, তাদের কাছে রসূল পাঠানো হয়নি। কাজেই হেদায়াতের বাণী তারা পাবে কোত্থেকে? তারা বলতে পারবে না যে, দীর্ঘকাল যাবত তাদেরকে সতর্ক করা হয়নি বা সুসংবাদও দেয়া হয়নি। কাজেই ভুল -ভ্রান্তি, বিপথগামিতা ও বিকৃতি আসা অসম্ভব নয়। এ সব ওজুহাত দেয়ার আর সুযোগ নেই। কারণ মোহাম্মদ (সা.) সেই সতর্কবাণী ও সুসংবাদ নিয়ে এসে গেছেন।

অতপর আল্লাহ সর্বশক্তিমান এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, একজন রসূল পাঠানো এবং আহলে কেতাবদের তাদের গুনাহের শাস্তি দেয়া এমন কাজ নয় যে, আল্লাহ তা করতে অক্ষম হবেন।

আহলে কেতাব নিয়ে এ আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। এতে আল্লাহর নির্ভুল দ্বীনে তারা যে সব বিকৃতি এনেছিলো, তা উন্মোচন ও সংশোধন করা হয়েছে। এ সত্য দ্বীন নিয়েই সকল নবী এসেছিলেন। আর এতেই সেই বিশুদ্ধ আকীদা রয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে মনোনীত করেছেন। এভাবে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানানো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের চক্রান্তকে খর্ব করা হয়েছে। আর সেই সাথে মুসলমানদের ও হেদায়াতপ্রার্থীদের জন্যে হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত ও আলোকিত করা হয়েছে। সত্য ও নির্ভুল সেরাতুল মোস্তাকীমের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের জরুরী একটি জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর আলোচনা করা হয়েছে বনী ইসরাইল তাদের রসূল ও ত্রাণকর্তা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কী আচরণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা যে পবিত্র ভূমি তাদের বরাদ্দ করেছিলেন তার উপকণ্ঠে এসে কিভাবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, কিভাবে তারা আল্লাহর কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে এবং তার কী পরিণাম তারা ভোগ করেছে।

এ বিষয়টি সূরার ২০ থেকে ২৬ নং আয়াত পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। এখানে বনী ইসরাইলের ইতিবৃত্তের একটি অধ্যায় সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর পেছনে অনেক নিগূঢ় রহস্য ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে।

একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য এই যে, মদীনায় ও সমগ্র আরব উপদ্বীপে এই বনী ইসরাইলই সর্ব প্রথম ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে শত্রুতা, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিরোধের সূচনা করেছিলো। প্রথম দিন থেকেই তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো। তারাই মদীনায় মোনাফেক তথা ভন্ড মুসলমানদেরকে লালন করে আসছিলো এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব রকমের চক্রান্তের উপকরণ তাদেরকে সরবরাহ করেছিলো। তারাই মোশরেকদেরকে মদীনার মুসলমানদের ওপর চড়াও হবার জন্যে উস্কে দিচ্ছিলো, ফুসলাচ্ছিলো ও চক্রান্ত আঁটছিলো। এমনকি খোদ মুসলমানদের মধ্যেও নানা রকমের গুজব ছড়িয়ে, ধোকা ও জালিয়াতের আশ্রয় নিয়ে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও নেতৃত্বের প্রতি সন্দেহ সংশয় ও বিকৃতি বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টায় তারাই ব্যাপৃত ছিলো। প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগেই তারা অতি গোপনে এ সব দুরভিসন্ধি চালিয়ে আসছিলো। ফলে তাদের মুখোশ উন্মোচন না করে মুসলমানাদের গত্যন্তর ছিলো না। কারা তাদের প্রকৃত শত্রু, তাদের পরিচয় কী, ইতিহাস কী, উপায় উপকরণ কী এবং তাদের সাথে যুদ্ধ-সংঘর্ষের প্রকৃত তাৎপর্য কী, এ কথা জানা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো।

আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, তারাই মুসলমানদের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রু থাকবে, যেমন অতীতেও তারা আল্লাহর দ্বীনের দুশমন ছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সামনে তাদের ও তাদের চক্রান্তের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

আরো একটা উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে প্রেরিত হেদায়াতের পূর্বে সবশেষ যে কেতাব ও হেদায়াত এসেছে, তার ধারক বাহক ও অনুসারী ছিলো বনী ইসরাইল। ইসলামের পূর্বে তাদের যুগটা ছিলো বেশ দীর্ঘ। তাদের আকীদা বিশ্বাসে তারা বহু বিকৃতি এনেছিলো, আল্লাহকে দেয়া অংগীকারকে তারা বারবার লংঘন করেছিলো। আর এই লংঘন ও বিপথগামিতার কুফল তাদের জীবনে, চরিত্রে ও ঐতিহ্যে দেখা দিয়েছিলো। এ কারণে মুসলিম জাতির পক্ষে তাদের পূর্বসূরী এই জাতির ইতিহাস ও ঐতিহাসিক আবর্তন, বিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া আবশ্যক ছিলো। কেননা মুসলমানরা সর্বকালের সকল নবীর উম্মতের উত্তরাধিকারী এবং আল্লাহর দ্বীনের সবচেয়ে পূর্ণাংগ সংস্করণের অনুসারী। বনী ইসরাইলের এই ইতিহাস ও বিবর্তন জেনেই তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, আল্লাহর দ্বীনের পথে পদস্খলন ও পথভ্রষ্টতা কিভাবে সংঘটিত হয় এবং তার পরিণাম কী হয়। বনী ইসরাইলের জীবনে ও চরিত্রে যে অধোপতন দেখা দিয়েছিলো, তার আলোকেই মুসলমানরা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে, তা দ্বারা যুগ-যুগ কাল ধরে উপকৃত হতে পারে।

এতে করে তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে পথের সকল বিপজ্জনক স্থান থেকে, শয়তানের পেতে রাখা কুপ্ররোচনার ফাঁদ থেকে ও বিভ্রান্তির কবল থেকে।

এর আরো একটা তাৎপর্য এই যে, বনী ইসরাইল জাতির ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা বেশ দীর্ঘ। আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, কোনো জাতিকে যখন অনেক দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয়, তখন তাদের মন শক্ত হয়ে যায় এবং তাদের কিছু কিছু প্রজন্ম বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। বনী ইসরাইলের সাথে এই দিক দিয়ে মুসলমানদের কিছু কিছু মিল দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের ইতিহাস হবে কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ। এই দীর্ঘ সময়ে তাদেরও বনী ইসরাইলের মতো যুগের সম্মুখীন হতে হবে। তাই এই উম্মতের বিভিন্ন প্রজন্মের নেতাদের সামনে বিভিন্ন জাতির পরিণতির নমুনা তুলে ধরা হয়েছে, যা দ্বারা বুঝতে পারে যে, রোগের প্রকৃতি কী এবং কিভাবে তার চিকিৎসা ও প্রতিকার করতে হবে। কারণ যারা জেনে, শুনে বিপথগামী হয়, তারাই হেদায়াত ও তার ওপর অবিচলতার পথে সবচেয়ে কঠিন বাধা হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। আর অজ্ঞ ও অপরিপক্ক লোকেরা হেদায়াত কবুল করে সবচেয়ে সহজে। কেননা নতুন প্রাপ্ত দাওয়াত তাদেরকে প্রকম্পিত করে এবং তাদের মনমগয থেকে পুরানো জমে থাকা বিভ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে দেয়। কেননা নতুন হাতুড়ির প্রথম আঘাতে তার স্বভাব প্রকৃতির মরিচা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা আগেও দাওয়াত শুনেছে, দ্বিতীয় দাওয়াত তাদেরকে তেমন শিহরিত করে না। তেমন তীব্র অনুভূতির সৃষ্টি করে না। তাই এদেরকে হেদায়াত করতে দ্বিগুণ চেষ্টা ও দীর্ঘ ধৈর্যের প্রয়োজন।

এ ছাড়া আরো বেশ কিছু গভীর তাৎপর্য রয়েছে, যার এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। আমি শুধু সংক্ষেপে এটুকু আভাস দেয়াই যথেষ্ট মনে করলাম।

মূসা (আ.)-এর সাথে ইহুদীদের জঘন্য আচরন

স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতিকে বললো, তোমরা স্মরণ করো তোমাদেরকে দেয়া আল্লাহর নেয়ামতকে, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীদেরকে আবির্ভূত করেন, তোমাদেরকে রাজা বানান .... (আয়াত ২০ ও ২১)

এদুটি আয়াতে উদ্ধৃত হযরত মূসার উক্তিতে আমরা দেখতে পাই যে, তার জাতি তার আদেশ পালনে দ্বিধা, দোদুল্যমানতা ও পশ্চাৎপদতা প্রদর্শন করবে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করছেন। তাদের সম্পর্কে হযরত মূসার অতীত অভিজ্ঞতায়ই এর কারণ নিহিত রয়েছে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার প্রয়োজন হয় এমন বেশ কিছু অভিযানে তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। মিসর থেকে তাদেরকে বের করে এনে অবমাননাকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এ কাজ তিনি করেছেন আল্লাহর নামে এবং আল্লাহরই শক্তির ওপর নির্ভর করে, যিনি তাদের জন্যে সমুদ্রকে দু'ভাগ করে দিয়ে ফেরাউন ও তার সৈন্য সামন্তকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এতো কিছু করার পরও তিনি তার জাতির পূর্ণ আনুগত্য লাভে সক্ষম হননি। সমুদ্র পার হয়ে আসার পর একটি পৌত্তলিক জাতিকে মূর্তিপূজারত দেখেই তারা বলে উঠলো, 'হে মূসা, ওদের যেমন মূর্তি রয়েছে, তেমনি আমাদের জন্যে মূর্তি তৈরি করো।'

চল্লিশ দিনের মেয়াদের একটা অনুষ্ঠানে তিনি যখন আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে গেলেন, তখন সেই সুযোগে সামেরী নামক এক কুচক্রী সোনার বাছুর তৈরি করে ফেললো আর সংগে সংগে বনী ইসরাইলের একটি গোষ্ঠী ওই মূর্তির পূজা শুরু করে দিলো এবং বললো, এ হচ্ছে মূসার সেই খোদার মূর্তি, যাঁর কাছে মূসা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে চলে গেছেন। আর এই সোনার বাছুর তৈরীতে সামেরী যে সোনা ব্যবহার করেছিলো তা ছিলো মিসরীয় রমণীদের কাছ থেকে চুরি করা গহনার সোনা। বনী ইসরাইল সম্পর্কে হযরত মূসার অভিজ্ঞতা সেই সময়ও অর্জিত হয়েছিলো, যখন মরুভূমির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে পাথরের টিলা থেকে পানির

ঝর্না বের করেছিলেন এবং আকাশ থেকে তাদের জন্যে অলৌকিক মজাদার খাদ্য 'মান্ন' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলেন। অজানা পথে ও অনিশ্চিত লক্ষ্যে উদভ্রান্ত ভবঘুরের মতো বিচরণ করা সত্তেও হযরত মূসা তাদেরকে এক উচ্চতর ও মর্যাদাপূর্ণ মুক্ত জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সেই উচ্চতর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ তায়ালা উঁচু মানের খাদ্য অবতীর্ণ করছিলেন। অথচ তারা তাদের ফেলে আসা অবমাননাকর জীবনে মিসরে যে সব নিম্ন মানের খাবার খেতে অভ্যস্ত ছিলো, সেই সব তরিতরকারি তরমুজ, ডাল, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো। একটি ঘটনায় তাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিলে সেই নির্দেশ বাস্তবায়নে তারা নানা রকমের ফন্দিফিকির, ছলছুতো ও তালবাহানা করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত যদিও তারা গরু যবাই করেছিলো, কিন্তু তাদের টালবাহানার অভিজ্ঞতা হযরত মূসা (আ.) ভুলে যাননি। হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহর আদেশসমূহ নিয়ে ফিরে এলেন, তখন আবার তারা তা মানার অংগীকার করতে অস্বীকার করলো। অথচ তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা যে নযীরবিহীন নেয়ামতসমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন এবং তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তার কথা তারা স্মরণই করলো না। তাদের মাথার ওপর পাহাড় ঝুলন্ত অবস্থায় না আনা পর্যন্ত তারা সেই আদেশ মেনে নেয়নি। কেননা তারা ওই পাহাড় তাদের মাথার ওপর পড়তে পারে বলে আশংকা করছিলো। এই শেষোক্ত অভিজ্ঞতাও হযরত মূসা ভুলে যাননি।

এই সব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মূসা (আ.) সেই পবিত্র ভূমির উপকণ্ঠে উপনীত হন, যার জন্যে বনী ইসরাইলকে নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন। এই ভূখন্ড সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তারা সেখানে রাজা হবে এবং তাদের মধ্য থেকেই নবীরা আসবে, যাতে তারা আল্লাহরই তদারকীতে চলতে ও দেশ চালাতে পারে।

এ সব অভিজ্ঞতার আলোকে হযরত মূসা (আ.)-এর স্বাভাবিকভাবেই আশংকা জন্মেছিলো যে, তার এই সর্বশেষ আহবানেও তারা সাড়া নাও দিতে পারে। তাই এই আহবানে তিনি তাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতিগুলোর উল্লেখ করেছেন। সর্বোত্তম সুসংবাদ দিয়েছেন, সবচেয়ে বড় প্রেরণাদায়ক কথাগুলো বলেছেন এবং সবচেয়ে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ২০ ও ২১ নং আয়াতে তাঁর ভাষণে এটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ওই সময় পর্যন্ত যে সব নেয়ামত দান করেছেন, তাদের মধ্যে থেকে বহু সংখ্যক নবী ও রাজা তথা শাসকের আবির্ভাব ঘটানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়িত করেছেন, যা ইতিপূর্বে কোনো জাতির কপালে জোটেনি। আর যে পবিত্র ভূমির ওয়াদা করেছিলেন, সেটা তো এখন তাদের সামনেই হাযির। কাজেই এটা এখন সুনিশ্চিত ব্যাপার।

ইতিপূর্বে তারা আল্লাহর দেয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতে দেখেছে। এখনও তেমনি একটি ওয়াদা পালিত হয়েছে এবং তাদেরকে এ ভূমিতে প্রবেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে পিছু হটলে তা হবে চরম ক্ষতির কারণ।

কিন্তু কাপুরুষতা, ভীরুতা, পশ্চাদপসরণ ও অংগীকার ভংগ করা ইসরাইলী জাতির মজ্জাগত স্বভাব। তাই তারা বললো,

'হে মূসা! ওখানে এক দুর্ধষ প্রতাপশালী জাতি বাস করে.........'। (আয়াত ২২, ২৩)

এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ইহুদী জাতির মজ্জাগত স্বভাব দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটে উঠেছে। কোনো রাখঢাক না করে, এমনকি সামান্যতম শিষ্টাচারের পরোয়া না করে তারা জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা

বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন। কাজেই তাদেরকে সাহস ও প্রেরণা যোগানোর কোনো চেষ্টার যেমন অবকাশ নেই, তেমনি কোনো ওজুহাত দাঁড় করানোরও সুযোগ নেই। ঝুঁকি একেবারেই কাছে। তাই আল্লাহ তায়ালা যতোই ঘোষণা করুন যে, এ ভূমি তাদের জন্যেই বরাদ্দ হয়েছে, তা তাদেরকে ওই দুর্ধর্ষ লোকদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই মরুভূমিতে যেমন 'মান্না'ও 'সালওয়া' নামক খাবার আকাশ থেকে নেমে আসতো, তেমনি তারা বিনা চেষ্টায় ও অনায়াসে বিজয় লাভ করতে চাইছিলো। অর্থাৎ ওই দুর্ধর্ষ জাতিটি আপনা আপনি নিজেদের বাস্তুভিটে ছেড়ে চলে যাক। তারপরই তারা সেখানে প্রবেশ করবে।

কিন্তু ইহুদীদের আকাংখা অনুসারে বিজয় এরূপ বিনামূল্যে পাওয়ার মতো জিনিস নয়। এমন বিজয় ইহুদীরাই কামনা করতে পারে, যাদের অন্তরে ঈমানের লেশ মাত্র নেই। (আয়াত নং ২৪ দেখুন।)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহর ভয় কতো মূল্যবান। এ আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, দু'জন খোদাভীরু লোক তাদের খোদাভীতির কারণে স্বতস্ফূর্তভাবেই ওই দুর্ধর্ষ জাতিকে পরোয়া করছে না এবং গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই ঈমান তাদেরকে কল্পিত ভীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস যোগাচ্ছে। তারা উভয়ে তাদের কথা দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছে যে, কঠিন পরিস্থিতিতে তেজস্বিতা ও বলিষ্ঠতা কেবল ঈমানের বলেই লাভ করা যায় এবং যেখানে মানুষের ভয় প্রবল, সেখানে আল্লাহর ভয়ই তাকে প্রতিরোধ করতে পারে। কেননা একজন মানুষের মনে আল্লাহ তায়ালা একই সময়ে আল্লাহর ভয় ও মানুষের ভয়কে একত্রিত করেন না। যে আল্লাহকে ভয় করে, সে অন্য কাউকে ভয় করতে পারে না।

'তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ো। ঢুকলেই তোমরা বিজয়ী হবে।'

মনস্তত্ত্ব ও সমরতত্ত্বের একটা স্বীকৃত তত্ত্ব হলো, 'সকল বাধা গুঁড়িয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাও।' কেননা শত্রুর বাড়ীর ফটকে প্রবেশ করতে পারলেই তার মনোবল ভেংগে যায় এবং হামলাকারীর মনোবল বেড়ে যায়। এভাবে প্রবেশ করলে প্রতিপক্ষ নিজের পরাজয় নিশ্চিত মনে করে এবং আক্রমণকারীর বিজয় অবধারিত হয়ে যায়।

'তোমরা মোমেন হয়ে থাকলে কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করো।' ....

বস্তুত একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করাই ঈমানের বৈশিষ্ট্য, আলামত ও দাবী।

কিন্তু বনী ইসরাইলের হৃদয়ে এসব মহৎ উপদেশের প্রভাব পড়বে কেমন করে?

'তারা বললো, হে মূসা, ওই দুর্ধর্ষ লোকেরা যতোক্ষণ ওখানে আছে, ততোক্ষণ আমরা কিছুতেই ওখানে ঢুকবো না। তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও, যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।'

কাপুরুষেরা এভাবেই নিজেদের জন্যে সংকীর্ণ পরিসর সৃষ্টি করে এবং তারপর ঔদ্ধত্য দেখাতে থাকে। তারা তাদের সামনে বিপদ আছে এই ভয়ে বেসামাল হয়ে গাধার মতো স্বস্থানে থেকেই হাত পা ছুঁড়তে থাকে এবং কোনো ক্রমেই সামনে এগোয় না। কাপুরুষতা ও ঔদ্ধত্য পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নও নয় বরং অনেক সময় এ দুটো অংগাংগিভাবে জড়িত থাকে। কাপুরুষকে যখন তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হয়, তখনই সে কাপুরুষতা প্রদর্শন করে। সে ওই দায়িত্ব পালনে অক্ষম ভেবে সংকুচিত হয়ে যায় আর দিশেহারা হয়ে ওই দায়িত্বকেই গালিগালাজ করে, আর যে তাকে তার অনিচ্ছা সত্তেও দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানায় তার ওপর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে।

'তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও, যুদ্ধ করো গে'– এ উক্তিটি অক্ষমের আস্ফালনের একটা দৃষ্টান্ত। ঔদ্ধত্য ও আস্ফালনে উত্তপ্ত গলাবাজি করা ছাড়া আর কিছু করার প্রয়োজন হয় না। আর দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হলে মানুষ অস্ত্র হাতে নেয়া ও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়াকেই যথেষ্ট মনে করে।

'তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও'।

এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহকে এই মুহূর্তে তারা আর নিজেদের প্রতিপালক মনে করছে না। কারণ তিনি তাদেরকে লড়াই করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ তারা মুসা (আ.)-কে উল্টে বলেছে– তুমি আর তোমার গিয়ে যুদ্ধ করো।

'আমরা এখানে বসে রইলাম।'

অর্থাৎ আমাদের কোনো রাজত্ব বা দেশের দরকার নেই, নেই কোনো সম্মান ও মর্যাদার প্রয়োজন। আর যেখানে কোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আছে, সেখানে তার মোকাবেলা করে কোনো ভূমি দখলেরও আমাদের ইচ্ছা নেই।

এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে মূসা (আ.)-এর সাধ্যের সীমানা। এটাই ছিলো চূড়ান্ত ও শেষ চেষ্টা। বনী ইসরাইলের হীনতা, নীচতা ও ভ্রষ্টতা এখানে এসে সহ্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়। পবিত্র ভূখন্ডের উপকণ্ঠে খোদ নবীর সাথে সাথে এসেও তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন ও আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ভংগ করলো। তখন আর তিনি কী করবেন? কার কাছে আশ্রয় চাইবেন? অগত্য, তিনি বললেন,

'হে আমার প্রতিপালক! আমি কেবল আমার নিজের ও আমার ভাই-এর দায়িত্ব নিতে পারি– আর কারো নয়। সুতরাং আমাদের মধ্যে ও এই অবাধ্য জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দাও।'

এ দোয়াতে রয়েছে মর্মবেদনা, রয়েছে কাকুতি-মিনতি ও আশ্রয় প্রার্থনা এবং আত্মসমর্পণ। আর সবশেষে এতে রয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও বিচ্ছেদের বাসনা।

মূসা (আ.) এ কথা বিলক্ষণ জানতেন যে তার হাতে তার নিজের ও তার ভাই ছাড়া আর কারোর নিয়ন্ত্রণ নেই। সে কথা আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু তিনি একজন উপেক্ষিত ও অপমানিত মানুষ হিসাবে, মহান আল্লাহর সাথে কথা বলার সুযোগপ্রাপ্ত একজন নবী হিসাবে এবং একজন আপোষহীন মোমেন হিসাবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেননি। একমাত্র তাঁরই কাছে তিনি নিজের উদ্বেগ ও ফরিয়াদ পেশ করেছেন এবং আল্লাহর অবাধ্য জাতির সাথে তাঁর বিচ্ছেদ কামনা করেছেন। কেননা আল্লাহর অংগীকার ভংগ করার পর তাদের সাথে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি কোনো বংশীয় ও ঐতিহাসিক বন্ধন বা পূর্বতন কোনো তৎপরতা নয়। সম্পর্কের ভিত্তি একমাত্র আল্লাহর দিকে আহবান এবং আল্লাহর সাথে করা অংগীকার। যা তারা ভংগ করেছে। তাই তাদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিই ধসে গেছে। নতুন কোনো বন্ধন সে সম্পর্ককে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাই তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে গেলেও তিনি আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পালনে অবিচল থাকবেন এটাই স্বাভাবিক।

একজন নবীর জন্যে ও একজন মোমেনের জন্যে এটাই সঠিক কর্মপন্থা ও সঠিক নীতি। আর এটাই মোমেনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বন্ধনের একমাত্র যোগসূত্র, যা টিকে থাকলে তাদের সম্পর্ক টিকে থাকবে, আর ছিন্ন হলে সম্পর্ক ছিন্ন হবে। বর্ণ, বংশ, জাতীয়তা, ভাষা, ইতিহাস

কিংবা অন্য কোনো পার্থিব যোগসূত্র এ সম্পর্ককে বহাল রাখতে পারে না, যদি আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাসের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় এবং জীবন যাপন পদ্ধতি ভিন্নতর হয়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর দোয়া কবুল করলেন এবং আল্লাহর অবাধ্য লোকদের সমুচিত প্রতিফল দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।' তিনি বললেন,

ঠিক আছে, ওই পবিত্র ভূমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে নিষিদ্ধ থাকবে। ততোদিন তারা পৃথিবীতে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কাজেই তুমি অবাধ্য লোকদের জন্যে দুঃখ করো না।'

এভাবে তারা পবিত্র ভূমির উপকণ্ঠে পৌঁছে যাওয়ার পরও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভবঘুরে বানিয়ে দিলেন এবং তাদের জন্যে বরাদ্দকৃত ভূমিকে তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিলেন। অধিকাংশের অভিমত এই যে, ওই ভূখন্ড শুধুমাত্র ওই প্রজন্মের ওপরই নিষিদ্ধ ছিলো, পরবর্তী কোনো বংশধরের জন্যে নয়। অন্য কোনো প্রজন্ম যদি তাদের পূর্ব পুরুষদের এই পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং যে প্রজন্মটি মিসরের গোলামী, শোষণ নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার দরুন এতোটা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, আল্লাহর দেয়া একটি ভূখন্ডকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক শাসন ও পরিচালনা করার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিলো, তা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির কোনো প্রজন্মের যদি আবির্ভাব ঘটে, তাহলে তাদের জন্যে আর ওই ভূখন্ড নিষিদ্ধ থাকবে না। বস্তুত গোলামী, শোষণ নির্যাতন, ও লাঞ্ছনা গঞ্জনা যে কোনো ব্যক্তি বা জাতির স্বভাব প্রকৃতিকে বিকৃত ও বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম।

বনী ইসরাইলের ভবঘুরে হয়ে পৃথিবীর যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর উল্লেখ করেই কোরআন আপাতত ক্ষান্ত হয়েছে। পরবর্তী ইতিহাস এখানে আর বর্ণনা করেনি। এটা কোরআনের বক্তব্য উপস্থাপনার একটা বিশেষ ভংগি, যার মধ্যে শৈল্পিক সুষমার পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষারও সমাবেশ ঘটেছে।

বনী ইসরাইলের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে শিক্ষা দিয়েছেন, সে শিক্ষাটিকে মুসলমানরা যথাযথভাবেই হৃদয়ংগম করেছিলো। তাই বদরের প্রান্তরে তারা যখন মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমান তাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কাফেরের মোকাবেলায় কঠিন ঝুঁকির সম্মুখীন ছিলো, তখন তারা রসূল (স.)-কে বলেছিলেন, হে রসূলুল্লাহ! বনী ইসরাইল যেমন তাদের নবীকে বলেছিলো যে, আপনি ও আপনার প্রতিপালক গিয়ে লড়াই করুন, আমরা এখানে বসে রইলাম', আজ আমরা আপনাকে সে কথা বলবো না। আমরা বরং বলবো, আপনি ও আপনার প্রতিপালক চলুন এবং লড়াই করুন, আমরাও আপনাদের সহযোদ্ধা হয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত।'

কোরআন কেসসা কাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দানের যে সাধারণ নীতি অবলম্বন করেছে, তারই একটা কার্যকর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বদরের মোজাহেদদের এই উক্তির মধ্য দিয়ে। বিশেষত বনী ইসরাইলের ইতিবৃত্ত এতো বিশদভবে বর্ণনা করার পেছনে যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে, বদরের ঘটনাটিও তার অন্যতম।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ
اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۚ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۚ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ
اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ
يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ
اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣٠﴾
فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۚ
قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ

রুকু ৫

২৭. (হে মোহাম্মদ,) তুমি এদের কাছে আদমের দুই পুত্রের গল্পটি যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও! (গল্পটি ছিলো,) যখন তারা দুই জনই (আল্লাহর নামে) কোরবানী পেশ করলো, তখন তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে কোরবানী কবুল করা হলো, আরেকজনের কাছ থেকে তা কবুল করা হলো না, (যার কোরবানী কবুল করা হয়নি) সে বললো, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো (যার কোরবানী কবুল করা হলো), সে বললো, আল্লাহ তায়ালা তো শুধু পরহেযগার লোকদের কাছ থেকেই (কোরবানী) কবুল করেন। ২৮. (হিংসার বশবর্তী হয়ে) তুমি যদি আজ আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তাহলে আমি (কিন্তু) তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার প্রতি আমার হাত বাড়িয়ে দেবো না, কেননা আমি সৃষ্টিকুলের মালিককে ভয় করি। ২৯. আমি (বরং) চাইবো, তুমি আমার গুনাহ ও তোমার গুনাহের (বোঝা) একাই তোমার (মাথার) ওপর উঠিয়ে নাও এবং (এভাবেই) তুমি জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে পড়ো, (মূলত) এ হচ্ছে যালেমদের (যথার্থ) কর্মফল। ৩০. শেষ পর্যন্ত তার কুপ্রবৃত্তি তাকে নিজ ভাইয়ের হত্যার কাজে উস্কানি দিলো, অতপর সে তাকে খুন করেই ফেললো এবং (এ কাজের ফলে) সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। ৩১. অতপর আল্লাহ তায়ালা (সেখানে) একটি কাক পাঠালেন, কাকটি (হত্যাকারীর সামনে এসে) মাটি খুঁড়তে লাগলো, উদ্দেশ্য, তাকে দেখানো কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে রাখবে; (এটা দেখে) সে (নিজে নিজে) বলতে লাগলো, হায়! আমি তো এই কাকটির চাইতেও অক্ষম হয়ে পড়েছি, আমি তো আমার ভাইয়ের লাশটাও গোপন করতে পারলাম না, অতপর সে সত্যি সত্যিই (নিজের

أَخِي ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا

بِالْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا

جَزَٰٓؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن

يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا

مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوٓا أَنَّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوٓا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

কৃতকর্মের জন্যে) অনুতপ্ত হলো। ৩২. (পরবর্তীকালে) ওই (ঘটনার) কারণেই আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে এই বিধান জারি করলাম যে, কোনো মানুষকে হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ (করার শাস্তি বিধান) ছাড়া (অন্য কোনো কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো; (আবার এমনিভাবে) যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো; এদের কাছে আমার রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, তারপরও এদের অধিকাংশ লোক এ যমীনের বুকে সীমালংঘনকারী হিসেবেই থেকে গেলো। ৩৩. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা (দেশ থেকে) তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের (জন্যে, তাছাড়া) পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই। ৩৪. তবে (এটা তাদের জন্যে নয়,) যাদের ওপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার আগেই তারা তাওবা করেছে, তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।

রুকু ৬

৩৫. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর দিকে (ধাবিত হওয়ার জন্যে) উপায় খুঁজতে থাকো (তার বিশেষ একটি উপায় হচ্ছে), তোমরা

وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ
مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ
وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوْٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝
فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

আল্লাহর পথে জেহাদ করো, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে পারবে। ৩৬. আর যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে, (কেয়ামতের দিন) পৃথিবীর সমুদয় ধন-দৌলতও যদি তাদের করায়ত্ত থাকে-(তার সাথে আরো) যদি সমপরিমাণ সম্পদ তাদের কাছে থাকে, (এ সম্পদ) মুক্তিপণ হিসেবে দিয়েও যদি সে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে চায় (তাও সম্ভব হবে না), তার কাছ থেকে (এর কিছুই সেদিন) গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্যে (সেদিন) কঠোর আযাব নির্ধারিত থাকবে। ৩৭. তারা (সেদিন) দোযখের আযাব থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু (কোনো অবস্থায়ই) তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, তাদের জন্যে স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ৩৮. পুরুষ ও নারী- এদের যে কেউই চুরি করবে, তাদের হাত দুটো কেটে ফেলো, এটা তাদেরই কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দন্ড; আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়। ৩৯. (হাঁ,) যে ব্যক্তি (এ জঘন্য) যুলুম করার পর (আল্লাহ তায়ালার কাছে) তাওবা করবে এবং নিজের সংশোধন করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন; আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে বড়ো ক্ষমাশীল ও দয়াময়। ৪০. তুমি কি (একথা) জানো না, এই আকাশমন্ডলী ও যমীনের একক সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করে দেন; (কেননা) সব কিছুর ওপর তিনিই হচ্ছেন একক ক্ষমতাবান।

তাফসীর

আয়াত-২৭-৪০

আলোচ্য আয়াতগুলোতে মানব জীবনের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় কিছু মৌলিক বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিধিগুলো ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত সমাজে মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা, সামষ্টিক জীবনের নিয়ম শৃংখলার নিরাপত্তা, বিদ্রোহ ও অরাজকতা থেকে ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যক্তির সহায় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত।

সমাজ জীবনের এইসব মৌলিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এই বিধিগুলো আলোচ্য আয়াতগুলোর পুরোটা জুড়েই বিস্তৃত। শুরুতে হযরত আদমের (আ.) দুই ছেলের ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে একটি ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের মনে অপরাধের প্ররোচনা দানকারী জিনিসগুলোর পরিচয় ও অপরাধের প্রকৃতি এই ঘটনায় তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অপরাধ কতো জঘন্য ও বীভৎস ধরনের হতে পারে এবং তা প্রতিরোধ করা, অপরাধীকে শাস্তি দেয়া ও অপরাধের প্ররোচনা দানকারী উপাদানগুলোকে প্রতিরোধ করার আবশ্যকতা কতোখানি।

এই ঘটনা ও তার অন্তর্নিহিত শিক্ষার সাথে এর অব্যবহিত পরে বর্ণিত বিধিসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। যথাস্থানে এই ঘটনাটি কি ভূমিকা পালন করে, তার শিক্ষা মানব হৃদয়ে কতো গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং এ দ্বারা মানুষের মনে ও বিবেকে ইসলামের অপরাধরোধক কঠোর আইনকে গ্রহণ করার জন্যে কতোদূর যোগ্যতা তৈরী হয় তা পাঠক গভীরভাবে উপলব্ধি করে। মানুষের জান ও মালের ওপর আক্রমণ জনজীবনের শান্তি শৃংখলা বিনষ্ট করা এবং ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার খর্ব করার মতো জঘন্য অপরাধ দমনে ইসলামের এ বিধিগুলোর কার্যকারিতা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বস্তুত যে সমাজে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত এবং আল্লাহর সমস্ত আইন কার্যকর আছে, সেখানে মানুষের জান মালের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা বিদ্যমান।

ইসলামী সমাজ তার গোটা জীবনকে আল্লাহর বিধান ও শরীয়তের আলোকে গড়ে তোলে এবং তার যাবতীয় সম্পর্ক ও যোগাযোগকেই সে আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত করে। এ জন্যে সে তার আওতাধীন প্রতিটি ব্যক্তি ও সংস্থাকে পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার, স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করে এবং সকল দমনমূলক ও যুলুম উৎপীড়নমূলক উপাদান থেকে রক্ষা করে। অনুরূপভাবে এমন কল্যাণধর্মী ন্যায়বিচারমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজে কারো জান ও মালের ওপর আক্রমণ চালানো বা আঘাত হানা, জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করা, কিংবা ব্যক্তির অধিকারকে হরণ করা এমন এক জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য হয়, যাকে কোনোভাবে ক্ষমা করা বা হালকাভাবে দেখা যায় না। এ থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম অপরাধ ও অপরাধীর বিরুদ্ধে এতো কঠোর, অনমনীয় ও আপোষহীন কেন। ন্যায় ও সঠিক পথে চলার ব্যাপারে সবার জন্যে সমান সুযোগ সম্পন্ন পরিবেশ সৃষ্টি এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন থেকে অপরাধে প্ররোচনাদানকারী উপাদানগুলো দূর করার পরই সে অপরাধ ও অপরাধীর বিরুদ্ধে এমন কঠোর অবস্থান নিয়ে থাকে। উপরন্তু, ইসলামী ব্যবস্থায় অপরাধীর জন্যে ন্যায় বিচারের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। সন্দেহের সৃষ্টি হলে শাস্তি রদ হয়ে যাবে। আর তাওবার দুয়ার সব সময় উন্মুক্ত রাখা হয়েছে এবং তাওবা দ্বারা দুনিয়ার শাস্তি কখনো কখনো ও আখেরাতের শাস্তি সর্বদাই মাফ হয়।

পরবর্তীতে এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার সময় এই সব বিধিব্যবস্থার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখা যাবে। তবে তার আগে একটা সাধারণ কথা বলে রাখতে চাই। সেই কথাটা এই সব বিধির বাস্তবায়নের পরিবেশ ও এগুলোর কার্যকারিতার শর্ত সংক্রান্ত।

দারুল হারব ও দারুল ইসলাম

আলোচ্য আয়াতগুলোতে যে বিধিসমূহ বর্ণিত হয়েছে, চাই তা জান ও মালের ওপর আঘাত ও আগ্রাসন সংক্রান্ত অথবা জনজীবনের সাধারণ শান্তির ও নিরাপত্তা নস্যাৎ করা সংক্রান্ত হোক, সেগুলো ইসলামী শরীয়তের অন্য সকল ফৌজদারী দন্ডবিধির মতোই শুধুমাত্র 'দারুল ইসলামে' বসবাসকারী মুসলমান সমাজেই প্রয়োগযোগ্য। শরীয়ত এই 'দারুল ইসলাম' পরিভাষাটি দ্বারা কি বুঝায়, তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব।

দারুল ইসলাম বলা হয় সেই সব দেশকে, যেখানে ইসলামী আইন-কানুন ও শরীয়তকে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়, চাই তার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান হোক, কিছু অধিবাসী মুসলমান ও কিছু অধিবাসী অমুসলিম হোক, অথবা অধিবাসীরা সবাই অমুসলিম হোক, কিন্তু তার শাসকরা মুসলমান এবং তারা সেখানে ইসলামের আইন কানুন ও শরীয়তকে কার্যকরী করে।(১) অথবা তারা শুধু মুসলমানই ছিলো, অথবা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই ছিলো, কিন্তু তাদের দেশের ওপর অমুসলিমরা বিজয়ী হয়, অথচ তা সত্তেও দেশের জনগণ ইসলামী আইন কানুন মেনে চলে এবং নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় বিরোধ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে। কাজেই কোনো দেশকে 'দারুল ইসলাম' গন্য করাটা পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে সেখানে ইসলামের বিধান চালু থাকা এবং ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী দেশ শাসিত হওয়ার ওপর।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'দারুল হারব'। এমন প্রতিটি দেশকেই দারুল হারব বলা হয় যেখানে ইসলামের আইন কানুন প্রচলিত ও প্রযুক্ত হয় না এবং ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসারে দেশ শাসিত হয় না, চাই তার অধিবাসীরা নিজেদেরকে মুসলমান, আহলে কেতাব বা কাফের যে নামেই আখ্যায়িত করুক না কেন। সুতরাং একটি দেশের 'দারুল হারবে' পরিগণিত হওয়া পুরোপুরি মাত্রায় নির্ভর করে সেখানে ইসলামী আইন চালু না থাকা এবং তার ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসিত না হওয়ার ওপর। আসলে কোনো দেশ দারুল হারব রূপে চিহ্নিত হয় শুধুমাত্র মুসলমান ও মুসলিম সমাজের দৃষ্টিতে। আর মুসলিম সমাজ হচ্ছে সেই সমাজ, যা উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে দারুল ইসলামে বসবাস করে।

এই মুসলিম সমাজ, যা আল্লাহর বিধানকে মেনে চলে এবং আল্লাহর আইন ও শরীয়ত মোতাবেক শাসিত হয়, একমাত্র এই সমাজেরই মানুষের জানমাল ও সামষ্টিক জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার অধিকার রয়েছে, যারা সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করে এবং জান ও মালের ওপর আক্রমণ চালায়, তাদের ইসলামী শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে। সেই শাস্তির বিবরণ আলোচ্য আয়াতগুলোতেও রয়েছে, আবার অন্যান্য জায়গায়ও রয়েছে।

বস্তুত ইসলামী সমাজ হচ্ছে এমন এক উঁচু মানের উদার ও ন্যায়পন্থী সমাজ, যেখানে প্রত্যেক সক্ষম ও অক্ষমের জন্যে কর্মসংস্থানের ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে এবং

---

(১) মুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিমদের ইসলামের সব আইন মানতে বাধ্য করা যায় না। তাদেরকে ইসলামের কেবল সেই সব আইন ও বিধি মানতে বাধ্য করা যায়, যা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। —সম্পাদক

যেখানে সৎকাজের পোষকতা দান এবং অসৎ কাজকে নিরুৎসাহিত করার তথা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের সুব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে রয়েছে। সুতরাং এ সমাজের এ অধিকার থাকাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত যে, এর আওতায় বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তি যেন এই সমাজের শাসন ব্যবস্থার কল্যাণে যে নেয়ামত পাওয়া যাচ্ছে তার সংরক্ষণ করে, অন্যদের জান, মাল ও স্বভাব চরিত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং 'দারুল ইসলাম'-এর নিরাপত্তা রক্ষা করে। কেননা এই দারুল ইসলামই তাকে সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার সহকারে এবং যাবতীয় মানবীয় বৈশিষ্ট ও মর্যাদা সহকারে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। এরপরও যে ব্যক্তি দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, সে অবশ্যই একজন সীমা অতিক্রমকারী, পাপিষ্ঠ ও দুষ্কৃতকারী এবং সে কঠোরতম শাস্তির যোগ্য। অবশ্য তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে নয় বরং প্রমাণের ভিত্তিতে শাস্তি দিতে হবে এবং কোনো রকম সন্দেহ দেখা দিলে সেই শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে।

এরপর আসে 'দারুল হারব'-এর প্রসংগ। দারুল হারবের যে সংজ্ঞা ওপরে দেয়া হয়েছে, তার আলোকে তার কোনো অধিকার নেই যে, ইসলামী শরীয়তের নির্ধারিত দন্ডবিধিতে যে সব নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে তার দ্বারা সে উপকৃত হবে। কেননা একেতো তা ইসলামী শরীয়তকে বাস্তবায়িত করে না; উপরন্তু তা ইসলামের সার্বভৌমত্বকেও স্বীকার করে না। দারুল ইসলামে বসবাসকারী মুসলমানরা যারা নিজেদের জীবনে ইসলামী শরীয়তকে বাস্তবায়িত করে, তাদের কাছে দারুল হারব কোনো সংরক্ষিত স্থান নয়, তার জান মালের নিরাপত্তার কোনো গ্যারান্টি দেয়া হয়নি ইসলামে। তবে মুসলমানদের সাথে তথা দারুল ইসলামের সাথে কোনো চুক্তি থাকলে সে কথা স্বতন্ত্র। যে সমস্ত অমুসলিম দারুল হারব থেকে এসে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে নিরাপত্তা চুক্তির অধীন ইসলামী আইন মোতাবেক শাসিত দারুল ইসলামের সীমানার মধ্যে বসবাস করে, ইসলাম তাকেও সেই সময় পর্যন্ত উপরোক্ত নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়।

ইতিহাসের প্রথম নরহত্যা

এই আলোচনার আলোকে আমি আলোচ্য আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্তি হচ্ছি,

'হে নবী, তুমি তাদেরকে আদমের দুই ছেলের ঘটনা শুনিয়ে দাও ....(আয়াত ২৭-৩১)

এই ঘটনাটা দুষ্কর্ম ও সীমা অতিক্রমের অযৌক্তিক স্পর্ধিত বাড়াবাড়ির একটা নযীর তুলে ধরে। অনুরূপভাবে সততা ও মহত্বেরও একটা দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত করে, আর এ দুটিকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করায়। উভয়টি কিভাবে নিজ নিজ স্বভাব প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে, তা দেখিয়ে দেয়। অসৎ লোক কেমন বীভৎস অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে, তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করে এ কটি আয়াতে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, চরিত্রহীন মানুষ এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাড়াবাড়ি করে থাকে যে তা জনগণের বিবেককে জাগিয়ে তোলে, বিক্ষুব্ধ করে, এবং এমন ন্যায়সংগত শাস্তির বিধান প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায়, যা সীমাতিক্রমকারী দুরাচারীকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে ও তার পরিণতি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখতে সক্ষম । এতদসত্তেও সে যদি ওই অপরাধ সংঘটিত করে, তাহলে তাকে এমন উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে, যা তার অপকর্মের ক্ষতিপূরণ করে। অনুরূপভাবে, এই শাস্তির বিধান সৎলোকের জানমালের নিরাপত্তাকেও নিশ্চিত করে। কেননা সৎলোককে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে, তাকে রক্ষা করতেই হবে, তাকে সর্বাত্মক নিরাপত্তা দিতেই হবে এবং এমন আইন ও বিধান চালু থাকা চাই যা একই সাথে ন্যায় বিচারও নিশ্চিত করে, আবার অপরাধকেও প্রতিহত করে।

কোরআনের এ আয়াত কটিতে ঘটনার বিবরণ থাকলেও নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও নামের উল্লেখ নেই যদিও কিছু বর্ণনায় আদম (আ.)-এর এই দুই ছেলের নাম কাবিল ও হাবিল এবং তাদের মধ্যে তাদের দুই বোনকে নিয়ে ঝগড়া বিবাদের বিশদ উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু আমি ঘটনাটা যেমন অনির্দিষ্টভাবে নাযিল হয়েছে, তেমন অনির্দিষ্ট রাখাই অগ্রগণ্য মনে করি। কারণ যে সব বর্ণনায় এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের নাম ও অন্যান্য বিষয়ের বিশদ বিবরণ রয়েছে, সেই সব বর্ণনার সব কটিই সন্দেহজনক। এ সব বিবরণ আহলে কেতাব থেকে গৃহীত কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ঘটনাটা এই সব বর্ণনায় যেভাবে নামধাম সহ বর্ণিত হয়েছে, হুবহু সেভাবেই বর্ণিত হয়েছে বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্টে। আর এ ঘটনার উল্লেখ সম্বলিত একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসটিতে কোনোই বিশদ বিবরণ নেই। হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত এ হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন,

‘অন্যায়ভাবে যে মানুষটিই খুন হবে, তার খুনের বদলার একটি অংশ আদম (আ.)-এর প্রথম ছেলেটির ওপর বর্তাবে। কেননা সে-ই নরহত্যার প্রবর্তক।’ (মোসনাদে আহমাদ)

আমরা এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে বড় জোর এতটুকুই দিতে পারি যে, ঘটনাটা মানব জাতির জন্মের প্রাথমিক যুগেই সংঘটিত হয়েছিলো, এটি ছিলো প্রথম ইচ্ছাকৃত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ নৃশংস হত্যাকান্ড এবং ঘাতক লাশ দাফন করাও জানতো না, ইত্যাদি।

কোরআনের বর্ণনায় ঘটনাটা যতোই সংক্ষিপ্ত থাকুক, ঘটনার উল্লেখের উদ্দেশ্য এবং তার শিক্ষা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণের মূল কাজটি পুরোপুরি সফল হয়েছে, বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এই মূল উদ্দেশ্য সাধনে কোনো বাড়তি সফলতা আসতো না। এ জন্যেই আমার মতে ঘটনাটা এ রকম অনির্দিষ্ট থাকাই সঠিক। এর কোনো নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পক্ষপাতী আমি নই।

প্রথম আয়াতটিতে (২৭ নং) আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘হে নবী তাদেরকে আদমের দুই ছেলের ঘটনাটা সত্য সঠিকভাবে শুনিয়ে দাও ....’

অর্থাৎ মূসার সাথে বনী ইসরাইলের আচরণের যে কাহিনী আমি এতক্ষণ বর্ণনা করলাম, তারপর তাদের কাছে এই দুই ধরনের মানুষের নমুনা সত্য ও সঠিকভাবে তুলে ধরো। ‘সত্য ও সঠিকভাবে’ বলার তাৎপর্য এই যে, এ ঘটনা বর্ণনাসূত্রের দিকে দিয়ে একেবারেই সত্য ও নির্ভুল। এ ঘটনা মানুষের সহজাত স্বভাব প্রকৃতির আসল সত্য রূপ উন্মোচিত করে এবং এ ঘটনা এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, কার্যকরভাবে অপরাধকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন ন্যায়সংগত আইন মানব সমাজের জন্যে অপরিহার্য।

আদম (আ.)-এর এই ছেলে দুটি এমন এক পবিত্র পরিবেশে অবস্থান করছিলো, যেখানে কোনো নির্মল হৃদয়ে কারো ওপর আক্রমণের ধারণারই উদ্রেক করে না। তারা সেখানে আল্লাহর সামনে আল্লাহর এবাদত করার পরিবেশে অবস্থান করছিলো। একটি কোরবানী করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

‘তারা কোরবানী করলো। কিন্তু তাদের একজনের কোরবানী গৃহীত হলো, আর অপর জনের কোরবানী গৃহীত হলো না।’

এখানে ব্যাকরণের বিচারে কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া (‘ফেয়েলে মাজহুল’) ব্যবহার করে এই মর্মে আভাস দেয়া হয়েছে যে, গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারটা একটি অদৃশ্য শক্তির ও একটি অদৃশ্য প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। এ দ্বারা দুটো বিষয় বুঝানো হয়েছে! প্রথমত এই যে, আমরা এই গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে যেন চিন্তাভাবনা না করি, যেমনটি অনেক তাফসীর গ্রন্থাবলীতে করা হয়েছে

এবং এমন সব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যার সম্পর্কে আমি প্রায় নিশ্চিত যে, তা 'ওল্ড টেষ্টমেন্টের' অলীক কাহিনীমালা থেকে গৃহীত। দ্বিতীয়ত যার কোরবানী গৃহীত হয়েছে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও তাকে হত্যা করার দুরভিসন্ধি করার কোনোই যুক্তি নেই। কেননা ব্যাপারটা আদৌ তার নিয়ন্ত্রণে ছিলো না। এটা করেছে এক অদৃশ্য শক্তি এক অদৃশ পন্থায়। সেই পন্থা তাদের দুজনের কারো পক্ষেই বুঝা সম্ভব ছিলো না। যার কোরবানী কবুল হয়েছে তারও ইচ্ছার উর্ধে ছিলো বিষয়টি। সুতরাং এক ভাই আর এক ভাইকে হত্যা করবে এবং তার মনে হত্যার ইচ্ছা জাগ্রত হবে এর কোনোই যুক্তি ছিলো না। এ ক্ষেত্রে একজন ন্যায়পন্থী মানুষের মনে হত্যার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়াই ছিলো সবচেয়ে অচিন্তনীয় ব্যাপার। কারণ সেখানে এবাদাত ও নৈকট্য লাভের পরিবেশ বিরাজ করছিলো এবং অদৃশ্য শক্তির প্রাধান্য বিরাজ করছিলো, যেখানে তার ভাই-এর কোনোই হাত ছিলো না।

'সে বললো, আমি তোমাকে হত্যা করবোই।'

এ ধরনের অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা ও দৃঢ় সংকল্প মিশ্রিত কথা আপনা থেকেই ইংগিত দিচ্ছে যে, অন্ধ বিদ্বেষ, ও আক্রোশ ছাড়া এর আর কোনো কারণ ছিলো না। এই ঘৃণ্য মনোবৃত্তি ছাড়া তার পেছনে আর কোনো উস্কানি ছিলো না। আর এ ধরনের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি কোনো সৎলোকের মনে জাগতেই পারে না।

এভাবে এ আয়াতটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই কারো ওপর আক্রমণ বা আঘাত করতে প্রস্তুত হওয়া আমাদের জন্মগত স্বভাব নয়।

আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত মানুষের অপর নমুনাটির জবাবের ভাষা এবং তার মনের পবিত্রতা ও সরলতা এই আক্রমণকে অধিকতর ঘৃণার্হ, ও বীভৎস করে তুলেছে।

'সে বললো, আল্লাহ তায়ালা তো কেবল খোদভীরু লোকের কাছ থেকেই কবুল করেন।'

এভাবে সৎ ছেলেটি অত্যন্ত সরল ও নিরীহ ভংগিতে কবুল করার মুল তত্ত্ব প্রকাশ করলো, কবুল করার আসল উপকরণ যে ঈমানের মধ্যে নিহিত তা জানালো, অত্যন্ত বিনীত ও বিনম্রভাবে আক্রমণমূখী ভাইটাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিলো। কোন পথে কোরবানী কবুল হয় তা দেখিয়ে দিলো এবং খুবই সূক্ষ্মভাবে তার প্রতি বিদ্রূপ করলো, এমনভাবে নয়- যাতে সে মনোক্ষুণ্ন বা উত্তেজিত হতে পারে।

এরপর সেই ঈমানদার খোদাভীরু, নিরীহ, সৎ ও শান্তিপ্রিয় ভাইটি তার উত্তেজিত অপরাধপ্রবণ ভাইয়ের উত্তেজনা নিরসনের চেষ্টায় বললো,

'তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে হাত বাড়াও, তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্যে হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।' (আয়াত ২৮)

এভাবে এ আয়াতটিতে সরলতা, নিরীহতা, শান্তিপ্রিয়তা ও খোদাভীতির এমন এক অনবদ্য নমুনা তুলে ধরা হয়েছে, যা চরম উগ্র পরিস্থিতিতেও মানবীয় বিবেককে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আক্রান্ত ব্যক্তির মহত্ত্ব ও সাহসিকতাকে প্রতিফলিত করে, আক্রমণের প্রচন্ডতর হুমকির ও শাসানির মধ্যে নিজের নিশ্চিন্ততা ও স্থিরতা দ্বারা প্রতিপক্ষকে মুগ্ধ করে এবং তার মনের খোদাভীতিকে তুলে ধরে।

তার এ উক্তির মধ্যে বিদ্বেষকে প্রশমিত করা, হিংসাকে প্রতিহত করা, দুরভিসন্ধি, ও অশুভ চিন্তাকে থামানো, উত্তেজিত স্নায়ুমন্ডলীকে ঠান্ডা করা এবং শত্রুভাবাপন্ন ভাইকে ভ্রাতৃত্বের মাধুর্যে,

ঈমানের মাহত্ম্য এবং তাকওয়া ও খোদাভীতির তীব্র অনুভূতিতে উজ্জীবিত করার মতো যথেষ্ট উপাদান ছিলো।

যথেষ্ট উপাদান থাকলেও আল্লাহভীরু ভাইটি তাতে খানিকটা সতর্কবাণীও সংযোজন করলো,

'আমি চাই যেন তুমি আমার পাপ ও তোমার পাপ বহন করে (আল্লাহর কাছে) প্রত্যাবর্তন করো, অতপর দোযখবাসী হও। এটাই যালেমদের পরিণতি।'(আয়াত-২৯)

অর্থাৎ তুমি যখন আমাকে হত্যা করতে হাত বাড়াবে, তখন আমি তোমার সাথে একই আচরণ করবো না। কেননা হত্যা করার মনোবৃত্তি আদতেই আমার নেই এবং তা আমার চিন্তাতেই আসে না। এর কারণ আমার অক্ষমতা নয় বরং খোদাভীতি। তুমি আমাকে হত্যার পাপও বহন করবে, আবার তোমার পাপের কারণে কোরবানী কবুল হয়নি, তাও বহন করবে– এভাবে তোমার দ্বিগুন পাপ হবে এবং দ্বিগুণ আযাবও হবে। এতে আমি বাধা দেবো না।

'ওটাই যালেমদের পরিণতি'– এ কথা দ্বারা সে হত্যার অপরাধটাকে অত্যন্ত ভয়ংকর করে চিত্রিত করলো, যাতে তার ভাইকে লজ্জা দিয়ে তার দুরভিসন্ধি থেকে ফেরাতে পারে। একজন সৎ, শান্তিপ্রিয় ও অমায়িক নিরীহ ভাইকে হত্যা করার মতো অপরাধের প্রতি তার যাতে ঘৃণা সৃষ্টি হয়, দ্বিগুণ পাপ থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে এবং তার মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়, সে জন্যে সে চেষ্টা চালালো। একজন মানুষের মন থেকে কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছা দূর করার জন্যে আর একজন মানুষের পক্ষে যতোটা চেষ্টা করা সম্ভব তা করতে সে মোটেই কসুর করলো না।

কিন্তু এতে তার ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া কী হলো, তা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, একজন খারাপ মানুষ কতো বেশি খারাপ হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অবশেষে তার প্রবৃত্তি তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করলো। ফলে সে তাকে হত্যা করলো ......'

অর্থাৎ এতো উপদেশ, সতর্কবাণী ও শান্ত করনের প্রয়াস সবই বিফলে গেলো। শেষ পর্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তি অপকর্মেই প্রবৃত্ত হলো। ফলে অপরাধ সংঘটিত হলো। তার প্রবৃত্তি তাকে হত্যাকান্ডে প্ররোচিত করলো। আপন ভাইয়ের হত্যাকান্ডে! আর তাতে তার যা পরিণতি হবার, তাই হলো।

'ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।'

ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষিপ্ত হলো। নিজের সাহায্যকারী ও সাথী ভাইকে হারালো। দুনিয়ার জীবনের শান্তি হারালো। কেননা খুনীর জীবন সুখের হয় না। সে আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ফলে তাকে দ্বিগুণ গুনাহের ভার বহন করতে হলো।

অতপর তার অপরাধের ফলে মৃত ভাই-এর লাশ পচে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করলো। আল্লাহর সুগভীর প্রজ্ঞা সেই দুর্ধর্ষ খুনীর সামনে তাঁর একটি অক্ষমতা উন্মোচিত করলো। ভাইয়ের লাশ দাফন করার ব্যাপারে সে অক্ষম হয়ে পড়লো। এমনকি কাক যা পারে, তাও সে পারে না এমন লজ্জাকর অবস্থায় সে পতিত হলো।

'অতপর আল্লাহ তায়ালা একটি কাককে পাঠালেন....... '(আয়াত নং ৩১)

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একটি কাক আর একটি কাককে হত্যা করলো, অথবা অপর একটি কাকের লাশ পেলো বা লাশ বহন করে আনলো। সে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মৃত কাকটিকে ফেলে মাটি চাপা দিলো। তাই হত্যাকারী অনুশোচনা করলো এবং কাকের অনুকরণে ভাইকে সমাহিত করলো।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হত্যাকারী ইতিপূর্বে আর কখনো মৃত মানুষ সমাহিত হওয়ার দৃশ্য দেখেনি। তা যদি দেখতো, তাহলে আর কোনো অসুবিধা হতো না। সম্ভবত এটাই ছিলো প্রথম মানুষের মৃত্যুর ঘটনা। স্বাভাবিক কারণেই সে ইতিপূর্বে আর কোনো লাশ দেখতে পায়নি। লাশ না দেখার কারণ এও হতে পারে যে, তার বয়স অল্প ছিলো, তার পূর্বে যারা মারা গেছে তাদের কাউকে সে দেখেনি। এখানে লজ্জিত হওয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, তা তার তাওবার লজ্জা যে নয়, সে কথা সুস্পষ্ট। নচেত আল্লাহ তার তওবা অবশ্যই কবুল করতেন। তার লজ্জা ও অনুতাপ ছিলো, তার হত্যাকান্ড দ্বারা কোনো লাভ না হওয়ায় এবং বাড়তি পেরেশানী ও দুশ্চিন্তাজনিত।

কাক কর্তৃক আর এক কাককে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, কাকদের নাকি এটাই রীতি। আবার এটা একটা অলৌকিক ঘটনাও হতে পারে। যেটিই হোক, দুটোই আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন।

নরহত্যার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগী

ঘটনাটি জনগণের মধ্যে যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তার ফলে জনমনে এ ধরনের হত্যাকান্ড প্রতিরোধের জন্যে আল্লাহর রচিত আইনকে মেনে নেয়ার যে স্বতস্ফূর্ত মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করে দিয়েছেন, তার দিকে ইংগিত করে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলকে এই বিধান দিয়েছি যে, ...'(আয়াত নং ৩২)

অর্থাৎ যেহেতু এই ধরনের অপরাধপ্রবণ মানুষ পৃথিবীতে আছে ও থাকবে এবং শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ চলবে, অপরাধপ্রবণ মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ এমন হবে যে, কোনো সদুপদেশ বা সতর্কবাণী তাদের হত্যাকান্ডের ন্যায় অপরাধ থেকে ফেরাতে সক্ষম হবে না এবং শান্তির ললিত বাণী কখনো কখনো আক্রমণ ও আগ্রাসন ঠেকাতে পারবে না, সেহেতু আমি স্থির করেছি যে, একটা মানুষের হত্যাও এত বড় অপরাধ যে, তা পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যার সমান, আর একজন মানুষকে হত্যা থেকে বাঁচানো সকল মানুষকে বাঁচানোর শামিল। আর এ বিধান আমি বনী ইসরাইলকে দিয়েছিলাম।

বস্তুত হত্যার বদলে হত্যা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিদ্রোহ দমনের প্রয়োজনে হত্যা ছাড়া অন্য যে কোনো পটভূমিতে একজন মানুষকে হত্যা করা গোটা মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল। কেননা প্রতিটি মানুষ অপর যে কোনো মানুষের মতোই। বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে সমভাবে মূল্যবান ও অকাট্য। তাই যে কোনো একজন মানুষকে হত্যা করা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের ওপরই আক্রমণের শামিল। সমগ্র মানব জাতিই এ অধিকারের অংশীদার। অনুরূপভাবে একজন মানুষকে খুন হওয়া থেকে রক্ষা করা ও বাঁচানো সমগ্র মানব জাতির প্রাণ রক্ষা করার শামিল, চাই তা ওই ব্যক্তির বেঁচে থাকা অবস্থায় তাকে হত্যার চেষ্টা থেকে বাঁচানো হোক, অথবা সে নিহত হবার পর তার হত্যার বদলে খুনীকে হত্যা করে অন্য একজনের খুন হওয়ার পথ রোধ করা হোক। কেননা এভাবে বেঁচে থাকার সেই অধিকারটি রক্ষা করা হয়, যা সকল মানুষের সম্মিলিত সম্পদ।

আমি ইতিপূর্বে এই সব অপরাধ দমনকল্পে জারীকৃত ইসলামী বিধিসমূহের জন্যে যে ভূমিকা আলোচনা করে এসেছি, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই জীবন রক্ষামূলক ব্যবস্থা শুধুমাত্র 'দারুল ইসলামের' মুসলিম, অমুসলিম ও আশ্রয় গ্রহণকারী বিদেশী নাগরিকসহ সমগ্র

অধিবাসীদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে দারুল হারবের অধিবাসীদের প্রাণ ও সম্পদের কোনো নিরাপত্তা ততোক্ষণ পর্যন্ত থাকবে না, যতোক্ষণ দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মধ্যে কোনো চুক্তি সম্পাদিত না হয়। সুতরাং এই মূলনীতিটি সব সময় স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়। আর সেই সাথে এ কথাও স্মরণ রাখা চাই যে, যে ভূখন্ডে আল্লাহর আইন ও শরীয়ত চালু থাকে না এবং এই শরীয়ত অনুযায়ী তা শাসিত হয় না, সেই ভূখন্ডই 'দারুল হারব'।

আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলের ওপর উক্ত নীতি কার্যকর করেছিলেন। কেননা সে যুগে তারাই ছিলো আসমানী কেতাবের অধিকারী এবং যতোদিন তারা তাদের জাতীয় জীবনে কোনো বিকৃতি বা রদবদল ছাড়া তাওরাতের শরীয়ত কায়েম রেখেছে, ততোদিন তারাই ছিলো 'দারুল ইসলামের' পক্ষের লোক বা প্রতিনিধি। কিন্তু এক পর্যায়ে বনী ইসরাইল তাদের শরীয়তের বিধি লংঘন করে। এমন কি সুস্পষ্ট বিধান নিয়ে ক্রমাগত নবী রসূলরা তাদের কাছে আসতে থাকা সত্তেও এবং স্বয়ং রসূল (স.)-এর যুগেও তাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এই শরীয়ত লংঘনকারী ও সীমা অতিক্রমকারীদের সংখ্যা তাদের মধ্যে ক্রমেই বাড়তে থাকে। কোরআন তাদের এই শরীয়ত লংঘন ও সীমা অতিক্রমের কর্মকান্ড নথিবদ্ধ করেছে এবং বলেছে যে, তাদের এই কর্মকান্ডের জন্যে কোনো ওযর বা যুক্তি ছিলো না, বিশেষত নতুন রসূলের আগমন ও তাদেরকে শরীয়তের বিধান প্রদান করার পর। আয়াতের শেষাংশে তাই বলা হয়েছে,

'আমাদের রসূলরা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তাদের কাছে গিয়েছিলো। এর পরও পৃথিবীতে তাদের অনেকে সীমা লংঘনকারী।'

আল্লাহর আইন লংঘন এবং তাঁর শরীয়তকে অবজ্ঞা করা বা পরিবর্তন করার অপচেষ্টার চেয়ে বড় সীমা লংঘন আর কী হতে পারে?

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হত্যাকে নৈরাজ্য ও দাংগা-হাংগামার সাথে যুক্ত করেছেন এবং এই দুটির উভয়টিকেই হত্যার বৈধতাদানকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ দুটি অপরাধের যে কোনো একটিতে জড়িত ব্যক্তির বাঁচার অধিকার ইসলামী আইনে সংরক্ষিত নয়। কারণ দারুল ইসলামের মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারী প্রশাসনকে রক্ষা করা ব্যক্তির জান মালের নিরাপত্তা বিধানের মতই জরুরী। কেননা সরকারী প্রশাসনের অধীনেই জনিরাপত্তা ও নিরুপদ্রব জনকল্যাণমূলক কাজের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব। বলতে গেলে ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধানের চেয়ে সরকারী প্রশাসনের নিরাপত্তা বিধান অধিকতর জরুরী। কেননা এ ছাড়া ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান সম্ভব নয়। ইসলামী সমাজের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সমাজকে রক্ষা করা এবং তার স্থিতিশীলতার যাবতীয় নিশ্চয়তা বিধান করা আরো বেশি জরুরী, যাতে করে জনগণ তার আওতায় তাদের কল্যাণমূলক তৎপরতা চালানোর সুযোগ পায়, মানব জীবন তার আওতায় উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে এবং বৈষয়িক ও নৈতিক উভয় প্রকারের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। বিশেষত এই কারণেও প্রশাসনিক নিরাপত্তা ব্যক্তির নিরাপত্তার চেয়ে বেশী জরুরী যে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র সকল মানুষের জন্যে জীবনের যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, তাদের চারপাশে এমন এক পরিবেশ তৈরী করে যেখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ব্যবস্থা হয়, সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পর প্রতিকারের পরিবর্তে সমস্যা সৃষ্টির পূর্বে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করে। অতপর প্রতিবিধানের যেটুকু বাকী থাকে তার প্রতিকার করে এবং সহজ সরল ও মধ্যম স্বভাবের মানুষকে অসৎ কাজ বা সীমা লংঘন করতে বাধ্য হতে হয়, বা এ জন্যে ছলছুতো বা ওযর-বাহানার সুযোগ সৃষ্টি হয়, এমন

কোনো ফাঁক-ফোকর রাখে না। এতো সব পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার পরও যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ এবং তার প্রশাসনের নিরাপত্তার জন্যে হুমকির সৃষ্টি করে সে এই সমাজের একটি নোংরা ও ঘৃণ্য উপাদান এবং দুষ্ট ক্ষত। সঠিক পথে ফিরে না এলে এই দুষ্ট ক্ষতকে নিশ্চিহ্ন করা অপরিহার্য। এই দুষ্ট ক্ষত ও নোংরা উপাদানটির শাস্তি বিধান করেই নাযিল হয়েছে পরবর্তী দুটি আয়াত। ইসলামী শরীয়তে একে 'বিদ্রোহ ও অরাজকতার শাস্তি' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কোরআনের সন্ত্রাস দমন আইন

'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি হলো ...... (আয়াত নং ৩৩ ও ৩৪)

উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে বর্ণিত এই অপরাধটির সংজ্ঞা এরূপ ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক দেশ শাসনকারী মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করা এবং এই শাসকের শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহরত, দারুল ইসলামের অধিকারীদেরকে ভীত সন্ত্রস্তকারী এবং তাদের জানমাল ও মানসম্ভ্রমের ওপর আক্রমণকারী একটি দল বা উপদলের আকারে সংঘবদ্ধ হওয়া কোনো কোনো ফেকাহবিদ এ ধরনের একটি দলের শহর বহির্ভূত এলাকায় মুসলিম শাসকের শাসন ক্ষমতার নাগালের বাইরে অবস্থানের শর্ত আরোপ করে থাকেন। আবার অন্যদের মতে এ ধরনের একটি বিদ্রোহী দলের শুধুমাত্র সংগঠিত হওয়া এবং দারুল ইসলামের অধিবাসীদের ওপর আক্রমণাত্মক কর্মকান্ড শুরু করাই এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তি বলবত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট, চাই তারা শহর-নগরের ভেতরে অবস্থান করুক বা বাইরে। বাস্তব অবস্থা ও উদ্ভূত পরিস্থিতিকে যথোচিভাবে মোকাবেলা করার স্বার্থে এই শেষোক্ত মতটিই অধিকতর উপযোগী।

আল্লাহর আইন ও শরীয়ত মোতাবেক দেশ শাসনকারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী এবং দারুল ইসলামের শরীয়তানুগত নাগরিকদের ওপর (মুসলিম, অমুসলিম বা আশ্রয় গ্রহণকারী বিদেশী নাগরিক) আক্রমণকারী এই রাষ্ট্রদ্রোহীরা শুধু যে সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তা নয়, বরং তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আইন ও শরীয়তের ওপর এবং শরীয়তের অনুগত জনগণের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপরই আগ্রাসন চালায়। তারা গোটা দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে হুমকি ছুঁড়ে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অনুরূপভাবে তারা আল্লাহর আইন ও শরীয়ত এবং তাঁর শরীয়তকে বাস্তবায়নকারী দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে অরাজকতারও বিস্তার ঘটায়। বস্তুত আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে অচল করে দেয়া বা তার বাস্তবায়নে বাধা দেয়া এবং যে জাতি ও দেশ তার বাস্তবায়ন করে, তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করার চেয়ে খারাপ কোনো অরাজকতা হতেই পারে না।

তারা যদিও ইসলামী সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং তার কর্ণধারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, কিন্তু আসলে তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত। নিসন্দেহে তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে না এবং রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর বিরুদ্ধেও হয়তো তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে না, তবে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে তারা কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রবর্তিত শরীয়ত, এই শরীয়তের অনুসারী জনগণ ও এই শরীয়ত বাস্তবায়নকারী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমেই তারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

আয়াতটির আরো একটা ব্যাখ্যা রয়েছে এবং তাও এই ব্যাখ্যার কাছাকাছি। সেটি এই যে, আলোচ্য অপরাধের জন্যে নির্ধারিত এই সমস্ত শাস্তি বিদ্রোহীদেরকে দেয়ার অধিকার একমাত্র সেই শাসকের রয়েছে, যিনি আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের শরীয়তের অনুসারী ও বাস্তবায়নকারী, আর এই শাস্তি একমাত্র সেই দেশেই দেয়া যাবে যে দেশ আল্লাহ তায়ালা ও রসূল প্রবর্তিত শরীয়ত অনুযায়ী শাসিত। এই গুণটি যে শাসকের নেই তার পক্ষে এবং যে দেশের এই গুণটি নেই সে দেশে এই শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

কথাটা আমি স্পষ্ট করেই বলছি। কেননা ক্ষমতাসীন শাসকদের লেজুড়বৃত্তিকারী একদল লোক সব সময়ই সেই সব শাসকের পক্ষে ফতোয়া দিতো, যারা তাদের ক্ষমতা আল্লাহর বিধান অনুসারে গ্রহণ করতো না, আল্লাহর আইন ও বিধানকে বাস্তবায়িত করতো না এবং তাদের দেশকে দারুল ইসলামে পরিণত করতো না। অথচ তারা মুসলিম শাসক হবার দাবীদার ছিলো। লেজুড়বৃত্তিকারীরা এই মর্মে ফতোয়া দিতো যে, ওই শাসকদেরকে যারা মানে না, তাদের ওপর এই আয়াতে বর্ণিত বিদ্রোহের শাস্তিগুলো প্রয়োগ করা হোক। এই ফতোয়া তারা শরীয়তের নামেই দিতো। অথচ যারা ওই শাসকদের অবাধ্য ছিলো, তারা আসলে আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের অবাধ্য ছিলো না, বরং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের বিরোধী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলো।

মুসলমানদের দেশে আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করে না এমন শাসকের এ অধিকার নেই যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদেরকে আল্লাহর শরীয়তের নামে পাকড়াও করে ও শাস্তি দেয়। আল্লাহর আইন ও শরীয়তের সাথে এ ধরনের শাসকের কী সম্পর্ক? সে তো অন্যায়ভাবে ইলাহ হবার অধিকার জবরদখলকারী এবং ইলাহ হবার অবৈধ দাবীদার। আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার তার কী অধিকার থাকতে পারে?

আল্লাহর শরীয়তকে বাস্তবায়নকারী মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটনকারী এবং দারুল ইসলামের অধিবাসী আল্লাহর বান্দাদেরকে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্তকারী ও তাদের জান মাল ও মান সম্ভ্রমের ওপর আক্রমণকারী এই সব সদস্য দল-উপদলের একমাত্র শাস্তি এই যে, হয় তাদেরকে স্বাভাবিক পন্থায় হত্যা করতে হবে, নচেত শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে, (কোনো কোনো মোফাসসেরের মতে, এরূপ অপরাধ করলে কিরূপ পরিণাম হয়, সে সম্পর্কে জন সাধারণের মধ্যে অধিকতর ভীতি সৃষ্টির জন্যে হত্যা করার পর মৃতদেরকে শূলে চড়াতে হবে) অথবা এক সাথে ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলতে হবে।

জনাব আব্দুল কাদের আওদা স্বীয় গ্রন্থ 'ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধি' তে আধুনিক আইনের সাথে ইসলামী আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বলেছেন,

'হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত এই যে, বর্ণিত শাস্তিগুলোর কোন্টি কোথায় প্রযোজ্য হবে, তা সংঘটিত অপরাধের মাত্রা অনুপাতে নির্ধারিত হবে। যে ব্যক্তি কোনো জিনিসপত্র লুণ্ঠন করেনি কিন্তু হত্যা করেছে, তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু কোনো হত্যাকান্ড ঘটায়নি, তার হাত পা কাটা হবে। যে ব্যক্তি হত্যা ও লুণ্ঠন দুটোই করেছে তাকে হত্যা করা হবে ও শূলে চড়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি কেবল সন্ত্রাস ও আতংক ছড়িয়েছে, কিন্তু হত্যা ও লুণ্ঠন করেনি, তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক বলেন, বিদ্রোহীরা যখন কাউকে হত্যা করে তখন তাকে হত্যা করতেই হবে। এরূপ ক্ষেত্রে শাসকের এখতিয়ার নেই যে, তাকে হাত পা কাটা ও দেশান্তরিত করার মধ্যে যে কোনো একটি শাস্তি দেবে। তার এখতিয়ার শুধু হত্যা ও দেশান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে যদি সম্পদ

লুণ্ঠন করে থাকে এবং হত্যা না করে থাকে, তাহলে দেশান্তর করার এখতিয়ার নেই। বরঞ্চ এখতিয়ার শুধু হত্যা করা, শূলে চড়ানো ও হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে যদি অপরাধী কেবল সন্ত্রাস ও আতংক ছড়ানোর কাজটাই করে থাকে, তাহলে শাসকের এখতিয়ার আছে যে, তাকে হত্যা, শূল, হাত-পা কর্তন বা দেশান্তরের যে কোনো একটি শাস্তি প্রদান করে। ইমাম মালেকের মতে এখতিয়ার থাকার অর্থ এই যে, শাসক স্বাধীনভাবে বিচার বিবেচনা করে যে কোনো একটি শাস্তি নির্বাচন করতে পারেন। বিদ্রোহী যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও চতুর হয়, তবে তার জন্যে হত্যা ও শূলে চড়ানোর শাস্তিই বাছাই করা উচিত। কেননা হাত পা কর্তন দ্বারা তার ক্ষতি রোধ করা সম্ভব নয়। আর যদি সে তেমন বুদ্ধিমান ও চতুর না হয়, তবে খুবই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়, তবে তাকে বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে দিতে হবে। আর যদি তার এই দুটো গুণের অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা ও প্রভাব প্রতিপত্তির কোনোটাই না থাকে, তা হলে অপেক্ষাকৃত সহজ শাস্তি দেশান্তরিত করা ও অন্য কোনো দর্শনমূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে।'

আমরা ইমাম মালেকের অভিমতের শেষাংশটি গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিদ্রোহ সংঘটন ও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যেই শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। কেননা এটা একটা নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ, যার উদ্দেশ্য হবে প্রথমত অপরাধ যাতে ঘটতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করা এবং অরাজকতা সৃষ্টিকারীদেরকে কঠোরভাবে দমন করা এবং যারা দারুল ইসলামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং শরীয়তের অনুসারী মুসলমানদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বেড়ায় তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া। অথচ এই দেশ ও ঐই সমাজের হওয়ার কথা শান্তির সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ।

দেশান্তরিত করার অর্থ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। এর অর্থ কি যে দেশে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সেখান থেকে বিতাড়িত করা, না যে জায়গায় সে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে সেখান থেকে বিতাড়িত করা অর্থাৎ তাকে বন্দী করা, না তাকে একেবারে দুনিয়া থেকেই বিতাড়িত করা, যা মৃত্যু ছাড়া সম্ভব নয়?

আমি মনে করি, এর এই অর্থটাই অগ্রগণ্য যে, তাকে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার জায়গা থেকে এতো দূরবর্তী স্থানে নির্বাসিত করা হবে, যেখানে সে নিজেকে দেশান্তরী ও দুর্বল বোধ করবে। সেখানে সে নিজের আপনজন বা দলবল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হতে সক্ষম হবে না। এতে করে সে তার সেই ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত বদলা পাবে, যা সে নিরীহ মানুষকে নিজের ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া ও ভীতি প্রদর্শন করার সময় দেখিয়েছিলো।

'ওটা হলো তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা, উপরন্তু তাদের জন্যে আখেরাতে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।'

অর্থাৎ দুনিয়াতে যে শাস্তি তারা ভোগ করবে, তা তাদের আখেরাতের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবে না এবং অন্য কতক শাস্তির ন্যায় তা দুনিয়ার অপবিত্রতা থেকেও তাদেরকে মুক্তি দেবে না। এখানেও শাস্তিকে কঠোরতর ও অপরাধকে জঘন্যতর করে দেখানো হয়েছে। কেননা দারুল ইসলামের মুসলমানদের সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করা অত্যন্ত জরুরী এবং ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক দেশ শাসনকারী সরকারের পক্ষে জনগণের আনুগত্য লাভ করা অপরিহার্য। এটাই হচ্ছে সেই একমাত্র কল্যাণমুখী মধ্যমপন্থী সমাজ, যার সমৃদ্ধির জন্যে তার সব রকমের নিরাপত্তা বিধান করা জরুরী। পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী এই প্রশাসনকে সব রকমের ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ রাখতে হবে।

অপরাধপ্রবণতা দমনের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া

কিন্তু যদি এই সব বিদ্রোহী নৈরাজ্যবাদী তাদের অপতৎপরতা ও অপরাধের নিকৃষ্টতা উপলব্ধি করে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে ও এ সব অপরাধমূলক কর্মকান্ড ধরা পড়ার আগেই বর্জন করে, তাহলে তাদের অপরাধ ও শাস্তি দুটোই এক সাথে রহিত হয়ে যাবে। সরকার তাদেরকে পাকড়াও করতে পারবে না, আর আল্লাহও আখেরাতে তাদেরকে মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কিন্তু যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই তাওবা করে, জেনে রেখো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

এই পরিস্থিতিতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি মওকুফ করে দেয়ার দু'টি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, এক, তাদের তাওবাকে সম্মান প্রদর্শন এবং তাকে হেদায়াতপ্রাপ্তি ও আত্মশুদ্ধির প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ। কেননা তারা তখনো আক্রমণাত্মক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারতো। দুই, তাদেরকে তওবায় উৎসাহিত করা এবং তাদের সাথে লড়াই করতে যে ন্যূনতম শ্রম ব্যয় হতো, তা থেকে অব্যাহতি লাভ।

এ থেকে এটাও বুঝা যায় যে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির স্রষ্টা এবং স্রষ্টা হওয়ার কারণে তার স্বভাব প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও কল্যাণকর দিকগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত, তাই তাঁর রচিত বিধানে মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি ও মেযাজের সকল ভাবান্তর, ভাবাবেগ ও সম্ভাবনার সাথে খাপ খাইয়ে চলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আল্লাহর এ বিধান মানুষকে শুধু আইনের ডান্ডা দিয়ে শাসন করে না। আইনের হাতিয়ার শুধু সেই ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করে যাকে হাতিয়ার ছাড়া সোজা করা যায় না। আসলে সে তার অন্তরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলার ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। এভাবে সে তার স্বভাবকেই শুধু ও সুন্দর বানানোর চেষ্টা চালায়। এর পাশাপাশি সে এমন সমাজ গঠন করে, যেখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে সৎ কাজ উৎসাহিত ও অসৎ কাজ নিরুৎসাহিত হয়। এ জন্যে কোরআন মনকে শোধরানোর সর্বাত্মক ব্যবস্থা না নিয়ে প্রায়ই শাস্তির ভয় দেখায় না। শুরুতে সে তাকওয়ার আবেদন জানায়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করার মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সফলতা লাভের জন্যে উৎসাহ দেয় এবং কুফর থেকে সাবধান করে এবং আখেরাতে কাফেরদের কী ভয়ংকর পরিণতি হবে তা ব্যাখ্যা করে। যেমন পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'হে মোমেনরা! আল্লাহকে ভয় করো ..... (আয়াত নং ৩৫, ৩৬ ও ৩৭)

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা, তাই তা মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সত্ত্বার সকল অংশকে এবং তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিজের আওতায় নিয়ে আসে, তাকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে এগিয়ে দেয় এবং আল্লাহর অবাধ্যতা ও আনুগত্যহীনতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ইসলামের প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বিশুদ্ধ করা, সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তাকে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে রাখা। সে তার জন্যে যে সব শাস্তির বিধান দেয়, তা হচ্ছে উক্ত উদ্দেশ্য সফল করার বহুসংখ্যক উপায় ও পন্থার একটি। শাস্তি দেয়াটা তার উদ্দেশ্য নয়, এবং ওটা তার একমাত্র পন্থাও নয়।

এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, কোরআন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে আদম (আ.)-এর দুই সন্তানের শিক্ষাপ্রদ ও তাৎপর্যবহ ঘটনা দিয়ে। অতপর এই অপরাধের

ভয়াবহ শাস্তির বিবরণ দিয়েছে। অতপর উপসংহারে আল্লাহকে ও তাঁর আযাবকে ভয় করার আহবান জানিয়েছে এবং আখেরাতের শাস্তির ভয়াল চিত্র তুলে ধরেছে।

৩৫ নং আয়াতের শুরু হয়েছে নিম্নোক্ত বাক্য দিয়ে,

'হে মোমেনরা! আল্লাহকে ভয় করো'।

বস্তুত মানুষের কাউকে ভয় করতে হলে আল্লাহকেই করা উচিত। একমাত্র আল্লাহর ভয়ই মানুষের জন্যে সম্মানজনক। তরবারি বা লাঠির ভয় হচ্ছে একান্ত (অর্থাৎ যে কোনো ধরনের অস্ত্রের ভয়) নিম্ন স্তরের ভয়। নিম্ন স্তরের মানুষ তথা কাপুরুষ ছাড়া ওটার আর কারো প্রয়োজন হয় না। আল্লাহভীতিই সর্বোত্তম, সবচেয়ে পবিত্র ও সবচেয়ে মহৎ জিনিস। কেননা আল্লাহভীতিই মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থার সাথী। যখন তাকে কোনো মানুষ দেখতে পায় না এবং আইন রক্ষক সংস্থার লোকেরা যখন তার নাগাল পায় না, তখনো একমাত্র আল্লাহর ভয়ই তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। আইন-আদালতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু আল্লাহর ভয় ছাড়া আইন একা কার্যকর হতে পারে না। কেননা আইন যে ক'টি অপরাধকে দমন করতে সক্ষম হয়, আল্লাহভীতি না থাকলে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী অপরাধ আইনের আওতার বাইরে থেকে যাবে। একমাত্র আইন দিয়ে না ব্যক্তিকে শুধরানো যায়, না সমাজকে। যতোক্ষণ তার পেছনে অদৃশ্য তদারকীর চেতনা সক্রিয় না থাকবে এবং খোদায়ী শক্তি ও প্রতাপ সম্পর্কে বিবেক হুশিয়ার না হবে, ততক্ষণ নিছক আইন দিয়ে মানুষকে সৎপথে রাখা যাবে না।

'আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো' ......

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করার সাথে সাথে তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় কী হতে পারে তাও অনুসন্ধান করো এবং কি কি উপায় উপকরণ দ্বারা তাঁর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা যায়, তা খোঁজ করো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর কাছ থেকে তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা চাও। মানুষ যখন অনুভব করবে যে, আল্লাহর কাছেই তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু রয়েছে এবং আল্লাহর কাছ থেকে তা যখন সে চায়, তখন সে মহাপ্রভুর সামনে যথার্থ গোলাম বা দাসের অবস্থান গ্রহণ করে। আর এভাবে সে সর্বোত্তম অবস্থানে এবং সাফল্যের নিকটতম অবস্থানে উপনীত হয়। উল্লেখিত উভয় তাফসীরই সঠিক ও সামঞ্জস্যশীল, আত্মশুদ্ধি ও বিবেকের উজ্জীবন এবং প্রত্যাশিত সাফল্যের সহায়ক। 'আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করবে' কথাটায় উক্ত সাফল্যেরই আশ্বাস দেখা যায়।

পরবর্তী দুটি আয়াতে (৩৬ ও ৩৭) দেখানো হয়েছে সেই সব কাফেরের দৃশ্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে না, তাঁর নৈকট্য লাভেও সচেষ্ট হয় না এবং সফলকামও হয় না। এ এক জীবন্ত ও চলন্ত দৃশ্য। কোরআনের বাচন ভংগিতে এটাকে শুধু বর্ণনায় ও প্রতিবেদনেই ফুটিয়ে তোলা হয়নি, বরং চলন্ত তৎপরতা ও প্রতিক্রিয়ার আকারে দেখানো হয়েছে। কেয়ামতের দৃশ্য ও অধিকাংশ বক্তব্য তুলে ধরার ব্যাপারে এটাই কোরআনের স্থায়ী রীতি। আল্লাহ বলেন,

'নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, ...'

মানুষ নিজের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে বড় জোর এতোটুকুই কল্পনা করতে পারে গোটা দুনিয়ায় যতো সহায় সম্পদ রয়েছে, কাফেরদের কাছে তার সবটাই থাকতে পারে। কিন্তু কোরআন তাদের কাছে তার চেয়েও বেশী সম্পদ থাকার কথা ধরে নিচ্ছে। সে ধরে নিচ্ছে যে, দুনিয়ায় যতো সহায় সম্পদ আছে, তার দ্বিগুণ সম্পদ যেন তাদের রয়েছে।

অতপর তাদের চিত্র দেখাচ্ছে যেন তারা কেয়ামতের আযাব থেকে রেহাই পাবার জন্যে এই সমুদয় সম্পদকে মুক্তিপণ হিসাবে উপস্থাপন করছে। তাদের দোযখ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা, অতপর তাতে ব্যর্থতা ও চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে যেমন ছিলো তেমনই থেকে যাওয়ার ছবি তুলে ধরছে।

এ হচ্ছে কতকগুলো ধারাবাহিক, সজীব ও সচল দৃশ্যের চিত্র। এতে যেমন রয়েছে কাফেরদের গোটা পৃথিবীর দ্বিগুণ সম্পদের মালিক হওয়ার দৃশ্য, তেমনি রয়েছে তাদের দোযখে প্রবেশের দৃশ্য, উক্ত সমুদয় সম্পদ মুক্তিপণ দিয়েও মুক্তিলাভে ব্যর্থতার দৃশ্য, বাধ্য হয়ে দোযখে অবস্থানের দৃশ্য, অতপর এই অবস্থায় তাদেরকে দোযখে রেখে যবনিকা পতনের দৃশ্য।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান ও ভারসাম্যপূর্ণ দন্ডবিধি

অতপর এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে বর্ণিত হচ্ছে চুরির শাস্তির বিধান। আল্লাহ তায়ালা বলেন, (৩৮, ৩৯ ও ৪০তম আয়াত)

'চোর পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক, তার হাত কেটে দাও ......'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে চাই তারা যে কোনো ধর্মমতের লোকই হোক না কেন, চুরির প্রবণতা থেকে মুক্তি দেয়ার এমন ব্যবস্থা করে যে, যে কোনো সুস্থ বিবেক ও মধ্যম ধরনের সৎ স্বভাবের লোকদের জন্যে তা যথেষ্ট। সে তাদের জীবিকার সমস্ত চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা দেয়, তাকে সততার যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয় এবং সম্পদের ন্যায়সংগত ও সুষম বন্টনের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়। সেই সাথে সে এ ব্যবস্থাও করে যেন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পদ শুধুমাত্র হালাল উৎস থেকে উপার্জিত হয় এবং কারো ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজের জন্যে ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী সাব্যস্ত হয়। আর এ সব কিছুর মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মন থেকে চুরির প্ররোচনা দূরীভূত করা হয়। কাজেই চুরি, ব্যক্তি মালিকানার ওপর যে কোনো আগ্রাসন এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যে কোনো অপচেষ্টার জন্যে কঠোর শাস্তি বিধান করার অধিকার তার থাকা উচিত। অথচ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা সত্তেও সে সামান্যতম সন্দেহ দেখা দিলেই শাস্তি রহিত করে এবং আসামীর অপরাধ অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে যাতে শাস্তি ভোগ না করে, তার নিশ্চয়তা দেয়।

এ ব্যাপারে আরো একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার বলে মনে হচ্ছে। ইসলামী জীবন বিধান একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। তাই এই বিধানের প্রকৃতি, মূলনীতি ও এর নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলোর প্রতি দৃষ্টি না দেয়া পর্যন্ত এর আইনগত খুঁটিনাটিকে যথাযথভাবে বুঝা যাবে না। অনুরূপভাবে, এই সব খুঁটিনাটি বিধিগুলোকে ততোক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয় যতোক্ষণ গোটা ইসলামী বিধানকে সার্বিকভাবে কার্যকরী ও প্রয়োগ করা না হয়। ইসলামের মূলনীতিসমূহ বা বিধিসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটিকে আংশিকভাবে ও বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়ন করা এমন একটা সামষ্টিক ব্যবস্থার অধীনে কিছুমাত্র ফলদায়ক হতে পারে না, যা পূর্ণাংগ ইসলামী ব্যবস্থা নয়। এ ধরনের পরিবেশে বিচ্ছিন্নভাবে যে বিধিটি বাস্তবায়িত হবে, তাকে ইসলামের বাস্তবায়ন বলা যাবে না। কেননা ইসলাম কোনো আংশিক বা খন্ডিত বিধির নাম নয়, বরং তা হচ্ছে পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা, যা বাস্তবায়িত হলে জীবনের সকল দিক ও বিভাগসহই বাস্তবায়িত হবে।

এতো গেল বিষয়টির একটা সার্বিক আলোচনা। সুনির্দিষ্টভাবে চুরির বিষয়টি নিয়ে যদি আলোচনা করা হয়, তাহলেও আমাদেরকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

দারুল ইসলামে বসবাসকারী মুসলিম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের ও জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপায় উপকরণ সংক্রান্ত সমুদয় অধিকারকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকারকে। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এ অধিকারকে পৌঁছানোর দায়িত্ব সমাজের এবং সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য দায়িত্ব। এ অধিকার সে পাবে প্রথমত কাজের মাধ্যমে, যদি সে কাজের যোগ্য হয়। সমাজের ও সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাকে কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া, কাজের সংস্থান করা ও কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যোগান দেয়া। কিন্তু যখন সে কাজের সুযোগ বা কাজের সরঞ্জামের অভাবে বা কাজে অক্ষম হওয়ার কারণে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে বেকার হয়ে পড়ে, অথবা যখন তার নিজের উপার্জন তার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয় না, তখন তার এই সব প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে একাধিক সুযোগ লাভ করবে। প্রথমত তার পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে শরীয়তের নির্ধারিত পরিমাণে সাহায্য পাওয়ার হকদার হবে। দ্বিতীয়ত তার সচ্ছল প্রতিবেশী বা মহল্লাবাসীর কাছ থেকে সাহায্য পাবে। তৃতীয়ত মুসলমানদের বাইতুল মালে যাকাতের যে অর্থ জমা হবে তা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ পাবে। যাকাতও যখন তার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে না, তখন সে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার সমগ্র 'দারুল ইসলামে' ইসলামী আইন ও শরীয়তের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে, তার কর্তব্য হবে সচ্ছল লোকদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে সেই পরিমাণ সম্পদ কর আরোপের মাধ্যমে আদায় করা, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো চাপ প্রয়োগ করা না হয়, আবশ্যকতার সীমা অতিক্রম না করা হয় এবং হালাল উপায়ে উপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর যুলুম করা না হয়।

অর্থোপার্জনের উপায় উপকরণকেও ইসলাম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই হালালভাবে উপার্জন ছাড়া কোনো সম্পদের ওপর ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ জন্যে ইসলামী সমাজে বিত্তবানদের ব্যক্তিগত মালিকানা দেখে বিত্তহীনরা ক্ষিপ্ত হয় না এবং একজনের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে অন্যরা লোভাতুর হয় না। বিশেষত এই কারণে যে, সরকার সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং কাউকে বঞ্চিত রাখে না।

তাছাড়া ইসলাম মানুষের বিবেক ও চরিত্রকে লালন ও গঠন করে। তাই সে তাদের চিন্তাকে কাজ ও কাজের মাধ্যমে অর্থোপার্জনে নিয়োজিত করে- চুরি ও চুরির মাধ্যমে অর্থোপার্জনে নয়। কাজের সংস্থান করা সম্ভব না হলে কিংবা এ দ্বারা অর্জিত অর্থ মৌলিক প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট না হলে তাদেরকে পবিত্র ও সম্মানজনকভাবে তাদের অধিকার প্রদান করে।

এরপর এরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কী কারণে চোর চুরি করবে? নিশ্চয়ই প্রয়োজন পূরণের জন্যে নয়। একমাত্র কাজ না করে রাতারাতি ধনী হবার লোভেই সে চুরি করবে। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম জনগণকে নিরাপত্তাহীনতার আতংকে নিক্ষেপ করে ধনী হবার বাসনা পোষণ করা যায় না। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে শান্তিতে বসবাস করা ও তাদের হালাল সম্পদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত ও নিরুদ্বেগ থাকার অধিকারকে নষ্ট হতে দেয়া যায় না।

ইসলামী সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের এ অধিকার সংরক্ষিত যে, সে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, কালোবাজারী, মওজুদদারী বা শ্রমিকদের মজুরী আত্মসাত ইত্যাদির পরিবর্তে হালাল উপায়ে সম্পদ আহরণ করবে। অতপর যাকাত দেবে এবং যাকাতের পরেও সমাজের সম্ভাব্য চাহিদা

পূরণের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কিছু দানও করবে। প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে যে, তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিরাপদে থাকবে এবং চোর-ডাকাত বা অন্য কোনো লুটেরার হস্তগত হবে না।

এতো সব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার পরও যখন কেউ চুরি করে, যখন প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত করা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিককে চুরি যে একটি গর্হিত অপরাধ ও নিষিদ্ধ কাজ তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এবং অন্যের সম্পত্তি দেখে কারোই ক্ষিপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ যার যে সম্পত্তি আছে তা সে কারো সম্পত্তি হরণ করে অর্জন করেনি, বা হারাম উপায়েও উপার্জন করেনি। তখন তার চুরির পক্ষে কোনো ওযর বা সাফাই দেয়ার অবকাশ নেই এবং তার অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা কারো পক্ষেই উচিত নয়।

তবে যদি অভাব বা কোনো সংগত কারণ থাকার সন্দেহ দেখা দেয়, ইসলামের সাধারণ মূলনীতি এই যে, সন্দেহের উদ্রেক হলে শাস্তি মওকুফ করা হবে। এ জন্যে দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বত্র ক্ষুধা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো, তখন হযরত ওমর (রা.) চোরের হাত কাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিশেষত হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার ছেলের কয়েকজন ভৃত্য যখন 'মুযায়না' গোত্রের উট চুরি করে ধরা পড়লো এবং তিনি তাদের হাত কাটার নির্দেশও দিয়ে দিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যখন জানতে পারলেন যে, তাদের মনিব তাদেরকে ক্ষুধায় কষ্ট দেয়, তখন তাদের শাস্তি তো মওকুফ করলেনই, উপরন্তু তাদের মনিবের ওপর শাস্তি স্বরূপ উটটির মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা আরোপ করলেন।

এভাবেই ইসলামের দন্ডবিধিকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে, ইসলামের স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান সকল নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি শ্রেণীর স্বার্থের জন্যে অপর শ্রেণীকে বিসর্জন দেয় না। শাস্তির ব্যবস্থা করার আগে অপরাধের প্রতিরোধ করে। একমাত্র তাদেরকেই সে শাস্তি দেয়, যারা কোনো কারণ ছাড়াই অন্যের ওপর আক্রমণ চালায়।

ইসলামে চুরির শাস্তি বিধান

এই সাধারণ তাত্ত্বিক আলোচনার পর এবার চুরির শাস্তি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

চুরি (ইসলামী আইনের পরিভাষায়) অন্যের সংরক্ষিত সম্পদকে গোপনে অপহরণ করার নাম। সুতরাং অপহৃত জিনিস এমন কোনো জিনিস হওয়া চাই, যার মূল্য নিরূপিত আছে বা নিরূপণযোগ্য। নচেত তা সম্পদ বলে গণ্য হবে না।

যে সংরক্ষিত সম্পদ গোপনে অপহরণ করাকে চুরি বলা হয়, তার ন্যূনতম পরিমাণ প্রায় সকল ফেকাহ শাস্ত্রবিদের সর্বসম্মত মতানুসারে সিকি দীনার অর্থাৎ আমাদের (মিসরের) বর্তমান মুদ্রায় প্রায় ২৫ কারস-এর সমান। এই চুরিকৃত সম্পদ চুরি হওয়ার আগে সুরক্ষিত স্থানে ছিলো এবং চোর তার সুরক্ষিত স্থান থেকে জিনিসটি নিয়ে বেরিয়ে গেছে এমন হওয়া চাই। সুতরাং যার কাছে কোনো জিনিস গচ্ছিত রাখা হয়েছে, সে যদি তা চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। অনুরূপ, গৃহের অভ্যন্তরে যাওয়া আসার অনুমতিপ্রাপ্ত ভৃত্য চুরি করলে সে জন্যে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা চোরাইকৃত সামগ্রী তার নাগাল থেকে সংরক্ষিত ছিলো না। অনুরূপভাবে, কেউ কোনো জিনিস ধার নিয়ে যদি অস্বীকার করে, তবে সে জন্যে তার হাত কাটা যাবে না। ক্ষেতে বিদ্যমান ফসল যতোক্ষণ ঘরে না ওঠে ততক্ষণ তা চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না। অনুরূপ ঘরের বাইরে বা সংরক্ষণের জন্যে তৈরী সিন্দুকের বাইরে রাখা সম্পদ চুরির জন্যেও হাত কাটা যাবে না। তা ছাড়া সম্পদ নির্ভেজাল অন্যের মালিকানাভুক্ত হতে হবে। যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পদ থেকে কোনো অংশীদার চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কেনো৷ ওই সম্পদে তারও অংশ রয়েছে। তাই তা অন্যের নির্ভেজাল মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি নয়। অনুরূপভাবে সরকারী কোষাগার থেকে যে চুরি করে তারও হাত কাটা যাবে না। কেননা ঐ সম্পত্তিতে তারও অংশ রয়েছে। সুতরাং

ওটা অন্যের নির্ভেজাল সম্পত্তি নয়। তাই বলে এ সব ক্ষেত্রে কেননা শাস্তিই দেয়া যাবে না তা নয়। এ সব ক্ষেত্রে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। 'তাযীর' অর্থাৎ হাত কাটার চেয়ে কম কোনো শাস্তি বিচারকের মতামত ও বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে নির্ধারিত হবে। এ শাস্তি বেত্রাঘাত, কারাদন্ড বা ক্ষেত্র বিশেষে শুধু সদুপদেশ দিয়েও ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

যখন হাত কাটা হবে, তখন ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কাটতে হবে। পুনর্বার চুরি করলে বাম পা গিরে পর্যন্ত কাটা হবে। এ পর্যন্ত সবাই একমত। অতপর তৃতীয়বার ও চতুর্থবার চুরির শাস্তি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

সন্দেহের উদ্রেক হলে শাস্তি মওকুফ হবে। ক্ষুধা ও অভাবের তাড়নাজনিত সন্দেহ, মালিকানায় অংশীদারিত্বের সন্দেহ, স্বীকারোক্তি দেয়ার পর তা প্রত্যাহারজনিত সন্দেহ এবং সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাহারজনিত সন্দেহ এই সব ধরনের সন্দেহই শাস্তি মওকুফের জন্যে যথেষ্ট।

সন্দেহের ব্যাখ্যা নিয়েও ফেকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেসব জিনিস মূলত সকলের জন্যে উন্মুক্ত কিন্তু পরে কেউ তাকে নিজস্ব মালিকানাভুক্ত বানিয়ে নিয়েছে, যেমন কারো সংরক্ষিত পানি ও কারো শিকার করা পাখি ইত্যাদি। এ দুটো জিনিস যেহেতু মূলত সকলের জন্যে উন্মুক্ত, তাই বিশেষ ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত হওয়ার পরও তাতে সন্দেহের রেশ থেকে যায়। এ জন্যে এ দুটো জিনিস চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি মওকুফ হবে। এটা ইমাম আবু হানীফার অভিমত। অনুরূপ যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি কারো একক মালিকানায় যাওয়ার পরও ইমাম আবু হানীফার মতে তাতে সন্দেহের রেশ থাকে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ এ সব ক্ষেত্রে শাস্তি মওকুফ করেন না। ইমাম আবু হানীফা দ্রুত পচনশীল জিনিস যথা অশুষ্ক খাদ্য, তরিতরকারি, গোশত, রুটি ইত্যাদির চুরিতেও শাস্তি মওকুফ করার পক্ষপাতী। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ অন্য তিন ইমামের সাথে একমত এবং ইমাম আবু হানীফার বিরোধী।

ফেকাহবিদদের মতভেদগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এগুলো ফেকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যে কটি উদাহরণ দিলাম তা ইসলামের উদারতা ও মানুষকে সন্দেহের বশে পাকড়াও না করার ব্যাপারে তার প্রবল ইচ্ছা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট। রসূল (স.) বলেছেন, 'সন্দেহ দেখা দিলে শাস্তি মওকুফ করে দাও।' আর হযরত ওমর (রা.) বলতেন, 'সন্দেহের কারণে শাস্তি মওকুফ করা আমার কাছে সন্দেহ সত্তেও শাস্তি দেয়ার চেয়ে প্রিয়।'

তবে এ পর্যন্ত চোরের ওপর হাত কাটার ন্যায় কঠোর শাস্তি প্রয়োগের অপরিহার্যতা, বিশেষত ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিম সমাজে চুরি থেকে আত্মরক্ষার যাবতীয় উপকরণাদি সরবরাহ ও সামাজিক সুবিচারের রক্ষাকবচ প্রদান করার পরও যারা চুরিতে লিপ্ত হয়, তাদের প্রতি ইসলামের অনমনীয় মনোভাব বর্ণনা করার পর এই শাস্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কে জনাব আব্দুল কাদের আওদা লিখিত 'ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধি' নামক গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি,

'চুরির জন্যে হাত কাটার শাস্তি নির্ধারণের কারণ এই যে, চোর যখন চুরির কথা ভাবে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে অন্যের উপার্জিত সম্পদ দিয়ে নিজের উপার্জন বৃদ্ধির কথাই ভাবে। অন্য কথায় বলা যায়, সে নিজের হালাল সম্পদকে খুবই তুচ্ছ মনে করে এবং হারাম উপায়ে তাকে বাড়াতে চায়। সে তার নিজের শ্রমের ফলে সন্তুষ্ট নয়, বরং অন্যের শ্রমের ফসলের প্রতি সে লোভাতুর। এ কাজটা সে করে এ জন্যে, যেন সে বেশী বেশী করে খরচ করতে পারে এবং খ্যাতিমান হতে পারে। অথবা শ্রমের কষ্ট থেকে রেহাই পেতে পারে অথবা নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে

পারে। কাজেই যে জিনিসটি তাকে চুরিতে প্ররোচিত করে তা হলো উপার্জন বা ধন সম্পদ বাড়ানোর ইচ্ছা। মানুষের মনের এই কু-প্ররোচক ও কু-ইচ্ছাটিকে ইসলাম হাত কাটার শাস্তি নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করেছে। কেননা হাত বা পা-টা কাটা গেলে উপার্জন কমে যাওয়া অবধারিত। কারণ হাত ও পা উপার্জনেরই হাতিয়ার। উপার্জন কমে গেলে সম্পদও না কমে পারে না, আর এর ফলে খরচ করা ও খ্যাতিমান হওয়ার সামর্থও কমে যাবে। উপরন্তু পরিশ্রমের কষ্ট বেড়ে যাবে এবং ভবিষ্যত হয়ে পড়বে অধিকতর শংকাময়।

'সুতরাং ইসলামী শরীয়ত হাত কাটার শাস্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে অপরাধের প্ররোচনা দানকারী মানসিক প্রবণতাগুলোকে অপর কতকগুলো বিপরীতমুখী মানসিক প্রবণতার সাহায্যে প্রতিহত করে। শেষোক্ত এই প্রবণতাগুলো অপরাধবিমুখ। যখন অপরাধের প্ররোচনাদানকারী শক্তিগুলো বিজয়ী হয় এবং মানুষ একবার অপরাধে লিপ্ত হয়, অতপর তার জন্যে তাকে যখন শাস্তি দেয়া হয়, তখন সেই শাস্তির তিক্ততা বিপরীতমুখী মানসিক শক্তিগুলোকে বিজয়ী করে দেয়। ফলে সে আর দ্বিতীয়বার উক্ত অপরাধে লিপ্ত হয় না।

ইসলামী শরীয়তের চুরির শাস্তি উল্লেখিত ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে চুরির শাস্তি কখনো এমন সুন্দর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আধুনিক আইন চুরির শাস্তি হিসাবে কারাদন্ড নির্ধারণ করেছে, যা চুরি তো বটেই সকল অপরাধ দমনেই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণ এই যে, কারাদন্ড এমন কোনো প্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না, যা তাকে চৌর্যবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। কেননা কারাভোগকালীন সময়টুকুকে ছাড়া কারাদন্ড চোরের চৌর্যবৃত্তির পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না। আর কারাগারে থাকাকালে অপরাধী যখন প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেয়ে যায়, তখন তার আর উপার্জনের দরকারই বা কী? জেল থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই আবার উপার্জন শুরু করতে পারে। হালাল হারাম যেভাবেই হোক, উপার্জনের গতি ও পরিমাণ বাড়িয়ে সে তার জেল খাটার সময়টার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার আরো বেশী সুযোগ পায়। কেননা এ সময় সে মানুষকে ধোকা দেয়ার ও আগের চেয়ে সৎ হয়ে যাওয়ার প্রদর্শনী করে মানুষকে তার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ধারণা দিয়ে তাদের সহযোগিতা লাভ করতে পারে। এভাবে অবশেষে সে যদি তার আসল উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে, তাহলে তো কথাই নেই। যা চেয়েছিলো তা পেয়ে গেলো। নচেত তার তেমন ক্ষতি হলো না এবং উল্লেখযোগ্য কোনো লাভ থেকে বঞ্চিতও হলো না।

কিন্তু হাত কাটার শাস্তি চোরের কাজের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে অথবা তার উপার্জনে ও কাজে বিরাট আকারের ক্ষতি সাধন করে। তার বাড়তি উপার্জনের সুযোগ সর্বাবস্থায় লোপ পায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার উপার্জন হয় ভীষণভাবে কমে যায়, নতুবা বন্ধ হয়ে যায়। আর শরীরে অপরাধের জ্বলন্ত নিদর্শন নিয়ে সে কাউকে ধোকা দিতে বা কারো আস্থা অথবা সহযোগিতা লাভে কখনো সমর্থ হয় না। তার কর্তিত হাত তার অতীত অপরাধের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে তার সাথে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং একেবারে নির্ভুলভাবে যে চূড়ান্ত কথাটা বলা যায় তা এই যে, কর্তনের শাস্তি দেয়া হলে আর্থিক ক্ষতির দিকটা সুনিশ্চিত, আর কারাদন্ড দেয়া হলে লাভের দিকটা ক্ষতির চেয়ে অধিকতর নিশ্চিত। আর এটা চোর সহ সব মানুষের জন্মগত স্বভাব যে, যে পথে লাভের সম্ভাবনা অধিক, সেই পথে যাওয়া থেকে পিছপা হয় না এবং যে পথে ক্ষতি সুনিশ্চিত সে পথে এক পাও এগুতে চায় না।

এরপরও যারা বলে যে, বর্তমানে মানবতা ও সভ্যতা যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তার সাথে কর্তনের শাস্তি বেমানান, তাদের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। মানবতা ও সভ্যতার দাবি যেন

এই দাঁড়িয়েছে যে, চোরকে তার অপরাধের জন্যে আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তার পাশবিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তাকে আরো উৎসাহ দিতে হবে, আমাদেরকে চুরি ডাকাতির ভয়ভীতি নীরবে সহ্য করে জীবন ধারণ করে যেতে হবে এবং কর্মবিমুখ চোর ডাকাতদেরকে আমাদের হাড়ভাঙ্গা খাটনির ফসল লুটপাট করে খাওয়ার অবাধ সুযোগ দিয়ে দিতে হবে।

মানবতা ও সভ্যতার দোহাই পেড়ে যারা কর্তনের দন্ডের বিরোধিতা করে, তাদের বক্তব্যে আমি এই ভেবেও হতবাক হয়ে যাই যে, সভ্যতা ও মানবতা যেন আমাদেরকে আধুনিক বিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবিত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যকে অস্বীকার করার আহ্বান জানাচ্ছে, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও জাতিসমূহের যুগ যুগকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে ভুলে যেতে বলছে, আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার আহ্বান জানাচ্ছে এবং আমাদের চিন্তাশক্তির স্বতস্ফূর্ত সিদ্ধান্তগুলোকে অগ্রাহ্য করতে বলছে, যাতে আমরা তাদের বিভ্রান্তিকর ও অযৌক্তিক বক্তব্যকে নির্বিবাদে মেনে নেই!

বস্তুত, ইসলামের এই অব্যর্থ শাস্তি যখন যথার্থই সভ্যতা ও মানবতার অনুকূল, তখন কারাদন্ড অবশ্যই বিলোপযোগ্য এবং কর্তনদন্ডই চিরস্থায়ী হবার যোগ্য। কেননা শেষোক্তটি মনস্তত্ত্ব, মানব প্রকৃতি, মানব জাতির আবহমানকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের অটুট ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর মানবতা ও মানব সভ্যতাও এই একই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে কারাদন্ডের পেছনে না আছে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, না আছে কোনো অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য, আর না আছে তর্কশাস্ত্রীয় ও বস্তুতাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে তার কোনো সামঞ্জস্য।

মানবীয় মনস্তত্ত্ব ও মানসিকতার নির্ভুল ও সুষ্ঠু পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কর্তনদন্ডের উদ্ভব হয়েছে। এজন্যে তা একই সময়ে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের জন্যেই উপযোগী। কেননা তা অপরাধ কমানো ও সমাজকে নিরাপত্তা দানের সহায়ক। ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের জন্যে যে শাস্তি সমভাবে উপযোগী ও মানান সই, তা অবশ্যই সর্বোত্তম ও সর্বাধিক ন্যায়সংগত দন্ড।

তথাপি এসব যুক্তি-তর্ক কারো কারো কাছে কর্তনদন্ডের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয়। তারা একে নিষ্ঠুর শাস্তি বলে অভিহিত করে থাকেন। বস্তুত, এটাই তাদের প্রথম যুক্তি এবং এটাই শেষ যুক্তি। কিন্তু নিসন্দেহে এটা একটা খোঁড়া যুক্তি। কেননা শাস্তি শাস্তিই। যদি নিষ্ঠুর না হয়ে বিনোদনমূলক, কোমল ও দুর্বল ধরনের কিছু হয়, তাহলে তা আর শাস্তি থাকবে না। শাস্তিতে কিছুটা কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা থাকতেই হবে। নচেত তাকে শাস্তি নামে আখ্যায়িত করা যাবে না।'(১)

আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু হয়েও চুরির এই কঠোর শাস্তি প্রবর্তন করে বলেন,

'তাদের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।'

অর্থাৎ অপরাধ দমনে এটি আল্লাহর প্রবর্তিত একটি কার্যকর শাস্তি। যে ব্যক্তি অপরাধ সংঘটিত করে, তার জন্যে এ ধরনের কার্যকর দমন ব্যবস্থা একটি দয়া, আনুকূল্য ও অনুকম্পা বিশেষ। কেননা এ শাস্তি তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এ শাস্তি গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যেও একটি করুণা বিশেষ। কেননা এ দ্বারা রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ ফিরে আসে। একমাত্র মাথা বিগড়ে যাওয়া মানুষ ছাড়া কেউ দাবী করতে পারে না যে, সে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর চেয়েও মানুষের বেশী দরদী ও তার প্রতি বেশী দয়ালু। ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলামের

---

(১) 'আত তাশরীউল জিনায়ী ফিল ইসলাম' (ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধি) প্রথম খন্ড, পৃ. ৬৫২-৬৫৪

সূচনা যুগে যখন এই শাস্তি চালু ছিলো, তখন সিকি শতাব্দী কালের মধ্যেও হাতে গনা কয়েক ব্যক্তির ওপর ছাড়া কার্যত হাত কাটার শাস্তির প্রয়োগ হয়নি। কেননা তৎকালীন প্রশাসনের শাস্তির অনমনীয়তা ও কঠোরতা এবং পর্যাপ্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে সেই সমাজে এই মুষ্টিমেয় কয় ব্যক্তি ছাড়া শাস্তি পাওয়ার যোগ্য লোকই সৃষ্টি হতে পারেনি।

অতপর আল্লাহ তায়ালা তাওবার দুয়ার উন্মুক্ত করেন তাওবা করতে ইচ্ছুকদের জন্যে, যদি তারা অনুতপ্ত হয়, সংযত হয় ও ফিরে আসে এবং নেতিবাচক শাস্তি পেয়েই থেমে থাকে না, বরং ইতিবাচকভাবে সৎ কাজ ও কল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করার পর তাওবা করে ও নিজের সংশোধন করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশলী ও দয়ালু।' (আয়াত নং ৩৯)

অন্যায় কাজ একটি ইতিবাচক ও বিকৃতিমূলক দুষ্কর্ম। যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে, তার কেবল অন্যায় কাজ বর্জন করে বসে থাকা যথেষ্ট নয়, বরং ইতিবাচক ও আত্মশুদ্ধিমূলক সৎ কাজ করে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। ইসলামী ব্যবস্থায় এ বিষয়টি বুঝতে আরো গভীরে যেতে হবে। অন্যায় কাজ থেকে তওবা করার পর সক্রিয় হয়ে ইতিবাচকভাবে সৎ ও কল্যাণমূলক কাজ করা আবশ্যক। খারাপ ও অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত হবার পর সক্রিয়ভাবে ভালো কাজ করা শুরু না করলে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং পুনরায় খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থেকে যায়। যখন কোনো মানুষ অন্যায় কাজ থেকে তাওবা করার পর সক্রিয়ভাবে সৎকাজে আত্মনিয়োগ করে, তখন সে খারাপের দিকে প্রত্যাবর্তনের শংকামুক্ত হয়। কেননা তার মধ্যে আর শূন্যতা থাকে না এবং সে ইতিবাচক কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে এভাবে লালন পালন ও গঠন করেন। কেননা তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের সৃষ্টিকে তিনিই উত্তমরূপে জানেন।

অপরাধ ও শাস্তি এবং তাওবা ও ক্ষমার উল্লেখের পর কোরআন তার পরবর্তী আয়াতে সেই মূলনীতির উল্লেখ করছে যার ওপর দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মফল বিধির ভিত্তি স্থাপিত। বস্তুত, মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক মহাবিশ্বে সর্বোচ্চ ইচ্ছারও অধিপতি। তিনি মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি নিরূপণে সার্বিক কর্তৃত্বেরও অধিকারী। তিনিই মহাবিশ্বের ও তার ভেতরে বিরাজমান সকল সৃষ্টির পরিণতি নির্ধারণ করেন। তিনিই তাদের জীবন যাপনের আইন ও বিধান রচনা করেন এবং দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাদের কাজের প্রতিফল দেন। তিনি বলেন,

'তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব একমাত্র তাঁর ....' (আয়াত ৪০)

বস্তুত, বিশ্ব জগতের ওপর একমাত্র তাঁরই একচ্ছত্র শাসন ও কর্তৃত্ব বিরাজ করে এবং এই একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকেই উৎসারিত হয় দুনিয়ায় জীবন যাপনের আইন কানুন এবং আখেরাতের কর্মফল। এ ক্ষেত্রে কোনো একাধিক, খন্ডিত বা স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নেই। আর দুনিয়ায় মানুষের জীবন ততোক্ষণ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না যতোক্ষণ তাদের জন্যে দুনিয়ার আইন প্রণয়ন ও আখেরাতের কর্মফল বিধানের কর্তৃত্ব একই সত্ত্বার কাছে সমর্পিত না হয়। এজন্যেই কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

'আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ যদি থাকতো, তাহলে উভয়টি বিধ্বস্ত হয়ে যেতো।' অন্যত্র আরো বলা হয়েছে, 'তিনিই আকাশেও ইলাহ এবং পৃথিবীতেও ইলাহ।'

يَٰٓأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
قَالُوٓا اٰمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۚ سَمّٰعُونَ
لِلْكَذِبِ سَمّٰعُونَ لِقَوْمٍ اٰخَرِينَ ۙ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ
مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ
وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ لَمْ
يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ سَمّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۗ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۗ وَإِنْ

৪১. হে রসূল, যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়, এরা সে দলের (লোক) যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু (সত্যিকার অর্থে) তাদের অন্তর কখনো ঈমান আনেনি, আর (তাদের ব্যাপারও নয়) যারা ইহুদী– তারা মিথ্যা কথা শোনার জন্যে (সদা) কান খড়া করে রাখে এবং (তাদের বন্ধু সম্প্রদায়ের) যেসব লোক কখনো তোমার কাছে আসেনি, এরা সেই অপর সম্প্রদায়টির জন্যেই নিজেদের কান খাড়া করে রাখে; আল্লাহর কেতাবের কথাগুলো আপন জায়গায় (বিন্যস্ত) থাকার পরেও এরা তা বিকৃত করে বেড়ায় এবং (অন্যদের কাছে) এরা বলে, (হাঁ) যদি এ (ধরনের কোনো) বিধান তোমাদের দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করো, আর সে ধরনের কিছু না দেয়া হলে তোমরা (তা থেকে) সতর্ক থেকো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যার পথচ্যুতি চান, তাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচানোর জন্যে তুমি তো কিছুই করতে পারো না; এই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) লোক, আল্লাহ তায়ালা কখনো যাদের অন্তরগুলোকে পাকসাফ করার এরাদা পোষণ করেন না, তাদের জন্যে পৃথিবীতে (যেমনি) রয়েছে অপমান (ও লাঞ্ছনা), পরকালেও (তেমনি) তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ আযাব ৪২. (ইহুদীদের চরিত্র হচ্ছে,) এরা (যেমন) মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, (তেমনি এরা হারাম মাল খেতেও ওস্তাদ; অতএব এরা যদি কখনো (কোনো বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার করতে পারো কিংবা তাদের উপেক্ষা করো, যদি তুমি তাদের ফিরিয়ে দাও তাহলে (নিশ্চিত থাকো), এরা তোমার কোনোই অনিষ্ট করতে পারবে না, তবে যদি তুমি তাদের বিচার ফয়সালা করতে চাও তাহলে অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে; নিসন্দেহে

حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ

يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ

وَمَآ أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورٌ ۚ يَحْكُمُ

بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا

اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ

وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ

اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ

بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ

بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ؕ وَمَنْ لَّمْ

আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারকদের ভালোবাসেন। ৪৩. এসব লোক কিভাবে তোমার কাছে বিচারের ভার নিয়ে হাযির হবে, যখন তাদের নিজেদের কাছেই (আল্লাহর পাঠানো) তাওরাত মজুদ রয়েছে, তাতেও তো (বিচার-আচার সংক্রান্ত) আল্লাহর বিধান আছে, (তুমি যা কিছুই করো না কেন) একটু পরেই তারা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এরা আসলে ঈমানদারই নয়।

রুকু ৭

৪৪. নিসন্দেহে আমি (মূসার কাছে) তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে (তাদের জন্যে) পথনির্দেশ ও আলোকবর্তিকা বর্তমান ছিলো, আমার নবীরা— যারা আমার বিধানেরই অনুবর্তন করতো, ইহুদী জাতিকে এ (হেদায়াত) মোতাবেকই আইন-কানুন প্রদান করতো, (নবীদের পর তাদের) জ্ঞানসাধক ও ধর্মীয় পন্ডিতরাও (এ অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করতো), কেননা, (নবীর পর) আল্লাহর কেতাব সংরক্ষণ করার দায়িত্ব এদেরই দেয়া হয়েছিলো, তারা (নিজেরাও) ছিলো এর (প্রত্যক্ষ) সাক্ষী, সুতরাং তোমরা মানুষদের ভয় না করে একান্তভাবে আমাকেই ভয় করো, আর আমার আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়ো না; যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই (হচ্ছে) কাফের। ৪৫. (তাওরাতে) আমি তাদের জন্যে বিধান নাযিল করেছিলাম যে, (তাদের) জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, (শাস্তি প্রয়োগের সময় এই শারীরিক) যখমটাই কিন্তু আসল দন্ড (বলে বিবেচিত হয়); অবশ্য (বাদী পক্ষের) কেউ যদি এই দন্ড মাফ করে দিতে চায়, তাহলে তা তার নিজের (গুনাহ-খাতার) জন্যে কাফফারা (হিসেবে গণ্য) হবে; আর যারাই

يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ
بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ص وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ
فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ لا وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ط وَمَنْ لَّمْ
يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط لِكُلٍّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ

আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করবে না, তারা (হচ্ছে) যালেম। ৪৬. এ ক্রমধারায় অতপর আমি মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, (সে সময়) আগে থেকে তাওরাতের যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো, সে ছিলো তার সত্যতা স্বীকারকারী, আর আমি তাকে ইনজীল দান করেছি, তাতে ছিলো হেদায়াত ও নূর; তখন তাওরাতের যা কিছু (তার কাছে বর্তমান ছিলো- ইনজীল কেতাব) তার সত্যতাও স্বীকার করেছে, (তদুপরি) তাতে আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে পথনির্দেশ ও উপদেশ (মজুদ) ছিলো। ৪৭. ইনজীলের অনুসারীদের উচিত এর ভেতর আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করা; (কেননা) যারাই আল্লাহর নাযিল করা আইনের ভিত্তিতে বিচার করবে না তারাই ফাসেক। ৪৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার প্রতি সত্য (দ্বীন)-সহ এ কেতাব নাযিল করেছি, (আগের) কেতাবসমূহের যা কিছু (অবিকৃত অবস্থায়) তার সামনে মজুদ রয়েছে, এ কেতাব তার সত্যতা স্বীকার করে (শুধু তাই নয়), এ কেতাব (সেসব বিধানের) হেফাযতকারীও বটে! (সুতরাং) আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতেই তুমি বিচার-ফয়সালা করো, আর (এ বিচারের সময়) তোমার নিজের কাছে যা সত্য (দ্বীন) এসেছে, তার থেকে সরে গিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না; আমি তোমাদের প্রতিটি (সম্প্রদায়ের) জন্যে শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; বরং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তোমাদের যাচাই-বাছাই করে নিতে চেয়েছেন, অতএব ভালো কাজে তোমরা সবাই প্রতিযোগিতা করো; (কেননা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই হবে

بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ
اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল, (এখানে) তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে মতভেদ করতে, (অতপর) তিনি অবশ্যই তা তোমাদের (স্পষ্ট করে) বলে দেবেন। ৪৯. (অতএব, হে মোহাম্মদ,) তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালা যে আইন-কানুন নাযিল করেছেন তুমি তারই ভিত্তিতে এদের মাঝে বিচার ফয়সালা করো এবং কখনো তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং তাদের (ষড়যন্ত্র) থেকে সতর্ক থেকো, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর নাযিল করেছেন তার কোনো কোনো বিষয়ে যেন তারা কখনো তোমাকে ফেতনায় না ফেলতে পারে; অতপর (তোমার ফয়সালায়) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজেদেরই কোনো গুনাহের জন্যে তাদের কোনোরকম মসিবতে ফেলতে চান; (কেননা) মানুষের মাঝে অধিকাংশই হচ্ছে অবাধ্য। ৫০. তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) বিশ্বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?

তাফসীর

আয়াত ৪১-৫০

এ আয়াত কটিতে ইসলামী আকীদা-তত্ত্ব, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে, যেমন আলোচিত হয়েছে ইতিপূর্বে সূরা আলে ইমরানে ও সূরা নিসায়। তবে এ বিষয়টি এ সূরায় সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং বিশেষ জোর দিয়ে আলোচিত হয়েছে। এটি এখানে কেবল আভাসে-ইংগিতে নয়, বরং সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর আইন দিয়ে যারা বিচার ফয়সালা করে না তারাই কাফের

যে বিষয়টি এখানে আলোচিত হয়েছে তা হলো শাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত। আর এটা আলোচিত হয়েছে আল্লাহর একক প্রভুত্ব ও ঈমান সংক্রান্ত আলোচনার পটভূমিতে। বিষয়টি মূলত নিম্নোক্ত জবাব হিসাবে সংক্ষেপে তুলে ধরা যায়,

পৃথিবীতে যে শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, তা কি আল্লাহর সেই সব চুক্তি, অংগীকার ও আইন অনুসারে চলবে, যা পূর্ববর্তী নবীদের ওপর ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং তাদের পর যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তাদের ওপর যার অনুসরণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিলো? না, এসব কিছু কেবল মানুষের নিত্য পরিবর্তনশীল খেয়ালখুশী, আল্লাহর বিধানের সাথে কোনো যোগসূত্র নেই এমন সব স্বার্থ এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর পর্যন্ত মানব সমাজে অনুসৃত রীতিপ্রথার অনুসারীই থাকবে? অন্য কথায় বলা যায়, পৃথিবীতে ও মানব জীবনে প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কি এককভাবে শুধু আল্লাহর থাকবে, না তার পুরোটা বা অংশ বিশেষ তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কারো হাতে ন্যস্ত হবে এবং সে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির তোয়াক্কা না করেই মানুষের জন্যে আইন প্রণয়ন করবে?

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, আল্লাহ ছাড়া এ বিশ্ব জগতের আর কোনো সার্বভৌম খোদা বা ইলাহ নেই। তিনি মানব জাতির একমাত্র ইলাহ তথা সার্বভৌম ও নিরংকুশ শাসক, উপাস্য ও আইনদাতা এবং মানব জাতি তাঁর দাসানুদাস। এ হিসাবে তাদের জন্যে তিনি যে আইন, বিধান ও শরীয়ত নির্ধারণ ও প্রবর্তন করেছেন এবং তা বাস্তবায়নের অংগীকার তাদের কাছ থেকে আদায় করেছেন, একমাত্র সেগুলোরই অধিকার রয়েছে পৃথিবীতে শাসন পরিচালনার দিকনির্দেশনা হিসাবে বহাল থাকার, মানুষের সকল বিবাদের মীমাংসা করার ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার এবং নবীরা ও তাদের উত্তরসূরী শাসকদেরও একমাত্র এই বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করা কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও নমনীয়তা প্রদর্শন বা ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই এবং এ থেকে একচুল পরিমাণও বিচ্যুত হবার অনুমতি নেই। কোনো প্রজন্ম বা গোত্র-গোষ্ঠী যদি এমন কোনো রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে থাকে, যার প্রতি আল্লাহর অনুমোদন নেই, তবে সেই রীতিনীতির কানাকড়িও মূল্য নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ সমস্যাটা কোনো মামুলী সমস্যা নয়, বরং এটা হচ্ছে ঈমান ও কুফরের, ইসলাম ও জাহলিয়াতের এবং শরীয়ত ও মনগড়া রীতিনীতির সমস্যা। এ দুয়ের মধ্যবর্তী কিছু নেই এবং এ ব্যাপারে কোনো আপোষের প্রশ্ন ওঠে না। মোমেন হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন করে এবং তা থেকে এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হয় না বা তাতে এক রতি পরিমাণও রদবদল করে না। আর কাফের, যালেম ও ফাসেক হলো তারাই, যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন করে না। শাসক ও বিচারকদের দুটি অবস্থাই হতে পারে। হয় তারা পুরোপুরিভাবে আল্লাহর শরীয়ত অনুসারে শাসন ও বিচার পরিচালনা করবে, নচেত আল্লাহর অননুমোদিত অন্য কোনো আইন ও বিধান অনুসারে। প্রথমোক্ত শাসক ও বিচারকরা মোমেন, আর শেষোক্ত শাসক ও বিচারকরা কাফের, যালেম ও ফাসেক। সাধারণ মানুষও দু'রকমের হতে পারে। হয় তারা শাসক ও বিচারকদের কাছ থেকে আল্লাহর হুকুম ও শাসন এবং আল্লাহর সকল বিচার ফয়সালা নির্বিবাদে গ্রহণ করবে, অথবা করবে না। গ্রহণ করলে তারা মোমেন, নচেত মোমেন নয়। এ দুই অবস্থার মাঝখানে তৃতীয় কোনো অবস্থা নেই। এ ব্যাপারে কোনো ওযর আপত্তি ও যুক্তিতর্ক চলবে না। আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক ও প্রভু। মানুষের কিসে কল্যাণ, তা তিনিই জানেন এবং মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যে তিনি তাঁর আইন ও বিধান রচনাও জারী করেন। আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর শরীয়ত ও আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম কোনো হুকুম কোনো শরীয়ত এবং কোনো বিধান নেই। তাঁর বান্দাদের কারো এ কথা বলার অধিকার নেই যে, আমি আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে মানিনা বা প্রত্যাখ্যান করছি, অথবা, আমি সৃষ্টির কল্যাণ অকল্যাণ আল্লাহর চেয়ে বেশী বুঝি। এ কথা যে বলবে, সে ঈমানের আওতা থেকে বেরিয়ে যাবে।

এটা হলো আলোচ্য আয়াতগুলোতে আলোচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়টি এখানে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন, আপোষহীন ও বজ্রকঠিন ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে মদীনার ইহুদীদের হাল হাকিকত এবং মোনাফেকদের সাথে তাদের দহরম মহরম ও যোগসাজশের বিষয়টি। এই ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশের মোকাবেলা করার জন্যে রসূল (স.)-কে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাও এই সাথে তুলে ধরা হয়েছে। মুসলমানরা মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত ইহুদীদের এই যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্র অব্যাহত ছিলো।

এ আয়াতগুলোতে প্রথমত বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর নবীদের কাছে নাযিলকৃত প্রত্যেক আসমানী কেতাব ও শরীয়তে অকাট্যভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী ও বিচার শাসন পরিচালনা সর্বতোভাবে আল্লাহর বিধান অনুসারেই করতে হবে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক গোটা জীবনকে আল্লাহর আইন অনুসারে পরিচালনা করতে হবে। এটিকে ঈমান ও কুফুরের, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের এবং আল্লাহর বিধান ও মানব রচিত বিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এক এক করে তাওরাত ও ইনজীলের নামোল্লেখ করে বলেছেন যে, এই উভয় কেতাবে আল্লাহর বিধানকে মানব জাতির জীবনের একমাত্র অনুকরণীয় ও অবশ্য পালনীয় বিধান হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছিলো। যেমন বলা হয়েছে যে, তাওরাতকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত ও আলোকবর্তিকা স্বরূপ নাযিল করেছেন, 'তাওরাতের আলোকে নবীরা, রব্বানীরা ও আলেমরা বিচার ফয়সালা করে।' ......'তাদের কাছে যে তাওরাত আছে তাতে রয়েছে আল্লাহর নির্দেশিকা' ..... 'তাতে আমি বিধান দিয়েছি যে, প্রাণের বদলে প্রাণ .....' আর ঈসা (আ.)-কে যে ইনজীল দেয়া হয়েছে, তা 'তাওরাতের সমর্থক ছিলো ...' আর কোরআনকে আল্লাহ তায়ালা 'তার পূর্ববর্তী সকল কেতাবের সমর্থক ও অগ্রগণ্য হিসাবে নাযিল করেছেন .....' 'অতএব আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে তাদের মধ্যে শাসন পরিচালনা করো ....' 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করে না, সে কাফের ...... সে যালেম ...... সে ফাসেক', 'তারা কি জাহেলিয়াতের শাসন চায়?'......... এভাবে সকল নবীর শরীয়তে এ বিষয়টি সম্পর্কে অভিন্ন ও অকাট্য বক্তব্য দেয়া হয়েছে। ইসলামী আইন ও বিধান অনুসারে শাসন ও বিচার পরিচালনা করাকে ঈমানের সীমারেখা ও মুসলমান হবার শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, শাসক ও শাসিত উভয়ের জন্যে। মূল কথা হলো, আল্লাহর বিধান অনুসারে শাসন করা শাসকের দায়িত্ব। আর শাসিতদের কর্তব্য হলো, ইসলামী বিধানের আলোকে পরিচালিত শাসন ও বিচারকে অম্লান বদনে মেনে নেয়া এবং অন্য কোনো আইন বা বিধান না মানা।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এর ওপর এত গুরুত্ব দেয়ার কারণও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণগুলো কী কী? এই কারণগুলো যখন কোরআনে অনুসন্ধান করি, তখন তা খুবই স্পষ্ট দেখতে পাই।

এ ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো, আল্লাহই যে মানুষের একমাত্র ইলাহ, একমাত্র প্রতিপালক, একমাত্র অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক এবং এক্ষেত্রে তার আর কোনো শরীক নেই, সে কথা হয় মেনে নিতে হবে, নতুবা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সুতরাং বিষয়টি হয় ঈমানের সাথে, নচেত কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট। হয় জাহেলিয়াতের সাথে, নয় ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট।

গোটা কোরআন জুড়ে এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা একমাত্র স্রষ্টা। তিনি বিশ্বজগত ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুকে তিনি মানুষের করতলগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা একক স্রষ্টা। সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই। অল্প কিংবা বেশী কোনো কিছুর ব্যাপারেই নয়। আল্লাহ তায়ালা এককভাবেই সব কিছুর মালিক। কেননা তিনি সৃষ্টিকর্তা, আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সব কিছুর তিনিই একচ্ছত্র মালিক। কেউ তার সাথে ছোট বা বড় কোনো কিছুতেই মালিকানায় শরীক নেই।

আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র রেযেক তথা জীবিকাদাতা। সুতরাং আর কেউ নিজের বা অন্যের জীবিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম নয়। ছোট বা বড় কারোই জীবিকা নয়।

মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহ তায়ালাই একচ্ছত্র ক্ষমতা ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী। এর কারণ এই যে, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও জীবিকাদাতা এবং তিনিই সেই শক্তির একচ্ছত্র অধিপতি, যে শক্তি ছাড়া সৃষ্টি করা, জীবিকা দান করা এবং কারো ক্ষতি বা উপকার করা যায় না। মহাবিশ্বে তিনিই একক শাসন ক্ষমতার অধিকারী।

আল্লাহর এই সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য সহকারে তাকে নিজের একমাত্র ইলাহ মেনে নেয়ার নামই ঈমান। তিনিই একমাত্র ইলাহ, একমাত্র মালিক, একমাত্র শাসক এবং তার কোনো অংশীদার নেই– এ কথা মেনে নেয়ার নামই ঈমান। আর এই সব গুণ বৈশিষ্টের দাবী অনুসারে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর হুকুমের আনুগত্য করার নাম হলো ইসলাম। আল্লাহকে সমগ্র বিশ্বের এবং বিশ্বের অংশ হিসাবে মানব জাতির একমাত্র ইলাহ, একমাত্র রব, একমাত্র অভিভাবক, একমাত্র শাসক ও একমাত্র আইনদাতা হিসাবে স্বীকার করাই ইসলাম। কাজেই আল্লাহর আইন ও বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থই হলো আল্লাহকে ইলাহ, রব, অভিভাবক ও শাসক হিসেবে মেনে নেয়া। আর আল্লাহর আইন, বিধান ও শরীয়তের কাছে আত্মসমর্পণ না করা এবং তাঁর আইন ও বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য কারো আইন ও বিধানকে জীবনের যে কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষেত্রের জন্যে বিধান হিসাবে গ্রহণের অর্থ আল্লাহকে ইলাহ, রব, শাসক ও অভিভাবক হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা, অস্বীকার করা ও অমান্য করা। এই আত্মসমর্পণ বা আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি কথায় হোক, কাজে হোক দুটোই সমান। কাজেই এ বিষয়টি সরাসরি ঈমান বা কুফরের সাথে এবং ইসলাম অথবা জাহেলিয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ও শাসন করে না, তারা কাফের, ... তারা যালেম .... তারা ফাসেক।

আল্লাহর আইনের শ্রেষ্ঠত্ব

আর দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো, আল্লাহর আইন যে কোনো মানব রচিত আইনের চেয়ে সর্বতোভাবে, অকাট্যভাবে ও নিশ্চিতভাবে উত্তম। আলোচ্য আয়াতগুলোর শেষাংশে আল্লাহ সেই কথাটাই বলেছেন এভাবে,

'বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম শাসক আর কে আছে?'

মানব জাতির জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় মানব রচিত যে কোনো আইন ও বিধানের চেয়ে যে আল্লাহর আইন ও বিধানই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও উত্তম, তা সর্বতোভাবে, শর্তহীনভাবে ও নিসংকোচে মেনে নেয়া বা না নেয়ার ওপরও ঈমান ও কুফর নির্ভরশীল। মেনে নিলে মোমেন, না মেনে নিলে নির্ঘাত কাফের। কোনো মানুষের এই দাবী করার কোনোই অধিকার নেই যে, মানব রচিত কোনো আইন বা বিধান আল্লাহর আইন বা বিধানের চেয়ে উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য, অথবা তার সমতুল্য, চাই তা মানব জাতির জীবনের যে কোনো অংশের বা অবস্থার জন্যেই হোক বা কেন। এ ধরনের দাবী করার পর নিজেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও মুসলমান বলে পরিচয় দেয়ার কোনোই অবকাশ থাকে না। এ ধরনের দাবী করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে নিজেকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর চেয়েও বেশী সূক্ষ্মদর্শী ও প্রাজ্ঞ বলে মনে করে। এ ধরনের দাবীর অর্থ এও হতে পারে যে, সে মনে করে, মানুষের কখন কী অবস্থা হবে এবং কখন কী প্রয়োজন দেখা দেবে, তা না জেনেই আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে আইন রচনা করেছেন,

অথবা জানতেন কিন্তু সে অনুসারে আইন রচনা না করে একটা শূন্যতা রেখে দিয়েছেন, যা মানব রচিত আইন দিয়ে পূরণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অথবা স্বেচ্ছাচারীভাবে চলার সুযোগ এনে দিয়েছে। আল্লাহর সম্পর্কে এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ ধ্যান ধারণা পোষণ করার পর মুখ দিয়ে যতোই ঈমান ও ইসলামের দাবী করা হোক না কেন, সে দাবী ধোপে টেকে না।

আল্লাহর বিধান যে মানব রচিত বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, তার প্রমাণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান থাকলেও মানুষের পক্ষে তা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করা কঠিন। কেননা মানব জাতির কোনো নির্দিষ্ট প্রজন্মের মধ্যে আল্লাহর বিধানের যৌক্তিকতা ও নিগূঢ়তত্ত্ব পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পায় না। যেটুকু এ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে, তা ফী যিলালিল কোরআনের পাতায় সবিস্তারে বর্ণনা করা কঠিন। তবে এখানে এর অংশ বিশেষ আলোচনা করাই যথেষ্ট মনে করছি,

আল্লাহর শরীয়ত মানব জীবনের জন্যে একটি পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান। এ বিধান মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে তার যাবতীয় আকৃতি ও অবস্থা সহকারে সংগঠিত করে, উন্নত করে ও দিক-নির্দেশনা দেয়।

এই বিধান মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে, তার প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে, যে জগতে সে বাস করে তার প্রকৃতি সম্পর্কে এবং যে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সে ও গোটা বিশ্ব জগত নিয়ন্ত্রিত সে সম্পর্কে পূর্ণাংগ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত। এ জন্যে এ বিধানে মানব জীবনের কোনো একটি দিকের ওপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দেয়া হয় না। কোনো দিক উপেক্ষিত হয় না, এর ভিত্তিতে পরিচালিত মানুষের এক ধরনের তৎপরতার সাথে আর এক ধরনের তৎপরতার কোনো ধ্বংসাত্মক সংঘাত ঘটে না, সংঘাত ঘটে না প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে মানুষের কর্মকান্ডেরও বরঞ্চ পরিপূর্ণ ভারসাম্য, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ মানব রচিত কোনো বিধানে এমন সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় না। কারণ মানব রচিত বিধান শুধু বাহ্যিক অবস্থাটাই জানে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ্য বিষয়ই অবগত থাকে। মানব রচিত বিধান মানুষের অজ্ঞতাজনিত বিপদ থেকে কখনো নিরাপদ থাকে না। তার বিভিন্ন তৎপরতার মধ্যে যে কোনো সময় ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে এবং এই সংঘর্ষ থেকে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

ইসলাম পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার ভিত্তিক জীবন বিধান। কারণ প্রথমত পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার কিসের দ্বারা ও কিভাবে হয়, সে কথা একমাত্র আল্লাহই নির্ভুলভাবে জানেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যেহেতু সকল সৃষ্টির প্রতিপালক, মনিব ও প্রভু, তাই সকলের সাথে ন্যায় বিচার করা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। একমাত্র তাঁর রচিত বিধানই প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী, আবেগ ঝোঁক ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম। এ বিধান অজ্ঞতা, ভুল ত্রুটি, বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, ঝোঁক ভাবাবেগ ও দুর্বলতায় জর্জরিত মানুষ যে আইন ও বিধান রচনা করে, তাতে অজ্ঞতা ও অক্ষমতাজনিত ত্রুটি তো থাকবেই, অধিকন্তু প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী, আবেগ, ঝোঁক ও দুর্বলতায় তা পরিপূর্ণ থাকবে, চাই আইন রচনাকারী কোনো ব্যক্তি, শ্রেণী বা জাতি বা প্রজন্ম যেই হোক না কেন। কেননা এই অবস্থাগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটি অবস্থারই স্বতন্ত্র ঝোঁক, আবেগ ও কামনা বাসনা থাকা ছাড়াও স্বতন্ত্র ধরনের অজ্ঞতা ও কোনো বিষয়ের সকল দিক ও বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অক্ষমতা থাকা অবধারিত। এমনকি একই প্রজন্মের একটি মাত্র অবস্থারও সকল দিক সুষ্ঠুভাবে বিবেচনা করতে মানুষ অক্ষম।

ইসলাম গোটা মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যশীল কেননা ইসলামের যিনি মালিক, তিনি মহাবিশ্বেরও মালিক। তিনিই মহাবিশ্বের ও মানুষের স্রষ্টা। সুতরাং তিনি যখন মানুষের জন্যে আইন রচনা করেন, তখন তাকে মহাবিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য

অংগ বিবেচনা করেই তা করেন। তবে এই অংগটির বৈশিষ্ট্য এই যে, তার স্রষ্টার নির্দেশে অন্য সকল সৃষ্টি তাঁর অনুগত এবং তাদের ওপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এজন্যে শর্ত রয়েছে যে, তাকে আল্লাহর বিধানের অনুসারী হতে হবে এবং জগতের অন্যান্য সৃষ্টি ও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে তাকে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এখান থেকেই সমন্বয় গড়ে ওঠে মানুষের তৎপরতা ও যে বিশ্বে সে বাস করে তার তৎপরতার মধ্যে। আর এ কারণে আল্লাহর যে বিধান বা শরীয়ত তার জীবনকে পরিচালিত করে, তা প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক গুণের অধিকারী হয়। আল্লাহর এ বিধান শুধু তার সত্ত্বার সাথে নয় এবং শুধু তার স্বগোত্রীয় মানুষদের সাথেও নয়, বরং এই বিরাট ও বিশাল জগতের সকল প্রাণী ও পদার্থের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলে। মানুষকে এ জগতেই বাস করতে হয়, এখান থেকে সে বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই তাকেও এই বিশ্বের সাথে এক সুষ্ঠু ও নির্ভুল নীতি মোতাবেক সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়।

ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান, যা গ্রহণ করলে ও মেনে চললে মানুষ মানুষের গোলামী ও দাসত্ব থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করে। অথচ ইসলাম ছাড়া অন্য সকল বিধানে মানুষ মানুষের দাসত্ব করে ও গোলামী করে। একমাত্র ইসলামেই মানুষ দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বান্দা ও গোলাম হয়।

আগেই বলেছি যে, ইলাহ হওয়ার জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট হলো সার্বভৌমত্ব তথা শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। যে ব্যক্তি কোনো একটি মানব গোষ্ঠীর জন্যে আইন রচনা করে, সে কার্যত তাদের ইলাহের পদে অধিষ্ঠিত হয় এবং ইলাহসুলভ গুণ বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করে। ফলে তারা আল্লাহর নয়, ওই ব্যক্তির বান্দা বা গোলামে পরিণত হয়। তারা আল্লাহর নয়, এ বান্দার আদেশের অনুগত হয়।

ইসলাম যখন আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে একমাত্র বৈধ আইন হিসাবে চালু করে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে মানুষকে দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে নিয়োগ করে এবং মানুষের স্বাধীনতা ঘোষণা করে, আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে মানুষের জন্ম ঘোষণা করে। কেননা মানুষ যতোক্ষণ তারই মতো আর একজন মানুষের শাসন থেকে মুক্ত না হয়, ততোক্ষণ প্রকৃত পক্ষে তার জন্মই হয় না এবং অস্তিত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিশ্ব মানবের প্রভু আল্লাহর সামনে অন্য সকল মানুষের মতো সম পর্যায়ের একজন দাস হিসাবে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে তার আবির্ভাবই ঘটে না।

জাহেলী যুগ কোনো নির্দিষ্ট যুগের নাম নয়

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আলোচিত এই বিষয়টি ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি হচ্ছে দাসত্ব ও প্রভুত্ব, ন্যায় বিচার ও সততা, স্বাধীনতা ও সমতা, মানুষের মুক্তি ও জন্মলাভ, তথা কুফর ও ঈমান এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মূল কথা।

জাহেলিয়াত প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট যুগের নাম নয়, বরং একটা অবস্থার নাম। কেননা সমাজে বা রাষ্ট্রে এর বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেলেই তাকে জাহেলিয়াত বলা যাবে। এর মূল উপাদানটা হলো জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর শরীয়তকে উপেক্ষা করে মানুষের আইন, মানুষের খেয়ালখুশী এবং মানুষের শাসনের আনুগত্য করা। চাই তা কোনো ব্যক্তির, শ্রেণীর, জাতির বা কোনো নির্দিষ্ট সময়কার গোটা মানব প্রজন্মেরই হোক না কেন। আল্লাহর আইন ও শরীয়তের বাইরে যা কিছু আছে, তা মানুষের খেয়ালখুশী ছাড়া আর কিছু নয়।

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো দলের জন্যে আইন রচনা করে, তাহলে তা হয় জাহেলিয়াত। কেনো এখানে মানুষের মতামত ও খেয়ালখুশী তার আইনে পরিণত হয়েছে। একটু ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া এই দুটিতে কোনোই পার্থক্য নেই। অর্থাৎ জাহেলিয়াতকেই আইন নাম দেয়া হয়েছে।

একটি শ্রেণী যদি অপর একটি শ্রেণীর জন্যে আইন প্রণয়ন করে, তবে সেটাও হবে জাহেলিয়াত। কেননা এখানে ওই শ্রেণীটির কল্যাণ এবং সংসদের সংখ্যাগুরু সদস্যদের অভিমতই আইনে পরিণত হয়েছে। কাজেই আইন ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান ছাড়া এখানে আর কোনো ব্যবধান নেই।

একটি জাতির সকল শ্রেণীর ও সকল ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা যদি নিজেদের জন্যে আইন তৈরী করে, তবে তাও জাহেলিয়াতে পরিগণিত হবে। কেননা মানুষের খেয়ালখুশী, অজ্ঞতা ও জাতির মতামতই এখানে আইনে পরিণত হয়েছে। কাজেই এখানে আইন ও জাহেলিয়াতে ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই।

বিশ্বের কতিপয় জাতি মিলিত হয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্যে আইন রচনা করলে তাও হবে জাহেলিয়াত। কেননা তাদের জাতিগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মতামতই আইনে পরিণত হয়েছে। কাজেই এখানেও আইন ও জাহেলিয়াতে ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই।

আর যখন বিশ্বের সকল ব্যক্তি, সকল সংস্থা, সকল সমাজ, সকল জাতি ও প্রজন্মের স্রষ্টা সকলের জন্যে আইন প্রণয়ন করেন, তখন সেটাই হয় আল্লাহর আইন বা শরীয়ত, যাতে কোনো একজনের স্বার্থ পদদলিত করে অপর জনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। কোনো ব্যক্তি, দল, রাষ্ট্র ও প্রজন্ম কারো প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। কেননা আল্লাহ সকলের প্রভু ও মনিব এবং তাঁর চোখে সবাই সমান। আর আল্লাহ সকলের প্রকৃত অবস্থা ও ভালো মন্দ জানেন। তাই তাদের দাবী ও প্রয়োজনকে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি বা শৈথিল্য প্রদর্শন না করে যথাযথভাবে পূরণ করতে তাঁর কোনো অসুবিধা নেই।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যখন মানুষের জন্যে আইন রচনা করেন, তখন সবাই আইন প্রণেতার গোলাম ও দাস হয়ে যায়, চাই সে কোনো ব্যক্তি, জাতি বা জাতি সমষ্টি হোক না কেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যখন মানুষের জন্যে আইন প্রণয়ন করেন, তখন সকল মানুষ একই রকম স্বাধীন মানুষে পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ কারো দাসত্ব করে না বা কেউ কারো সামনে মাথা নোয়ায় না।

এ জন্যে এ বিষয়টি, তথা গোলামী ও প্রভুত্বের এ তত্ত্বটি, মানব জাতির জীবনে ও গোটা বিশ্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'সত্য যদি তাদের খেয়ালখুশীর অধীন হতো, তাহলে আকাশ, পৃথিবী ও তার অভ্যন্তরের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতো।' কাজেই আল্লাহর নাযিল করা বিধান ছাড়া অন্য কিছুর অনুকরণে বিচার ফয়সালা ও শাসন করার অর্থই হলো অসততা, অরাজকতা এবং সর্বশেষে ঈমান থেকে বহিষ্কৃতি। এটাই কোরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য।

মুসলমানদের জীবনে ইহুদী স্বভাবের অনুপ্রবেশ

'হে রসূল। যারা কুফুরের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, অর্থাৎ যারা কেবল মুখ দিয়ে বলে যে, ঈমান এনেছি, ...(আয়াত নং ৪১, ৪২ ও ৪৩)

এ তিনটি আয়াত হিজরতের পরের প্রথম কয়েক বছরে নাযিল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তখনও ইহুদীরা মদীনাতেই বাস করছিলো। ওহুদ যুদ্ধের আগে যখন বনু কায়নুকা এবং ওহুদ যুদ্ধের পর যখন বনু নযীর মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়, তার আগে না হলেও খন্দক যুদ্ধের আগে বনু কোরায়যা বহিষ্কৃত হবার পূর্বে এ আয়াত ক'টি অবশ্যই নাযিল হয়েছিলো। এ সময় ইহুদীরা তাদের এই সব চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলো। আর গর্ত যেমন সাপের আশ্রয়স্থল, তেমনি ইহুদীরা

ছিলো মোনাফেকদের আশ্রয়স্থল। উভয় গোষ্ঠী কুফুরের প্রতিষ্ঠার জন্যে ত্বরিতগতিতে চেষ্টা চালাচ্ছিলো, যদিও মোনাফেকরা মুখে ঈমানের দাবী করতো। এই তৎপরতা রসূল (স.)-কে কষ্ট দিতো ও উদ্বিগ্ন করে তুলতো।

আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে সমবেদনা জানাচ্ছেন ও প্রবোধ দিচ্ছেন, ইহুদী ও মোনাফেকদের তৎপরতাকে তিনি যাতে হালকাভাবে গ্রহণ করেন, সেজন্যে উপদেশ দিচ্ছেন, উভয় গোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচন করে দিচ্ছেন এবং ইহুদীরা পূর্ব থেকে পাতানো ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির আওতায় তাঁর কাছে কোনো বিবাদের মীমাংসার জন্যে এলে তাঁর করণীয় কী. সে সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত কয়টি ইহুদীদের এমন একটি দল সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো, যারা চুরি অথবা ব্যাভিচার করেছিলো। প্রকৃতপক্ষে অপরাধটি কী ছিলো, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তাওরাতে সে অপরাধের জন্যে শাস্তি নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু এই দলটি তাওরাতের ওই শাস্তি পাল্টে একটি বিকল্প শাস্তির প্রচলন করেছিলো। কেননা প্রথম দিকে তারা অভিজাত লোকদেরকে এই শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এই ব্যাপারে আরো শিথিল হয়ে যায় এবং সবার ক্ষেত্রেই বিকল্প শাস্তি চালু করে। (আধুনিক যুগের নামধারী মুসলমানরা যেমন বিকল্প শাস্তি চালু করে নিয়েছে।) অপরাধ সংঘটনের পর তারা দুরভিসন্ধিমূলভাবে রসূল (স.)-এর কাছে এসে তাঁর ফতোয়া বা মত চাইবার সিদ্ধান্ত নিলো। তারা ভাবলো, রসূল (স.) যদি হালকা ধরনের অন্য কোনো শাস্তির রায় করেন, তাহলে তারা মেনে নেবে। আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করার সময় এটিকে তারা ছুতা হিসাবে তুলে ধরতে পারবে। কেননা একজন রসূলের ফতোয়া অনুযায়ী তারা কাজ করেছে। আর যদি তিনি তাওরাতে যা আছে, হুবহু সেই শাস্তির পক্ষেই ফতোয়া বা রায় দেন, তাহলে তারা তা মানবে না। পরিকল্পনা মোতাবেক তারা একজনকে রসূল (স.)-এর কাছে ফতোয়া চাইতে পাঠালো। আয়াতে তাদের এই দুরভিসন্ধিকে এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে,

'যদি এই মত দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণ করো, নচেত এড়িয়ে চলো।

আল্লাহর বিধানকে নিয়ে ও আল্লাহর রসূলের সাথে তাদের ছিনিমিনি খেলা, ধৃষ্টতা ও ছলচাতুরি যখন এই পর্যায়ে পৌছলো, তখনই এ আয়াত ক'টি নাযিল হলো। প্রত্যেক আসমানী কেতাবের ধারক-বাহকেরাই কেতাব নাযিল হবার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে এ রকমই করতো। তাদের হৃদয় শক্ত হয়ে যেতো, বিশ্বাসের উষ্ণতা কমে যেতো এবং আল্লাহর আইনের কড়াকড়ি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে নানা রকমের 'ফতোয়া' অর্থাৎ ছলছুতো খুঁজতো, যাতে আল্লাহর আইনকে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। আজকের নামধারী মুসলমানদের মধ্যেও কি এ ধরনের লোক নেই, 'যারা মুখে বলে আমরা মোমেন, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি?' ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, বরং ছলে বলে কৌশলে তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই কি তারা ফতোয়াবাজিতে লিপ্ত হচ্ছে না? মাঝে মাঝে তারা যে ধর্মের কথা পাড়েন, তা কি শুধু তাদের মনগড়া ধ্যান ধারণা ও প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর পক্ষে ইসলামের সমর্থন আদায় করার জন্যে নয়? কিন্তু ইসলাম যদি তাদেরকে প্রকৃত সত্য বিধান শুনিয়ে দেয়, তাহলে আর তা দিয়ে তাদের কোনো প্রয়োজন থাকে না। এক্ষেত্রে তারা সেকালের ইহুদীদের মতোই বলে যে, 'যেটা স্থির করা হয়েছে, তার পক্ষে ফতোয়া এলে মেনে নাও, নচেত প্রত্যাখ্যান করো।' অবস্থাটা হুবহু একই রকম। সম্ভবত এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলের ঘটনাবলী এতো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যাতে মুসলমানদের পরবর্তী বংশধর তা থেকে সাবধান হয় এবং বিপথগামিতা থেকে রক্ষা পায়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে কুফুরের দিকে দ্রুত ধাবমান এই সব কুচক্রী সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, ওদের নিয়ে তুমি চিন্তিত হয়ো না। ওরা তো বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। তোমার এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই এবং তোমার কোনো দায়দায়িত্বও নেই। তারা নিজেরাই যে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হবার জন্যে সচেষ্ট, তা থেকে তুমি তাদেরকে ফেরাতে পারবে না। তাই বলছেন,

'আল্লাহ তায়ালা যাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিতে চান, তাকে তুমি কোনো সাহায্যই করতে পারবে না।'

তাদের অন্তরাত্মা অপবিত্র ও নোংরা হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পবিত্র করতে চান। কেননা তারা অপবিত্রই থাকতে বদ্ধপরিকর।

'তাদেরকে পবিত্র করতে আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছুক নন।'

অতপর তাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি দেবেন।

'তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর তাদের জন্যে আখেরাতে রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।' কাজেই তোমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। তাদের কুফুরীতে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আর তাদের সম্পর্কে ভেবো না। কেননা তাদের যা হবার, তা হবেই। সেটা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

অতপর তারা বিচার বা মতামত চাইতে এলে তাঁর করণীয় কী হবে, তা বলার আগে তাদের বর্তমান অবস্থা ও তাদের স্বভাব চরিত্রের চরম বিকৃতির উল্লেখ করছেন,

'তারা মিথ্যা শ্রবণে ও হারামখুরীতে অতিশয় পটু।........(আয়াত ৪২)

তারা মিথ্যা শ্রবণে অতিশয় পটু- এই কথাটার এখানে পুনরাবৃত্তি করে আভাস দেয়া হয়েছে যে, এটা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা শোনার জন্যে তাদের মন ব্যাকুল থাকে, আর সত্য কথা শুনলে বিরক্ত হয়। এটাই বিকারগ্রস্ত মনের স্বভাব ও অভ্যাস। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মতো বিকারগ্রস্ত সমাজেও মিথ্যাচার খুবই জনপ্রিয়, আর সত্য ও হক কথা এই সমাজে নিতান্তই অরুচিকর। বনী ইসরাইলের অভিশপ্ত যুগে হক ছিলো সবচেয়ে অচল পণ্য, আর বাতিল ছিলো সবচেয়ে চালু পণ্য।

'সুহ্ত' অর্থ যে কোনো হারাম সম্পদ। সুদ, ঘুষ, কথা বিক্রি ও ফতোয়া বিক্রির সম্পদ যা সর্বকালে সকল খোদাদ্রোহী সমাজে দেদার উপভোগ করা হয়- সম্পূর্ণ হারাম। আরবীতে হারাম উপার্জনকে 'সুহত' বলা হয় এ জন্যে যে, এতে কোনো বরকত থাকে না। বিকারগ্রস্ত ও আল্লাহর আইন লংঘনকারী সমাজগুলোর মতো বরকতহীন সমাজ যে আর হতে পারে না, তা তো আমরা স্বচোখেই দেখতে পাচ্ছি।

ইহুদীরা রসূল (স.)-এর কাছে তাঁর ফয়সালা চাইতে এলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে উপেক্ষা করতে পারেন। ওরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর ইচ্ছা করলে তাদের বিবাদের নিষ্পত্তিও করে দিতে পারেন। যদি নিষ্পত্তি করেন, তবে তা যেন ইনসাফের সাথে করেন, তাদের ইচ্ছা ও খেয়ালখুশী দ্বারা যেন প্রভাবিত না হন এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কুফরের প্রতি তাদের দ্রুত ধাবিত হওয়া দেখেও যেন প্রভাবিত না হন।

'বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা ইনসাফকারাদেরকে ভালোবাসেন।'

রসূল (স.) এবং যে কোনো মুসলিম শাসক ও মুসলিম বিচারক শুধু আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক রাখেন এবং আল্লাহর জন্যেই তারা ন্যায় বিচার করেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা ন্যায়

বিচারকদেরকে ভালোবাসেন। যখন সাধারণ মানুষ যুলুম, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিকৃতিতে লিপ্ত হয়, তখন তাদের পক্ষ থেকে যতো অপরাধই সংঘটিত হোক, তা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়াই সুবিচার। কেননা সুবিচার মানুষের জন্যে নয়, আল্লাহর জন্যে করা হয়। ইসলামের আইনে ও বিচারে সর্বকালে ও সকল স্থানে এটাই একমাত্র নিশ্চিত রক্ষাকবচ।

রসূল (স.)-এর সাথে ইহুদীদের ধোকাবাজী

উল্লেখিত ইহুদী গোষ্ঠীর ব্যাপারে রসূল (স.)-কে এই স্বাধীনতা প্রদান থেকে বুঝা যায় যে, এ নির্দেশ হিজরতের পরে প্রাথমিক যুগেই নাযিল হয়েছিলো। কেননা এর পর ইসলামী শরীয়তের বিধি অনুসারে বিচার ফয়সালা করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। দারুল ইসলামে তথা ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন ও শরীয়ত ছাড়া আর কোনো আইন বাস্তবায়িত হতে পারে না। দারুল ইসলামের অধিবাসীরা সবাই ইসলামী শরীয়তের বিচার ফয়সালা মানতে বাধ্য। অবশ্য দারুল ইসলামের মুসলিম সমাজে বসবাসকারী আহলে কেতাবের ব্যাপারে ইসলামের বিশেষ ও স্বতন্ত্র নীতি চালু থাকবে। তাদের ধর্মীয় বিধানে যে সব আইন কানুন রয়েছে, সেগুলো এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ শাসন ব্যবস্থা মেনে চলতে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে। এ ছাড়া আর কিছু তাদেরকে মানতে বাধ্য করা যাবে না। তাদের আইনে যা কিছু বৈধ, তা তাদের জন্যে বৈধই থাকবে। যেমন তারা শুকর পালন করতে ও খেতে এবং মদ রাখতে ও খেতে পারবে। কিন্তু মুসলমানদের কাছে বিক্রি করতে পারবে না। তবে সুদের লেনদেন করা তাদের ওপর নিষিদ্ধ থাকবে। কেননা ওটা তাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ। আর চুরি ও ব্যাভিচারের শাস্তি তাদের ওপর কার্যকর করা হবে। কেননা তাদের ধর্মেও এই সব শাস্তিই নির্ধারিত রয়েছে। অনুরূপভাবে, সাধারণ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্যে তাদেরকে সেই শাস্তিই দেয়া হবে, যা মুসলমানদেরকে দেয়া হয়। কেননা এটা ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম অমুসলিম সকল অধিবাসীর নিরাপত্তার জন্যেই জরুরী। তাই এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কাউকেই কোনো ছাড় দেয়া যাবে না।

যতোদিন পর্যন্ত রসূল (স.)-কে তাদের বিবাদ মিটানো বা না মিটানোর ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিলো, ততদিন আহলে কেতাব তাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও বিবাদ বিসম্বাদ নিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে আসতো। এর একটি উদাহরণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে,

'একবার ইহুদীরা রসূল (স.)-এর কাছে এসে জানালো যে, তাদের মধ্য হতে জনৈক পুরুষ ও জনৈকা স্ত্রী ব্যাভিচার করেছে। রসূল (স.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তাওরাতে রজম (পাথর মেরে হত্যার শাস্তি) সম্পর্কে কী বিধান পাও? তারা বললো, আমরা তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক বেত্রাঘাত করে থাকি। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছো। তাওরাতে রজমের বিধান রয়েছে। তখন তারা তাওরাত নিয়ে এলো এবং তা খুললো। জনৈক ইহুদী তাওরাতের রজম সংক্রান্ত আয়াতের ওপর হাত রেখে তার আগের ও পরের অংশ পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে হাত উঠালে দেখা গেলো সেখানে রজম সংক্রান্ত আয়াত রয়েছে। তখন তারা বললো, হে মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে সালামের কথা সত্য। এখানে রজমের বিধান রয়েছে। তখন রসূল (স.) রজমের আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। সে সময় আমি দেখেছিলাম, পুরুষটি মহিলার ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে পাথর থেকে রক্ষা করছে। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ আর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এটি নিম্নরূপ:

'দুটি ইহুদী গোত্র সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। এই দুটি গোত্রের মধ্যে একটি অপরটিকে জাহেলী যুগে দুর্বল করে ফেলেছিলো, তারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এই মর্মে আপোষ রফা করে যে, তাদের মধ্যকার সবল গোত্রটি যদি দুর্বল গোত্রটির কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার দিয়াত (রক্তপণ) হবে ৫০ ওসক। আর দুর্বল গোত্রটি যদি সবল গোত্রের কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার দিয়াত হবে ১০০ ওসক। এই চুক্তির ভিত্তিতে উভয় গোত্রের সম্পর্ক রসূল (স.)-এর মদীনায় আগমন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর একদিন দুর্বল গোত্র সবল গোত্রের একজনকে হত্যা করে বসলো। যথারীতি সবল গোত্র দুর্বল গোত্রের কাছে ১০০ ওসক দিয়াত চেয়ে পাঠালো। দুর্বল গোত্রটি জবাব দিলো, একই ধর্মাবলম্বী, একই শহরের অধিবাসী ও একই বংশোদ্ভূত দুটি গোত্রের মধ্যে কি এমন বৈষম্য থাকতে পারে যে, একটি গোত্রের দিয়াত অপর গোত্রের অর্ধেক হবে? আমরা এ চুক্তি সম্পাদন করেছিলাম শুধু তোমাদের ভয়ে। অথচ এটা অন্যায় ও বৈষম্যমূলক চুক্তি। এখন যখন মোহাম্মদ (স.) এখানে এসে গেছেন, তখন আর এভাবে দিয়াত দেবো না। এ জবাবের ফলে দুই গোত্রে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে তারা রসূল (স.)-কে সালিশ মানলো। অতপর সবল গোত্রের লোকেরা পরস্পরকে বলতে লাগলো, আল্লাহর কসম, মোহাম্মদ তোমাদেরকে ওদের কাছ থেকে ওদের দ্বিগুণ দিয়াত আদায় করে দেবে না। ওরা তো সত্যই বলেছে যে, ওরা নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করেই কেবলমাত্র দুর্বল বলে এই চুক্তিতে রাযী হয়েছে। মোহাম্মদের কাছে এমন কাউকে গোপনে পাঠাও, যে তোমাদেরকে তাঁর অভিমত জানাতে পারবে। যদি মোহাম্মদ তোমাদের ইচ্ছা মোতাবেক রায় দেন, তাহলে তাকে সালিশ মানবে, নচেত মানবে না। অতপর তারা রসূল (স.)-এর কাছে কয়েকজন মোনাফেককে পাঠালো, যাতে তারা রসূল (স.)-এর মনোভাব জানাতে পারে। তারা যখন রসূল (স.)-এর কাছে এলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় বিষয় ও তাদের ইচ্ছ তাঁর রসূলকে জানিয়ে দিলেন। এই উপলক্ষেই ৪১ থেকে ৪৬ নং আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়। এ আয়াত ক'টি তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে এবং এতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। (আবু দাউদ) ইবনে জারীরের উদ্ধৃত অপর একটি বর্ণনায় সবল গোত্রকে বনু নাযীর এবং দুর্বল গোত্রকে বনু কোরায়যা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতগুলো ইহুদীদের বহিষ্কার ও শাস্তি প্রদানের আগে নাযিল হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে প্রশ্নের আকারে মন্তব্য করা হয়েছে। এ মন্তব্য শুধু এই ঘটনার ক্ষেত্রে নয়, বরং উভয় ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বস্তুত এ আচরণ তাদের স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। মন্তব্যটি এই,

'ওরা কিভাবে তোমাকে সালিশ মানবে। অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যাতে স্বয়ং আল্লাহর ফায়সালা রয়েছে, অতপর তারা তা পেছনে ফেলে চলে যায়?'

অর্থাৎ এটা অত্যন্ত গুরুতর অশোভনীয় ব্যাপার হবে যে, তারা রসূল (স.)-কে সালিস মানবে, অতপর তিনি আল্লাহর শরীয়ত ও আল্লাহর ফয়সালা অনুসারে সিদ্ধান্ত দেবেন, উপরন্তু তাদের কাছে আল্লাহর আইন ও ফয়সালা সম্বলিত তাওরাত রয়েছে, যার সমর্থক হিসাবে কোরআন এসেছে, এভাবে রসূলের ফয়সালা তাওরাত ও কোরআনের ফয়সালার অনুরূপ হবে, আর এতো সব কিছুর পর তারা সেই ফয়সালা অমান্য করবে। এই অমান্য করাটা প্রথমে মেনে নেয়ার পরে হোক অথবা প্রথম থেকেই অসম্মতি প্রকাশের মাধ্যমে হোক দুটিই সমান।

ব্যাপারটাকে শুধু অশোভন বলেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি, বরং আয়াতের শেষাংশে এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে,

'তারা মোমেন নয়।'

কেননা ঈমানও থাকবে, আবার আল্লাহর শরীয়তকেও অমান্য করা হবে- এ দুটো একত্রে সম্ভব নয়। যারা নিজেদেরকে বা অন্য কাউকে 'মোমেন' বলে দাবী করবে, অতপর তারা নিজেদের জীবনে শরীয়তের বিধানকে মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না, তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা। আল্লাহর এই অকাট্য উক্তি 'তারা মোমেন নয়', এর সাথে তাদের ওই দাবী সাংঘর্ষিক। এখানে শুধু শাসকদের পক্ষ থেকে শরীয়ত অমান্য করার কথা বলা হচ্ছে না, বরং শাসিতদের পক্ষ থেকে আল্লাহর ফয়সালা অমান্য করার কথাও বলা হচ্ছে, যা তাদেরকে ঈমানের গন্ডির বাইরে নিক্ষেপ করে, চাই মুখ দিয়ে তারা যতোই মোমেন বলে দাবী করুক।

এখানকার এই ছোট বাক্যটির সাথে সূরা নিসার অপর একটি আয়াতের গভীর মিল রয়েছে। সে আয়াতটি হলো,

'তোমার প্রভুর শপথ! তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তাদের বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে তোমাকে তারা সালিস মানবে এবং তোমার ফয়সালা মেনে নিতে তারা তাদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনুভব করবে না, বরঞ্চ তোমার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করবে।'

উভয়টি শাসিতদের সাথে সম্পৃক্ত, শাসকদের সাথে নয়। উভয়টি ঈমানের গন্ডি থেকে মানুষকে বের করে দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ফয়সালায় যে সন্তুষ্ট হয় না এবং ফয়সালা মেনে নেয় না, তার ঈমানকে অস্বীকার করে।

মানবরচিত আইন ও ঈমান এক সাথে চলতে পারে না

আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফয়সালা না মানা স্বয়ং আল্লাহকে ইলাহ, মনিব ও মানব জাতির অভিভাবক হিসাবে অমান্য করার নামান্তর। আর আল্লাহর আইন ও ফয়সালা মেনে নেয়া আল্লাহকে ইলাহ, মনিব ও অভিভাবক হিসাবে মেনে নেয়ার শামিল। আর তাঁকে মানতে অস্বীকার করা অমান্য করারই আলামত।

উপরোক্ত আয়াতে সেই শাসিতদের সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা জানানো হয়েছে, যারা তাদের জীবনে আল্লাহর শরীয়তকে গ্রহণ করে না। এবার সেই শাসকদের সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা জানানো হচ্ছে, যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ও শাসন করে না। এ ফয়সালা আল্লাহর কাছ থেকে সকল নবীর কাছে আগত বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শুরুতেই বলা হয়েছে তাওরাত সম্পর্কে,

'নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাওরাতে রয়েছে আলো ও নির্দেশিকা। .....আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের .... তারা যালেম। (আয়াত ৪৪-৪৫)

আল্লাহর কাছ থেকে যতোবার মানুষের জন্যে জীবন বিধান এসেছে, তা বাস্তবে অনুসৃত হবার জন্যেই এসেছে, মানুষের জীবনকে পরিচালনা করা, সংগঠিত করা ও সংরক্ষণ করার জন্যে এসেছে। কেবল অন্তরে একটি বিশ্বাস হয়ে সুপ্ত থাকা, অথবা কেবল উপাসনালয়ের চৌহদ্দীর মধ্যে নিছক অনুষ্ঠান সর্বস্ব এবাদত হিসাবে থেকে যাওয়ার জন্যে আসেনি। যদিও এই উভয় জিনিস আকীদা ও এবাদাত মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং মানুষের মনমগযের লালন, বিকাশ ও প্রশিক্ষণের জন্যে তা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মানব জীবনকে পরিচালনা, সংরক্ষণ ও সংগঠনের কাজে তা যথেষ্ট নয়, যতোক্ষণ না তার মূলে মানব জীবনে বাস্তবায়িত একটা আইনগত, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তার ভিত্তিতে মানুষকে জবাবদিহী করা না হয় ও শাস্তি না দেয়া হয়।

আর মানব জীবন ততোক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ও সুসমন্বিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতোক্ষণ তা তার আকীদা বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক এবাদত ও আইন কানুনকে এমন একটি মাত্র উৎস থেকে গ্রহণ না করবে, যে উৎস তার গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কাজ ও আচরণ তদারক করে এবং তারই আইন অনুসারে দুনিয়া ও আখেরাতে কর্মফল দেয়।

কিন্তু যখন জীবন বিধান গ্রহণের উৎস একাধিক ও তার বাস্তবায়নকারী শক্তি বিভক্ত হয়, যথা মনমগযে অবস্থিত আকীদা বিশ্বাসে এবং আনুষ্ঠানিক এবাদাত উপাসনায় সকল শক্তি তো আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত থাকলো, কিন্তু আইন কানুনে ও সামাজিক রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থায় আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোনো এক বা একাধিক শক্তির হাতে কর্তৃত্ব নিহিত থাকলো এবং আখেরাতের কর্মফল প্রদানের ক্ষমতা আল্লাহর হাতে থাকলো, কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি বা পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা রইলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে, তাহলে মানব সত্ত্বা দুইটি কর্তৃপক্ষের মধ্যে, দুইটি বিধানের মধ্যে ও দুইটি শক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। এরূপ অবস্থায়ই মানব জীবনে সেই বিপর্যয় ও বিকৃতি নেমে আসে, যার কথা কোরআন বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছে। যেমন, 'আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ যদি থাকতো, তাহলে আকাশ ও পৃথিবী বিপর্যয়ের শিকার হয়ে যেতো।' 'সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর অনুসরণ করতো, তাহলে আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যকার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতো।'....' অতপর আমি তোমাকে একটি শরীয়ত তথা আইন দিয়েছি, কাজেই সেই আইনকে অনুসরণ করো এবং অজ্ঞ লোকদের মনোবাসনার অনুসরণ করো না।'

এ কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যখনই তার দ্বীন এসেছে, তখন তা মানব জীবনের জন্যে অনুসরণীয় একটি বাস্তব ও আইনগত বিধান হিসাবেই এসেছে। এই দ্বীন কোনো নির্দিষ্ট গ্রাম বা শহরের জন্যে আসুক, কোনো নির্দিষ্ট জাতি ও দেশের জন্যে আসুক অথবা সমগ্র মানব জাতির জন্যে ও তার সকল প্রজন্মের জন্যে আসুক, তা বাস্তব জীবনকে পরিচালিত করার জন্যে একটি আইনগত বিধিব্যবস্থা নিয়েই এসেছে। সেই সাথে নিয়ে এসেছে জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলার উপযুক্ত আকীদা বিশ্বাস এবং আল্লাহর সাথে হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টিকারী ও মযবুতকারী আনুষ্ঠানিক এবাদত উপাসনা। আল্লাহর কাছ থেকে যখনই তাঁর দ্বীন নিয়ে কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটতো, তখন এই তিনটি জিনিসই হতো আল্লাহর দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। কেননা আল্লাহর দ্বীন যতোক্ষণ মানুষের বাস্তব জীবনের অনুসরণয়ে ও অনুকরণীয় আইন ও বিধানে পরিণত না হয়, ততোক্ষণ মানব জীবন সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ হয় না।

পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে যখন আল্লাহর দ্বীন একটি গ্রাম বা শহরের জন্যে বা কোনো গোত্রের জন্যে আসতো, তখন তা ওই গ্রাম বা গোত্রের চলমান পরিস্থিতির সাথে হলেও তা জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে বিধান নিয়ে আসতো। এ কথা কোরআনে একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে। এখানেও বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম– এই তিন বৃহৎ ধর্মেই মানব জাতির জন্যে পূর্ণাংগ বিধান দেয়া হয়েছে,

সর্ব প্রথম তাওরাতের কথা বলা হয়েছে,

'নিশ্চয় আমি তাওরাতকে হেদায়াত ও আলোক সহকারে নাযিল করেছি ...

বস্তুত তাওরাত যেভাবে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছিলেন, সেভাবে তা ছিলো আল্লাহর এক পূর্ণাংগ কেতাব। বনী ইসরাইলকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ওই কেতাবখানি এসেছিলো। তাতে আকীদা-বিশ্বাসের পর্যায়ে যেমন তাওহীদের বর্ণনা ছিলো, এবাদতের বিধান ছিলো, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইনও ছিলো।'

'নবীরা ওই কেতাব অনুসারে বিচার ও শাসন করতেন ...

অর্থাৎ আকীদা ও এবাদাতের বিধান দিয়ে হৃদয় ও বিবেককে আলোকিত করা ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়াই শুধু তাওরাত নাযিল করার উদ্দেশ্যে ছিলো না, বরং আল্লাহর বিধান অনুসারে বাস্তব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী আইন ও শরীয়ত প্রদান করে জীবনকে আলোকিত করা, পথ প্রদর্শন করা এবং সংরক্ষণ করাও ছিলো তার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এই কেতাব দ্বারা বিচার ও শাসন করতেন কারা? করতেন সেই সব নবী, যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আত্মসমর্পণ করার পর তাদের আর নিজস্ব কোনো সত্ত্বা থাকতো না, সব কিছুই আল্লাহর হয়ে যেতো। তাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছা, দাবী ও ক্ষমতা থাকতো না– যা কিনা আল্লাহর একক বৈশিষ্ট্য! বস্তুত ইসলামের মূল অর্থই হলো আত্মসমর্পণ করা। তারা কাদেরকে শাসন ও পরিচালনা করতেন? ইহুদীদেরকে। কেননা এটা তাদের জন্যে নির্দিষ্ট আইন এ শরীয়ত ছিলো। এ কেতাব দ্বারা আরো যারা ইহুদীদেরকে শাসন করতেন, তারা হলেন তাদের বিচারকমন্ডলী ও আলেমরা। কেননা তাদেরকে আল্লাহর কেতাবের হেফাযতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। এই কেতাবের সাক্ষী হওয়ার অর্থাৎ তাদের নিজেদের ও জাতির জীবনে তা বাস্তবায়িত করার দায়িত্বও তাদেরকে অর্পণ করা হয়েছিলো।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা অপরিহার্য্য

তাওরাত সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত করার আগে মুসলমানদের দিকে পুনরায় মনোযোগ দিয়ে সাধারণভাবে আল্লাহর কেতাব অনুসারে শাসন ও বিচার ফয়সালা করার নির্দেশ দান, এই কাজ করতে গিয়ে জনগণের পক্ষ থেকে বাধা ও শত্রুতার সম্মুখীন হলে করণীয় কী তা অবহিত করা ও এর বিরোধিতাকারীদের শাস্তি কী, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

‘কাজেই তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করো না। যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন করে না, তারা কাফের।’

এ কথা আল্লাহর জানা ছিলো যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার শাসন করার উদ্যোগ যে যুগে ও যে জাতিতেই গ্রহণ করা হোক, জনগণের একটা অংশ বিরোধিতা করবেই। তাদের মন এ উদ্যোগকে কখনো সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে না। বিশেষত যারা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী, অহংকারী ও আধিপত্যবাদী, তারা তো মানবেই না। কেননা আল্লাহর বিধান অনুসারে শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তা তাদের প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও ক্ষমতা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে এবং যাবতীয় প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে আল্লাহর কাছে। অনুরূপভাবে তাদের কাছ থেকে আল্লাহর অনুমোদিত মানব রচিত বিধান অনুসারে শাসন ও বিচার করা, আইন রচনা ও সার্বভৌমত্বের অধিকার কেড়ে নেবে। আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, যুলুম, শোষণ ও হারামখুরীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থের প্রতিভুরা আল্লাহর বিধান কায়েম করার আহবানের বিরোধিতা করবেই। কারণ আল্লাহর বিধান তাদের যুলুম শোষণমূলক কায়েমী স্বার্থকে কখনো টিকতে দেবে না। পাপাচারী, লম্পট, ভোগবাদী, বিলাসী, দুর্নীতিবাজ ও অবৈধ সম্পদের মালিকরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেই। কেননা আল্লাহর দ্বীন তাদেরকে এ সব নোংরামি থেকে পবিত্র না করে ছাড়বে না এবং এজন্যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেই। অনুরূপভাবে এমন আরো বহু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করবে, যারা পৃথিবীতে ন্যায়, সততা ও সুবিচার কায়েম হোক তা দেখতে চায় না। এ সব বিরোধিতার মোকাবেলা করা এবং এ জন্যে দৈহিক ও আর্থিক কষ্ট, ত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করার জন্যে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার সংগ্রামের সৈনিকদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবেই। আল্লাহ তায়ালা এ সব জানতেন বলেই তাদেরকে বলেছেন,

'সুতরাং জনগণকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো।'

অর্থাৎ আল্লাহর আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার কাজ এই সব লোকের ভয়ে বন্ধ রেখো না। এই মহান কাজে বাধা দানকারী ও বিরোধিতাকারী জনগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী রয়েছে। একটি শ্রেণী রয়েছে তারা মূলতই খোদাদ্রোহী। তারা আল্লাহর আইন মেনে চলতে চায় না এবং আল্লাহকে আইন ও শাসন ক্ষমতাসহ যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র খোদা বা ইলাহ বলে মানতে রাযী নয়। আর এক গোষ্ঠী রয়েছে, যারা জনগণের ওপর যে শোষণ নিপীড়ন চালাতে এবং নিজেদের কায়েমী স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর, তার পথে ইসলামকে অন্তরায় বিবেচনা করে। এ ছাড়া এমন কিছু পথভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী গোষ্ঠী ও শ্রেণীও এর বিরোধিতা করে, যারা আল্লাহর শরীয়তের বিধানকে কষ্টকর ও বিরক্তিকর মনে করে এবং এর বিরুদ্ধে দাংগা হাংগামা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এ সব দল, গোষ্ঠী ও মহলসহ সর্ব শ্রেণীর ইসলাম বিরোধীদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তকে মানব জীবনের নিয়ন্তা ও পরিচালক বানানোর সংগ্রাম বানিয়ে যেতে হবে এবং তাদের ভয়ে এ কাজ বন্ধ রাখা যাবে না। ভয় শুধু আল্লাহকেই করা যায়, আর কাউকে নয়।

আল্লাহ তায়ালা এ কথাও জানতেন যে, আল্লাহর কেতাবকে ও তাঁর বিধানকে বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিদের কেউ কেউ কখনো কখনো দুনিয়ার মোহে আক্রান্ত হয়ে যাবে। ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী, বিত্তশালী ও ভোগবাদী মহলকে ক্রমাগত আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করতে দেখে এক সময় তাদেরকেও দুনিয়ার লালসায় পেয়ে বসবে। পেশাদার ধর্মযাজকদের মধ্যে সর্বত্র ও সর্বকালে এটা ঘটতে দেখা যায়, বিশেষত বনী ইসরাইলের আলেমদের ক্ষেত্রে এটা একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দিয়েছিলো। এ বিষয়টি জানতেন বলেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

'তোমরা আমার আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না।'

বিক্রি করা বলতে এখানে আপোষ করা বুঝানো হয়েছে, যা কোথাও নীরবতা অবলম্বন তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনে বিরত থাকার মাধ্যমে, কোথাও আল্লাহর বিধান ও আইনকে বিকৃত করার মাধ্যমে এবং কোথাও ভ্রান্ত ফতোয়া দানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহর দ্বীনের বিনিময়ে যাই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা স্বল্প, অপ্রতুল ও তুচ্ছ জিনিস, এমন কি তা যদি গোটা দুনিয়ার রাজত্বও হয়। কিছু বেতন ভাতা, পদ পদবী, খেতাব উপাধিও এ ধরনের ক্ষুদ্র প্রাপ্তি তো আরো তুচ্ছ, যার বিনিময়ে আল্লাহর দ্বীনকে বিক্রি করা হয় এবং অবধারিত জাহান্নামকে কিনে নেয়া হয়।

যাকে আমানত সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তার বিশ্বাসঘাতকতার মতো জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা আর হতে পারে না। যাকে রক্ষক ও পাহারাদার নিয়োগ করা হয়, তার ইচ্ছাকৃত শৈথিল্যের মতো ঘৃণ্য শৈথিল্য আর হতে পারে না এবং যাকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তার জালিয়াতি ও শঠতার চেয়ে নিকৃষ্ট শঠতা আর হতে পারে না। যারা 'ধার্মিক' নামে পরিচিত হয়েও আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে শাসক, নিয়ন্তা ও পরিচালক বানানোর কাজ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর কেতাবকে শাব্দিকভাবে বিকৃত করার মাধ্যমে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীকে আল্লাহর কেতাবের বিনিময়ে খুশী করার কষ্ট করে, তারা প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, শঠতা ও শৈথিল্য প্রদর্শনের দায়ে দোষী।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই যাদের কাফের বলেছেন

'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে ফয়সালা ও বিচার শাসন করে না, তারা কাফের।'

এখানে স্থান, কাল, প্রজন্ম ও বংশধর নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষকে দ্ব্যর্থহীন ও অকুণ্ঠভাবে আল্লাহর বিধান অনুসারে ফায়সালা না করলে কাফের ঘোষণা করা হয়েছে।

এর কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। সেই কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, বিচার করে না ও শাসন করে না, সে আল্লাহকে ইলাহ বলে স্বীকারই করে না। কেননা আইন রচনা ও জারী করার সার্বভৌম ও নিরংকুশ ক্ষমতা ইলাহ হওয়ার অনিবার্য দাবী ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদে অন্য কোনো বিধান অনুসারে বা স্বেচ্ছাচারীভাবে বিচার-ফয়সালা ও শাসন করে, সে আল্লাহকে একক খোদা ও ইলাহ তো মানেই না, উপরন্তু সে নিজের জন্যে খোদা ও ইলাহ হওয়ার অধিকার দাবী করে। এই দুটো কাজ যদি কুফরী না হয়, তাহলে কুফরী আর কাকে বলে? মুখ দিয়ে ঈমান ও ইসলামের দাবীর কী স্বার্থকতা থাকে, যদি কাজের দ্বারা কেউ কথার চেয়েও স্পষ্টভাবে কুফরী করে? কাজ তো কথার চেয়েও মনোভাব প্রকাশের ব্যাপারে বেশী শক্তিশালী।

এই সর্বাত্মক, কঠোর ও অনমনীয় ফয়সালার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার অর্থ সত্যের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করা ও তা থেকে পালানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এ ঘোষণার নানা রকমের কৃত্রিম ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করা আল্লাহর কেতাবকে ও আল্লাহর বক্তব্যকে বিকৃত করার চেষ্টার শামিল। অথচ আল্লাহ তায়ালা এই ঘোষণায় যাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাফের আখ্যা দিয়েছেন কোনো রকমের বিতর্ক ও কৃত্রিম ব্যাখ্যা দ্বারা তাদেরকে কাফের আখ্যাপ্রাপ্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে ঐ ধরনের বিতর্ক ও ব্যাখ্যার কোনোই ফায়দা ও সার্থকতা নেই।

ইসলামের কেসাস আইনই হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে এই সর্বব্যাপী মূলনীতি ঘোষণা করার পর কোরআন তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহর শরীয়তের কিছু কিছু বিধি নমুনা স্বরূপ তুলে ধরেছে, যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব বনী ইসরাইলের নবীগণ ও আলেমদের ওপর অর্পিত ছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাওরাতে আমি তাদেরকে এই বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলা প্রাণ, চোখের বদলা চোখ, নাকের বদলা নাক, কানের বদলা কান, দাঁতের বদলা দাঁত এবং সকল ক্ষতের সমান বদলা।.... (আয়াত নং ৪৫)

তাওরাতে বর্ণিত এই বিধান ইসলামী শরীয়তে বহাল রাখা হয়েছে এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অবশ্য তা শুধু ইসলামী রাষ্ট্রেই কার্যকরী হবে– অন্য কোথাও নয়। এর বাস্তব কারণ রয়েছে। কেননা ইসলামী সরকার ইসলামে রাষ্ট্রের সীমার বাইরে তা বাস্তবায়নের সমর্থ নয়। যেখানে সমর্থ হবে সেখানে কার্যকরী করবে। কেননা এই শরীয়তের বিধান সকল মানুষের জন্যে ও সকল যুগের জন্যে প্রযোজ্য। ইসলামের এ আইনে একটি বিধি সংযোজন করা হয়েছে। সেটি এই যে,

'যে ব্যক্তি এই শাস্তি মাফ করে দেবে, তার জন্যে এটা পাপ মোচনের কারণ হবে।' তাওরাতের আইনে বিধিটি ছিলো না। সেখানে শাস্তির কোনো বিকল্প বা ক্ষমার ব্যবস্থা ছিলো না।

ইসলামী শরীয়তের এই কেসাস বিধি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

কেসাস সংক্রান্ত আল্লাহর আইনে সর্ব প্রথম যে জিনিসটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হলো, রক্তপাতে ও শাস্তিতে সমতা। আল্লাহর আইন ছাড়া আর কোনো আইনে মানুষের সমতা স্বীকার

করে প্রাণের বদলা প্রাণ ও অন্যান্য যখমের বদলা অনুরূপ যখম নির্ধারণ করা হয়নি। ইসলামে এই সমতাকে মেনে নেয়া হয়েছে স্থান, কাল, শ্রেণী, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের ক্ষেত্রে। প্রাণ ও অংগ-প্রত্যংগের ক্ষেত্রে ইসলাম যে সমতার বিধান দিয়েছে, তাতে বর্ণ, শ্রেণী, শাসক, শাসিত, সবাইকে সমান গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে একই মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহর আইনের সামনে সবাই সমান।

আল্লাহর আইনে এই যে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটা 'মানুষ'-এর জন্মের পূর্ণাংগ ও সঠিক ঘোষণা। এই আইনে মানুষকে দেয়া হয়েছে সমানাধিকার, যা সে দুইভাবে প্রয়োগ করে প্রথমত একই আইনের কাছে হত্যা, যখম ইত্যাদির বিচার প্রার্থনা ও একই আদালত থেকে বিচার লাভ। দ্বিতীয়ত, একই মান ও একই ভিত্তিতে কেসাস বা দন্ডের নিশ্চয়তা।

এটাই ছিলো সমতার প্রথম ঘোষণা। মানব রচিত বিধান হাজার হাজার বছর ধরে ইসলামী আইনের এই মান থেকে অনেক নীচে ছিলো। আইনগত দিক দিয়ে তা কখনো কখনো এই মানের সমপর্যায়ে উন্নীত হলেও বাস্তবায়নের দিক দিয়ে তা সব সময় এর চেয়ে নিম্নমানের ছিলো।

ইহুদীদের কেতাব তাওরাতে সাম্যের এই মহান নীতি প্রবর্তিত হলেও ইহুদীরা তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই সাম্যের নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা যে বৈষম্য ও বিভেদের প্রচলন ঘটিয়েছে, সেটা শুধু ইহুদী-অইহুদীদের মধ্যে সীমিত থাকেনি, বরং ইহুদীদের নিজেদের মধ্যেও তার প্রসার ঘটেছিলো। অ-ইহুদীদের সম্পর্কে তো তারা বলতো, 'নিরক্ষর (আরব)দের ব্যাপারে, আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' আর তাদের নিজেদের ভেতরেও যে তারা বৈষম্যমূলক ও বিভেদাত্মক আচরণ করতো, সেটা দুর্বল বনু কোরায়যা গোত্রের সাথে শক্তিশালী বনু নাযীর গোত্রের আচরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র রসূল (স.) এসেই তাদেরকে সাম্যের বিধানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। দুর্বল বনু কুরাইযার মস্তককে তিনি সবল বনু নাযীদের সমপর্যায়ে উন্নীত করেন।

মহান সাম্যভিত্তিক এই কেসাস বিধান শুধু যে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছিলো তা নয়, বরং তা অপরাধীকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে কার্যকরভাবে ঠেকাতে সক্ষম হয়েছিলো। এ শাস্তি কাউকে হত্যা বা যখম করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করার ইচ্ছা পোষণকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের অপবাসনা চরিতার্থ করার আগে বারবার চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য করতো। কেননা সে জানতো যে, সে হত্যাকান্ড ঘটালে যতো বড় অভিজাত বা উচ্চ পদ-মর্যাদাসম্পন্ন লোকই সে হোক না কেন, তাকে গ্রেফতার করা হবেই এবং যে ধরনের অপরাধ সে ঘটাবে, ঠিক সেই ধরনের শাস্তিই সে পাবে। সে যদি কারো হাত বা পা কেটে দেয়, তবে তারও হাত বা পা কেটে দেয়া হবে। আর সে যদি কারো চোখ, কান, নাক বা দাঁত নষ্ট করে দেয়, তবে তার দেহের ঠিক সেই অংগকেই নষ্ট করা হবে। সে যদি জানতো যে, অপরাধ করলে তাকে জেলে যেতে হবে, তাহলে এটা হতো না, চাই তার কারাদন্ড যতো দীর্ঘস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন। শরীরের অংগ কর্তনের মতো যন্ত্রণাদায়ক, পংগুকারী ও রূপ বিকৃতকারী শাস্তির সামনে কারাদন্ড কোনো শাস্তিই নয়। চুরির শাস্তি প্রসংগে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে এসেছি।

মহান সাম্য ভিত্তিক এই কেসাস বিধান মানুষের জীবনের নিরাপত্তার চেয়েও বেশী যেটা নিশ্চিত করে, তা এই যে, এটা ক্ষতিগ্রস্তদের মনে স্বাভাবিক শান্তি আনে এবং প্রতিশোধস্পৃহা, অন্ধ আক্রোশ ও জাহেলী ভাবাবেগকে প্রশমিত করে।

হত্যা যখমের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়াত ও অন্যান্য আর্থিক পণ্য গ্রহণে কেউ কেউ রাযী হলেও কেসাস ছাড়া অনেকেরই মনের ক্ষোভ মেটে না। তাওরাতে যেমন আল্লাহর আইন স্বাভাবিক স্বস্তি ফিরিয়ে আনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলো, ইসলামী শরীয়তেও তেমনি স্বাভাবিক স্বস্তিকে

গুরুত্ব দিয়েছে। অতপর স্বস্তিদায়ক কেসাসকে নিশ্চিত করার পর ক্ষমা ও মহানুভবতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এমনভাবে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে, যেন কেসাস গ্রহণে অক্ষম হয়ে নয় বরং কেসাস গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্তেও ক্ষমা করতে পারে। বলা হয়েছে,

'অতপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কেসাসকে ক্ষমা করে দেবে, তার এই ক্ষমা তার গুনাহ মার্জনায় সহায়ক হবে। এর ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন। হত্যার বেলায় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বা অভিভাবক এবং যখমের বেলায় স্বয়ং আহত ব্যক্তি কেসাস তথা সমপর্যায়ের দৈহিক শাস্তি (খুনের বদলে খুন ও অংগের বদলে অংগ) মাফ করে দিতে পারে। ক্ষমা দ্বারা কেসাসের বদলে দিয়াত তথা আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ, অথবা কেসাস ও দিয়াত দুটোই মাফ করে দেয়া বুঝায়। এই দুই ধরনের ক্ষমা একমাত্র নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীই করতে সক্ষম। কেননা শাস্তি দান বা ক্ষমা করা দুটোই তার হাতে ন্যস্ত। অবশ্য এর পরও সরকার নিজস্ব বিবেচনা মোতাবেক ঘাতককে কোনো দন্ড দিতে পারে।

এ আহ্বান অনেক সময় মানুষকে ক্ষমা ও মহানুভবতা প্রদর্শনে এবং আল্লাহর ক্ষমা লাভে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা উপলব্ধি করে যে, যে মানুষটি বা অংগটি তারা হারিয়েছে, অর্থ দন্ড বা শারীরিক দন্ড দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয় এবং এর কোনোটি দ্বারাই তাদের কোনো লাভ হবে না। শাস্তি হচ্ছে পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা। এর পরও অন্তরে কিছু ক্ষোভ থেকে যায়, যাকে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ক্ষতিপূরণ দ্বারাই প্রশমিত করা সম্ভব।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক কোরায়শী জনৈক আনসারীর দাঁত ভেংগে দেয়। তৎক্ষণাত হযরত মোয়াবিয়ার কাছে অভিযোগ করা হলো। মোয়াবিয়া (রা.) বললেন, আহত ব্যক্তিকে আমরা খুশী করবো, কিন্তু আহত আনসারী শাস্তির জন্যে যিদ ধরে বসলেন। মোয়াবিয়া (রা.) অভিযুক্ত কোরায়শীকে বললেন, তোমার সাথীর ব্যাপারটা তুমিই মিটিয়ে ফেলো। আবু দারদা সেখানে বসে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, কোনো ব্যক্তি যদি শরীরে কোনো আঘাত পায় এবং তা ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন অথবা তার একটা গুনাহ মাফ করে দেবেন। একথা শুনে আনসারী বললেন, আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। এভাবে আহত ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে গেলো। অথচ মোয়াবিয়ার আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবে সে সন্তুষ্ট হয়নি।

মহাজ্ঞানী আল্লাহর বিধান এ রকমই। তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন যে, কী ধরনের আবেগ-অনুভূতি তাঁর সৃষ্ট জীবের মনে বিরাজ করে এবং কী ধরনের বিধি ও নির্দেশ দ্বারা তার মনকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করা যায়।

অন্যান্য আসমানী কেতাবের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি

তাওরাতের বিধিসমূহের এ অংশটি কোরআন ও ইসলামী শরীয়তেরও অংগীভূত হয়ে গেছে। এগুলো বর্ণনা করার পর সাধারণ মূলনীতি দিয়ে উপসংহার টানা হয়েছে যে,

'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার শাসন করে না, তারা যালেম।'

এখানে নতুন যে বিশেষণটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো 'যালেম'। এ বিশেষণটি দ্বারা পূর্ববর্তী বিশেষণ 'কাফের' থেকে আলাদা কিছু বুঝানো হচ্ছে না, বরং এ দ্বারা আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা বিচার ও শাসন করে না, তাদের একটা অতিরিক্ত বিশেষণ তুলে ধরা হয়েছে। সে কাফের এজন্যে যে, বান্দাদের জন্যে আল্লাহর আইন প্রণয়নের একক অধিকার অস্বীকার করার মাধ্যমে সে আল্লাহকে নিজের ইলাহ বা খোদা হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছে, আর নিজেকে

মানুষের জন্যে আইন ও বিধান রচনার অধিকারী বলে স্বীকার করার মাধ্যমে নিজেকে ইলাহ বা খোদা বলে দাবী করেছে। আর সে যালেম এ জন্যে যে, মানুষকে তাদের একমাত্র প্রভু ও প্রতিপালকের আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মানতে বাধ্য করেছে। অথচ একমাত্র আল্লাহর আইনই তার জন্যে উপযোগী এবং তার যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সক্ষম। তা ছাড়া নিজেকে ধ্বংস ও কুফরীর শাস্তির যোগ্য বানানো এবং নিজে যে মানব সমাজের মধ্যে বসবাস করছে, সেই সমাজকে অরাজকতা ও খোদাদ্রোহিতার দিকে ঠেলে দিয়ে সে নিজের ওপরও যুলুম করেছে।

সুতরাং দুটো বাক্য আসলে একটাই বাক্য এবং তা এরূপ, 'যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার ও শাসন করে না, তারা কাফের ও যালেম।'

এরপর বলা হচ্ছে যে, তাওরাতের পরেও এই মূলনীতি অক্ষুণ্ন রয়েছে যে, আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন না করলে তাকে ফাসেক বা আল্লাহর অবাধ্য হিসাবে চিহ্নিত হতে হবে। আল্লাহ বলেন,

'অতপর তাদের পরে আমি নিয়ে এসেছিলাম মরিয়ামের পুত্র ঈসা (আ.)-কে ....(আয়াত নং ৪৬ ও ৪৭)

আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ.)-কে ইনজীল দিয়েছিলেন কেবল এ জন্যেই যেন তা মানুষের অনুসৃত জীবন ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়। ইনজীলে স্বতন্ত্র কোনো আইন ছিলো না, কেবল তাওরাতে বর্ণিত আইনসমূহের সামান্য কিছু সংশোধনী ছিলো। ওই কেতাব তাওরাতেরই সমর্থক হয়ে এসেছিলো। তাই এই সব সংশোধনী ছাড়া অন্য সব বিষয়ে হুবহু তাওরাতের আইনই মেনে চলতে হতো। এতে আল্লাহ তায়ালা মোত্তাকীনদের জন্যে হেদায়াত, আলো ও উপদেশমালা রেখেছেন। এ কথার অর্থ দাঁড়ালো এই যে, মোত্তাকীন বা খোদাভীরু তারাই, যারা আল্লাহর কেতাব থেকে হেদায়াত, আলো ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকে, আল্লাহর কেতাবের হেদায়াত ও আলো গ্রহণ করার জন্যে তাদের মন উন্মুক্ত থাকে। যাদের অন্তর পাষাণের মত নিষ্ক্রিয় ও অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের অন্তরে এর উপদেশ প্রবেশ করে না, তারা এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। এর আকীদা বিশ্বাসে কোনো স্বাদ পায় না, এতে যে আলো ও পথনির্দেশ রয়েছে, তা দ্বারা উপকৃত হয় না এবং সে জন্যে তা গ্রহণও করে না। আল্লাহর কেতাবে হেদায়াতের আলো রয়েছে, কিন্তু একমাত্র উন্মুক্ত অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ সে আলো দেখতে পায় না। এতে পথনির্দেশ ও সদুপদেশ রয়েছে, কিন্তু আগ্রহী আত্মা ও বোদ্ধা অন্তর না থাকলে তা কেউ গ্রহণ করতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা ইনজীলে আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে পথনির্দেশ, আলো ও উপদেশমালা রেখে দিয়েছেন এবং তাকে ইনজীলধারীদের জন্যে জীবন বিধান ও শাসনতন্ত্র বানিয়েছেন। অর্থাৎ ইনজীল তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট, সকল মানুষের জন্যে নয়। এর অবস্থা তাওরাতের মতোই এবং শেষ নবীর পূর্বে আগত প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কেতাবের মতোই। তবে এর আইন কানুনের যে অংশ কোরআনের আইন কানুনের অনুরূপ, সে অংশকে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে হবে। বস্তুত ইনজীলের আইন কানুন সবই তাওরাত থেকে আগত। কেসাসের বিধানটিও যে তদ্রূপ, সে কথা আগেই বলেছি। এ জন্যে ইনজীলের ধারক বাহকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তাওরাত থেকে প্রাপ্ত যে আইন কানুন ইনজীলে রয়েছে, তা যেন তারা মেনে চলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ইনজীলের ধারক বাহকরা যেন ইনজীলে আল্লাহ তায়ালা যে বিধান নাযিল করেছেন তদনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন করে' .....

সুতরাং মূলনীতি হলো এই যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে যাবতীয় বিচার ফয়সালা ও শাসন পরিচালনা করতে হবে, অন্য কিছু অনুসারে নয়। ইসলামের পূর্বে তাওরাত ও ইনজীলে

এবং ইসলাম আগমনের পর কোরআনে আল্লাহর যে বিধান নাযিল হয়েছে, তার বাস্তবায়ন ব্যতীত আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের কোনো মূল্য নেই এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত গণ্য হবে না। কেননা এই সব আইন একই আইন এবং একই শরীয়ত। আল্লাহর সর্বশেষ শরীয়তই একমাত্র নির্ভরযোগ্য শরীয়ত।

'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন করে না, তারাই ফাসেক।'

এখানেও বক্তব্যটি স্থান, কাল ও ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে 'ফাসেক' বিশেষণটি পূর্ববর্তী কাফের ও যালেম বিশেষণদ্বয়ের ওপর সংযোজিত। পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে এটা পৃথক কিছু নয় এবং এ দ্বারা পৃথক কোনো গোষ্ঠী বুঝায় না। এটা পূর্ববর্তী বিশেষণ দুটির অতিরিক্ত একটা বিশেষণ। আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা বিচার-ফায়সালা ও শাসন করে না, তারা যে শ্রেণীর ও যে প্রজন্মের লোকই হোক না কেন, এ বিশেষণটি তাদের ওপর প্রযোজ্য।

কুফর হলো আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করার নাম এবং এই প্রত্যাখ্যান আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। অনুরূপভাবে, যুলুম হলো মানুষকে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন মেনে চলতে বাধ্য করা এবং তাদের জীবনে বিকৃতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার নাম। আর ফাসেকী হলো আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও অন্য কোনো বিধানের অনুসরণ করার নাম। সুতরাং প্রথম কাজটি অর্থাৎ কুফরের মধ্যেই সবগুলো বিশেষণ অন্তর্ভুক্ত। যে কাফের, সে যালেমও এবং ফাসেকও।

এখানে শৈথিল্য বা আপোষের কোনো সুযোগ নেই

সবার শেষে বিবরণ দেয়া হয়েছে শেষ নবীর মাধ্যমে আগত সর্বশেষ শরীয়তের তথা ইসলামের। এই শরীয়তই ইসলামের সর্বশেষ সংস্করণ বহন করে এনেছে, যাতে তা সমগ্র মানব জাতির দ্বীন ও শরীয়ত হতে পারে, পূর্ববর্তী সকল দ্বীন ও শরীয়তকে বাতিল করে সে সবের ওপর স্থান গ্রহণ করতে পারে এবং তা আল্লাহর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিধান গণ্য হতে পারে। এই বিধান মানব জাতির জীবনের সকল দিক ও বিভাগ তথা আকীদা বিশ্বাস, সমাজ ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যেই এসেছে। এ বিধান অনুসারে বিচার-ফয়সালা ও শাসন কার্য পরিচালনা করা হবে এ উদ্দেশ্যেই তা এসেছে– এ জন্যে আসেনি যে, তা নিয়ে কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা হবে এবং বড় বড় বই-পুস্তক রচনা করা হবে। আল্লাহর এ বিধান এ জন্যে এসেছে যে, তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ও অবিকলভাব অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা হবে, এর কোনো একটি হুকুমও পরিত্যক্ত হবে না বা পরিবর্তন করা হবে না, চাই তা জীবনের যতো ছোটো বা বড় অবস্থার সাথেই যুক্ত হোক না কেন। এভাবে যদি আল্লাহর বিধানকে মেনে চলা হয়, তা হলে সেটা হবে ইসলাম, নচেত জাহেলিয়াত, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তি পুজা, আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করা আর এ কথা বলা যে, দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, একেবারেই অর্থহীন ও অযৌক্তিক। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে জনগণকে তিনিই ঐক্যবদ্ধ করে দিতে পারতেন। তিনি সেটা চাননি। তিনি চেয়েছেন তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী বিচার ফয়সালা ও শাসন পরিচালনা করা হোক, তা তাতে জনগণের প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক না কেন। আল্লাহর এ বক্তব্যই ৪৮, ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

এ তিনটি আয়াতে যে রূপ খোলাখুলিভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহর বিধানের কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকেও কোনো বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশের দোহাই দিয়ে, কোনো যুক্তিতেই ত্যাগ না করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, তা অধ্যয়ন করার পর কোনো মানুষ যখন দেখে যে, কেউ নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়েও পরিস্থিতি ও পরিবেশের দোহাই

দিয়ে পুরো শরীয়তকেই পরিত্যাগ করে চলেছে, তখন সে অবাক না হয়ে পারে না। আল্লাহর আইনকে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করে কিভাবে মানুষ মুসলমান হবার দাবী করে, তা সে বুঝে উঠতে পারে না।

জীবনের সকল পরিস্থিতিতে ও সকল পরিবেশেই যে ইসলাম উপযোগী এবং আল্লাহ তায়ালা যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে ইলাহ, তথা প্রভু ও আইনদাতা, তা অস্বীকারকারী কিভাবে 'মুসলমান' বলে দাবী করে, তা সত্যিই দুর্বোধ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন

'আমি তোমার কাছে সত্য সহকারে কেতাব নাযিল করেছি।'

বস্তুত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিছু নযিল হওয়াই তার সত্য হওয়ার প্রমাণ। তিনিই শরীয়ত নাযিল করা ও আইন চালু করার অধিকারী। এ শরীয়তের সব ধারাতেই সত্য প্রতিফলিত। আকীদা হোক, আইন হোক, আদেশ হোক বা সংবাদ হোক. সব কিছুতেই নিরেট ও নির্ভেজাল সত্য প্রকাশিত।

'এ কেতাব তার পূর্ববর্তী সকল কেতাবের সমর্থক ও সকল কেতাবের ওপর অগ্রগণ্য।'

বস্তুত ইসলাম হচ্ছে দ্বীনের সর্বশেষ রূপ। জীবন বিধান ও মানুষের আইন হিসাবেও এটা সর্বশেষ। এতে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের অবকাশ নেই। চাই যে কোনো মতভেদ নিরসনের জন্যে তাকে এই কেতাবের আলোকে বিবেচনা করা উচিত, তাই সে মতভেদ মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে আকীদা নিয়ে সংঘটিত হোক, ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে সংঘটিত হোক, অথবা স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত হোক। এই কেতাবের আলোকেই সকল মতামতের বিচার করতে হবে। এই কেতাব দ্বারা সমর্থিত না হলে মানুষের মতামতের কোনো মূল্য নেই।

আর এই সত্যেরই দাবী এই যে,

'অতএব তুমি আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে তাদের মধ্যে সকল বিবাদের নিষ্পত্তি করে দাও,..........'

এ নির্দেশ মূলত রসূল (স.)-কে দেয়া হয়েছে। কেননা আহলে কেতাব তাঁর কাছে নিজেদের বিবাদের নিষ্পত্তির জন্যে আসতো। তবে এটা শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি সর্বব্যাপী নির্দেশ। এ নির্দেশ কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানের ওপর প্রযোজ্য। কেননা কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন নবী রসূল আসবে না এবং এই কেতাবের কোনো কিছু সংশোধনের জন্যে কোনো ওহীও আসবে না।

আল্লাহর এ দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এতে কোনো কিছুই পরিবর্তনযোগ্য নেই। এ দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা যখন মানুষের জন্যে মনোনীত করেছেন, তখন তিনি জানতেন যে, এ দ্বীন সকল মানুষের জন্যে যথেষ্ট এবং এতে মানুষের যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এ দ্বীন কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্যে যথেষ্ট। এতে কিছুমাত্র পরিবর্তন বা পরিবর্ধন এই পূর্ণাংগ বিধানকে অস্বীকার করার শামিল এবং এ কাজ দ্বারা মানুষ ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে, যদিও সে হাজার বার মুখে বলে যে, 'আমি মুসলমান।'

আল্লাহ তায়ালা এ কথা জানতেন যে, আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে আসার জন্যে বহু রকমের ছল ছুতোর আশ্রয় নেয়া হতে পারে এবং অন্তরে এরূপ কুপ্ররোচনা আসা বিচিত্র কিছু নয় যে, বিশেষ বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আল্লাহর বিধানের সব কিছুকে বাস্তবায়িত করা ও সব কিছু অনুসারে বিচার ফয়সালা করা তেমন জরুরী নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, তোমার কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে আগমনকারীদের খেয়ালখুশী মোতাবেক আল্লাহর বিধানের অংশ বিশেষকে পরিত্যাগ বা রদবদল করতে রাযী হয়ে যেও না।

এ ধরনের কুপ্ররোচনাগুলোর মধ্যে যেটি সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবী রাখে, তা হলো এই যে, বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী শ্রেণী ও গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ঐক্য ও মনের মিল প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে ছোটখাট ও মৌলিক নয় এমন সব বিধিতে কিছুটা শৈথিল্য প্রদর্শন করা যেতে পারে যখন শরীয়তের কোনো বিধির সাথে ওই সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীর ইচ্ছা-আকাংখার সংঘাত দেখা দেয়।

বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা রসূল (স.)-কে এই মর্মে প্রস্তাব দিয়েছিলো যে, পাথর মেরে হত্যার বিধিসহ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিধিতে তিনি যদি নমনীয় হন, তাহলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছিলো বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে আয়াতের বক্তব্য যে এ ধরনের কোনো বিশেষ প্রস্তাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা সাধারণভাবে এই আপোসহীন নীতি ঘোষণা করেছেন যে, পরিস্থিতি ও পরিবেশের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে কোনো অবস্থাতেই নমনীয়তা প্রদর্শন ও মনের মিল ঘটানোর স্বার্থে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের কোনোই সুযোগ নেই। তাই এ ব্যাপারে লুকিয়ে লুকিয়ে আপোষকামী মনোভাব পোষণ করা যাবে না তাই তিনি তাঁর নবীকে বলেন,

দুনিয়ার সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো, তবে তিনিই সেটা করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি চাননি। প্রত্যেকের জন্যে স্বতন্ত্র বিধি ও আইন তৈরী করেছেন এবং তাদেরকে তিনি যে দ্বীন ও শরীয়ত দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে তিনি পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক। মানুষকে পার্থিব জীবনে আল্লাহ তায়ালা যে সব নেয়ামত দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারেও তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। প্রত্যেকে নিজ নিজ মত ও পথ অনুসারে চলবে, অতপর সবাই যখন আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, তখন তিনি তাদেরকে জানাবেন যে, তারা কে কেমন কাজ করে এসেছে। তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবে ও কর্মফল দেবেন। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ অবলম্বনকারীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে আল্লাহর শরীয়তের ব্যাপারে নমনীয়তা দেখানো জায়েয নেই। কেননা তারা ঐক্যবদ্ধ হবে না। 'সকলের জন্যে স্বতন্ত্র নীতি ও বিধি তৈরী করেছি ....'।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের অনুপ্রবেশের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। বিশেষত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা ও মনের মিল ঘটানোর নামে সবাইকে খুশী করা বা ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর শরীয়তের কোনো বিধিতে নমনীয়তা প্রদর্শনের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর শরীয়ত এতো মূল্যবান এবং এতো অপরিবর্তনীয় যে, যে ঐক্য কখনো হবে না বলে আল্লাহ তায়ালা স্থির করে রেখেছেন, তার খাতিরে শরীয়তের কোনো একটি অংশকেও বিসর্জন দেয়ার অবকাশ নেই। মানুষ সৃষ্টিই হয়েছে রকমারি যোগ্যতা, রুচি, অভিমত, নীতি এবং মত ও পথ সহকারে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদেরকে এরূপ বহু মত, বহু পথ ও বহু রুচির অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। এর পেছনে তাঁর কোন সূক্ষ্ম ও মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটা তিনিই ভালো জানেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সামনে হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং সবাইকে প্রতিযোগিতা করে তার দিকে অগ্রসর হবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন, আর এটাই তাদের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ওপরই তাদের প্রতিফল নির্ভর করছে। যেদিন তারা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, সেই দিন তার কাছ থেকে এর যথোচিত প্রতিফল পাবে।

এমতাবস্থায় আল্লাহর আইনের বিনিময়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা একটা নিষ্ফল চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। অন্য কথায় বলা যায়, মানুষের জীবনের সঠিক কল্যাণ ও সুস্থতাকে বিপন্ন করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ না হয়ে পারে না। বস্তুত আল্লাহর আইনকে লংঘন বা পরিবর্তনের অর্থ দাঁড়াবে এই সে, পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অরাজকতার সৃষ্টি হবে। সঠিক পথ থেকে মানুষ বিভ্রান্ত হবে। মানব জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং মানুষ মানুষকে প্রভু মানতে

আরম্ভ করবে। এর যেটাই ঘটুক, তা এতো বড় ও মারাত্মক বিপর্যয় যে, মানুষের স্বভাবের বিপরীত ও আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী একটা জিনিস অর্জন করার জন্যে তা সংঘটিত করা বৈধ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা। তিনি যা খুশী সৃষ্টি করেন, যা খুশী স্থির করেন, তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনিই যখন মানুষের মত, পথ, রুচি ও নীতির বিভিন্নতা চেয়েছেন, তখন তা পাল্টানো কারো পক্ষে সম্ভব নয় এবং তাঁর জন্যে আল্লাহর বিধানকে রদবদল করা বা লংঘন করার অবকাশ থাকতে পারে না।

এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্যে শরীয়তের কোনো বিধির ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন করা এ আয়াতের দৃষ্টিতে একটা ঘৃণ্য ও ধিক্কারযোগ্য কাজ। এ ব্যাপারে আল্লাহর কোনো অনুমোদন নেই। কোনো মুসলমানও এটা মেনে নিতে পারে না। কেননা সে আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধি কোনো কাজের উদ্যোগ নিতে পারে না। এ আয়াতের আলোকে তাই এটা একেবারেই দুর্বোধ্য যে, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তারা কিভাবে বলতে পারে যে, আমরা শরীয়তের বিধান বাস্তবায়িত করে পর্যটকদেরকে হারাতে পারি না?

পরবর্তী আয়াতে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে আরো জোরদারভাবে। ৪৮ নং আয়াতে মানুষের খেয়ালখুশী অনুসারে আল্লাহর বিধানকে বর্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর ৪৯ নং আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মানুষের সৃষ্টি করা ফেতনা তথা বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর বিধানের কোনো অংশ বিশেষকেও বর্জন করো না। এখানে উচ্চারিত হুশিয়ারিটা আরো সূক্ষ্ম এবং আরো কঠোর। এটা বাস্তব অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। বস্তুত এটা একটা ফেতনা, যা থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী। এ ক্ষেত্রে দুই অবস্থার একটি না হয়েই পারে না। হয় পুরোপুরিভাবে আল্লাহর বিধান অনুসারে শাসন ও বিচার ফয়সালা করা হবে। নচেত প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে ও ফেতনায় লিপ্ত হওয়া হবে। শেষেরটি থেকে আল্লাহ তায়ালা সাবধান করেছেন।

এরপর সম্ভাব্য অবস্থার বিবরণ দিয়ে রসূল (স.)-কে এই মর্মে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, তারা যদি ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি ছোট-বড় বিধানকে জোরদার ভাবে আঁকড়ে না ধরে এবং পরিপূর্ণ ইসলামকে জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ ও তদনুসারে যাবতীয় কাজ করা থেকে পশ্চাদপসরণ করে, তাহলে তিনি যেন মর্মাহত না হন।

(এটা সেই সময়কার কথা, যখন ইহুদীদেরকে কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণাংগ ইসলামী বিধান মেনে চলা তাদের জন্যে তখনো বাধ্যতামূলক হয়নি।)

'তারা যদি পশ্চাদাপসরণ করে'........ (আয়াত ৪৯)

অর্থাৎ তারা পশ্চাদপসরণ করলে তোমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। তাদের কারণে তুমি ইসলামী শরীয়তে পূর্ণাংগ বাস্তবায়ন থেকে বিরত হয়ো না। তারা পশ্চাদপসরণ করছে এজন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কিছু পাপের শাস্তি দিতে চান। এই পশ্চাদপসরণ হেতু তারাই খারাপ পরিণতি ভুগবে– তুমি নও, ইসলামও নয় এবং মুসলমানও নয়। তা ছাড়া মানুষের স্বভাবই এরকম যে, 'বহু সংখ্যক মানুষ ফাসেক।' অর্থাৎ অবাধ্য ও বিপথগামী। তারা স্বভাবতই এ রকম। এখানে তোমার কিছু করার নেই। এতে ইসলামেরও কোনো দোষ নেই। তাদেরকে জোর করে সঠিক পথে বহাল রাখার কোনো উপায় নেই।

এভাবে মোমেনের অন্তরে শয়তানের অনুপ্রবেশের সকল ফাক ফোকর বন্ধ করা হয়েছে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে এবং যে কোনো ওজুহাতে শরীয়তের যে কোনো বিধি লংঘন বা বর্জনের পথ আটকে দেয়া হয়েছে।

ইসলামে হক ও বাতেলের মাঝখানে থাকার কোনো অবকাশ নেই

এরপর তাদেরকে দুই রাস্তার সংযোগ-স্থলে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

হয় আল্লাহর শাসন, নচেত জাহেলিয়াতের শাসন- এই দুই পথের এক পথ তাকে অবলম্বন করতে হবে। এর মধ্যবর্তী বা বিকল্প কোনো পথ নেই। হয় পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমত কায়েম হবে। মানব জীবনে আল্লাহর আইন চালু হবে এবং আল্লাহর বিধান মানুষের জীবনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে। নচেত কায়েম হবে জাহেলী শাসন এবং চালু হবে স্বেচ্ছাচারিতা ও মানুষের গোলামীর বিধান। এর কোন্‌টি তারা চায়?

'তবে কি তারা জাহেলিয়াতের শাসন চায়? বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে ভালো শাসক আর কে আছে?'

এ উক্তি দ্বারা জাহেলিয়াতের সংজ্ঞা নিরূপিত হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর কোরআন জাহেলিয়াতের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, জাহেলিয়াত হচ্ছে মানুষের ওপর মানুষের শাসন, মানুষ কর্তৃক মানুষের গোলামী এবং আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্বকে অস্বীকার করে তদস্থলে কিছু সংখ্যক মানুষের প্রভুত্ব মেনে নেয়া এবং তাদের গোলামী ও দাসত্ব করা।

কোরআনের এ উক্তির আলোকে জাহেলিয়াত কোনো নির্দিষ্ট কাল নয়, বরং একটা নির্দিষ্ট অবস্থা। এ অবস্থা অতীতেও ছিলো, আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ হচ্ছে ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা অবস্থা ও পরিস্থিতি।

মানুষ যে কোনো যুগের বা যে কোনো স্থানের অধিবাসী হোক না কেন, হয় তারা আল্লাহর আইন দ্বারা শাসিত হবে, কারো পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বাধা বা বিভ্রান্তির শিকার হবে না এবং আল্লাহর এই শাসনকে নির্বিবাদে মেনে নেবে,

অথবা যে কোনো ধরনের মানব রচিত আইন দ্বারা শাসিত হবে এবং সেই শাসনকে সানন্দে মেনে নেবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় মানুষ আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী গণ্য হবে। আর শেষোক্ত অবস্থায় সে গণ্য হবে জাহেলিয়াতের অধীন এবং যাদের আইনে শাসিত, তাদের গোলাম। তাদেরকে কোনোক্রমেই আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী বলা যাবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর শাসন কামনা করে না, সে অবশ্যই জাহেলিয়াতের শাসন কামনা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন প্রত্যাখ্যান করে, সে অবশ্যই জাহেলিয়াতের আইন গ্রহণ করে এবং জাহেলিয়াতের অধীন জীবন যাপন করে।

এ হচ্ছে দুই পথের সংযোগস্থল। আল্লাহ এ দুটো পথ মানুষকে দেখিয়ে ও জানিয়ে দিচ্ছেন। এর পর তারা স্বাধীন।

এরপর তাদের সামনে প্রশ্ন রাখছেন যে, আল্লাহর শাসন ভালো, না জাহেলিয়াতের শাসন ভালো। প্রশ্নটা এমন ভংগিতে রাখছেন যাতে জাহেলিয়াতের শাসন ভালো এবং আল্লাহর শাসন মন্দ এই ধারণা গড়ে ওঠে। প্রশ্নটি এই,

'বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে ভালো শাসক আর কে আছে?'

বস্তুত, আল্লাহর চেয়ে উত্তম শাসক আর কেউ নেই।

এমন ধৃষ্টতা কার আছে যে, মানুষের ওপর আল্লাহর চেয়ে উত্তম আইন জারী ও উত্তম শাসন করতে পারার দাবী করতে পারে? আর এতো বড় দাবী করার পক্ষে কি কোনো যুক্তি সে দেখাতে পারে? সে কি বলতে পারবে যে, মানুষের স্রষ্টার চেয়েও সে মানুষকে ভালো চিনে ?

সে কি বলতে পারবে যে, মানুষের প্রভুর চেয়েও সে মানুষের কল্যাণ কিসে হয় তা বেশী জানে? সে কি বলতে পারবে যে, যে আল্লাহ তায়ালা নিজের সর্বশেষ নবীকে পাঠিয়েছেন, সর্বশেষ শরীয়ত জারী করেছেন ও কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে নিজের শরীয়তকে চালু রেখেছেন, সেই আল্লাহ জানতেন না যে, ভবিষ্যতে মানুষ কিছু সমস্যা ও প্রয়োজনের সম্মুখীন হবে, সেগুলো না

জানার কারণে তিনি তাঁর শরীয়তে ওই সব সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা রাখতে পারেননি এবং শেষ যুগে মানুষ আকস্মিকভাবে সেই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে?

যারা আল্লাহর আইনকে মানব জীবনের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকারী হিসাবে গ্রহণ করে না, বরং তার বদলে জাহেলিয়াতের আইন ও শাসনকে গ্রহণ করে এবং নিজের কিংবা অন্য কোনো মানুষের বা জাতির অথবা কোনো বিশেষ প্রজন্মের রচিত আইন বা খেয়ালখুশীকে আল্লাহর আইনের ও শাসনের উর্ধে স্থান দেয়, তারা উল্লেখিত ওজুহাতগুলোর মধ্যে কোন ওজুহাতটা দাঁড় করাতে পারবে? বিশেষত সে যখন নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তখন এর কোনো একটি কথাও কি সে মুখে আনতে পারবে?

সে কি প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশ, বাধা-বিপত্তি, মানুষের অনীহা ও অনাগ্রহ এবং শত্রুর ভীতিকে ওজুহাত হিসাবে দেখাতে পারবে? এগুলো যে থাকতে পারে তা কি আল্লাহ তায়ালা জানতেন না? এসব না জেনেই কি তিনি মুসলমানদেরকে নিজেদের মধ্যে তাঁর আইন জারী করতে, তাঁর বিধান অনুসারে চলতে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শরীয়তের অংশ বিশেষকে বর্জন করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন? নব উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান দিতে কি আল্লাহর আইন অক্ষম? এগুলো সম্পর্কে যিনি এতো সাবধান করেন এবং এতো কড়াকড়ি করেন, তিনি কি এগুলোর উদ্ভবের কথা জানতেন না?

একজন অমুসলিম যা খুশী বলতে পারে। কিন্তু একজন মুসলমান বা মুসলমান বলে পরিচয় দানকারী কোনো ব্যক্তি এ জাতীয় উক্তি করলে তার মধ্যে ইসলামের লেশমাত্র থাকলেও কি এ কথা বলা সম্ভব?

এটা একটা সংযোগ, স্থল। এটা দুই পথের একটি পথ বেছে নেয়ার স্থান। তৃতীয় কোনো পথ নেই। তর্ক-বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। হয় ইসলামকে, নয় জাহেলিয়াতকে, হয় ঈমানকে, নয়তো কুফরকে, হয় আল্লাহর শাসনকে, নয়তো জাহেলিয়াতের শাসনকে মেনে নিতে হবে। তৃতীয় কোনো পথ খোলা নেই।

যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন করে না, তারা যালেম, কাফের ও ফাসেক। আর যারা আল্লাহর আইন ও শাসনকে গ্রহণ করে না, তারা মোমেন নয়।

মুসলমান মাত্রেরই মনমগযে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বদ্ধমূল থাকা উচিত। মানুষের বাস্তব জীবনে ও কর্মকান্ডে আল্লাহর আইনকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা উচিত। শত্রু ও বন্ধু নির্বিশেষে সকলের ওপর একে কার্যকরী করা উচিত, কার্যকরী করতে হলে যা যা করা দরকার, তাও করা উচিত এবং এর ফলাফল মেনে নেয়া উচিত।

মুসলমানদের বিবেক ও মনমগয যতোক্ষণ এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হবে, ততোক্ষণ তাদের ভেতরে ভারসাম্য আসবে না, তাদের সামনে সঠিক মানদন্ড দৃশ্যমান হবে না, তাদের বিবেক সত্য ও মিথ্যা বা হক ও বাতিলে পার্থক্য করতে পারবে না এবং সঠিক পথে এক কদমও চলতে পারবে না। সাধারণ মানুষের মন মগযে এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা থাকলেও মুসলমানদের মনে অস্পষ্টতা থাকতে পারে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥١ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ
يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ
اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝٥٢ وَيَقُوْلُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ
لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝٥٣ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ
يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا

রুকু ৮

৫১. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (কখনো) ইহুদী-খৃস্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (কেননা) এরা নিজেরা (সব সময়)-ই একে অপরের বন্ধু; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (কখনো) এদের কাউকে বন্ধু বানিয়ে নেয় তাহলে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না। ৫২. অতপর যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি দেখবে, তারা (বিশেষ) তৎপরতার সাথে এই বলে তাদের সাথে মিলিত হচ্ছে যে, 'আমাদের আশংকা হচ্ছে, কোনো বিপর্যয় এসে আমাদের ওপর আপতিত হবে'; পরে হয়তো আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের কাছে) বিজয় নিয়ে আসবেন কিংবা তাঁর কাছ থেকে অন্য কিছু (অনুগ্রহ তিনি দান করবেন), তখন (তা দেখে এ) লোকেরা নিজেদের মনের ভেতর যে কপটতা লুকিয়ে রেখেছিলো, তার জন্যে ভীষণ অনুতপ্ত হবে। ৫৩. (তখন) ঈমানদার লোকেরা বলবে, এরাই কি ছিলো সেসব মানুষ, যারা আল্লাহ তায়ালার নামে বড়ো বড়ো শপথ করতো (যে), তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে; (এই আচরণের ফলে) তাদের কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেলো, ফলে তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো। ৫৪. হে মানুষ, তোমরা যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো, তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি নিজের দ্বীন (ইসলাম) থেকে (মোরতাদ হয়ে) ফিরে আসে (তাতে আল্লাহ তায়ালার কোনো ক্ষতি নেই,) তবে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, (তারা হবে) মোমেনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে,

يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ

عَلِيْمٌ ۝٥٤ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ

الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۝٥٥ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝٥٦ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٥٧

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝٥٨ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٥٩ قُلْ هَلْ

কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তারা করবে না; (মূলত) এ হচ্ছে আল্লাহর একটি অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞার আধার। ৫৫. তোমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সামনে যারা) সদা অবনমিত থাকে। ৫৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে (তারা যেন জেনে রাখে), কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার দলটিই বিজয়ী হবে।

রুকু ৯

৫৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের আগে যাদের (আল্লাহ তায়ালার) কেতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে রেখেছে, তাদের এবং কাফেরদের কখনো তোমরা নিজেদের বন্ধু বানিয়ো না, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মোমেন হয়ে থাকো তাহলে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই (বন্ধু বানাও এবং তাঁকেই) ভয় করো। ৫৮. যখন তোমরা (মানুষদের) নামাযের জন্যে ডাকো, তখন এই ডাককে এরা হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তু বানিয়ে দেয়; এরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা (হক-বাতিলের) কিছুই বোঝে না। ৫৯. (হে রসূল,) তুমি এদের বলো, তোমরা যে আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছো, তার কারণ এই যে, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং আমাদের ওপর আগে ও বর্তমানে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি! (আসলে) তোমাদের অধিকাংশ (মানুষই) হচ্ছে গুনাহগার। ৬০. (হে রসূল,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের বলে দেবো–

أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا

وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا

بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ

كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن

قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾ وَقَالَتِ

الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ

مَبْسُوطَتَانِ ۙ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ

আল্লাহর কাছ থেকে সবচাইতে নিকৃষ্ট পুরস্কার কে পাবে? সে লোক (হচ্ছে,) যার ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, যার ওপর আল্লাহর ক্রোধ রয়েছে এবং যাদের কিছু লোককে তিনি বানর, (কিছু লোককে) শুয়োরে পরিণত করে দিয়েছেন, যারা মিথ্যা মাবুদের আনুগত্য স্বীকার করেছে; এরাই হচ্ছে সেসব লোক, (পরকালে) যাদের অবস্থান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং (দুনিয়াতেও) এরা সরল পথ থেকে (বহুদূরে) বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। ৬১. তারা যখন তোমার সামনে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আসলে) তারা তোমার কাছে কুফরী নিয়েই প্রবেশ করছিলো এবং তা নিয়েই তোমার কাছ থেকে তারা বেরিয়ে গেছে; (তারা মনের ভেতর) যা কিছু লুকিয়ে রাখছিলো আল্লাহ সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ৬২. তাদের অনেককেই তুমি দেখতে পাবে– গুনাহ করা, (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ ও হারাম মাল ভোগ করার কাজে এরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলেছে; এরা যা করে (মূলত) তা বড়োই নিকৃষ্ট কাজ! ৬৩. (কতো ভালো হতো এদের) ধর্মীয় নেতা ও পন্ডিত ব্যক্তিরা যদি এদের এসব পাপের কথা ও হারাম মাল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতো! (কারণ) এরা যা কিছু (সংগ্রহ) করছে তা বড়োই জঘন্য! ৬৪. ইহুদীরা বলে, আল্লাহর (দানের) হাত বাঁধা পড়ে গেছে; (আসলে) তাদের নিজেদের হাতই বাঁধা পড়ে গেছে, আর তারা যা কিছু বলেছে সে কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর তো (দুনিয়া আখেরাতের) উভয় হাতই মুক্ত, যেভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন। (প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে), তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকেরই

مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ

الْقِيٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى

الْاَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ

اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ

لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۚ وَكَثِيْرٌ

مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

সীমালংঘন ও কুফরী বাড়িয়ে দিয়েছে; (ফলে) আমি তাদের মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত একটা শত্রুতা ও পরস্পর বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি; যখনি তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তখনি তা নিভিয়ে দিয়েছেন, তারা (বার বার) এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে; আসলে আল্লাহ তায়ালা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মোটেই ভালোবাসেন না। ৬৫. যদি আহলে কেতাবরা ঈমান আনতো এবং (আল্লাহকে) ভয় করতো, তবে অবশ্যই আমি তাদের গুনাহখাতা মুছে দিতাম এবং তাদের আমি অবশ্যই নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম। ৬৬. যদি তারা তাওরাত ও ইনজীল (তথা তার বিধান) প্রতিষ্ঠা করতো, আর যা তাদের ওপর তাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে তারা রেযেক পেতো তাদের মাথার ওপরের (আসমান) থেকে ও তাদের পায়ের নীচের (যমীন) থেকে; তাদের মধ্যে অবশ্য একদল (ন্যায় ও) মধ্যপন্থী লোক রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যাদের কর্মকান্ড খুবই নিকৃষ্ট!

তাফসীর

আয়াত-৫১-৬৬

এ আয়াত ক'টি থেকে সূরার ভূমিকায় আমার বলে আসা এ কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয় যে, হিজরী ৬ষ্ঠ বছরে হোদায়বিয়াতে নাযিল হওয়া সূরা আল ফাতহের পর এ সূরার পুরোটা নাযিল হয়নি বরং এর বেশ কিছু অংশ তার আগে নাযিল হয়েছে। অন্তত পক্ষে খন্দক যুদ্ধের বছর তথা ৪র্থ হিজরীতে বনু কোরায়যাকে এবং বদর যুদ্ধের পর যখন বনু কাইনুকাকে বহিষ্কার করা হয়, তারও আগে এ সূরা নাযিল হয়ে থাকতে পারে।

এ আয়াতগুলোতে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত এমন কিছু ঘটনা ও পরিস্থিতির ইংগিত রয়েছে, যার পেছনে ইহুদী ও মোনাফেকদের হাত ছিলো, এবং সেগুলো ইহুদীদের দর্প চূর্ণ হবার র সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। এর সর্বশেষ ঘটনাটি বনু কোরায়যার ঘটনার সময়ে সংঘটিত হয়।

বিধর্মীদের ব্যাপারে অনুসৃত মূলনীতি

এ আয়াতগুলোতে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যারা তা করবে, তাদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরই দলভুক্ত গণ্য করা হবে বলে হুশিয়ারী জ্ঞাপন করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং যুক্তি দেখায় যে, বন্ধুত্ব না রাখলে বিপদের আশংকা রয়েছে, তাদের মন ব্যাধিগ্রস্ত। এ আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে সেই সব লোক থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, যারা ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ ও উপহাস করে এবং মুসলমানদের সামায পড়ার প্রতিও ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। এ সব উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, এ সূরা নাযিল হবার সময়ে মদীনায় ইহুদী ও মোনাফেকদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো বলেই এসব ঘটনা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো এবং এ জন্যেই এতো কঠোর হুশিয়ারী ও হুমকি উচ্চারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো ইহুদীদের আসল চরিত্র উন্মোচনের, তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপনের এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মুখোশ খুলে দেয়ারও, আর এজন্যে বহু বিচিত্র ভাষা ও ভংগি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোনো কোনো রেওয়ায়াতে এই আয়াতগুলোর মধ্য থেকে কোনো কোনোটির নাযিল হবার উপলক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় বদর যুদ্ধের পরে সংঘটিত বনু কাইনুকার ঘটনা, মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের ভূমিকা ও তৎপরতা এবং ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব বহাল রাখার সপক্ষে তার এই যুক্তি যে, আমি ইহুদীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলে ও ইহুদী ভৃত্যদেরকে বিদায় কবলে বিপদের আশংকা করি, ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

এমনকি এসব বর্ণনাকে যদি বাদও দেই, তবে কেবল এই আয়াতগুলোর বাচনভংগি, নাযিল হবার পটভূমি ও পরিবেশ এবং সমকালীন মদীনার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অধ্যয়নও সূরার ভূমিকায় আমি এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে যা বলেছি, তার যথার্থতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এ আয়াতগুলোতে আরো যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে, তা হলো মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে কোরআন কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এবং কোরআনের এই পদ্ধতি ও মূলনীতিগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী, যা সে মুসলমানদের অন্তরে ও তাদের সমাজে প্রতিনিয়ত বদ্ধমূল করতে চায়। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ ও মূলনীতিসমূহ চিরন্তন ও শাশ্বত, মুসলিম উম্মাহর কোনো বিশেষ প্রজন্মের সাথে তা যুক্ত নয়। এগুলো প্রত্যেক প্রজন্মের মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের গঠন ও লালনের ভিত্তি।

কোরআন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে লালন ও তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের জন্যে যে কয়টি জিনিসকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তা হলো প্রথমত তার প্রতিপালক, তার রসূল, তার আকীদা ও আদর্শ এবং সেই আকীদা ও আদর্শের অনুসারী তার মুসলিম জাতি ও সমাজের প্রতি তার আন্তরিকতাপূর্ণ ও একনিষ্ঠ মমত্ববোধ ও ভালোবাসা, দ্বিতীয়ত যে সমাজে সে বাস করে, তার সাথে অন্য যারা আল্লাহর পতাকা সমুন্নত করে না, রসূলের নেতৃত্বের আনুগত্য করে না ও আল্লাহর দলের প্রনিধিত্বকারী সংগঠনে যোগ দেয় না, তাদের পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ, তৃতীয়ত প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে,একথা জানিয়ে দেয়া যে, মানব জাতির জীবনে ও ইতিহাসের ঘটনাবলীতে আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে মনোনীত করেছেন, চতুর্থত এই মনোনয়ন ও তার সাথে যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণা স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই এটা দিয়ে

থাকেন। পঞ্চমত অমুসলিমদের সাথে সখ্যতা, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ পোষণ আল্লাহর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে বেরিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর এই সম্মানজনক মনোনয়ন ও তার এই চমৎকার অনুগ্রহ ও করুণাকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়টি উক্তিতে এই বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। যেমন, 'হে মোমেনরা, তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। যারা তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, তারা তাদেরই দলভুক্ত। আল্লাহ যালেমদেরকে সুপথ দেখান না। (আয়াত নং ৫১) অনুরূপভাবে, ৫৪, ৫৫ ও ৫৬ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

অতপর কোরআন মুসলমানদের শত্রুদের আসল পরিচয় ও তাদের সাথে তাদের চলমান সংঘাত ও সংঘর্ষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে তৈরী করে। তাদের সাথে মুসলমানদের সংঘাতের মূল কারণ হলো আকীদা ও আদর্শ, মুসলমানদের অন্য সব কিছুর আগে তাদের আকীদা ও আদর্শের জন্যেই তাদের ওপর তাদের শত্রুরা ক্ষিপ্ত। তাদের এই ক্ষিপ্ততা ও শত্রুতা কখনো নিরসন হবার নয়। কেননা তারা আল্লাহর দ্বীনের অবাধ্য হবার কারণে যারাই এই দ্বীনের অনুগত তাদেরকে ঘৃণা ও অপছন্দ করে। যেমন ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, (হে রসূল) তুমি এদের বলো, তোমরা যে আমাদের প্রতি ঘৃণামূলক প্রতিশোধ নিচ্ছো তার কারণ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর ওপর এবং আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর তোমাদের অধিকাংশই হচ্ছে ফাসেক।

বস্তুত ইসলামী আকীদা ও আদর্শই সকল শত্রুতা ও সংঘাতের আসল কারণ।

তা ছাড়া দৈনন্দিন জীবন যাপনের ইসলামী বিধান এবং তার এই সব মৌলিক শিক্ষা ও নির্দেশের মূল্যও অসাধারণ। আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল, তাঁর দ্বীন ও তাঁর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম জনতা ও সমাজের সাথে ভালোবাসার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং এর বিরুদ্ধে জনগণের একাংশের শত্রু হয়ে যাওয়া ও যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, সে কথা জানা ও বুঝা এ দুটো জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈমানের শর্তাবলী পূরণের খাতিরেই হোক, মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠনের খাতিরেই হোক অথবা মুসলিম সংগঠনের আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার খাতিরেই হোক আদর্শের অনুগতদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং শত্রুদের বিরুদ্ধাচরণের স্বাভাবিকতা সম্পর্কে সচেতন থাকা খুবই জরুরী। যারা ইসলামের পতাকা বহন করে, তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের প্রতি যথার্থ বিশ্বাসী হতে পারবে না, তারা পৃথিবীতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো কৃতিত্ব রাখতে পারবে না এবং তাদের কোনো ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তিও গড়ে উঠবে না, যতোক্ষণ তাদের সাথে ইসলাম বিরোধীদের পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ না ঘটবে, যতক্ষণ তাদের আল্লাহ প্রেম, রসূল প্রেম ও দ্বীন প্রেম সর্বাত্মক আন্তরিকতা ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় সমৃদ্ধ না হবে, যতোক্ষণ তারা তাদের সাথে তাদের শত্রুদের সংঘাত সংঘর্ষের প্রকৃতি ও তার মূল কারণ অবগত না হবে এবং যতোক্ষণ এ ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস না জন্মাবে যে, শত্রুদের পরস্পরের মধ্যে যতোই কোন্দল থাক, মুসলমানদের ও ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই ও শত্রুতা পোষণে তারা সর্বতোভাবে একমত ও ঐক্যবদ্ধ।

এ আয়াতগুলোতে মুসলমানদের কাছে ইসলামের দুশমনদের সাথে তাদের লড়াই ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রকৃত কারণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেই শুধু ক্ষান্ত থাকা হয়নি, বরং ঐ দুশমনদের স্বরূপ এবং তাদের শত্রুতার ধরন, প্রকৃতি ও ব্যাপকতাও তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা যাদের

সাথে তাদের লড়াই চলছে, তাদেরকে সঠিকভাবে চিনে নিতে পারে, তাদের মনে এই লড়াই সম্পর্কে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাকে এবং এ লড়াই যে অনিবার্য, তা যেন অনুধাবন করতে পারে। এ জন্যে ৫১, ৫৭, ৫৮, ৬১ ও ৬৪ নং আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন। এ আয়াতগুলোতে শত্রুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভংগি ও ভূমিকা, তাদের ব্যাপারে তাদের সমস্ত আভ্যন্তরীণ কোন্দল ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাদের ধর্মীয় কর্মকান্ড ও নামাযের প্রতি তাদের উপহাস ও বিদ্রূপের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, শত্রুদের এসব অপতৎপরতা প্রতিরোধ না করে যে পারা যাবে না, সে সম্পর্কে তাদের মনমগযে কোনো দ্বিধা সংশয় থাকা উচিত নয়।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বাতিল শক্তির সাথে হকপন্থীদের এই অব্যাহত ও অনিবার্য সংঘাত সংঘর্ষের শেষ পরিণতি কী এবং আখেরাতে পরিণাম যা-ই হোক, তার পূর্বে এই পার্থিব জীবনে জাতিসমূহের ভাগ্য নির্ধারণে ঈমানের গুরুত্ব কতখানি। এ ব্যাপারে ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে 'আল্লাহর দল' আখ্যায়িত করা ও তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা লক্ষ্যণীয়। তা ছাড়া ৬৬ নং আয়াতেও তাদের পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধির আশ্বাস লক্ষ্য করুন। অনুরূপভাবে ৫৪ নং আয়াতে আল্লাহর মনোনীত মুসলিম বান্দার গুণাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত বিবরণ ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার, মুসলিম ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ এবং মুসলিম জাতিকে অটুট ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার পথে এক একটি পদক্ষেপ স্বরূপ।

'হে মোমেনরা! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করো না।' (আয়াত নং ৫১, ৫২ ও ৫৩)

ইহুদী নাসারাদের সাথে মিত্রতা না গড়ার কঠোর নির্দেশ

প্রথমে এ আয়াত কয়টিতে উল্লেখিত 'ওয়ালায়াত' (বন্ধুত্ব) শব্দটির ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়, যা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বজায় রাখতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে নিষেধ করেছেন।

ওয়ালায়াত অর্থ হচ্ছে বিধর্মীদের সাথে মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা। বিধর্মীদের ধর্মের অনুসরণের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক থাকার প্রশ্নই ওঠে না যে, ইহুদী, খৃষ্টান বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর ধর্মের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে আগ্রহী হতে পারে। যে জিনিসটি মুসলমানদের মধ্যে বিতর্কিত ছিলো এবং অনেকেই তা বৈধ মনে করতো, তাহলো পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহযোগিতা, যারা এটিকে বৈধ মনে করতো, তাদের যুক্তি ছিলো এই যে, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ এই দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও বাস্তবতাসম্মত। তাছাড়া মদীনায় ইসলাম আগমনের প্রথম যুগে এই বন্ধুত্ব বহাল ছিলো। কিন্তু যখন প্রমাণিত হলো যে, মদীনায় মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার সম্পর্ক মোটেই সম্ভব নয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তা বাতিল করে দিলেন।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই জিনিসটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং তা সুপরিচিত। মদীনার মুসলমানদের সাথে হিজরত করে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসেনি এমন মুসলমানদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা যতোক্ষণ হিজরত করে আসবে না, ততোক্ষণ তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই।'

স্বভাবতই এখানে ধর্মের ক্ষেত্রে একাত্মতা ও একীভূত হওয়া বুঝানো হয়নি। কেননা মুসলমান তো সর্বাবস্থায় ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানের বন্ধু ও তার সাথে একাত্ম। এখানে বুঝানো হয়েছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ককে। কেননা এ জিনিসটা একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের সাথে অন্য একটি রাষ্ট্রের মুসলমানদের হতে পারে না, যতোক্ষণ তারা ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করে চলে না আসে। এই অর্থেই অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার অর্থেই ওয়ালায়াত ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের পাতানো নিষিদ্ধ, যদিও মদীনার প্রাথমিক যুগে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। মনে রাখতে হবে যে, আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে ইসলামের উদারতা ও মহানুভবতা এক জিনিস, আর তাদেরকে অভিভাবক বা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা আর এক জিনিস। তবে কোনো কোনো মুসলমান এ দুটোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। এ ধরনের মুসলমানরা আসলে ইসলামের প্রকৃত পরিচয় ও তার ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারেনি। ইসলাম যে একটা বাস্তব আন্দোলনমুখী আদর্শ, এই আদর্শের তাত্ত্বিক রূপরেখা অনুসারে সে যে পৃথিবীতে একটা সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চায়, সে কথা তারা জানে না। তারা এও জানে না যে, ইসলামের তাত্ত্বিক আদর্শ ও মতবাদ মানব রচিত যাবতীয় মতবাদ ও মতাদর্শ থেকে শুধু আলাদাই নয়, বরং সেগুলোর সাথে সংঘর্ষমুখর। এ আদর্শ প্রবৃত্তির কামনা বাসনার লাগামহীন জোয়ারে ভেসে যাওয়া, পথভ্রষ্ট ও খোদাদ্রোহী মানব সন্তানদের বিরুদ্ধেও সংঘর্ষমুখর। তাদের সাথে সে এমন এক লড়াই পরিচালনা করে যার লক্ষ্য হলো এই আদর্শের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র সমাজ ও রাষ্ট্র বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা, আর এই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই কোনো ক্রমেই বন্ধ হয় না।

যারা অমুসলিমদের সাথে উদার ও সহিষ্ণু আচরণ করা আর তাদের সাথে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা পূণ্য মৈত্রী ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পায় না, তার ইসলামী আদর্শকে বুঝা ও আহলে কেতাবের সাথে মুসলমানদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝার মত পরিছন্ন বোধশক্তি থেকে বঞ্চিত। এ সম্পর্কে কোরআনের যে দ্ব্যর্থহীন নির্দেশাবলী রয়েছে, সে সম্পর্কেও তারা উদাসীন। তাই মুসলিম সমাজে সুনিশ্চিত নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাসরত ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি যে উদারতা ও মহানুভবতা প্রদর্শনের জন্যে ইসলাম আহবান জানায়, তার সাথে তারা মুসলমানদের সেই পারস্পরিক সংযোগ, সহযোগিতা ও একাত্মতাকে তালগোল পাকিয়ে একাকার করে ফেলে, যা তারা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলিম জনতার সাথে বজায় রাখে। অথচ তারা কোরআনে বর্ণিত আহলে কেতাবের এ সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে যায় যে,

'তারা মুসলমানদের সাথে লড়াই-এর বেলায় পরস্পরের সহযোগী ও মিত্র। এটা তাদের চিরন্তন স্বভাব। মুসলমানদের মধ্যে তারা একমাত্র ইসলামকেই আপত্তিকর মনে করে। তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে আহলে কেতাবের ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের ওপর খুশী হবে না। মুসলমানদের ও ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইতে আপোষহীন ও কৃতসংকল্প। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের উষ্মা ও আক্রোশ তাদের মুখ দিয়েই ফুটে বের হয়। আর তাদের মনে লুকানো থাকে আরো ভয়ংকর বিদ্বেষের আগুন।'

আহলে কেতাবের সাথে উদারতা, মহানুভবতা ও সহিষ্ণুতার আচরণ করতে মুসলমান মাত্রকেই আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের সাথে মৈত্রী ও বন্ধুত্বের আচরণ করতে ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানদের ধর্ম, তার বিধিব্যবস্থা ও

তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি অন্য সকল ধর্ম থেকে আলাদা, আহলে কেতাবের সাথেও তার মিল নেই। মুসলমানরা আহলে কেতাবের প্রতি যতো প্রীতি, ভালোবাসা ও মহানুভবতা দেখাক, তাদের নিজ ধর্মের ওপর অবিচলতা ও তার বাস্তবায়ন প্রচেষ্টায় আহলে কেতাব কখনো খুশী হতে পারে না। আর এ কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও যুদ্ধ করার জন্যে তাদের পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতা যথারীতি চলতেই থাকবে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল বিধর্মীরাই এক মঞ্চে

আমরা যদি মনে করি যে, কাফের, মোশরেক ও নাস্তিকদের মোকাবেলায় ধর্ম পালনে আমাদের আহলে কেতাবের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, তাহলে সেটা হবে আমাদের চরম সরলতা ও বোকামি। কেননা মুসলমানদের সাথে যখন লড়াই হয়, তখন তারা কাফের ও মোশরেকদের সাথেই ঐক্যবদ্ধ হয়।

পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের এ যুগেই শুধু নয়, বরং সকল যুগেই এক ধরনের সরলমতি মুসলমান মনে করে যে, যেহেতু আহলে কেতাব ও আমরা ধর্মের অনুসারী, তাই বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদ মোকাবেলার জন্যে আমাদের আহলে কেতাবের সাথে হাতে হাত রেখে চলা উচিত। তারা কোরআনের শিক্ষা ও ইতিহাসের শিক্ষা দুটোই ভুলে যায়। আহলে কেতাব তো মোশরেকদেরকে বলেছিলো যে, মুসলমানদের চেয়ে তোমাদের ধর্ম ভালো। আহলে কেতাব মদীনায় মুসলমানদের ওপর মোশরেকদেরকে চড়াও করেছিলো এবং লড়াইতে সর্ব প্রকারে সহযোগিতা করেছিলো। দু'শো বছর ধরে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ চালিয়েছে। স্পেনে তাদের বিরুদ্ধে চালিয়েছে লোমহর্ষক নির্যাতন। তারাই ফিলিস্তীন থেকে বিতাড়িত করেছে আরব মুসলমানদেরকে এবং তাদের স্থানে এনে বসিয়েছে ইহুদীদেরকে। আর এ কাজে তারা নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছে। আহলে কেতাবই তো নাস্তিক, পৌত্তলিক ও বস্তুবাদীদের সহযোগিতায় মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, আলজেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চীন, রাশিয়া ও ভারত এবং অন্য সব জায়গায় নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ ও নির্বাসনের শিকারে পরিণত করছে। (১)

এর পরও, কোরআনের সমস্ত ঘোষণা ও বিবরণ সত্ত্বেও, আমাদের মুসলমানদের কেউ কেউ মনে করে যে, ধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের আগ্রাসন ঠেকানোর জন্যে আমাদের আহলে কেতাবের সাথে পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতা গড়ার অবকাশ রয়েছে।

নিসন্দেহে এই সব লোক কোরআন পড়ে না। আর পড়লেও ইসলামের স্বভাবগত উদারতা ও মহানুভবতার আহবানকে তারা বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্কের সাথে গুলিয়ে একাকার করে ফেলেছে, যা করতে কোরআন নিষেধ করেছে।

ইসলামকে তারা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র আদর্শ হিসাবেও বোঝে না, একটি ইতিবাচক ও নতুন বাস্তব সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে তৎপর আন্দোলন হিসাবেও উপলব্ধি করে না। এটি সেই আদর্শ ও সেই সমাজ, যা আহলে কেতাবের শত্রুতার মুখে অতীতেও টিকে ছিলো, আজও টিকে আছে। এটা তার অপরিবর্তনীয় চিরন্তন ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভূমিকা।

---

(১) সাম্প্রতিককালের বসনিয়া, হার্সেগোভিনা চেচনিয়া– স্বয়ং তাফসীরকারকের জন্মভূমি মিশরে এই নাস্তিক ও আহলে কেতাবরা কিভাবে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করেছে তার দিকে তাকালে লেখকের উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।–সম্পাদাক

কোরআনের শিক্ষা ও ঘোষণা সম্পর্কে তারা যতই উদাসীন থাকুক না কেন, আমরা তার অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন উক্তিকে ভুলে যেতে পারি না যে,

‘হে মোমেনরা, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না .....।’

প্রাথমিকভাবে এ সম্বোধন যদিও মদীনার মুসলিম সমাজকেই করা হয়েছিলো, কিন্তু সেই সাথে এটা দুনিয়ার সকল ভূখন্ডে কেয়ামত পর্যন্ত যতো মুসলমান বাস করবে, তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সে সময় এ নির্দেশ জারী করার কারণ ছিলো এই যে, মদীনার মুসলমানদের একাংশ ও আহলে কেতাবের একাংশ অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক সম্পর্কচ্ছেদ ঘটতে তখনো বাকী ছিলো। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা, অর্থনৈতিক লেন দেন ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ও যোগাযোগ তখনো চালু ছিলো। মদীনায় বিরাজমান তদানীন্তন সামাজিক অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটা স্বাভাবিক ছিলো। বিশেষত মদীনাবাসী আরব ও ইহুদীদের মধ্যে এই সম্পর্ক বিরাজ করছিলো। আর এই সম্পর্কের সুবাদে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব রকমের ফন্দি ফিকির ও ষড়যন্ত্র আঁটতো। তাদের এই সব রকমারি ষড়যন্ত্রের বিবরণ বিগত পাঁচটি পারা জুড়ে রয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও তার কিছু কিছু রয়েছে।

মুসলমানদের নিজস্ব আকীদা ও আদর্শের প্রচার ও তার নতুন জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্যে যে সংগ্রাম করা প্রয়োজন, সেই সংগ্রামের প্রয়োজনীয় চেতনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করাই ছিলো কোরআনের প্রধান উদ্দেশ্য। তার আরো উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে এমন চূড়ান্ত বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা, যা চারিত্রিক ঔদার্য ও মহানুভবতাকে নিষিদ্ধ করে না। কেননা এটা তো মুসলমানদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এই বিচ্ছেদ দ্বারা সে মুসলমানদের সেই সম্পর্ক, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলো, যা সে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের সাথে ছাড়া আর কারো সাথে রাখতে পারে না। এই সচেতনতা ও এই বিচ্ছেদ প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, চাই সে যে দেশের ও যে প্রজন্মের মানুষই হোক না কেন।

‘তারা পরস্পরের বন্ধু।’....

এটা এমন একটা সত্য, যা কোনো নির্দিষ্ট যুগের সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। কেননা এটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াজাত সত্য। আহলে কেতাব কোনো ভূখন্ডের এবং ইতিহাসের কোনো যুগেই মুসলমানদের বন্ধু হবে না। এই সত্য কথার প্রযোজ্যতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি মুসলমানরা যখন মদীনায় উপস্থিত, তখনো তারা মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে লড়বার জন্যে পরস্পরে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তার পর থেকে ইতিহাসের সকল যুগে ও পৃথিবীর সকল ভূখন্ডে অব্যাহতভাবে চলে আসছে মুসলমানদের ওপর আহলে কেতাবের আগ্রাসন।

বিধর্মীদের সাথে সখ্যতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী

এরপর এই মৌলিক তত্ত্বের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। কেননা ইহুদী ও খৃষ্টানরা যখন পরস্পরের বন্ধু ও মিত্র হয়, তখন তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণকারী তাদেরই একজন হয়ে থাকে। যে মুসলমান এটা করবে, সে নিজেকে ইসলাম থেকে ও মুসলিম উম্মাহ থেকে বহিষ্কার করবে এবং অন্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ এটাই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি।

‘যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, সেও তাদেরই একজন হয়ে যাবে।’

বস্তুত, এ কাজটি করে সে নিজের ওপর, মুসলমানদের ওপর ও ইসলামের ওপর যুলুমকারী বলে চিহ্নিত হবে। এ যুলুমের কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাকে তার মিত্র ও অভিভাবক ইহুদী ও খৃষ্টানদের দলভুক্ত করবেন। তাকে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শনও করবেন না এবং মুসলমানদের দলভুক্তও করবেন না।

'আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে সুপথ দেখান না।'

এটি ছিলো মদীনার মুসলমানদের জন্যে একটি কঠোর হুশিয়ারী। তবে এতে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন ছিলো না। হুশিয়ারীটা কঠোর বটে, তবে বাস্তবসম্মত ছিলো। যে ইহুদী ও খৃষ্টানরা পরস্পরের বন্ধু ও মিত্র, তাদেরকে কোনো মুসলমান বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, আর তার পরও সে মুসলমান ও মোমেন হিসাবে বহাল থাকবে- এটা অসম্ভব। মুসলমানদের মিত্র ও বন্ধু তো একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমান সমাজ। কাজেই তার মুসলমান সমাজের সদস্যপদ বহাল থাকতেই পারে না। এ দুটো সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী জিনিস।

অনুরূপভাবে কোনো মুসলমানের অনুভূতি যদি এতো শিথিল হয় যে, সে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয় না, তাহলে তার পক্ষে ইসলামী আন্দোলনে কোনো মূল্যবান অবদান রাখা সম্ভব হতে পারে না। কেননা ইসলামী আন্দোলন এতো বড় একটি প্রক্রিয়ার নাম, যার পয়লা লক্ষ্য পৃথিবীতে একটি পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, যার সাথে চলমান পৃথিবীর আর কোন রাষ্ট্রের কোনো তুলনাই চলে না এবং যার আদর্শের সাথে আর কোনো রাষ্ট্রের আদর্শের কোনোই মিল নেই।

মুসলমান মাত্রেরই এ ব্যাপারে পূর্ণ প্রত্যয় থাকা চাই যে, তার ধর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম, মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে আগত তাঁর দ্বীনই একমাত্র নির্ভুল জীবন বিধান এবং যে মতাদর্শের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করার আদেশ তাকে দেয়া হয়েছে, সেটাই সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় মতাদর্শ। অন্য কোনো মতাদর্শ এর বিকল্প হতে ও এর অভাব পূরণ করতে পারে না। একমাত্র এই জীবন বিধানের মাধ্যমেই মানুষের জীবন সুষ্ঠু, সুন্দর, শৃংখলাবদ্ধ ও পরিপাটি হয়। এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা ছাড়া আল্লাহ মানুষের পাপ মোচন করবেন না এবং আকীদা বিশ্বাসে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে আল্লাহর এই দ্বীনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন দ্বারাই সে আল্লাহর কাছে ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। এ জন্যে পূর্ববর্তী কেতাবসমূহের যে সব বিধিকে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বহাল রেখেছেন, তা ছাড়া আর কোনো কিছুতে ইসলামী বিধানের সাথে অন্য কোনো ধর্মের বিধানের বিন্দুমাত্র সংমিশ্রণও গ্রহণযোগ্য হবে না।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ উপলব্ধিই একজন মুসলমানকে সমস্ত বাধা বিপত্তি, বিপদ মুসীবত, দুঃখ কষ্ট ও ষড়যন্ত্র অগ্রাহ্য করে আল্লাহর মনোনীত বিধান বাস্তবায়নের সংগ্রাম পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বস্তুত পৃথিবীতে পৌত্তলিকতা, আহলে কেতাব গোষ্ঠীর বিকৃতি ও বিভ্রান্তি অথবা নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি সহ যে রকমারি জাহেলিয়াত প্রচলিত রয়েছে, তার কোনো একটিও যদি ইসলামের শূন্যতা পূরণ করতে পারতো, তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করা ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজন হতো না। এমনকি ইসলামের সাথে আহলে কেতাব ইত্যাদি গোষ্ঠীর পার্থক্যও যদি কম থাকতো এবং আপোষ রফার মাধ্যমে সেই পার্থক্য নিরসন করা যেতো, তাহলেও ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের জন্যে খুব বেশী দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার আবশ্যকতা দেখা দিতো না।

ইসলামের সাথে অন্য সকল বিধানের বা ধর্মের সর্বাত্মক সম্পর্কচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তাকে যারা হালকাভাবে ও নমনীয়ভাবে দেখে এবং এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, ওহী ভিত্তিক ধর্মগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও নমনীয়তা আনয়ন করা প্রয়োজন, তারা ধর্ম ও নমনীয়তা এই উভয় শব্দের অর্থ বুঝতে ভুল করে। তারা এ কথা বুঝতে চেষ্টা করে না যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে আগত সর্বশেষ ধর্ম ইসলামই একমাত্র ধর্ম। আর নমনীয়তা ও উদারতা শুধু ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার ও লেন দেনের ক্ষেত্রেই চলতে পারে, আকীদা বিশ্বাস ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নয়। তারা আসলে মুসলমানদের অন্তরে বদ্ধমূল এই দৃঢ় প্রত্যয়কেই হালকা ও নমনীয় করে দিতে চায় যে, আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মকে গ্রহণ করেন না এবং আল্লাহর এই বিধান ইসলামকেই বাস্তবায়িত করা মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলামের অন্য কোনো বিকল্প গ্রহণ অথবা ইসলামের কোনো রদবদল বা পরিবর্তন সাধন তাদের জন্যে বৈধ নয়, চাই তা যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন। কোরআনই তাদের মধ্যে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করে তার নিম্নোক্ত উক্তিসমূহের মাধ্যমে,

‘আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র ধর্ম।’ ......

‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে গ্রহণ করবে, তা তার কাজ থেকে গ্রহণ করা হবে না।’

‘তাদের সম্পর্কে সাবধান থাকো যেন আল্লাহ তোমার কাছে যে বিধান নাযিল করেছেন তার কোনো অংশ থেকেও তারা তোমাকে বিপথগামী করতে না পারে।’........

‘হে মোমেনরা, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না ....’

বস্তুত কোরআন যে কথা বলে সেটাই চূড়ান্ত। তাই কোরআন থেকে পাওয়া উক্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের ব্যাপারে কোনো মুসলমানের বিন্দুমাত্রও নমনীয় হওয়ার অবকাশ নেই।

মোনাফেকরাই শুধু বিধর্মীদের সাথে মিত্রতা রাখে

যে বাস্তব পরিস্থিতির কারণে কোরআন এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, সেই পরিস্থিতিকে কোরআন পরবর্তী আয়াতে নিম্নরূপ চিত্রিত করেছে,

‘যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদেরকে তুমি দেখতে পাবে, আহলে কেতাবের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এবং বলছে, আমাদের ওপর বিপদাপদ আসে কিনা, সে জন্যে আমরা শংকিত।’ .... (আয়াত নং ৫২)

ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, একবার ওবাদা ইবনে সামেত রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ। আমি জানাতে চাই যে, আজ থেকে আমি ইহুদী ভৃত্যদের মনিব নই। আমি শুধু আল্লাহ ও তার রসূলকে আমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছি।’ এ কথা শোনা মাত্র মোনাফেকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, আমি বিপদের আশংকা করি। আমার ভৃত্যদেরকে আমি ত্যাগ করবো না। রসূল (স.) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে বললেন, ওহে আবুল হুবাব, ইহুদীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে অস্বীকার করে তুমি ওবাদা ইবনে সামেতের চেয়ে অধিকতর কৃপণ সাব্যস্ত হয়েছো। অতএব, তোমাকে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার অনুমতি দেয়া গেলো, কিন্তু ওবাদাকে নয়।’ সে বললো, আমি মেনে নিচ্ছি। এ প্রসংগেই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, ‘হে মোমেনরা! ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না।’

ইবনে জারীর যুহরী থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধে মোশরেকদের পরাজয়ের পর মুসলমানরা তাদের ইহুদী বন্ধুদেরকে বলতে লাগলো, ‘তোমাদের ওপর আবার কখন বদরের মতো

দিন এসে পড়ে তার ঠিক নেই। সময় থাকতে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।' মালেক ইবনুস্ সাইফ নামক ইহুদী বললো, কোরায়শদের মতো যুদ্ধে অনভিজ্ঞ একটা গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে পেরে তোমরা গর্বে মেতে উঠেছো, কেমন? আমরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করি, তাহলে তোমরা আমাদের সাথে লড়াইতে পেরে উঠবে না।' একথা শোনার পর ওবাদা ইবনুস সামেত রসূল (স.)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার ইহুদী মিত্ররা জনবল, অস্ত্রবল ও ধন বলে প্রবল শক্তিধর। আমি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে জানাচ্ছি যে, আমি ইহুদীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, 'কিন্তু আমি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি না। আমি এমন এক ব্যক্তি যে, তাদের ছাড়া আমার চলবেই না।' রসূল (স.) তাকে বললেন, ওহে আবুল হুবাব, তুমি ভেবে দেখেছো কি যে, ইহুদীদের বন্ধুত্ব দ্বারা তুমি ওবাদা ইবনে সামেতের চেয়ে কতখানি বেশী মর্যাদাশালী হয়েছো? তোমাকে এই সুযোগ দেয়া গেলো, কিন্তু ওবাদাকে নয়।' তখন সে বললো, 'আমি মেনে নিলাম।'

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.)-এর সাথে সম্পাদিত নিরাপত্তা ও শান্তি চুক্তি সর্বপ্রথম যে ইহুদী গোত্রটি ভংগ করে, সেটি হলো বানু কাইনুকা। ভংগ করা মাত্রই রসূল (স.) তাদেরকে অবরোধ করলেন। এতে তারা রসূল (স.)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপোষ রফা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। রসূল (স.) যখন বনু কাইনুকাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন, অমনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এসে রসূল (স.)-কে বললো, হে মোহাম্মদ! আমার মিত্রদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। রসূল (স.) তার কথা অগ্রাহ্য করলেন। সে নাছোড় বান্দা হয়ে রসূল (স.)-এর লৌহ বর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো। রসূল (স.) বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। এই সময় তাঁর মুখ-মন্ডলে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠলো। অতপর পুনরায় বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। সে বললো, না, আল্লাহর কসম, আমার মিত্রদেরকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমি ছাড়বো না। বনু কাইনুকার চারশো বর্মহীন ও তিনশো বর্মধারী যোদ্ধা আমাকে সারা পৃথিবীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। অথচ আপনি তাদেরকে এক সকালেই সাবাড় করে দিতে চান? আমি বিভিন্ন বিপদের আশংকা করি। তখন রসূল (স.) বললেন, তোমার মিত্ররা তোমারই রইলো, (অর্থাৎ মাফ করা হলো।)

মোহাম্মদ বিন ইসহাক আরো বর্ণনা করেন যে, বনু কাইনুকা যখন রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধালো, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের পক্ষ নিলো ও তাদেরকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হলো। পক্ষান্তরে খাযরাজ গোত্রের ওবাদা ইবনে সামেত রসূল (স.)-এর কাছে গেলেন। তাঁরও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মতো বিপুল সংখ্যক ইহুদী মিত্র ছিলো। কিন্তু তিনি তাদেরকে রসূল (স.)-এর হাতে সোপর্দ করলেন, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদের সাথে মিত্রতা পরিত্যাগ করলাম, একমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করলাম। আমি কাফেরদের মৈত্রী ও চুক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। এই ওবাদা ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কেই নাযিল হয় ৫১ নং আয়াত থেকে ৫৬ নং আয়াত পর্যন্ত।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ওসামা ইবনে যায়েদ বলেছেন, আমি রসূল (স.)-এর সাথে অসুস্থ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে দেখতে গেলাম। এই সময় রসূল (স.) তাকে বললেন, আমি তোমাকে ইহুদীদের ভালোবাসতে নিষেধ করেছিলাম। আব্দুল্লাহ বললো, আসয়াদ ইবনে যারারা তাদেরকে ঘৃণা করে। এরপর সংগে সংগেই সে মারা গেলো। (আবু দাঊদ)

ইসলামের শত্রু মিত্র

এই রেওয়াতগুলো থেকে সামগ্রিকভাবে তৎকালীন মুসলিম সমাজের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। সেই অবস্থাটা ছিলো আসলে মদীনার রসূল পূর্ব যুগের অবস্থারই উত্তরাধিকার। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, সে যুগ থেকে মদীনায় যে ধরনের ধ্যান ধারণা ও মানসিকতা বিরাজ করছিলো, তা দ্বারা ইহুদী মুসলমান সম্পর্ক টিকে থাকা বা না থাকার ব্যাপারে কোনো অটুট ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতো না। তবে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এই রেওয়াতগুলোতে শুধু ইহুদীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টানদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে আয়াতের বক্তব্যে ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় গোত্রই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত আয়াতে মুসলমান ও অমুসলমানদের (চাই আহলে কেতাব হোক বা পৌত্তলিক) মাঝে বিরাজমান চিরন্তন সম্পর্ক, অবস্থা ও ধারণাকেই তুলে ধরা হয়েছে। এ কথা সত্য যে, রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় মুসলমানদের সম্পর্কে ইহুদী ও খৃষ্টানদের দৃষ্টিভংগিতে কিছুটা পার্থক্য ছিলো। যেমন এই সূরার এক আয়াতে বলা হয়েছে,

'তুমি দেখবে, মোমেনদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো ইহুদী ও মোশরেকগণ, আর তাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু খৃষ্টানরা .....'

কিন্তু এতদসত্ত্বে এ আয়াতে উভয় গোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে সমান করে দেয়া হয়েছে। আর পরবর্তী একটি আয়াতে মোশরেক ও আহলে কেতাবকে পর্যন্ত একাকার করে ফেলা হয়েছে, অন্তত মৈত্রী ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে। কারণ এর গোড়ায় রয়েছে একটা স্থায়ী মূলনীতি। সেটি এই যে, কোনো মুসলমানের অপর একজন মুসলমান ব্যতীত কারো সাথে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক বন্ধুত্ব থাকতে পারবে না, আর মুসলমান আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মুসলিম সমাজ ব্যতীত আর কারো সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী পাতাতে পারবে না। এই একটি বিষয় ছাড়া আর সব কিছুতে সকল সম্প্রদায় ইসলামের দৃষ্টিতে সমান, চাই ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমানদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভংগিতে যতোই ভারসাম্য থাক না কেন।

এই সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ এই চিরন্তন ও আপোসহীন মূলনীতি নির্ধারণ করলেও তাঁর জ্ঞান শুধু রসূল (স.)-এর জীবিতকালীন সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তিনি সর্বকালের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুলতম ও সূক্ষ্মতম জ্ঞানের অধিকারী। পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানরা যে শত্রুতার পরিচয় দিয়েছে, তা ইহুদীদের শত্রুতার চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না। যদিও ইসলামকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে গ্রহণে আরব ও মিসরের খৃষ্টানদের ব্যতিক্রমী ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে, কিন্তু পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের যে ভূমিকা দেখতে পাই, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, আগ্রাসী যুদ্ধ ইত্যাদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালানো ইহুদীদের সর্বকালের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো, পাশ্চাত্যের খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র ইতিহাস জুড়েই সেই সব কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। এমনি যে আবিসিনিয়ার রাজা মুসলমানদেরকে ও ইসলামকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, সেই আবিসিনিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে অন্য সমস্ত আক্রমণকারীকে টেক্কা দিয়েছে। তার এ আচরণের সাথে একমাত্র ইহুদীদের আচরণেরই তুলনা চলে।

আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ বিধায় কোরআন নাযিল হবার সময় খৃষ্টানদের ভিন্ন ধরনের অর্থাৎ চমকপ্রদ ভূমিকা পালন করা সত্তেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সকল অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি একই ধরনের সতর্কতামূলক মনোভাব পোষণ করার সাধারণ মূলনীতি ঘোষণা করেছেন। ব্যতিক্রমী ধরনের মহৎ আচরণ যে কোনো যুগে, যে কোনো দেশে, যে কোনো ব্যক্তি দেখাতে পারে।

ইসলাম ও মুসলমানরা- যদিও অনেকেই তেমন ভালো মুসলমান নয়- পৃথিবীর সর্বত্র ইহুদী ও খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে আগ্রাসী যুদ্ধের শিকার হয়ে চলেছে। এ দ্বারা আল্লাহর এই উক্তি 'কাফেররা পরস্পরের মিত্র ও বন্ধু'-এর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয় অকাট্যভাবে। আর এ দ্বারা একথাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে যে উপদেশ দিয়েছেন, যে আদেশ ও নিষেধ তাদের প্রতি জারী করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের অনুগতদের মধ্যে ও অবাধ্যদের মধ্যে সর্বাত্মক দূরত্ব ও বিচ্ছেদ অবলম্বনের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম মুসলমানদেরকে আদর্শের ভিত্তিতে সকল মানুষের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার আদেশ দেয়। সুতরাং মুসলমানের চিন্তায় ও কর্মে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের কোনো অস্তিত্ব যদি থেকেই থাকে,তবে তা আদর্শ ও আকীদাকে কেন্দ্র করেই থাকতে পারে। কাজেই মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে আর যাই হোক, বন্ধুত্ব তথা সাহায্য-সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা তাদের পক্ষে আদর্শের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা করাও সম্ভব নয়। এমনকি যদি তা নাস্তিক্যবাদের মোকাবেলায় হয় তবুও নয়। আমাদের মধ্যকার কিছু সরলমতি মানুষ এবং কোরআন পড়ে না এমন কিছু মানুষ এ ধারণা পোষণ করে থাকে বটে। অথচ বাস্তবে তা অসম্ভব। মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে এমন কোনো অভিন্ন আদর্শিক বিষয়ই যখন নেই, যার জন্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা বিনিময় করা যায়, তখন আর কিভাবে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে?

ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন

কিছু সংখ্যক লোক কোরআন অধ্যয়ন না করা, ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ না জানা এবং প্রতারণাপূর্ণ অপপ্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে মনে করে যে, ধর্মাবলম্বীরা সবাই এক শ্রেণীভুক্ত এবং নাস্তিক্যবাদীরা সবাই আর এক শ্রেণীভুক্ত। তাই নাস্তিক্যবাদের মোকাবেলায় ধর্মপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানো বাঞ্ছনীয়। কেননা নাস্তিক্যবাদ তো সব ধর্মকেই অস্বীকার করে এবং ধার্মিকতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালায়।

কিন্তু এই চিন্তাধারাকে ইসলাম সমর্থন করে না। যে মুসলমান ইসলামের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে, সেও এটাকে মেনে নিতে পারে না। ইসলামের প্রকৃত স্বাদ কেবল সেই ব্যক্তিই পায়, যে ইসলামকে শুধু একটি বিশ্বাস নয়, বরং এই বিশ্বাস থেকে গড়ে ওঠা এমন একটা সর্বাত্মক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করে, যার উদ্দেশ্য ইসলামী রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

ইসলাম কী জিনিস, সেটা ইসলামী আদর্শে ও মুসলমানদের চেতনায় একই রকম স্পষ্ট ও পরিচিত। ধর্ম শুধু ইসলামই। অন্য কোনো ধর্মকে ইসলাম ধর্মরূপে স্বীকারই করে না। কেননা একথা আল্লাহ তায়ালা নিজেই কোরআনের একাধিক জায়গায় বলেছেন। ৫১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি এ ধরনের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করেছি। মোহাম্মদ (স.)-এর রসূল হয়ে আবির্ভূত হওয়ার পর ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু আল্লাহর পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়নি। আর ইসলামের সেই রূপটিই গ্রহণযোগ্য, যা মোহাম্মদ (স.) নিয়ে এসেছেন। মোহাম্মদ (স.)-এর পূর্বে খৃষ্টধর্ম গ্রহণযোগ্য ছিলো। এখন তা আর গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ যোগ্য ছিলো। তাঁর আগমনের পর ওটার আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

মোহাম্মদ (স.)-এর রসূল হয়ে আগমনের পর আহলে কেতাব- ইহুদী ও খৃষ্টান গোষ্ঠীদ্বয়ের অস্তিত্ব থাকার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অনুসৃত ধর্মকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন বা তাদের অনুসৃত ধর্মকে নিজের অনুমোদিত ধর্মের মর্যাদা দেন। শেষ নবীর আগমনের পূর্বে তা

গ্রহণযোগ্য ছিলো বটে, কিন্তু তারপর ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মের স্বীকৃতি না আছে ইসলামী আদর্শে, না আছে মুসলমানদের চেতনায়। খোদ কোরআনেই একথা অকাট্যভাবে বিবৃত হয়েছে।

একথা সত্য যে, ইসলাম তাদেরকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। কেননা ইসলামে ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তির অবকাশ নেই। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, তারা ধর্মের নামে যা কিছু অনুসরণ করে, তাকেই 'ধর্ম' হিসাবে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় এবং তাদেরকে একটা বৈধ ধর্মের অনুসারী মনে করে। তাই নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে মিলিত হয়ে কোন ধর্মীয় ঐক্যজোট গঠন ইসলামের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম। ইসলাম ছাড়া আর সব কিছু অধর্ম বা ধর্মহীনতা। এই অধর্ম পরবর্তীতে তিন রকমের মতবাদের রূপ নিয়ে থাকে। প্রথমত, এমন মতবাদ, যার মূলতত্ত্ব আল্লাহর কাছ থেকে আগত, কিন্তু তাকে বিকৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এমন মতবাদ, যার মূল পৌত্তলিকতা এবং তা পৌত্তলিকতার আকারেই টিকে আছে, তৃতীয়ত নাস্তিকতা যা যাবতীয় ধর্মকে অস্বীকার করে। এই তিন ধরনের মতবাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা থাকলেও এর প্রত্যেকটিই ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী। এর কোনোটির সাথে ইসলামের কোনো মৈত্রী বা বন্ধুত্ব নেই।

মুসলমানরা আহলে কেতাবের সাথে সামাজিক লেন দেন ও আচার ব্যবহার বজায় রাখে। ইসলাম তাদেরকে এই লেন দেন ও আচার ব্যবহার উত্তমভাবে করতে শিক্ষা দেয় ও দাবী জানায় যতোক্ষণ তারা মুসলমানদেরকে কষ্ট না দেয়। এমনকি মুসলমানদেরকে সতী সাধ্বী ইহুদী বা খৃষ্টান মহিলাদেরকে বিয়ে করারও অনুমতি দেয়া হয়। অবশ্য ফেকাহ শাস্ত্রে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, যে সব খৃষ্টান মহিলা হযরত ঈসাকে আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র বা তিন খোদার একজন বলে বিশ্বাস করে, সে সব মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয কিনা এবং তারা আহলে কেতাবের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে, না মোশরেক বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি ধরেও নেই যে, ইহুদী ও খৃষ্টান মহিলারা যে ধরনের আকীদা বিশ্বাসেরই অধিকারী হোক না কেন, তাদেরকে সর্বাবস্থায় বিয়ে করা জায়েয, তাহলেও উত্তম আচরণ ও বিয়ের বৈধতার অর্থ ধর্মীয় ব্যাপারে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা নয়। তার অর্থ এও নয় যে, মোহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পর আহলে কেতাবের ধর্মকে মুসলমানরা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং নাস্তিক্যবাদ রোধের জন্যে তাদের সাথে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করতে পারে।

ইসলাম আহলে কেতাব, মোশরেক ও পৌত্তলিক সকলেরই আকীদা বিশ্বাসকে সংশোধন করতে এসেছে এবং তাদের সকলকেই ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছে। কারণ একমাত্র এই ধর্মকেই আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন করেন, অন্য কোনো ধর্মকে নয়। অতপর ইহুদীরা যখন বুঝতে পারলো যে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে না এবং ইসলামের দাওয়াত দেয়া হলে তারা তাতে খুশীও হতে পারবে না, তখন কোরআন তাদের এই মানসিকতাকে রুখে দাঁড়ালো এবং তাদেরকে জানালো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। সে দাওয়াত অগ্রাহ্য করলে তারা কাফের বলে গণ্য হবে। নাস্তিক ও পৌত্তলিকদের ন্যায় আহলে কেতাবকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়া মুসলমানের কর্তব্য ও দায়িত্ব। কিন্তু এদের কাউকে ইসলাম গ্রহণে বলপ্রয়োগ করা, চাপ দেয়া বা বাধ্য করার অনুমতি তাকে দেয়া হয়নি। কেননা বলপ্রয়োগে মানুষের অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না। বলপ্রয়োগ শুধু যে নিষিদ্ধ তা নয়, বরং তা নিষ্ফলও।

আহলে কেতাব যে ধর্ম অনুসরণ করে চলেছে, মোহাম্মদ (স.)-এর আগমনের পরও তাকে যদি মুসলমানরা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে করে, তবে তাদের পক্ষে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কোনো অর্থ থাকে না। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব মুসলমানদের

ওপর কেবল তখনই অর্পিত হয়, যখন তারা তাদের অনুসৃত ধর্মকে ধর্ম বলেই স্বীকার করে না। এ জন্যেই তারা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানায়।

এই স্বতসিদ্ধ অকাট্য যুক্তির পর যারা ইসলামের অনুসারী নয়, তাদের সাথে মৈত্রী ও সহযোগিতার মাধ্যমে পৃথিবীতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা মুসলমানদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়।

ইসলামের সাথে বাতিলের ঐক্য সম্ভব নয়

ইসলামের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি একাধারে ঈমান ও আকীদার সাথে এবং আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পৃক্ত হবার কারণে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আমার উপরোক্ত আলোচনা ও কোরআনের দ্ব্যর্থহীন উক্তিসমূহের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুসলমান ও আহলে কেতাবের মধ্যে কোনো ঐক্য মৈত্রী ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা অসম্ভব। বিষয়টি আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে জড়িত হবার কারণেও এটা স্পষ্ট যে, আহলে কেতাব ও মুসলমানদের ঐক্য ও মৈত্রী অসম্ভব। একজন মুসলমানের যাবতীয় চেষ্টা সাধনা যেখানে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হওয়া উচিত, সেখানে তার পক্ষে এই চেষ্টায় এমন লোকের সাথে সহযোগিতা করা কিভাবে সম্ভব, যে ইসলামকে আদৌ নিজের ধর্ম, জীবন ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং আইন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে না? মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্যে প্রযোজ্য এবং যাবতীয় কর্মকান্ডের ওপর প্রযোজ্য আল্লাহর দেয়া ও মোহাম্মদ (স.) আনীত জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি ছোট-বড় বিধিকে যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে ও শর্তহীনভাবে মেনে নেয় না, সে তো পুরোপুরি কাফের ও অমুসলিম। এ ধরনের লোকের সাথে একজন মুসলমানের ঐক্য ও সহযোগিতা কিভাবে সম্ভব? এ ধরনের লোকের চেষ্টা সাধনার লক্ষ্য ইসলামের ও তার লক্ষ্যের পরিপন্থী মহলেও অন্ততপক্ষে ইসলামের লক্ষ্য থেকে ভিন্ন তো হবেই। ইসলাম তো ইসলামী আকীদা ও আদর্শ ভিত্তিক কাজ বা উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো আকীদা ও আদর্শ ভিত্তিক কাজ ও লক্ষ্যকে স্বীকৃতিই দেয় না, চাই তা যতই ন্যায়সংগত লক্ষ্য বা কাজ হোক না কেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা কুফরীতে লিপ্ত, তাদের সৎ কাজ ঝড়ের দিনে বাতাসের প্রবল ঝাপটার কবলে পতিত ছাই এর স্তূপের ন্যায়।'

ইসলাম মুসলমানকে তার সমগ্র চেষ্টা সাধনা ইসলামের জন্যে নিয়োজিত করার নির্দেশ দেয়। তার জীবনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকেও ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা বা ইসলামের বাইরে রাখার কোনোই অবকাশ নেই। বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে শুধু সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম ও তার জীবন ব্যবস্থা কী তা জানে না। জীবনের এমন কোনো দিক কল্পনাও করা যায় না যা ইসলাম বহির্ভূত এবং যার ব্যাপারে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী বা মুসলমানরা ইসলাম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আর কোনোভাবেই তাদের ওপর খুশী হয় না এমন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সহযোগিতা করা বা নেওয়া যেতে পারে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা মুসলমানদের ওপর কখনো খুশী হবে না যতক্ষণ তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করে। সুতরাং এহেন ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের মুসলমানত্ব বজায় রেখে সহযোগিতা করা আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে যেমনি অসম্ভব, তেমনি বাস্তবতার দিক দিয়েও অসম্ভব।

এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এই বলে ওজুহাত দাঁড় করেছিলো যে, 'আমি বিপদের আশংকা করি।' এই লোকটির অন্তরে ছিলো ব্যাধি। ইহুদীদের সাথে মিত্রতা ও বন্ধুত্ব রক্ষার্থে সে যে ছুটোছুটি ও চেষ্টা সাধনা করতো, তা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে সে এই ওজুহাত দাঁড় করায়। অথচ এটা ছিলো তার ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। মানুষের অভিভাবক ও সাহায্যকারী

হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া শুধু যে গোমরাহী তা নয়, বরং ব্যর্থ ও নিষ্ফল চেষ্টাও বটে। ইবনে সালুল যে ওজুহাত পেশ করেছিলো, ওটা সর্বকালের সকল সুবিধাবাদী ইবনে সালুলরাই পেশ করে থাকে। তার এ চিন্তাধারা এমন প্রত্যেক মোনাফেকই পোষণ করে থাকে, যার মন রোগাক্রান্ত এবং যে প্রকৃত ঈমান কী তা জানে না। পক্ষান্তরে, ইহুদীদের কার্যকলাপ দেখার পর ওবাদা ইবনে সামেতের অন্তরে তাদের মৈত্রী ও বন্ধুত্বের প্রতি ঘৃণা জন্মে যায়। কেননা তাঁর মন ছিলো ঈমানদার। তাই তিনি ইহুদীদের বন্ধুত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল সেটি বুকে টেনে নিয়েছিলো।

এ দুটো আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চিন্তা ও চেতনা থেকে তার উৎপত্তি। এ ধরনের বিভিন্নতা ঈমানদার অন্তরে ও ঈমানের তাৎপর্য বোঝে না এমন অন্তরের মধ্যে সর্বকালেই বিরাজমান।

যারা ইসলামের শত্রুদের কাছ থেকে ও সেই সব মোনাফেকের কাছ থেকে সাহায্য চায়, যাদের আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস, ভালোবাসা ও নির্ভরশীলতা নেই, তাদেরকে কোরআন এই বলে হুশিয়ার করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হয়তো অচিরেই মুসলমানদেরকে বিজয় এনে দিতে পারেন অথবা এমন কিছু ঘটাতে পারেন, যা দ্বারা কার কী ভূমিকা ও তৎপরতা এবং কে পর্দার আড়ালে কপটতা ও ভন্ডামির বেসাতি চালিয়ে যাচ্ছে, তা ফাঁস হয়ে যাবে।

'আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই বিজয় এনে দিবেন.......।'

এ ধরনের বিজয় যখন আসবে , চাই সেটা মক্কা বিজয়ের আকারেই আসুক, অথবা বিজয়ের অর্থ মোমেন ও মোনাফেকদের পার্থক্য ফাঁস করে দেয়া হোক, অথবা আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্ত তথা শাস্তি যখন নাযিল করা হবে, তখন যাদের মনে ব্যাধি ছিলো, তারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মৈত্রী বজায় রাখার চেষ্টা ও তৎপরতা চালানোর জন্যে এবং ফাঁস হয়ে যাওয়া ভন্ডামি ও দ্বিমুখী আচরণের জন্যে অনুতপ্ত হবে। এই সময় মোমেনদের কি অবস্থা হবে, সেটা তুলে ধরা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। বলা হয়েছে যে, মোনাফেকদের এই অবস্থা দেখে মোমেনরা অবাক হয়ে যাবে এবং তাদের অতীতের ভন্ডামিপূর্ণ আচরণ ও তার ক্ষতিকর পরিণতির জন্যে তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে।

'মোমেনরা বলবে এরাই কি সেই সব লোক, যারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলতো যে, তারা তোমাদের সাথে আছে? তাদের সমস্ত সৎকাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' (আয়াত নং ৫৩)

আল্লাহ একদিন যথার্থই বিজয় দিয়েছিলেন। সেদিন ভন্ড মোমেনদের গোপন দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো। তাদের সৎ কাজগুলো বাতিল হয়ে গিয়েছিলো এবং তারা বিফল মনোরথ হয়ে গিয়েছিলো। আজও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় এসে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আমাদের জন্যে বহাল রয়েছে। যদি আমরা একমাত্র আল্লাহর সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হই, একমাত্র তাঁর জন্যেই আমাদের মৈত্রী ও ভালবাসাকে নিয়োজিত রাখি, তাঁর বিধানকে হৃদয়ঙ্গম করি, সেই বিধানের ওপর আমাদের চিন্তাধারাকে বহাল রাখি, আল্লাহর হেদায়াত ও শিক্ষার বাস্তবায়নের জন্যে লড়াই ও আন্দোলন পরিচালনা করি এবং আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসূল ও মোমেনদেরকে একমাত্র বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করি।

এ পর্যন্ত এসে মোমেনদের উদ্দেশ্যে কোরআনের প্রথম বক্তব্য শেষ হয়েছে। এতে তাদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে মৈত্রী স্থাপনে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের মাধ্যমে নিজদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং অচেতনভাবে

ইসলামের বহির্ভূত ও তাদের ও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যায়। এরপর শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বক্তব্য। এতে যারা মৈত্রী স্থাপন বা অন্যান্য উপায়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে, তাদেরকে এই বলে হুশিয়ারী সংকেত দেয়া হয়েছে যে, তাদের মুরতাদ হওয়াতে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না। এ দ্বারা তারা আল্লাহকে অক্ষম করে দিতেও পারবে না, কিংবা ইসলামেরও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। ইসলামের ভক্ত, অনুরক্ত ও সাহায্যকারী একটি দল আল্লাহর জানা মতে প্রস্তুত ও সংরক্ষিত রয়েছে। মোমেনদের একটি দল যদি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে পিছিয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অপর দলকে এ কাজে নিয়োজিত করবেন। এখানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে আল্লাহর জানা মতে সংরক্ষিত সেই প্রিয় দলটির নিদর্শনাবলী তুলে ধরা হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রিয়, চমকপ্রদ ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী। এখানে মুসলমানদের মিত্র ও বন্ধু হবার যোগ্য একমাত্র গোষ্ঠীটির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই বক্তব্যের সমাপ্তি টানা হয়েছে আল্লাহর এই প্রিয় গোষ্ঠী বা দলের পরিচালিত লড়াই-এর শেষ পরিণতি জানানোর মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, সেই পরিণতি হচ্ছে বিজয় এবং তা সেই দলের ভাগ্যেই জুটবে, যারা শুধু আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মোমেনদেরই নিজেদের মিত্র, বন্ধু ও সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করবে।

'হে মোমেনরা! তোমাদের মধ্য হতে যারা ইসলামকে পরিত্যাগ করবে, তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ এমন একটি গোষ্ঠীকে নিয়ে আসবেন, ...(৫৪, ৫৫ ও ৫৬)

এখানে যে ভংগিতে ইসলাম পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে হুমকি দেয়া হয়েছে তাতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব এবং ইসলাম পরিত্যাগের মধ্যে একটা যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষত 'তোমাদের মধ্যে যারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত'– এই উক্তির মধ্য দিয়ে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টান, ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত ও ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বনকারী রূপে আখ্যায়িত করার পর এই হুমকি তাৎপর্যপূর্ণ। এদিক দিয়ে দ্বিতীয় সম্বোধন অর্থাৎ 'হে মোমেনরা, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম পরিত্যাগ করবে' প্রথম সম্বোধন অর্থাৎ 'হে মোমেনরা, তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না' এর সত্যায়ক ও সমর্থক বলে গণ্য হবে। এরপর তৃতীয় যে সম্বোধন সামনে আসছে তাও এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। আহলে কেতাব ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞার পর এ কথা বলে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনেরই শামিল। এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, ইসলামে কাফেরদের ও আহলে কেতাবের সাথে আচরণে যেটুকু পার্থক্য করা হয়েছে, তা বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর ক্ষেত্রে নয় বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেই করা হয়েছে।

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির একমাত্র যোগসূত্র

'হে মোমেনরা, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ধর্ম (ইসলাম) পরিত্যাগ করবে ......'

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মোমেনদের দলকে যে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে নির্বাচিত করেছেন এবং এই দ্বীন ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কল্যাণ, পবিত্রতা ও সততা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সেটা নিছক আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা। যে ব্যক্তি আল্লাহর এই অনুগ্রহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায়, সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার গ্রহণ বা বর্জনে আল্লাহর কিছুই আসে-যায় না। আল্লাহ তায়ালা এই অসাধারণ অনুগ্রহের জন্যে তাকেই নির্বাচিত করেন, যাকে এর যোগ্য মনে করেন। যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেন, তাদের সুস্পষ্ট আলামত ও গুণ বৈশিষ্ট্যের চিত্র এখানে এভাবে তুলে ধরেছেন যে,

'আল্লাহ তায়ালা এমন একটি গোষ্ঠীকে আবির্ভূত করবেন-যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে।'

অর্থাৎ পারস্পরিক ভালোবাসা ও সন্তোষই হচ্ছে তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। প্রেম, প্রীতি ও মমতাই তাদের প্রেমময় প্রভুর সাথে তাদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করে। লক্ষ কোটি বান্দার মধ্য থেকে কোনো একজন বান্দার প্রতি আল্লাহর এই ভালোবাসার তাৎপর্য কী এবং তা কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা একমাত্র সেই ব্যক্তিই বুঝে, যে আল্লাহকে তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে চিনে, নিজ চেতনায়, অনুভূতিতে, হৃদয়ে ও সমগ্র সত্ত্বায় সেই গুণাবলীর প্রভাব উপলব্ধি করে, যে সকল অনুগ্রহের অনুগ্রাহক মহান আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানে, এই মহাবিশ্বের এবং এই মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র সৃষ্টি মানুষের স্রষ্টা কে তা জানে এবং কে সেই অতুলনীয়, মহা শক্তিধর বিশ্ব বিধাতা, আর কেইবা তার এই অনুগৃহীত প্রিয় বান্দা তা জানে। বস্তুত তাঁর এ বান্দা মানুষ তাঁরই সৃষ্টি। চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, অনাদি, অনন্ত, প্রকাশ্য ও গোপন মহাপ্রতাপশালী ও মহামহিম আল্লাহর সৃষ্টি।

অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসাও এমন এক নেয়ামত, যা এই ভালোবাসার স্বাদ উপভোগকারী ছাড়া আর কেউ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা যেমন অসাধারণ নেয়ামত, তেমনি তার ভালোবাসা ও পরিচয় লাভের পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যে অনুগ্রহ করেন, তাও এক অনুপম অনুগ্রহ।

বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা এই দুটোই মানবীয় ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। একমাত্র সত্যিকার তাসাউফপন্থীরাই এই ভালোবাসার কিছু কিছু বর্ণনা দিতে পারেন– তাসাউফের খোলস-ধারীরা নয়। রাবেয়া আদভিয়ার কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আমার চেতনায় এই অতুলনীয় ভালোবাসার প্রকৃত স্বাদ এনে দেয়,

'জীবন যতো তিক্তই হোক না কেন, তুমি যেন আমার কাছে মিষ্টই থাকো।'

সমগ্র জগত আমার প্রতি রুষ্ট থাক, তুমি যেন আমার প্রতি তুষ্ট থাকো।

আমার সাথে সমগ্র জগতবাসীর সম্পর্ক যতোই খারাপ থাক, তোমার সাথে যেন আমার সম্পর্ক ভালো থাকে।

আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা যদি নিখাদ হয়, তবে সব কিছুই আমার কাছে সহজ এবং পৃথিবীর ওপরে বিরাজমান সব কিছুই মাটির মতো নরম ও সরস।'

মহান আল্লাহর এই ভালোবাসা গোটা বিশ্বজগত জুড়ে বিস্তৃত হয়, প্রতিটি পদার্থ ও প্রাণীতে তার ছাপ পড়ে এবং তা গোটা প্রকৃতি ও গোটা মানব জাতিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আর যে বিশেষ বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করে, সে এই ভালোবাসায় গোটা সৃষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে এবং তারই কল্যাণে গোটা সৃষ্টি কল্যাণময় হয়।

ইসলামী আদর্শ মোমেন বান্দাকে তার প্রতিপালকের সাথে এই বিস্ময়কর বন্ধনে আবদ্ধ করে। আর অস্থায়ীভাবে নয় বরং চিরস্থায়ীভাবে আবদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয় যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্যে ভালোবাসা বরাদ্দ করবেন।'...... 'নিশ্চয় আমার প্রভু দয়াময় ও প্রেমময়।' ....'তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়।' 'যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন জানিয়ে দাও যে, আমি কাছেই আছি, প্রার্থনাকারী যখনই আমার কাছে প্রার্থনা করে, তখনই আমি তা গ্রহণ করি।' .... 'যারা মোমেন তারা আল্লাহকে অধিকতর ভালোবাসে।' 'বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব আয়াত অধ্যয়ন করেও যারা বলে যে, ইসলাম একটা নীরস, নির্মম ও কাটখোট্টা আদর্শ, মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্ককে কেবল শাস্তি ও কঠোরতা সম্পর্ক বলে আখ্যায়িত করে তাদের কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারি না। সত্য বটে, খৃষ্টবাদ যেমন ঈসা মাসীহকে আল্লাহর পুত্র

অর্থাৎ পারস্পরিক ভালোবাসা ও সন্তোষই হচ্ছে তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। প্রেম, প্রীতি ও মমতাই তাদের প্রেমময় প্রভুর সাথে তাদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করে। লক্ষ কোটি বান্দার মধ্য থেকে কোনো একজন বান্দার প্রতি আল্লাহর এই ভালোবাসার তাৎপর্য কী এবং তা কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা একমাত্র সেই ব্যক্তিই বুঝে, যে আল্লাহকে তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে চিনে, নিজ চেতনায়, অনুভূতিতে, হৃদয়ে ও সমগ্র সত্ত্বায় সেই গুণাবলীর প্রভাব উপলব্ধি করে, যে সকল অনুগ্রহের অনুগ্রাহক মহান আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানে, এই মহাবিশ্বের এবং এই মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র সৃষ্টি মানুষের স্রষ্টা কে তা জানে এবং কে সেই অতুলনীয়, মহা শক্তিধর বিশ্ব বিধাতা, আর কেইবা তার এই অনুগৃহীত প্রিয় বান্দা তা জানে। বস্তুত তাঁর এ বান্দা মানুষ তাঁরই সৃষ্টি। চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, অনাদি, অনন্ত, প্রকাশ্য ও গোপন মহাপ্রতাপশালী ও মহামহিম আল্লাহর সৃষ্টি।

অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসাও এমন এক নেয়ামত, যা এই ভালোবাসার স্বাদ উপভোগকারী ছাড়া আর কেউ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা যেমন অসাধারণ নেয়ামত, তেমনি তার ভালোবাসা ও পরিচয় লাভের পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যে অনুগ্রহ করেন, তাও এক অনুপম অনুগ্রহ।

বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা এই দুটোই মানবীয় ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। একমাত্র সত্যিকার তাসাউফপন্থীরাই এই ভালোবাসার কিছু কিছু বর্ণনা দিতে পারেন– তাসাউফের খোলস-ধারীরা নয়। রাবেয়া আদভিয়ার কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আমার চেতনায় এই অতুলনীয় ভালোবাসার প্রকৃত স্বাদ এনে দেয়,

'জীবন যতো তিক্তই হোক না কেন, তুমি যেন আমার কাছে মিষ্টই থাকো।'

সমগ্র জগত আমার প্রতি রুষ্ট থাক, তুমি যেন আমার প্রতি তুষ্ট থাকো।

আমার সাথে সমগ্র জগতবাসীর সম্পর্ক যতোই খারাপ থাক, তোমার সাথে যেন আমার সম্পর্ক ভালো থাকে।

আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা যদি নিখাদ হয়, তবে সব কিছুই আমার কাছে সহজ এবং পৃথিবীর ওপরে বিরাজমান সব কিছুই মাটির মতো নরম ও সরস।'

মহান আল্লাহর এই ভালোবাসা গোটা বিশ্বজগত জুড়ে বিস্তৃত হয়, প্রতিটি পদার্থ ও প্রাণীতে তার ছাপ পড়ে এবং তা গোটা প্রকৃতি ও গোটা মানব জাতিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আর যে বিশেষ বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করে, সে এই ভালোবাসায় গোটা সৃষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে এবং তারই কল্যাণে গোটা সৃষ্টি কল্যাণময় হয়।

ইসলামী আদর্শ মোমেন বান্দাকে তার প্রতিপালকের সাথে এই বিস্ময়কর বন্ধনে আবদ্ধ করে। আর অস্থায়ীভাবে নয় বরং চিরস্থায়ীভাবে আবদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয় যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্যে ভালোবাসা বরাদ্দ করবেন।'...... 'নিশ্চয় আমার প্রভু দয়াময় ও প্রেমময়।' ....'তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়।' 'যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন জানিয়ে দাও যে, আমি কাছেই আছি, প্রার্থনাকারী যখনই আমার কাছে প্রার্থনা করে, তখনই আমি তা গ্রহণ করি।' .... 'যারা মোমেন তারা আল্লাহকে অধিকতর ভালোবাসে।' 'বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব আয়াত অধ্যয়ন করেও যারা বলে যে, ইসলাম একটা নীরস, নির্মম ও কাটখোট্টা আদর্শ, মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্ককে কেবল শাস্তি ও কঠোরতা সম্পর্ক বলে আখ্যায়িত করে তাদের কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারি না। সত্য বটে, খৃষ্টবাদ যেমন ঈসা মাসীহকে আল্লাহর পুত্র

ও অবতার আখ্যায়িত করে এবং এই দ্বিত্বের মধ্য দিয়ে আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করে, ইসলামে সে ধরনের কোনো ধারণার স্থান নেই।

ইসলাম এমন একটি আদর্শ, যাতে কোনো গোঁজামিল নেই। এর সব কিছুই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। একদিকে তা যেমন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে বিরাজমান প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিরাট ব্যবধানকে স্পষ্ট করে, অপরদিকে তেমনি আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মধ্যকার প্রীতি ও ভালোবাসার সজীব ও সরস সম্পর্ককেও অটুট রাখে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ককে ইসলাম একাধারে ভালোবাসা ও করুণার সম্পর্ক এবং ন্যায় বিচারের সম্পর্ক হিসাবে চিত্রিত করে। বস্তুত ইসলাম এমন পূর্ণাংগ আদর্শ যে রব্বুল আলামীনের সাথে মানব সত্তার সম্পর্কের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই সে পূরণ করে।

আল্লাহর নির্বাচিত দলটির বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহর মনোনীত মোমেন দলটির গুণাবলীর বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

'আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে।'

এ কথা বলে তিনি তাদেরকে সেই পরিবেশে ছেড়ে দেন, যার চাহিদা মোমেনের হৃদয় অনুভব করে। মোমেন দ্বীন প্রতিষ্ঠায় এই কঠিন দায়িত্ব যখন গ্রহণ করে, তখন সে একে মহান আল্লাহর এক অপার অনুগ্রহ ও সদয় মনোনয়ন বলে মনে করে। অতপর মোমেনের অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করছেন,

'(তারা অপর) মোমেনদের প্রতি সদয় ও দরদী।'

অর্থাৎ উদার, মহানুভব, সহানুভূতিশীল, সহজ সরল, কোমল, নমনীয়, অমায়িক,মিশুক ও স্নেহময়। মোমেনের সাথে আচরণে উদ্ধত নয়, ধৃষ্ট নয়, কঠোর নয়, নিষ্ঠুর নয়।

মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সহজ সরল ও অমায়িক আচরণে হীনতা বা অপমানের কিছুই নেই। এটা নিছক ভ্রাতৃত্ব, যা পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের পরিবর্তে নৈকট্য আনে, মেলামেশার প্রতিবন্ধকতা ও আড়ম্বর দূর করে, পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতর করে ও অন্তরের সাথে অন্তরের মিল সৃষ্টি করে। ফলে কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না, কেউ করো নাগালের বাইরে থাকে না এবং কারো প্রতি কারো বিদ্বেষ, তিক্ততা বা অপ্রীতি থাকে না।

আসলে যে জিনিসটি মানুষকে তার দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বা অহংকারী বানায় তা হচ্ছে তার আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপরতা ও অহমবোধ। সে যদি তার মোমেন ভাইদের সাথে মিলেমিশে যায়, তাহলে দূরত্ব ও অন্তরায় সৃষ্টিকারী কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেনই বা থাকবে? তারা তো আল্লাহর জন্যেই একত্রিত হয়েছে, যাতে তিনি তাদেরকে এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে এবং তারা এই মহান ভালোবাসা ভাগাভাগি করে নিয়ে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে থাকতে পারে।

'কাফেরদের ওপর প্রবল ও পরাক্রান্ত।'

অর্থাৎ তাদের মধ্যে কাফেরদের প্রতি একটা অনীহাবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আত্মপ্রকাশের স্থান এটাই। কাফেরদের ওপর প্রবল ও পরাক্রান্ত হওয়ার উদ্দেশ্য নিজের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা বাগানো বা ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা নয়, বরং আল্লাহর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। কাফেরদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ববোধ থাকার কারণ এই যে, তাদের কাছে যে আদর্শ রয়েছে, অর্থাৎ ইসলাম, তাকেই তারা শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মনে করে। আর এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসরণ করা কল্যাণকর বলে সবাইকে তা পালনে বাধ্য করা জরুরী মনে করে, অন্যদেরকে নিজের স্বার্থের এবং নিজেকে অন্যদের স্বার্থের তল্পিবাহী করার জন্যে নয়। তা ছাড়া, মানব রচিত মতবাদের ওপর আল্লাহর দ্বীনের বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী, আল্লাহর শক্তি যে দুনিয়ার সকল শক্তির ওপর বিজয়ী হবেই

এবং আল্লাহর দল যে অন্য সকল দলের ওপর বিজয়ী হবেই, সেই প্রত্যয়ও কাফেরদের ওপর মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ববোধের উৎস। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মুসলমানরা কোনো কোনো যুদ্ধে হেরেও যেতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তারাই শ্রেষ্ঠ।

'তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং তাতে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না।'

বস্তুত তাদের সংগ্রাম আল্লাহর পথে, অর্থাৎ আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার পথে, তাঁর আইন ও শরীয়ত বাস্তবায়নের পথে, যাতে মানুষের ইহ-পরকালের সর্বাংগীণ কল্যাণ, সুখ সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। এটাও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে আল্লাহর মনোনীত মোমেনদের বৈশিষ্ট্য।

লক্ষ্যণীয় যে, 'আল্লাহর পথে লড়াই করে' বলা হয়েছে। নিজেদের স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্যে নয়, নিজেদের জাতির, দেশের ও বংশধরের কল্যাণের জন্যে নয়। 'আল্লাহর পথে' অর্থ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর আইন ও শরীয়ত চালু করার জন্যে, মানব জাতির সর্বাংগীণ কল্যাণের জন্যে। এতে মুসলমানদের নিজস্ব কোনো স্বার্থ নেই।

'নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না।'

কেনইবা ভয় করবে? তারা তো আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে গেছে। চলতি প্রজন্মের রীতিনীতি সমাজের রুচি ও জাহেলিয়াতের কৃষ্টি দিয়ে তাদের কী কাজ? তারা তো আল্লাহর বিধান অনুসরণ করছে এবং সমাজ জীবনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। মানুষের নিন্দার ভয় তো সেই ব্যক্তির করার কথা, যার আইন কানুন ও মানদন্ডের উৎস মানুষের কামনা বাসনা ও মানব রচিত বিধান এবং যে মানুষের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর মানদন্ড ও মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে এবং তাকে মানুষের মানদন্ড, মূল্যবোধ ও কামনা বাসনার ওপর আধিপত্যশীল ও কর্তৃত্বশীল করতে চায় এবং যে ব্যক্তি নিজের শক্তি ও সম্মান আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করে, সে কে কী বললো ও কে কী করলো তার কোনো পরোয়া করে না, চাই যতো প্রতাপশালী, যতো ক্ষমতাবান এবং যতো উচ্চাংগের সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারীরাই বলুক বা করুক না কেন।

আমরা মানুষের কথা, কাজ, শক্তি, সম্পদ, প্রতিপত্তি, রীতিপ্রথা, বিচার বিবেচনা, মানদন্ড ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি শুধু এজন্যে যে, আমরা সেই আসল সত্যকে ভুলে যাই, যার ভিত্তিতে আমাদের যাবতীয় বিচার বিবেচনা ও মূল্যায়ন হওয়া উচিত। সেই সত্যটি হলো আল্লাহর হুকুম, বিধান ও শরীয়ত। একমাত্র আল্লাহর বিধান ও তার শরীয়তই সত্য, আর যা কিছুই তার বিরোধী তা বাতিল ও মিথ্যা চাই তা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকুক এবং হাজার হাজার বছর ব্যাপী মানব প্রজন্মগুলো তাকে মেনে নিক ও কার্যকরী করুক।

কোনো প্রচলিত ব্যবস্থা, বিধান, রীতিপ্রথা বা মূল্যবোধের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং কোটি কোটি মানুষ কর্তৃক তা গ্রহণ, পালন ও বাস্তবায়ন ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন। ইসলামী বিধানের কাছে কোনো রীতিপ্রথা, বিধি ব্যবস্থা বা মূল্যবোধের গুরুত্ব বা গ্রহণযোগ্যতা থাকে কেবল তখনই, যখন তা আল্লাহর বিধান থেকে উৎসারিত হবে। কেননা একমাত্র সেই বিধান থেকেই যাবতীয় রীতিনীতি, মানদন্ড ও মূল্যবোধ গৃহীত হয়ে থাকে।

এ কারণেই মোমেনরা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় পায় না। এটা আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত মোমেনদের বৈশিষ্ট্য।

আর আল্লাহর মনোনীত ও প্রিয় বান্দা হতে পারা, ওই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া, তাদের অন্তরাত্মার এই প্রশান্তি ও নিরাপত্তাবোধ এবং তারই প্রদর্শিত পথে তাদের জেহাদ করা– এ সবই আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। আয়াতের শেষাংশে তাই বলা হয়েছে,

'এ হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে দেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সুপ্রশস্ত ও মহাজ্ঞানী।'

অর্থাৎ সুপ্রশস্ত ভান্ডার থেকে তিনি সব কিছু দিয়ে থাকেন এবং যাই দেন জেনে শুনে এবং জ্ঞাতসারেই দেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে নিজ জ্ঞান ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে মনোনীত করেন, তাদেরকে যা দেন, তার মত ব্যাপক দান আর কী হতে পারে?

মোমেনদের বন্ধু ও অভিভাবক কারা

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের একমাত্র বন্ধু ও অভিভাবক কারা, তার বিবরণ দিচ্ছেন।

'তোমাদের একমাত্র বন্ধু হলো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই মোমেনগণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও বিনয়াবনত থাকে।'

এভাবে মুসলমানদের বন্ধুর সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই সীমা কোনো ব্যাখ্যা দ্বারাই সম্প্রসারিত করার অবকাশ নেই, নেই ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী আন্দোলনকে নমনীয় করার কোনো সুযোগ।

বস্তুত ব্যাপারটা এ রকম না হয়ে উপায়ও ছিলো না। কেননা আগেই বলেছি যে, সমস্যাটা মূলতই আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের। সমস্যাটা এই আকীদার আলোকে আন্দোলন পরিচালনার। বন্ধুত্ব হওয়া চাই নির্ভেজালভাবে আল্লাহর জন্যে এবং একমাত্র তাঁরই প্রতি থাকা চাই সর্বাত্মক বিশ্বাস। ইসলাম হওয়া চাই একমাত্র ধর্ম। যারা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে ও জীবনের সঠিক বিধান হিসাবে গ্রহণ করে না, তাদের সাথে মুসলমানদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হতে হবে। আর ইসলামী আন্দোলনের থাকতে হবে দৃঢ়তা এবং সাংগঠনিক শৃংখলা। তাই তাতে শুধুমাত্র একই নেতৃত্ব ও একই পতাকার কর্তৃত্ব থাকতে হবে। আর পারস্পরিক সহযোগিতা থাকবে শুধু মোমেনদের মধ্যে। কেননা এ সহযোগিতা ইসলামী আকীদা ও আদর্শভিত্তিক জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই পরিচালিত।

তাই বলে ইসলাম যাতে নিছক শিরোনাম, নিছক শ্লোগান ও পতাকা, নিছক মুখ দিয়ে উচ্চারিত কথা, নিছক উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত বংশীয় সম্পদ, কিংবা একটি নির্দিষ্ট জায়গার অধিবাসীদের গুণ মাত্রে পরিণত হয়ে না থাকে, সে জন্যে মোমেনদের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা,

'তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনয়াবনত থাকে।'

তাদের একটি অন্যতম গুণ বলা হয়েছে নামায কায়েম করা– শুধু নামায আদায় করা নয় নামায কায়েম করা দ্বারা বুঝানো হয় পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করা, যার ফলে নামাযীকে আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে রক্ষা করেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নিশ্চয়ই নামায পাপ ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে।'

যাকে নামায খারাপ কাজ থেকে রক্ষা করে না, সে নামাযই কায়েম করেনি। যদি করতো তবে সে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পেতোই। আল্লাহ তায়ালা একথাই বলেছেন এ আয়াতে।

তাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যাকাত দেয়া। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে সম্পদের হক প্রদান করা। বস্তু যাকাত নিছক আর্থিক কর নয়, বরং তা এবাদতও। একে আর্থিক এবাদতও বলা চলে। এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য যে, একটি ফরয দ্বারা সে বহু সংখ্যক উদ্দেশ্য সফল করে। অথচ মানব রচিত মতবাদগুলো এ রকম নয়। ওসব মতবাদে একটা উদ্দেশ্য সফল হলে অন্য বহু সংখ্যক উদ্দেশ্য উপেক্ষিত হয়।

এ কথা সত্য যে, সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কার সাধনের প্রয়োজনে কিছু না কিছু কর আরোপ অন্য কথায় দেশ, জাতি বা যে কোনো কর্তৃপক্ষের নামে ধনীদের কাছ থেকে গরীবদের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় না করে পারা যায় না। এ দ্বারা অভাবী লোকদের কাছে কিছু অর্থ-কড়ি পৌঁছে দেয়া যায়। এভাবে অন্তত একটা উদ্দেশ্য সফল হয়। পক্ষান্তরে যাকাতের আভিধানিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর একটা এবাদত হিসাবে তা বিবেক ও মনের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি সাধন করে। এর সাথে যুক্ত এই পবিত্র অনুভূতি দ্বারাও বিবেক ও মনের পরিশুদ্ধি অর্জিত হয় যে দরিদ্র লোকদেরকে যাকাত দেয়া হচ্ছে, তারা সমাজের কোনো তুচ্ছ শ্রেণী নয় বরং তার ভাই। যাকাতকে আল্লাহর এবাদত মনে করার কারণে দাতা আখেরাতে এর শুভ প্রতিদান পাওয়ার আশা করে। অনুরূপভাবে, এ দ্বারা দেশে কল্যাণকর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ সাধিত হওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথও সুগম হয়। তা ছাড়া, যাকাত গ্রহণকারীদের মনে এই পবিত্র অনুভূতিও বদ্ধমূল হয় যে, আল্লাহ তায়ালা ধনীদের সম্পদে যাকাত ধার্য করে গরীবদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। ধনীদেরকে ভাই মনে করার পরিবর্তে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের মনোভাব সৃষ্টি হয় না। বিশেষত, যখন তারা এ কথা স্মরণ করে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ধনীরা অর্থোপার্জন করতে গিয়ে কোনো হারাম পন্থা অবলম্বন করে না বা কারো ওপর যুলুম করে না। সর্বশেষে তা এই পবিত্র, কল্যাণময় ও সন্তোষপূর্ণ পরিবেশে তথা পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধির পরিবেশে আর্থিক করের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করে।

যাকাত দেয়া মোমেনদের এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাদের মধ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মনোবৃত্তি গড়ে তোলে। আর এই আনুগত্যের নামই ইসলাম।

'এবং তারা বিনয়াবনত হয়।'

অর্থাৎ বিনয়াবনত থাকা এবং আনুগত্য করা তাদের স্থায়ী নীতি ও আসল স্বভাব। এ জন্যেই শুধু নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার উল্লেখ করে ক্ষান্ত থাকা হয়নি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপক ও সর্বাত্মক গুণ। তাদের সর্বপ্রধান ও স্থায়ী গুণ হলো আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য। আর এই গুণ দ্বারাই তারা সমধিক প্রসিদ্ধ।

বস্তুত এরূপ ক্ষেত্রে কোরআনের বক্তব্য অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যবহ।

বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ও তার কিছু শর্ত

পরবর্তী আয়াতে আসছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ও প্রত্যয়, তার আনুগত্য, তাকে একমাত্র বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ আনুষংগিকভাবে তাঁর রসূলকে ও মোমেনদেরকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ এবং আল্লাহর একনিষ্ঠ মোমেন বান্দা ব্যতীত আর সবার সাথে মোমেনদেরকে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর যারা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মোমেনদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, আল্লাহর দলই বিজয়ী হয়ে থাকে।'

ঈমানের প্রধান স্তম্ভ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরই বিজয়ের এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সেই স্তম্ভটি হলো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী প্রদান, এটাকে মুসলমানদের সমাজ থেকে বহিষ্কৃতি, ইহুদী খৃষ্টানদের অন্তর্ভুক্তি এবং ইসলাম পরিত্যাগ করা তথা মুরতাদ হওয়ার শামিল বলে গণ্য করার পরই বিজয়ের এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

এখানে কোরআনের একটি স্থায়ী বক্তব্য ফুটে উঠেছে। সেটি এই যে, আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিলেও শুধু তার ভিত্তিতেই ইসলাম গ্রহণ করতে বলে না, বরং ইসলাম সর্বোত্তম ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা বিধায় তা গ্রহণ করার আহবান জানান। বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ ইসলামের এমন এক পরিণতি, যা যথাসময়ে অবশ্যই বাস্তব রূপ লাভ করবে। তবে সেটা বাস্তব রূপ লাভ করবে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে প্রলুব্ধ ও উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন তা কার্যকরী করার জন্যে। ইসলামের বিজয়ে মুসলমানদের কোনো কৃতিত্ব নেই। এ বিজয় হচ্ছে আল্লাহর নিজের সিদ্ধান্ত, যা তিনি মুসলমানদের হাতে বাস্তবায়িত করে থাকেন। মুসলমানদেরকে তিনি এই বিজয়ের সুফল ভোগ করান শুধু তাদের এর প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান থাকার প্রতিদান হিসাবে, এর জন্যে তাদের চেষ্টা সাধনার প্রতিদান হিসাবে এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভের সুফল হিসাবে যে সব সৎকাজ সংঘটিত হয় ও পৃথিবীর যে সংস্কার ও সংশোধন সম্পন্ন হয় তার প্রতিদান হিসাবে।

আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি এবং বিরাজমান বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে সাহায্য করার জন্যেও দিয়ে থাকেন। কেননা অনেক সময় এ সব বাধা বিপত্তি তাদের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেয়। একদিন ইসলামের বিজয় হবেই এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের পর তাদের সকল দুঃখ কষ্ট ও বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার মনোবল সৃষ্টি হয়। এ কারণে মুসলিম দল এই আশা পোষণ করে যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর জন্যে যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা তাদের হাতেই সফল হোক। এতে করে তাদের জেহাদের সওয়াব পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সওয়াব এবং এর ফলশ্রুতিতে যে সব সৎকর্ম সংঘটিত হবে তার সওয়াবও তারাই পাবে।

এই উক্তি দ্বারা তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থা, তাদের এই সব সুসংবাদের প্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহর দলের বিজয়ের এই মূলনীতির উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা কী তা বুঝা যায়। সেই সাথে এও বুঝা যায় যে, সূরার এই অংশটির নাযিল হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে আমি যে মত ইতিপূর্বে জানিয়ে এসেছি, সেটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও অগ্রগণ্য।

এরপর আমাদের ক্ষেত্রেও এই মূলনীতি প্রযোজ্য। এ মূলনীতির কোনো নির্দিষ্ট স্থান ও কাল নেই। তাই আমরা এটিকে আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নীতি বলে মেনে নিতে পারি। যদিও মোমেনরা কিছু কিছু যুদ্ধে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর চূড়ান্ত অমোঘ নিয়ম এই যে, আল্লাহর দলই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে থাকে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে যাই কিছু ঘটুক, আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি সে সবের উর্ধে ও সে সবের চেয়ে সত্য। আর আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহর রসূল ও মোমেনদের সাথে সুগভীর ভালোবাসা, একাত্মতা ও সম্প্রীতিই সেই একমাত্র উপকরণ, যা দ্বারা চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে পবিত্র কোরআন মুসলমানদেরকে তাদের আকীদা বিশ্বাসের বিরোধী মোশরেক ও আহলে কেতাব গোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে নিষেধ করা এবং এই ঈমানী মূলনীতিটাকে তাদের মন মগযে ও চেতনায় বদ্ধমূল করে নেয়ার আহ্বান জানানোর জন্যে যে রকমারি বাচনভংগি অবলম্বন করেছে, তা দ্বারা শুধু ইসলামী মতাদর্শেই নয়, বরং ইসলামী আন্দোলনেও এই মূলনীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, 'হে মোমেনরা' বলে প্রথম যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তাতে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ এবং বিজয় বা অন্য কোনো ঘটনা ঘটিয়ে আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের গোপন কারসাজি ও গাঁটছড়া ফাঁস করে দিতে পারেন বলে ভীতি প্রদর্শন করা

হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তাতে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা বা ভীতি প্রদর্শনের পরিবর্তে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা, রসূল ও মুসলমানদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী স্থাপন করে নিজেদের মুরতাদ হবার ব্যবস্থা যেন না করে এবং আল্লাহর প্রিয় ও প্রেমিক বান্দাদের দলভুক্ত হতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর দলকে বিজয়ী করার খোদায়ী প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করা হয়েছে।

বিধর্মীদের সাথে মিত্রতা প্রসংগে

এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলমানদের প্রতি তৃতীয় আহ্বান। এ আহ্বানে তাদের অন্তরে তাদের ধর্ম, এবাদাত ও নামাযের প্রতি গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা, বন্ধুত্ব ও মৈত্রী স্থাপনের নিষেধাজ্ঞায় আহলে কেতাব ও মোশরেকদেরকে সমপর্যায়ে স্থাপন করা এই নিষেধাজ্ঞাকে তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ের সাথে যুক্ত করা, এই সমস্ত আহ্বানে সাড়া দেয়ার ওপর যে ঈমান নির্ভরশীল তা উল্লেখ করা, কাফের ও আহলে কেতাবের কর্মকান্ডের নিন্দা ও ধিক্কার জানানো এবং তাদেরকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মোমেনরা! যারা তোমাদের দ্বীনকে ঠাট্টা ও খেলার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে, তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করো না ...... (আয়াত নং ৫৭ ও ৫৮)

মোমেনসুলভ ইসলামী আত্মমর্যাদা বোধ যার আছে এবং যে ব্যক্তি তার ধর্মের অবমাননা করা হলে কোনো কিছুতেই নিজের জন্যে সম্মান ও মর্যাদা অনুভব করে না, নিজের এবাদাত ও নামাযকে অপমানিত করা হলে এবং তার প্রতিপালকের সামনে তার দন্ডায়মান হওয়াকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হলে যে অস্থির হয়ে ওঠে, তার জন্যে এ দুটি আয়াতের বক্তব্য গভীর উদ্দীপনার সঞ্চারক। সুতরাং মোমেনদের সাথে এই সব অপকর্মের নির্বোধ হোতাদের বন্ধুত্ব ও মৈত্রী কিভাবে গড়ে উঠতে পারে! আসলে এসব অপকর্ম তারা কেবল তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যেই করে থাকে। নচেত আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর এবাদাতের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করা এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, যার বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের ভারসাম্য বহাল আছে। বুদ্ধি বিবেক স্বাভাবিক ও সুস্থ থাকলে মানুষ তার চার পাশে কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রেরণাদায়ক উপকরণগুলোই দেখতে পায়। আর যখন তা অসুস্থ ও বিকৃত হয়, তখন এসব উপকরণ তার চোখে পড়ে না। কেননা তখন তার সাথে গোটা প্রাকৃতিক জগতের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি উপকরণ ইংগিত দিতে থাকে যে, তার একজন মা'বুদ বা উপাস্য রয়েছে, যিনি ভক্তি ও এবাদত পাওয়ার যোগ্য। বিবেক বুদ্ধি যখন সুস্থ, স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে, তখন তা বিশ্ব প্রতিপালকের এবাদাতের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য দুটোই উপলব্ধি করে। কাজেই সে সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় এই এবাদাতকে হাসি তামাশা ও উপহাসের পাত্র মনে করতে পারে না।

এই হাসি তামাশা ও উপহাস করার কাজটা কাফেরদের দ্বারা যেমন সংঘটিত হতো, তেমনি সংঘটিত হতো ইহুদীদের দ্বারাও। রসূল (স.)-এর কাছে যখন কোরআন নাযিল হতো, তখন এই দু'টি গোষ্ঠী এই অপকর্মে লিপ্ত হতো। সীরাতের গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় না যে, খৃষ্টানরাও এ কাজে লিপ্ত হতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্যে তাদের চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতি ও তাদের স্থায়ী জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে দিয়েছেন। মুসলমানদের ভবিষ্যত প্রজন্মগুলোর সাথে কী আচরণ করা হবে, সেটাও আল্লাহ তায়ালা জানতেন। আমরা মুসলমানরা আগেও দেখেছি, এখনও দেখছি এবং সমগ্র ইতিহাস সাক্ষী যে, খৃষ্টানদের মধ্য হতে ইসলাম ও মুসলমানদের যতো শত্রু ছিল এবং আছে, ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও তা বেশী। খৃষ্টানরা ইহুদী ও পৌত্তলিকদের মতোই ইসলামের দুশমন। শত শত বছর ধরে তারা মুসলমানদের ক্ষতি করার সুযোগের অপেক্ষায় তাকে তাকে থেকেছে। বিশেষত হযরত আবু বকর ও ওমরের আমলে রোম

সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হবার পর তাদের ইসলাম বৈরিতা এতদূর বেড়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তা ক্রুসেড যুদ্ধের রূপ ধারণ করেছে। এরপর 'প্রাচ্য সমস্যা' নামে সারা বিশ্বের খৃষ্টানরা খেলাফতকে উৎখাত করার জন্যে সংঘবদ্ধ হয়। এরপর আসে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, যা খৃষ্টবাদকে লুকিয়ে রাখলেও তাদের কথাবার্তা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা। এই তৎপরতা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথকে সুগম করে দেয়। এরপর ওই সব আগ্রাসী যুদ্ধ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে। এই অভিযানে ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকেরা সমভাবে অংশ গ্রহণ করতে থাকে।

কোরআন এসেছে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জীবনের দিগদর্শন হয়ে টিকে থাকার জন্যে। এ গ্রন্থ তাদের আকীদা বিশ্বাসকে যেমন সংগঠিত করে, তেমনি তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও সুসমন্বিত রূপ দেয়। অনুরূপভাবে, তা তাদের আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিকল্পনা প্রণয়নেও সাহায্য করে। এই গ্রন্থই তাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের ছাড়া আর কারো সাথে তাদের মিতালী হতে পারে না। এ গ্রন্থ তাদেরকে ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে। আর এ ব্যাপারে তার অনড় ও অটল ভূমিকাকে সে নানা ভাবে নানা জায়গায় প্রকাশ করে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে উদারতা ও মহানুভবতা শিক্ষা দেয়। সে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সদাচারও করতে বলে। কিন্তু তাদের সবার সাথে মিতালী ও বন্ধুত্ব পাতাতে কড়াকড়িভাবে নিষেধ করে। কেননা উদারতা ও সদাচার হচ্ছে নৈতিকতা ও সামাজিকতার ব্যাপারে। আর মিতালী বা বন্ধুত্ব আকীদা বিশ্বাস ও সাংগঠনিকতার সাথে সম্পৃক্ত। মিতালী হচ্ছে সাহায্য ও সহযোগিতার নাম। এটা এক দল বা গোষ্ঠীর সাথে অপর দল বা গোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতার নাম। অথচ আহলে কেতাব বা কাফেরদের সাথে মুসলমানদের কোনো সহযোগিতা হতে পারে না। কেননা আমরা আগেই বলেছি যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে কারো সাথে সহযোগিতা করার মানেই হলো, তার জীবনাদর্শকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্যে দ্বীনী ও জেহাদী কর্মকান্ডে পারস্পরিক সাহায্য। এ কাজটা একজন মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কিভাবে সম্ভব? আর যদি বা সম্ভব হয়, তবে প্রশ্ন এই যে, তা কোন ব্যাপারে হবে!

এটা এমন একটা বিজয়, যার ব্যাপারে কোনো আপোষ চলে না এবং আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে শুধু আপোষহীন ভূমিকাই পছন্দ করেন। একজন মুসলমানের পক্ষে স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে এ রকম ভূমিকাই মানান সই।

মুসলমানরাই হচ্ছে ষড়যন্ত্রের একমাত্র শিকার

মোমেনদেরকে পর পর তিনবার সম্বোধন করার পর এবার আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে আহলে কেতাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করার আদেশ দিয়েছেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন যে, মুসলমানদের প্রতি তাদের রুষ্ট হবার কারণ কি? তাদের রুষ্ট হবার কারণ কি এ ছাড়া আর কিছু আছে যে, তারা আল্লাহর ওপর, তাদের ওপর নাযিলকৃত ও আহলে কেতাবের ওপর নাযিল করা সকল কেতাবের ওপরই ঈমান রাখে? মুসলমানরা ঈমানদার আর আহলে কেতাবের অধিকাংশই ফাসেক হওয়া ছাড়া কি এর আর কোনো কারণ আছে? আসলে এটা অত্যন্ত লজ্জাকর প্রশ্ন। এ দ্বারা বৈরিতা ও মুসলমানদের সাথে তাদের বিচ্ছেদ ঘটার আসল কারণ ফাঁস হয়ে গেছে। ৫৯ ও ৬০ নং আয়াত দুটি লক্ষ্য করুন।..........

রসূল (স.)-কে আহলে কেতাবের কাছে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, তা আসলে তাদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা এবং মুসলমানদের ও তাদের ধর্মীয় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে তাদের বৈরিতা পোষণের মূল কারণ উদঘাটনের জন্যেই। সেই সাথে তাদের এই বৈরিতার প্রতি

আল্লাহর অসন্তোষ প্রকাশ মুসলমানদের মনে কাফেরদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মানো ও তাদেরকে এর অপকারিতা বুঝানোও এর উদ্দেশ্য। আর এর পাশাপাশি উক্ত মৈত্রী স্থাপনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

রসূল (স.)-এর যুগেই হোক কিংবা আজকের যুগেই হোক, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ও ইসলামের পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে আহলে কেতাবের উন্নাসিকতা ও ক্ষোভের একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানরা আল্লাহ, কোরআন ও অন্যান্য কেতাবের প্রতি ঈমান এনেছে। তাদের মুসলমান হওয়া এবং ইহুদী বা খৃষ্টান না হওয়াই আহলে কেতাবের শত্রুতা ও ক্ষোভের মূল কারণ। তাদের শত্রুতার আর একটি কারণ হলো, তারা নিজেরা আল্লাহর কেতাবের অবাধ্য হয়ে গেছে। আর এই অবাধ্যতার আলামত হলো শেষ নবী ও শেষ কেতাবের প্রতি তাদের ঈমান না আনা। অথচ এই শেষ কেতাব তাদের ওপর নাযিল হওয়া মূল কেতাবের এবং সকল রসূলের সত্যতা স্বীকার করে, তাদের বিকৃত ও মনগড়া কেতাবের নয়।

বস্তুত, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আহলে কেতাবের এই শত্রুতা ও যুদ্ধ বিগত চৌদ্দশ বছরেও শেষ হয়নি। মদীনায় যেদিন তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, সেই দিন থেকেই চলে আসছে এ শত্রুতা। কেননা মুসলমানদের এই রাষ্ট্রটি ছিলো তাদের দ্বীন ও আদর্শ ভিত্তিক। এই দ্বীন ও আদর্শ থেকে মুসলমানদেরকে ফেরাতে না পারা পর্যন্ত তারা রণে ভংগ দেবে না। কেননা তারা নিজেরা ফাসেক ও খোদাদ্রোহী বিধায় আল্লাহর প্রকৃত অনুগত মুসলমানরা তাদের চক্ষুশূল। তাদেরকে তারা সহ্য করতে পারে না।

এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছেন। সূরা বাকারায় আল্লাহ তাঁর রসূলকে বলেন,

‘ইহুদী ও খৃষ্টানরা তোমার ওপর ততক্ষণ সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হয়ে না যাও।’

এই সূরাতেই আল্লাহ তায়ালা ৫নং আয়াতে একই কথা বলেছেন একটু ভিন্ন ভংগিতে। অথচ এই সত্যটিকে আজকের ইহুদী ও খৃষ্টান এমন কি মুসলমানদেরও অনেকে অস্বীকার করতে চাইবে। নাস্তিকতার বিরুদ্ধে ধর্মপন্থীদের ঐক্য গড়ার লক্ষ্যেই এ কথা বলা হচ্ছে। এটা আসলে আহলে কেতাবের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়া ও মাদকাচ্ছন্ন করার অপচেষ্টা মাত্র। ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর শাশ্বত বিধান সম্পর্কে যে উপলব্ধি সৃষ্টি করেছে, তাকে নষ্ট করার চেষ্টা মাত্র। কারণ এই উপলব্ধি যতোদিন অক্ষত ও স্বাভাবিক ছিলো, ততোদিন সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম বিশ্বকে কুক্ষিগত করা তো দূরের কথা, ইসলামের প্রসার ও অগ্রযাত্রাকে পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রুসেড যুদ্ধ ও মিশনারী আগ্রাসনে ব্যর্থ হবার পর প্রতারণা ও মাদকাচ্ছন্ন করার পথ অনুসরণে বাধ্য হয়েছে, যাতে করে মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে এই ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করতে পারে যে, ধর্ম নিয়ে সংঘাত ও সংঘর্ষের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং ধর্মীয় সংঘাত ও সংঘর্ষের যুগটা ছিলো নিরেট অন্ধকার যুগ, যা দুনিয়ার সকল জাতিকে এক সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এরপর দুনিয়া জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ও ‘প্রগতিশীল’ বনে গেছে। তাই ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহ হওয়াটা উচিতও নয়, কাম্যও নয় এবং বৈধও নয়। এ যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ যদি কোনো কিছুর কারণে হতেই হয়, তবে তা অর্থনৈতিক কারণে হওয়া উচিত। কেবল সম্পদ, বাজার ও শোষণ-নির্যাতনের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। তাদের এই মতবাদ মেনে নিলে মুসলমানদের ও তাদের উত্তরসূরীদের পক্ষে ধর্মের বিষয়ে এবং ধর্ম সংক্রান্ত লড়াই-এর বিষয়ে আদৌ কোনো চিন্তা-ভাবনাই করা সংগত হয় না।

ষড়যন্ত্রের শীকার মুসলিমজাতি

মুসলিম দেশগুলোকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণতকারী ইহুদী ও খৃষ্টানরা যখন এভাবে মুসলিম জনগণকে মাদকাচ্ছন্ন করে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া ও তাদেরকে ঘুম পাড়ানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হয় এবং যখন তাদের বিবেক এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখন উপনিবেশবাদীদের আর এ আশংকা থাকে না যে, মুসলমানরা আল্লাহ তায়ারা ও ইসলামী আদর্শের খাতিরে তাদের ওপর ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হবে। কেননা তারা কখনো একদিনের জন্যেও এমন উত্তেজিত হয়নি। আর তাদেরকে ঘুম পাড়ানো ও চেতনা বিলুপ্ত করার পর ব্যাপারটা আরো সহজ হয়ে যায়। এভাবে তারা শুধু আদর্শের লড়াইতেই জয় লাভ করে না, বরং মুসলিম জনগণের সহায় সম্পদ লুণ্ঠনের কাজেও সফলতা লাভ করে। আদর্শগত ও বস্তুগত উভয় লড়াইতেই তারা জিতে যায়। কেননা দুটোই তখন কাছাকাছি অবস্থান করে।

অপরদিকে মুসলিম দেশগুলোতে যারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ক্রীড়নক, যাদেরকে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম বিশ্বের স্থানে স্থানে গোপনে বা প্রকাশ্যে নিযুক্ত করে, তারাও বিদেশী প্রভুদের ন্যায় বলে যে, ‘জেহাদের’ দিন এখন আর নেই। কেননা তারা নিরেট দালাল। ইহুদী ও খৃষ্টানরা বাইরে বসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কাজ করে এই দালালরা ঠিক সেই কাজই ভেতরে থেকে করে। তারা ক্রুসেড যুদ্ধ সম্পর্কে বলে যে, ওটা ‘ক্রুসেড’ তথা ধর্মযুদ্ধ ছিলো না। আর যে মুসলমানরা ইসলামী আকীদা ও আদর্শের পতাকা হাতে নিয়ে এ সব লড়াইয়ে যোগদান করেছিলো, তাদেরকে তারা ‘মুসলমান’ নয় বরং ‘জাতীয়তাবাদী’ বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

তৃতীয় একটি দল রয়েছে, যারা সরলমতি ও প্রতারিত। সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য দেশে ক্রুসেডারদের পৌত্ররা তাদেরকে আহবান জানায় যে, ‘তোমরা আমাদের কাছে এসো, আমরা মিতালী পাতাই। যাতে নাস্তিকদের শত্রু ধর্মকে সংরক্ষণ করতে পারি।’ এ আহবানে সাড়া দেয় আলোচ্য প্রতারিত সরলমনা গোষ্ঠীটি। তারা ভুলে যায় যে, এই ইহুদী ও খৃষ্টানদের যখনই মুসলমানদের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাত বাধে, তখনই তারা নাস্তিক্যদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। এটা তাদের চিরাচরিত স্বভাব। আজও তাদের এই স্বভাব অব্যাহত রয়েছে। নাস্তিকবাদী বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চাইতে তাদের ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গরজই বেশী। কেননা তারা জানে যে, নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদ ক্ষণস্থায়ী শত্রু। আর ইসলাম তাদের চিরন্তন শত্রু। ইসলামের পুনরুত্থানকামী প্রতিষ্ঠানগুলোর জাগরণ করে দেয়া ছাড়া উক্ত মিতালীর আহবানের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সেই সাথে প্রতারণার শিকার সরলমনা লোকদের চেষ্টা সাধনা দ্বারা উপকৃত হওয়াও তাদের উদ্দেশ্য। এভাবে এই গোষ্ঠীকে তারা নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। কেননা নাস্তিকরা সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক শত্রু।

বস্তুত ইহুদী ও খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন এক লড়াইতে রত, যে লড়াইতে মুসলমানদের কাছে ইসলামী বিধানের কল্যাণে গঠিত সচেতনতা ছাড়া আর কোনো সাজ সরঞ্জাম নেই।

যারা আহলে কেতাবের নাস্তিক্য বিরোধী মৈত্রীর আহবানকে তাদের আন্তরিকতার পরিচায়ক মনে করে, তারা একদিকে যেমন বিগত চৌদ্দ শতক জুড়ে ইতিহাসের বাস্তবতাকে ভুলে যায়, তেমনি ভুলে যায় এ ব্যাপারে আল্লাহর শিক্ষাও। আল্লাহর এ শিক্ষার আলোকে তাদের সাথে কোনো আপোষের অবকাশ নেই এবং এ শিক্ষাকে পাশ কাটানোরও কোনো সুযোগ নেই। উপরন্তু এ শিক্ষা আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে ও আস্থা স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আল্লাহর প্রতিটি কথা যে সত্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ, সে ব্যাপারে অটল বিশ্বাস জন্মায়।

উল্লেখিত মহলটি মৌখিকভাবে ও লেখনীর মাধ্যমে একপেশে বক্তব্য পেশ করতে অভ্যস্ত কোরআন ও হাদীস থেকে তারা শুধু সেই আয়াতগুলোই গ্রহণ করে, যাতে মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সদাচার, করার আদেশ দেয়া হয় এবং আচার ব্যবহারে উদারতা ও সহৃদয়তার

পরিচয় দিতে বলা হয়। কিন্তু যে সমস্ত আয়াতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও মিতালী পাতানোর বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সে সব আয়াত সম্পর্কে তারা উদাসীন। তারা উদাসীন সেই সব আয়াত এবং হাদীস সম্পর্কে, যাতে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশানুযায়ী কোনো মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মুসলমানের সহযোগিতা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক কেবল ইসলাম ও ইসলামী বিধান বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই হতে পারে। অথচ আহলে কেতাবের সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে এক সাথে মিলিত হয়ে কাজ করার জন্যে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য কোনো বিধি বা ভিত্তি নেই। যদিও ইহুদী খৃষ্টানদের ধর্ম বিকৃত হওয়ার পূর্বে তার সাথে ইসলামের যথেষ্ট নীতিগত মিল ছিলো। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং বলেছেন যে, আহলে কেতাব গোষ্ঠীর মুসলমানদের ওপর যা কিছু ক্রোধ ও আক্রোশ রয়েছে তা কেবল ইসলামের কারণেই রয়েছে। এই ইসলাম ত্যাগ করা ছাড়া মুসলমানদের ওপর তারা সন্তুষ্টই হতে পারে না।

ইসলামে কোনো আপোষকামীতা নেই

মুসলমানদের মধ্যে যারা কোরআন ও সুন্নাহর একপেশে ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে মিতালী পাতানোর পক্ষপাতী, তারা কোরআনকে বিভক্ত করে। ফলে যে আয়াতগুলো তাদের নমনীয় ও মনগড়া নীতির পক্ষে যায় এবং তাদের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্য হয়, সেই গুলোকেই তারা গ্রহণ করে। আর যেগুলো তাদের মনের নমনীয় ইচ্ছা ও আবেগের বিরোধী, সেগুলোকে তারা বর্জন করে।

আমরা এ ক্ষেত্রে ওই সব ধোকাবাজ বা প্রতারিত লোকদের বক্তব্য শোনার চাইতে আল্লাহর বক্তব্য শোনাই অধিকতর শ্রেয় মনে করি। আর আল্লাহর বক্তব্য এ বিষয়ে একেবারেই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

আল্লাহ আলোচ্য আয়াতে প্রথমে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, মুসলমানদের ওপর আহলে কেতাবের রাগ ও ক্ষোভের অন্যতম কারণ হলো, মুসলমানরা শেষ নবীর আনীত দ্বীনের ওপর ঈমান এনে ফেলেছে। এরপর আল্লাহ বলেছেন, অপর কারণটি হলো,

'তোমাদের অধিকাংশই আল্লাহর অবাধ্য।'

এখানে আমাদের কিছুক্ষণ থেমে আল্লাহর কথাটা নিয়ে একটু ভেবে দেখা উচিত। অর্থাৎ ফাসেক ও অবাধ্যসুলভ কার্যকলাপ হলো তাদের ক্ষোভের আর একটা কারণ। ফাসেক হলে মানুষ সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। এটা একটা বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক রীতি। যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ হারিয়ে বিপথগামী হয়, সে স্বভাবতই সৎ ব্যক্তির ওপর ক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে সৎপথ অনুসরণ করতে দেখা তার কাছে অসহনীয় হয়ে পড়ে। তার অস্তিত্ব তার মধ্যে অনবরত নিজের সম্পর্কে এই অনুভূতি জাগায় যে, সে একজন পাপী ও আল্লাহর অবাধ্য। এ ধরনের সৎলোক যেন তার ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে একজন স্থায়ী সাক্ষী। এ জন্যেই সে তাকে অপছন্দ করে ও তার ওপর ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ থাকে। তার সঠিক ও হক পথের অনুসরণ ও তা অব্যাহত রাখা তার গাত্রদাহের সৃষ্ট করে। তাই সে তাকে তার ভ্রান্ত পথে টেনে আনার চেষ্টা করতে থাকে। আর সে যদি তার নেতৃত্ব না মানে, তবে তাকে খতম করে দিতে চায়।

এটা একটা চিরন্তন রীতি। শুধু মদীনার আহলে কেতাব গোষ্ঠী মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধেই এই মনোভাব পোষণ করতো না, বরং সর্বকালের সকল জায়গায় আহলে কেতাব সকল

মুসলমানের বিরুদ্ধে এরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকে। সকল ফাসেক ও পাপিষ্ঠ লোকেরা সকল ধার্মিক ও সৎ লোকদের বিরুদ্ধে এরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকে। অসৎ লোকদের সমাজে সৎ লোকেরা এবং পাপিষ্ঠ লোকদের সমাজে পুণ্যবান লোকেরা সব সময় আক্রোশ ও হিংসার শিকার হয়ে থাকে। বিপথগামী লোকদের সমাজে সুপথগামী সব সময় হিংস্রতার শিকার হয়ে থাকে। কোরআনের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, এই দু'পক্ষের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সংঘাত স্বাভাবিক ব্যাপার।

সৎ লোকেরা যে অসৎ লোকদের, হকপন্থীরা যে বাতেলপন্থীদের, পুণ্যবান লোকেরা যে পাপিষ্ঠ লোকদের এবং সুপথগামীরা যে বিপথগামীদের ক্রোধ, আক্রোশ ও হিংস্রতার শিকার হবে, সে কথা আল্লাহ আগে থেকেই জানতেন। সেই সাথে তিনি এও জানতেন যে, সৎ হকপন্থী ও পুণ্যবান লোকদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাতিল, পাপ ও গোমরাহীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই না করে গত্যন্তর থাকবে না। এটা এমন এক লড়াই, যা হকপন্থীরা ইচ্ছা করলেও বাতিলের বিরুদ্ধে না লড়ে থাকতে পারবে না। কেননা বাতিল শক্তি একদিন তাদের ওপর হামলা করবে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইবে। তাই হকপন্থীরা এ সংঘাত এড়িয়ে যেতে চাইলেও তা পারবে না। বাতিলশক্তি, পাপী গোষ্ঠী, বিপথগামী গোষ্ঠী এবং দুষ্কৃতকারী গোষ্ঠী সৎ, পুণ্যবান ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের ওপর বিনা উস্কানিতে কোনো আক্রমণ করবে না। তাদের সাথে সংঘাত এড়ানো যাবে এবং আপোস মীমাংসা সম্ভব হবে এরূপ ভাবা চরম বাতুলতা। তাই বুদ্ধিমত্তা সহকারে ও যাবতীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে সেই অনিবার্য লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করাই তাদের জন্যে কল্যাণকর আর আল্লাহও সেজন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। নচেত প্রতারণার মধ্য দিয়ে একদিন তাদেরকে বাতিলের কাছে আত্মসমর্পণ ও পরাজয় বরণ করতে হবে। বাতিল শক্তির গ্রাসে পরিণত হতে হবে।

আল্লাহর কাছে যারা নিকৃষ্ট

এরপর আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে আহলে কেতাব গোষ্ঠীর মোকাবেলা করার যে নির্দেশ দিচ্ছেন, তা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এ নির্দেশ দেয়ার আগে তিনি মুসলমানদের ওপর তাদের আক্রোশের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রংসগে তিনি তাদের প্রধান ইতিহাস এবং দুনিয়ার জীবনেই প্রাপ্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন। ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বলো, আমি কি তোমাদেরকে তাদের কথা জানাবো, যারা আল্লাহর কাছে অধিকতর নিকৃষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন? তারা হচ্ছে সেই সব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন।.....'

এখানে আমরা ইহুদী জাতির প্রকৃত চেহারা দেখতে পাই, তাদের ইতিহাস জানতে পারি। জানতে পারি যে, তাদের ওপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ নেমে এসেছিলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের কতক লোককে বাঁদর ও শুকর পর্যন্ত বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা তাগূতের পূজাও পর্যন্ত করেছিলো। তাদের এ সব অপকর্ম ও তাদের ওপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপের কাহিনী কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে তাদেরকে বানর ও শূকর বানানো হয়েছিলো, সে কাহিনীও তুলে ধরা হয়েছে। তবে তারা কিভাবে তাগূতের পূজা করেছিলো, সে ব্যাপারে কিছু কথা বলা দরকার। কেননা এ সুরার পটভূমিতে বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

যে শক্তি আল্লাহর অনুমোদিত নয়, আল্লাহর আইন ও শরীয়ত অনুযায়ী হুকুম জারী না করে ন্যায় ও সত্যের দাবী পদদলিত করে তাকেই তাগূত বলা হয়। আর যে শক্তি আল্লাহর ক্ষমতা,

সার্বভৌমত্ব ও ইলাহসুলভ মর্যাদার ওপর আক্রমণ চালায় তা হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট ধরনের আগ্রাসী শক্তি। আর এটা শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের দিক দিয়ে তাগুতের সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ।

আহলে কেতাব তাদের ধর্মযাজক ও সংসারবিরাগীদেরকে আক্ষরিক অর্থে পূজা করতো না বটে, তবে আল্লাহর আইনকে উপেক্ষা করে তাদের আইনকে অনুসরণ করতো। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধর্মযাজকদের গোলাম এবং মোশরেক আখ্যায়িত করেছেন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তারা যথার্থই তাগুতের পূজা করেছিলো। অর্থাৎ যে শক্তি নিজের ন্যায়সংগত অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তার পূজা করেছিলো। তারা এই সব তাগুতের সামনে রুকু-সেজদা করেনি, কিন্তু তাদের হুকুমের আনুগত্য ও অনুসরণ করে তাদের পূজা ও উপাসনা করেছে। আর এ পূজা মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের আওতাবহির্ভূত করে দেয়।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে আহলে কেতাবের মোকাবেলা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। সেই ঐতিহাসিক পটভূমিতে তারা যে শাস্তির যোগ্য হয়েছে, তার আলোকেই এই নির্দেশ দিচ্ছেন। সেই প্রাচীন আহলে কেতাব, আর আজকের মদীনার আহেল কেতাবকে একই প্রজন্মভুক্ত ধরে নিয়ে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে তারা চিরকাল একই রকম। এ নির্দেশ দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের পরিণতি।

'বলো, আমি কি তোমাদেরকে নিকৃষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের কথা জানাবো?...

অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর ক্ষিপ্ত ও রুষ্ট আহলে কেতাবের চেয়ে মুসলমান হওয়ার কারণে তাদেরকে নির্যাতনকারী ও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বর্তমান প্রজন্মের আহলে কেতাবের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রাচীন আহলে কেতাবের কথা কি জানাবো? প্রাচীন সেই আহলে কেতাব গোষ্ঠী তো স্বয়ং আল্লাহর ক্রোধ ও রোষের শিকার হয়েছিলো। আল্লাহর রোষ ও আযাবের সামনে দুর্বল মানুষের রোষ ও নির্যাতনের তুলনা কেমন করে হয়? আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং যাদেরকে অধিকতর গোমরাহ ও নিকৃষ্টতর বলেছেন, তাদের চেয়ে অধম আর কে?

'তারাই নিকৃষ্টতর এবং সঠিক পথ থেকে অধিকতর গোমরাহ।'

ইহুদী জাতির ইতিহাস ও শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে তাদের সাথে মিতালী ও বন্ধুত্ব পাতানোর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেই সাথে তাদের ষড়যন্ত্রও তুলে ধরেছেন। এখানে বিশেষভাবে ইহুদীদের চরিত্র তুলে ধরার কারণ এই যে, এই সূরা নাযিল হবার সময়ে তারাই নানা ঘটনা ঘটাচ্ছিলো এবং বেশীর ভাগ দুষ্কর্ম তারাই করতো। (৬১ থেকে ৬৪ নং আয়াত পর্যন্ত পড়ে দেখুন)

এ আয়াতগুলোতে কোরআনের বিশেষ বর্ণনাভংগি অনুযায়ী জীবন্ত দৃশ্যসমূহ ও চলমান ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে। এ আয়াতগুলো যিনি অধ্যয়ন করবেন তিনি বহু শতাব্দী পূর্বেকার ইহুদীদের চরিত্র অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করতে পারবেন। তবে কারো কারো মতে, এ আয়াত কটিতে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শুধু ইহুদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং মদীনার কিছু সংখ্যক মোনাফেকের চরিত্রও তদ্রূপ ছিলো। প্রথম আয়াতটিতে বলা হচ্ছে যে, তারা যখন মুসলমানদের কাছে আসে তখন বলে যে, 'আমরা মুসলমান হয়ে গেছি।' অথচ তাদের মনে থাকে কুফরী। তারা

মুসলমানদের কাছে আসেও কুফরী নিয়ে, যায়ও কুফরী নিয়ে। সম্ভবত এই গোষ্ঠীটি ইহুদীদের সেই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত, যারা পরস্পরকে বলতো যে, দিনের শুরুতে মুসলমান হও এবং দিনের শেষ ভাগে কাফের হও, যাতে মুসলমানরাও বিভ্রান্ত হয়ে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে।

'তারা যা কিছু লুকাতো, তার কথা আল্লাহই ভালো জানেন।'

আল্লাহ তায়ালা এ কথাটা বলেছেন প্রথমত এজন্যে যে, এটা একটা বাস্তব ঘটনা। দ্বিতীয়, এ উদ্দেশ্য যে, মুসলমানরা যেন নিশ্চিত থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের শত্রুর চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন। কেননা তিনি এই গোপন চক্রান্তের কথা জানেন। তৃতীয়ত, এ উদ্দেশ্যে যে, চক্রান্তকারীদেরকে তিনি হুশিয়ার করে দিতে চান, যাতে তারা তা থেকে বিরত থাকে।

এরপর তাদের আরো কিছু কার্যকলাপ এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যেন তা চাক্ষুষ দৃষ্টির গোচরীভূত!

'তাদের অনেককে তুমি দেখতে পাবে পাপ ও বাড়াবাড়িতে এবং হারাম ভক্ষণে প্রতিযোগিতারত। তাদের এ সব কাজ বড়ই জঘন্য।'

এখানে পাপ, বাড়াবাড়ি ও হারামখোরিতে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টাকে কথার মধ্য দিয়ে ছবি এঁকে দেখানো হচ্ছে, যাতে তা অধিকতর হীন ও নিকৃষ্ট কাজ হিসাবে পরিগণিত হয়। তবে এই সাথে তা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের অবনতি এবং দুষ্কৃতির ব্যাপকতা ও প্রাধান্য লাভজনিত কুৎসিত মানসিক অবস্থাটাও চিত্রিত করে। চরম অধোপতিত সমাজের দৃশ্য আংগুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে, সেখানে সবল দুর্বল নির্বিশেষে সবাই কিভাবে অনাচার ও দুস্কৃতির দিকে এবং বাড়াবাড়ি ও পাপাচারের দিকে পাল্লা দিয়ে ধাবিত হয়। বস্তুত দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে পাপাচার ও অন্যায় অত্যাচার কেবল সবলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং দুর্বল লোকেরাও তার সাথে একইভাবে জড়িত হয়ে যায়।

দুর্বলেরা নিজেরাও বাড়াবাড়ি ও পাপাচারের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার কারণে তারা স্বভাবতই আর সবলদের ওপর বাড়াবাড়ি করা বা সবলদের বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে না। তারা নিজেরাই পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার করে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলোতে লিপ্ত হয়। অপরাধপ্রবণ সমাজগুলোতে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলোই হয়ে পড়ে প্রহরাহীন ও অরক্ষিত জিনিস। পাপাচার ও বাড়াবাড়ি অপরাধপ্রবণ বিকারগ্রস্ত সমাজের স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় এবং এগুলোতে প্রতিযোগিতা করাই এ সমাজের নৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

তৎকালীন ইহুদীদের সমাজও ছিলো এ রকম। হারামখোরি ছিলো তাদের নিয়মিত অভ্যাস। এটা সর্বকালের ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য।

'বস্তুত তারা খুবই জঘন্য কাজে লিপ্ত।'

ধর্মযাযক ও পুরোহিতদের ভূমিকা

পরবর্তী আয়াতে বিকৃত ও বাতিল সমাজ ব্যবস্থার আরো একটা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তার প্রতি কঠোর ধিক্কার জানানো হয়েছে। সেটি হচ্ছে, ইহুদী শরীয়তের ধারক-বাহক ও যাজকদের পক্ষ থেকে সমাজে পাপাচার, অত্যাচার ও হারামখোরির ব্যাপক প্রসারে নীরব ও নির্বিকার থাকা এবং এভাবে পাল্লা দিয়ে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া লোকদের নিষেধ না করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘আল্লাহ তায়ালা ও ধর্ম বিশেষজ্ঞরা তাদেরকে অন্যায় বাক্যালাপ ও হারাম খাওয়া থেকে নিষেধ করলো না কেন? তাদের এ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা কী জঘন্য ছিলো!’

বস্তুত সমাজে পাপাচার ও অন্যায় অত্যাচার চলতে থাকবে, আর ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা ও ধর্মের পতাকাবাহীরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে, এটা একটা বাতিল, বিকারগ্রস্ত ও পতনোন্মুখ সমাজের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কোরআন উল্লেখ করেছে যে, বনী ইসরাইলের সমাজে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতো। তারা সমাজে অনুষ্ঠিত দুষ্কর্মের কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতো না।

একটা কল্যাণধর্মী, সৎ, শক্তিশালী ও সুসমন্বিত সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার প্রক্রিয়া চালু থাকে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার মতো সচেতন ও সাহসী মানুষ বিদ্যমান থাকে। এরূপ আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি কর্ণপাত ও আনুগত্য করার মতো লোকও কিছু না কিছু বিদ্যমান থাকে এবং সাধারণভাবে সমাজ এতোটা সচেতন ও শক্তিশালী থাকে যে, সেখানে অপরাধীরা এরূপ আদেশ ও নিষেধকে অবজ্ঞা করা এবং সৎ কাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজে নিষেধকারীদেরকে নির্যাতন করার সাহস পায় না।

মুসলিম উম্মাহর ভেতরেই এ সব গুণ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত বলে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। যেমন বলেছেন,

‘তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, যাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।’ আর বনী ইসরাইল সম্পর্কেবলেছেন,

‘তারা অন্যায় কাজ করা থেকে পরস্পরকে নিষেধ করতো না।’

সুতরাং এ বৈশিষ্ট্য উক্ত দুই সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উপকরণ।

এটা যে কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্যেও সতর্কবাণী বটে। যারা ইসলামী শরীয়তের রক্ষক ও ধারক বাহক, তাদের সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনের ওপরই সমাজের সুস্থতা ও অসুস্থতা নির্ভরশীল। আগেই বলেছি যে, এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্যে আদেশ ও নিষেধ করার ক্ষমতা হস্তগত হওয়া জরুরী। মনে রাখতে হবে যে, আদেশ দেয়া ও নিষেধ করা এবং দাওয়াত দেয়া এক কথা নয়।

দাওয়াত তো উপদেশ। আর আদেশ ও নিষেধ ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত কাজ বিশেষ। তাই সৎকাজের আদেশ দাতা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারীদের ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত, যাতে সমাজে তাদের আদেশ ও নিষেধের গুরুত্ব হয় এবং তা নিছক অসার কথায় পর্যবসিত না হয়।

পাপিষ্ঠ ও অপরিণামদর্শী ইহুদীরা কি ধরনের গর্হিত বাক্যালাপ করতো, কোরআন এখানে তার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছে,

‘ইহুদীরা বলতো আল্লাহর হাত তো শেকল দিয়ে বাঁধা। আসলে ওদের হাতই শেকল দিয়ে বাঁধা। এ ধরনের কথার জন্যে তারা অভিশপ্ত হয়েছে। বরঞ্চ আল্লাহর হাত উন্মুক্ত ও বিস্তৃত। তিনি যেমন খুশী ব্যয় করেন।’

এটা আসলে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ইহুদীদের খারাপ ধারণারই নমুনা। কোরআন তাদের এই খারাপ ধারণার বেশ কিছু নমুনা উদ্ধৃত করেছে। যেমন তাদের কাছে দান সদকা চাওয়া হলে তারা নিজেদের কার্পণ্যকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্যে বলতো, আল্লাহ তায়ালা তো গরীব হয়ে গেছে

আর আমরা ধনী।' তারা এ কথাও বলতো যে, 'আল্লাহর হাত শেকলে বাঁধা।' এ দ্বারা তারা বুঝাতো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সামান্যই ধন সম্পদ দিয়ে থাকেন। কাজেই কেমন করে দান সদকা করবে? তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে জঘন্য মিথ্যা কথাটা বলতে চাইতো তা ছিলো এই যে, আল্লাহ তায়ালা (নাউযুবিল্লাহ) কৃপণ হয়ে গেছেন। কিন্তু এই কথাটা ঘুরিয়ে আরো কুৎসিত, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও কুফরীপূর্ণ ভাষায় বলতো যে, আল্লাহর হাত শেকলে বাঁধা। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহুদীদের মানসিকতা কত হীন, নীচ ও ইতরামির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো।

তাদের এই কথার প্রতিফল স্বরূপ তাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত করা এবং এই দোষ স্বয়ং তাদের ওপর কার্যকর করার মাধ্যমেই জবাব দেয়া হয়েছে যে,

'ওদেরই হাত শেকলে বাঁধা। উপরন্তু এ কথার জন্যে তারা অভিশাপ কুড়িয়েছে।'

বস্তুত তারা এ রকমই ছিলো। ধন সম্পদের ব্যাপারে তাদের মত কৃপণ আল্লাহর সৃষ্টি জগতে দ্বিতীয়টি নেই।

অতপর আল্লাহ এই বাতিল ও নিকৃষ্ট চিন্তাধারাকে শুধরে দিয়ে নিজের মহত্ব ও মহানুভবতা এবং নিজের বান্দাদেরকে বিনা হিসাবে রিযিকদানের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

'বরং তাঁর হাত দুটো উদার ও উন্মুক্ত। তিনি যেমন খুশী দান করেন।'

আল্লাহর দান যে অফুরন্ত ও সীমাহীন এবং সকল সৃষ্টির জন্যে অবারিত, তা সবাই দেখতে পায় এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। কেবল স্বীকার করে না ও দেখতে পায় না ইহুদীরা। কেননা তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ এবং অস্বীকারকারী। এমনকি তারা আল্লাহর প্রতি অশালীন বাক্য ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে জানাচ্ছেন এই অভিশপ্ত জাতির ওপর অচিরেই আরো কী কী দুর্যোগ নামবে এবং আরো কি কি দোষে তারা কলংকিত হবে। শুধু আল্লাহর শেষ নবীর প্রতি তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে এবং এই শেষ নবীর মাধ্যমে তাদের অতীত ও বর্তমানের অনেক গোপন দোষক্রুটি উন্মোচিত হওয়ার কারণেই তাদের এই সব দোষক্রুটি আরো বেড়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে, তা তাদের অনেকের মধ্যে বিদ্রোহ ও কুফরী বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

খানিকটা হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে এবং খানিকটা রসূল (স.)-এর প্রতি আল্লাহর নাযিল করা ওহী দ্বারা অপমানিত হবার কারণে তাদের কুফরী ও খোদাদ্রোহিতা আরো বেড়ে যাবে। কেননা একবার ঈমান আনতে অস্বীকার করার পর প্রতিপক্ষ হয়ে গিয়ে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া এবং ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা, বিদ্রোহ ও কুফরী বেড়ে যাওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ফল রসূল (স.) যেখানে মোমেনদের জন্যে রহমত স্বরূপ, সেখানে কাফেরদের ওপর মুসীবত স্বরূপ হয়ে যান।

এরপর আল্লহ তায়ালা রসূল (স.)-কে আরো জানাচ্ছেন যে, তিনি ইহুদীদের জন্যে আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও শত্রুতায় জর্জরিত হওয়া অবধারিত করে রেখেছেন। তাদের ইসলাম বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধে তাদের জন্যে পরাজয় নির্ধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিয়েছি। যখনই তারা কোনো যুদ্ধের আগুন জ্বালাবে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেবেন।'

ইহুদী জাতির মধ্যে বহু উপদল ও উপদলীয় কোন্দল সব সময়ই বিরাজমান ছিলো, যদিও বর্তমানে তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরস্পরকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে বলে

প্রতীয়মান হয়। আজকাল তারা মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ উস্কে দেয়ার অপচেষ্টাও চালাচ্ছে এবং তাতে সফলও হচ্ছে। তবে স্বল্প সময় স্থায়ী ও কৃত্রিম একটা পরিস্থিতিকে আমাদের আমল দেয়া উচিত নয়। চৌদ্দ শ' বছর ব্যাপী এমনকি ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেও ইহুদীরা পারস্পারিক কোন্দল, লাঞ্ছনা ও অনৈক্যে জর্জরিত ছিলো। তাদের শেষ পরিণতিও তদ্রূপ, চাই তাদের চারপাশে যতোই পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকের ভীড় থাক না কেন। তবে ইহুদীদের বর্তমান অবস্থা কতোদিন স্থায়ী থাকবে, সেটা নির্ভর করে মোমেনদের একটি সংঘবদ্ধ সংগ্রামী দলের আবির্ভাবের ওপর। কেননা এ ধরনের মোমেন দলের ওপরই আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সেই সংঘবদ্ধ সংগ্রামী মোমেন দল আজ কোথায়, যে দল আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য পাবে যে দল আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নেপথ্য মঞ্চ হিসাবে অবস্থান করবে এবং যে দলকে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করবেন?

যেদিন মুসলিম উম্মাহ প্রকৃত ও পূর্ণাংগ ইসলামের দিকে ফিরে আসবে, যেদিন তারা তাদের সমগ্র জীবনকে ইসলামী শরীয়ত ও আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে, সেই দিন আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি এই ইহুদী জাতির ওপর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবে। ইহুদীরা এ ব্যাপারটা জানে বলেই তাদের থলিতে যতো ফন্দিফিকির ও চক্রান্ত জমা আছে এবং যতো আঘাত ও আক্রমণের পরিকল্পনা সঞ্চিত আছে, তার সবই পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে সংগ্রামরত ইসলামী পুনর্জাগরণী দলগুলোর ওপর প্রয়োগ করে চলেছে এবং নিজেদের হাত দিয়ে নয় বরং তাদের ক্রীড়নক ও ধামাধরা গোষ্ঠীগুলোর হাত দিয়ে জঘন্যতম ও হিংস্রতম আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সংগ্রামী নিষ্ঠাবান মোমেনদের বেলায় তারা আত্মীয়তা বা অংগীকারেরও কোনো মর্যাদা দেয় না।

তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছায় সফল ও জয়ী হয়েই থাকেন। আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যথা সময়ে বাস্তবায়িত হবেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা ঢুকিয়ে রেখেছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ তায়ালা তা নিভিয়ে দেন।'

বস্তুত, ইহুদীরা যে অনাচার ও অরাজকতার আগুন সারা পৃথিবীতে জালিয়ে রেখেছে, তা নেভানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা কাউকে না কাউকে অবশ্যই পাঠাবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অরাজকতা ও বিশৃংখলা পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন না, তা নির্মূল ও প্রতিহত করতে পারে এমন কোনো বান্দাকে তিনি না পাঠিয়েই পারেন না।

'তারা পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়। আর আল্লাহ অরাজকতা পছন্দ করেন না।'

ইসলামের ভারসাম্যমূলক মূলনীতি

আলোচ্য আয়াতগুলোর শেষ দুটিতে ইসলামের সর্বোচ্চ মূলনীতিটি আলোচিত হচ্ছে। মূলনীতিটি এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো মোমেনদের জীবনে ইহকাল ও পরকালে সর্বাংগীণ কল্যাণ, মংগল ও সুস্থতা নিশ্চিত করা। এখানে দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য নেই, দুনিয়া ও আখেরাতেও নেই কোনো ভেদাভেদ। ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র বিধান। ইসলাম ধর্মীয় ও সাংসারিক উভয় জীবনের জন্যে শান্তির একমাত্র ব্যবস্থা। এই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী মূলনীতির আলোচনা এসেছে আল্লাহর দ্বীন থেকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্যুতি সংক্রান্ত আলোচনার রেশ ধরে। তারা আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণ পরিহার করে হারাম জীবিকা উপার্জন এবং পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে আল্লাহর কেতাবকে বিকৃত করার অপকর্মে লিপ্ত হতো। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর দ্বীন অমান্য করার চেয়ে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করাই ছিলো অধিকতর উপকারী ও লাভজনক। আল্লাহ তায়ালা সেই কথাই বলেছেন নিম্নের দুটি আয়াতে।

'যদি আহলে কেতাব ঈমান আনতো ও খোদাভীতির পথ অনুসরণ করতো, তাহলে আমি তাদের গুনাহ মাফ করে দিতাম এবং নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশতে প্রবেশ করাতাম। যদি আহলে কেতাব তাওরাত ও ইনজীলকে বাস্তবায়িত করতো এবং তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (সর্বশেষে) যা নাযিল করা হয়েছে তা কার্যকরী করতো, তবে তারা তাদের ওপর থেকে ও পায়ের নীচ থেকে খাদ্যের সরবরাহ পেতো। তাদের মধ্যে একটি দল আছে মধ্যপন্থী। তবে তাদের অনেকেই অসৎ কর্মশীল।'

এই দুটো আয়াত ইসলামী জীবনাদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এবং মানব জীবনের একটি মহাসত্যকে তুলে ধরেছে। আজ যখন মানুষের বিবেক বুদ্ধি, মূল্যবোধ ও সামাজিক পরিবেশ আদর্শিক গোমরাহী ও গোলক ধাঁধায় এতই দিশাহারা যে, এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও মহাসত্যের কোনো সন্ধানই পাচ্ছে না, তখন এ দুটি জিনিসকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশী।

আল্লাহ তায়ালা আহলে কেতাবকে লক্ষ্য করে এখানে যে কথাটা বলেছেন, তা যে কোনো আসমানী কেতাবধারী জাতির বেলায় প্রযোজ্য। কথাটা এই যে, তারা যদি আল্লাহর দ্বীনের ওপর ঈমান এনে তাকওয়া ও খোদাভীতির জীবন গড়ে তুলতো, তাহলে আখেরাতে এই প্রতিদান পেতো যে, তাদের গুনাহ মাফ করে বেহেশতে প্রবেশ করানো হতো। আর যদি আল্লাহর ওই দ্বীনকে যা তাওরাত, ইনজীল ও যাবতীয় আসমানী কেতাবে বর্ণিত ও আলোচিত হয়েছে পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করতো, তাহলে তাদের পার্থিব জীবন সর্বাঙ্গীণ সুন্দর, সুস্থ ও শান্তিময় হতো। তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে জীবিকা সরবরাহ করা হতো। জীবন যাপনের সুষ্ঠু পরিবেশ, সম্পদের প্রাচুর্য, ব্যাপক উৎপাদন ও সুষম বন্টনের ফলে সর্বাত্মক সচ্ছলতা আসতো। কিন্তু তারা ঈমানও আনে না, তাকওয়ার পথও অবলম্বন করে না এবং তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে গুটিকয় সদাচারী লোক ব্যতীত কেউ আল্লাহর বিধানও মেনে চলে না। তাদের অনেকেই অসৎ কর্মশীল।'

এভাবে এই দুটি আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ঈমান, খোদাভীতি এবং পার্থিব জীবনে আল্লাহর বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন শুধু আখেরাতের প্রতিদানই নিশ্চিত করে না, যদিও সেটাই অগ্রগণ্য ও চিরস্থায়ী বরং তা পার্থিব জীবনেও সুখ শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং মোমেনদের জন্যে ইহকালীন পুরস্কার অবধারিত করে, তা সে সম্পদের প্রাচুর্য, উৎপাদনের আধিক্য, সুষম বন্টন ও পর্যাপ্ততা যেদিক দিয়েই বিবেচনা করা হোক না কেন। 'তাদের ওপর থেকে ও পায়ের নীচ থেকে খাদ্যের সরবরাহ পেতো' কথাটা আক্ষরিক অর্থেই প্রাচুর্য ও সরবরাহের ব্যাপকতার চিত্র তুলে ধরে।

এভাবে এও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আখেরাতে উত্তম প্রতিদান লাভ ও দুনিয়ার জীবনকে সুখময় করার জন্যে আলাদা আলাদা পন্থা নেই। একই পন্থা ও পদ্ধতি রয়েছে, যা দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই সুখময় করা যায়। এই পন্থা যখন অগ্রাহ্য ও অমান্য করা হয়, তখন দুনিয়াও বিকারগ্রস্ত এবং আখেরাতও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই একক পন্থা ও পদ্ধতিটা হলো ঈমান, তাকওয়া ও আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে কায়েম করা।

দুনিয়া আখেরাত হচ্ছে একই গন্তব্যের দুটো মানযিল

আল্লাহর এ বিধান শুধু আকীদা বিশ্বাস, ঈমান, মানসিক অনুভূতি ও উপলব্ধি এবং খোদাভীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের বাস্তব ও কর্মময় জীবন পর্যন্তও বিস্তৃত। এই বিধান বাস্তবায়নের অর্থই এর আলোকে জীবন পরিচালনা ও গঠন করা। ঈমান ও খোদাভীতি

সহকারে এই বিধানের পূর্ণাংগ বাস্তবায়নই ইহকালীন জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি, জীবিকার পর্যাপ্ত সরবরাহ, উৎপাদনের আধিক্য ও সুষম বন্টন নিশ্চিত করে। ফলে আল্লাহর বিধানের অধীনে সকল মানুষ আকাশ ও পৃথিবী উভয় জায়গা থেকে ব্যাপক জীবিকা লাভ করে ও সর্বাংগীণ সুখ ও তৃপ্তির জীবন যাপন করে।

ইসলামী জীবন বিধান ধর্মকে দুনিয়ার বিকল্প, আখেরাতের সুখকে দুনিয়ার সুখের বিকল্প এবং আখেরাতের মুক্তির পথকে দুনিয়ার সুখ ও নিরাপত্তার পথ থেকে ভিন্ন পথ হিসাবে বিবেচনা করে না। অথচ এই সত্যটাই এ যুগের মানুষের বিবেক বুদ্ধি, চিন্তাধারা ও বাস্তব জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

আজকের মানুষের চিন্তাধারায়, বিবেকবুদ্ধিতে ও বাস্তব জীবনে দুনিয়ার পথ ও আখেরাতের পথ আলাদা হয়ে গেছে। এই দুই পথকে এক করার কোনো উপায় আছে কিনা, সেটা এ যুগের বিভ্রান্ত মানব জাতির কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এর সম্পূর্ণ উল্টোটাই তারা জানে। তারা জানে যে, তাদেরকে হয় দুনিয়ার পথ বেছে নিতে হবে এবং আখেরাতকে হিসাব নিকাশ ও বিচার বিবেচনার বাইরে রাখতে হবে। নচেত আখেরাতের পথ বেছে নিতে হবে এবং দুনিয়ার জীবনটাকে হিসাব নিকাশ ও বিচার বিবেচনার আওতা বহির্ভূত রাখতে হবে। এ দুটোকে একত্রিত করার কোনো উপায় বাস্তবেও নেই, কল্পনাতেও নেই। কেননা দুনিয়ার বাস্তব জীবনধারা তাদেরকে একথাই শেখায়।

আল্লাহ তায়ালা থেকে ও আল্লাহর বিধান থেকে দূরে অবস্থিত আজকের ভ্রষ্ট জাহেলী জীবনধারাই দুনিয়ার পথ ও আখেরাতের পথকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রেখেছে। ফলে যারা সমাজে প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং পার্থিব সম্পদ লাভ করতে চায়, তারা আখেরাতের পথ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, উন্নত ও মহৎ জীবনাদর্শ এবং পবিত্র ও পরিশীলিত আচরণ ও কার্যকলাপ এড়িয়ে চলতে বাধ্য হয়। অথচ ধর্ম এ সব জিনিসকেই উৎসাহিত করে থাকে। অনুরূপভাবে যারা আখেরাতে মুক্তি লাভকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তারা দুনিয়ার নোংরা জীবনধারা, দুনিয়ায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের উপায় উপকরণ ও দুনিয়ার আর্থিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়। কেননা এসব উপায় উপকরণ পরিচ্ছন্নও হতে পারে না, ধর্ম ও নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীলও নয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সহায়কও নয়।

অথচ মানুষ এই পরিস্থিতিকে অনিবার্য বাস্তবতা মনে করে। এই অবাঞ্জিত অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো পথ খুঁজে পায় না। দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির পথকে একীভূত করার কোনো উপায় দেখতে পায় না।

আসলে কিন্তু এটা কোনো অনিবার্য ব্যাপার নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে ভেদাভেদ কোনো চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব নয়। সত্য কথা এই যে, এটা মানব জীবনের জন্যে আদৌ স্বাভাবিকই নয়। এটা একটা সাময়িক বিভ্রান্তি ও বিকৃতি।

মানব জীবনের জন্যে স্বাভাবিক ব্যাপার এটাই যে, দুনিয়া ও আখেরাতের পথ যেন একই পথ হয়। যেটা আখেরাতে কল্যাণের পথ, অবিকল সেটাই যেন হয় দুনিয়ার জন্যেও কল্যাণের পথ। পার্থিব জীবনে যে কাজে সম্পদের উৎপাদন, উন্নয়ন ও প্রাচুর্য অর্জিত হয়, সেই কাজ দুনিয়ায় যেমন সুখের কারণ হয়ে থাকে, আখেরাতেও যেন তেমনি পুণ্যের কারণ হয়। ঈমান, খোদাভীতি ও নেক আমল যেমন আল্লাহর সন্তোষ ও আখেরাতের মুক্তি লাভে সহায়ক হয়ে থাকে, তেমনি তা যেন পার্থিব জীবনকে সুখময় ও সৌন্দর্যমন্ডিত করার কাজেও সহায়ক হয়।

স্বাভাবিকভাবে মানব জীবনের মূলনীতি এটাই। তবে এই মূলনীতি কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করে, যখন মানুষের জীবন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর মনোনীত বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই বিধান অনুসরণ করলে জীবনের প্রতিটি কাজ এবাদতে পরিণত হয়। এই বিধানই মানুষের ওপর আল্লাহর শরীয়ত অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনাকে ফরয বলে ঘোষণা করেছে, ইসলামের পরিভাষায় এর নাম খেলাফত। শ্রম, উৎপাদন, উন্নয়ন, প্রাচুর্য, ন্যায়সম্মত বন্টন– এই সবই খেলাফতের আওতাভুক্ত। এ দ্বারা আল্লাহর দেয়া জীবিকা আকাশের ওপর থেকে ও মাটির নীচ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াতে বলেছেন।

ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসারে পৃথিবীতে মানুষের কাজই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অনুমতিক্রমে ও তাঁর শর্তানুসারে প্রতিনিধিত্ব করা। তাই যে শ্রম দ্বারা সম্পদ উৎপন্ন হয়, যে কাজ দ্বারা পৃথিবীর অন্তর্নিহিত শক্তি, কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে, সমৃদ্ধি আনা যায়, এমন কি যে কাজ দ্বারা প্রাকৃতিক ও মহাবিশ্বের অজানা সম্পদকে আবিষ্কার করে ব্যবহার করে উন্নয়ন সাধন করা যায়, সেই সব কাজ ও শ্রম খেলাফতের দায়িত্ব সম্পদনের নামান্তর। মানুষের এই দায়িত্ব আল্লাহর আইন, বিধান ও শরীয়ত অনুযায়ী পালন আল্লাহর এবাদতের শামিল। এ এবাদত দ্বারা বান্দা একদিকে যেমন পৃথিবীতে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি লাভ করে, তেমনি আখেরাতেও সওয়াব পায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার অনুগত করে দিয়েছেন এই পৃথিবীকে। এই পৃথিবীতে বসবাস করে সে নিজের উক্ত এবাদতরূপী শ্রম দ্বারা সুখ-শান্তি লাভ করতে সক্ষম। এই কথাটাই কোরআন অত্যন্ত মনোমুগ্ধকার ভাষায় এখানে ব্যক্ত করেছে।

ইসলামী জীবনাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি পৃথিবীর লুক্কায়িত সম্পদ উদঘাটনে সচেষ্ট হয় না এবং যে প্রকৃতিকে তার অনুগত ও বশীভূত করে দেয়া হয়েছে, তার শক্তিগুলোকে ব্যবহারের চেষ্টা করে না, সে আল্লাহর নাফরমান বান্দা হিসাবে বিবেচিত হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করার উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা ফেরেশতাদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, সেই খেলাফতের দায়িত্ব পালনে সে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে আল্লাহর বান্দাদের জন্যে প্রদত্ত আল্লাহর জীবিকাকে তাদের কাছে পৌঁছার সুযোগ করে না দেয়ার জন্যে দায়ী হবে। এভাবে দুনিয়ার ক্ষতির জন্যে সে আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এভাবে ইসলামী বিধান দুনিয়ার কাজ ও আখেরাতের কাজকে একীভূত ও উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় সাধন করে। তাই আখেরাত পাওয়ার জন্যে কোনো মানুষকে দুনিয়া খোয়াতে এবং দুনিয়া পাওয়ার জন্যে কাউকে আখেরাত খোয়াতে হয় না। কেননা দুনিয়া ও আখেরাত ইসলামের দৃষ্টিতে পরস্পরের বিরোধীও নয়, একে অপরের বিকল্পও নয়। বরং পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক।

এ কথা সাধারণ মানুষের বেলায় এবং মুসলিম জাতিগুলোর বেলায় সামগ্রিকভাবে যেমন প্রযোজ্য, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ব্যক্তির বেলায়ও প্রযোজ্য। কেননা ইসলামী বিধানে ব্যক্তি ও সমষ্টির কর্মপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন নয় এবং পরস্পরের বিরোধী ও পরিপন্থী নয়। ইসলামী বিধানের আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য সর্বোচ্চ ও সর্বাত্মক শরীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে শ্রম দেয়া ও উৎপাদন করা এবং এই শ্রম ও উৎপাদনের কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি যে কামনা করবে, সে ধোকা দেবে না, মানুষকে ঠকাবে না, মানুষের ওপর যুলুম নিপীড়ন ও শোষণ চালাবে না এবং খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এ ধরনের লোকেরা দুর্নীতি ও হারামখোরিতেও লিপ্ত হয় না। এ ধরনের লোকেরা নিজের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন সম্পদে তার নিজের ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকারে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি বিশ্বাস করে ওই সম্পদে

আল্লাহর নির্ধারিত সীমার আওতায় সমাজের অধিকারেও। কেননা ইসলামী বিধান এই সব সীমার আওতায় ব্যক্তির কাজের অধিকারও স্বীকার করে। এই ব্যক্তিগত মালিকানা ও অধিকার স্বীকার করা সত্ত্বেও একজন মুসলমান তার ভায়ের যে জিনিসের অভাব, তা তার কাছে থাকলে তা তাকে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই দানকেও সে আল্লাহর এবাদত গন্য করে এবং দুনিয়ায় বরকত ও আখেরাতে বেহেশতের আকারে এর সুফল পাবে বলে বিশ্বাস করে। ইসলাম বান্দার ওপর দিনে পাঁচবার নামায, প্রতি বছরে ত্রিশ দিন রমযানের রোযা, সারা জীবনে একবার হজ্জ এবং প্রতি বছর যাকাত বা প্রতি ফসলের মওসুমে উশর ফরয করার মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে সংযোগ পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

এ কারণেই ইসলামে ফরয এবাদতগুলোর এতো গুরুত্ব। এ দ্বারা সমগ্র জীবনের জন্যে অবশ্যপালনীয় আল্লাহর পূর্ণাংগ জীবন বিধানের সাথে বান্দার সম্পর্ক সুরক্ষিত করা হয় এবং এ জন্যে আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পুনরুজ্জীবিত করা হয়। সেই সাথে এগুলো বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভেও সাহায্য করে এবং আল্লাহর এই পূর্ণাংগ জীবন বিধানকে সঠিকভাবে পালন করার সংকল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে। এ জীবন বিধান শ্রম, উৎপাদন, বন্টন ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিরোধের মীমাংসার ব্যবস্থা করে। এবাদতগুলো আল্লাহর পূর্ণাংগ বিধান প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্যের অনুভূতি পুনরুজ্জীবিত করে। অনুরূপভাবে তা মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী প্রবৃত্তির লালসা, ভ্রষ্টতা ও একগুঁয়েমি প্রতিহত করতেও সাহায্য করে। এই সব এবাদত শ্রম, উৎপাদন, বন্টন, শাসন, বিচার এবং পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা ও মানব জীবনের ওপর তার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে জেহাদ পরিচালনা প্রভৃতি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বস্তুত ঈমান, খোদাভীতি ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতগুলোর সমন্বয়ে ইসলামের সেই অংশটি গঠিত, যা অপর অংশকে সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করে। এভাবে ঈমান, খোদাভীতি ও বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির পথও উন্মুক্ত করে। আল্লাহ তায়ালা এই দুটি আয়াতে এটারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইসলামী আদর্শ ও তা থেকে উদ্ভূত ইসলামী আইন ও বিধান আখেরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের বিকল্প বা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জীবনের বিকল্প হিসাবে আখ্যায়িত করে না। বরং উভয় জীবনকে একই পন্থায় ও একই চেষ্টা-তৎপরতার মাধ্যমে একই সাথে সক্রিয় করে। তবে এই উভয় জীবন একই সাথে মানুষের জীবনে বিরাজ করে কেবল তখনই, যখন মানুষ নিজ জীবনে একমাত্র আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে এবং তার সাথে সে মানব রচিত বা তার স্বরচিত এমন কোনো বিধি বা নীতির সংমিশ্রণ ঘটায় না, যা আল্লাহর বিধানের অধীনে ও তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বস্তুত একমাত্র আল্লাহর বিধানেই দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে।

অনুরূপভাবে, ইসলামী জীবনাদর্শ ও তা থেকে উদ্ভূত ইসলামী আইন ও বিধান ঈমান, এবাদাত, সততা ও খোদাভীতিকে বস্তুগত জীবনের শ্রম, উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরে না। ইসলাম এমন বিধান নয় যে, সে মানুষকে শুধু আখেরাতের বেহেশত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে এবং তা অর্জনের পন্থা বাতলাবে। কিন্তু দুনিয়ার বেহেশত তথা সুখশান্তি অর্জনের পন্থা রচনা করার ভার খোদ মানুষের ওপর ন্যস্ত করে রাখবে। বর্তমান যুগের কিছু খৃষ্টান অবশ্য এরূপই মনে করে থাকে। ইসলামী বিধানে পার্থিব জীবনের শ্রম, উৎপাদন ও

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের আওতাভুক্ত আর ঈমান, এবাদাত, সততা ও খোদাভীতি মানব জীবনে ইসলামের বাস্তবায়নের সহায়ক। এর উক্ত উভয় ধরনের কাজ একত্রে মিলিত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় বেহেশত তথা সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। উভয় বেহেশতে যাওয়ার জন্যে একই পথ নির্ধারিত। দুনিয়ার বাস্তব জীবন ও ধর্ম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অথচ এ যুগে পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় এ দুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। ওই সব সমাজের লোকেরা মনে করে, মানুষের পক্ষে দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, উভয়কে একত্রিত করার কোনো উপায় নেই, তাত্ত্বিকভাবেও নয়, বাস্তবেও নয়। কেননা তাদের মতে, দুনিয়া ও আখেরাত আসলেইএকত্রিত হয় না।

দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে, দুনিয়া ও আখেরাতে কাজের মাঝে, আধ্যাত্মিক এবাদত ও বস্তুগত আবিস্কার উদ্ভাবনের মাঝে এবং দুনিয়ার সাফল্য ও আখেরাতের সাফল্যের মাঝে এই যে বিভেদ ও ব্যবধান, তা আল্লাহর কোনো নির্দেশে আরোপিত হয়নি, বরং তা মানুষ নিজেই নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়েছে। আর তাও চাপিয়ে নিয়েছে আল্লাহর বিধান অমান্য করার মাধ্যমে এবং সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে।

অথচ এই স্ব-অর্পিত ও মনগড়া বিভেদ তার জন্যে দুনিয়ার জীবনেও সীমাহীন দুঃখকষ্ট ও বিপদ মুসিবত ডেকে এনেছে, আর আখেরাতেও তার জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছে আরো ভয়াবহ আযাব।

বিশ্বব্যাপী অশান্তির মূল কারণ

যারা ধর্মকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ভেবেছে যে, ধর্মকে প্রত্যাখ্যান ও বর্জন করাই শ্রম, উৎপাদন, বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়, তারা এর পরিণামে হতাশা, অস্থিরতা, উদ্বেগ ও পেরেশানী ছাড়া আর কিছু পায়নি। ঈমানের দরুন যে মানসিক শান্তি, তৃপ্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করা যায়, তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজ স্বভাব প্রকৃতির সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মানুষ মাত্রেরই হৃদয় ও বিবেকে জন্মগতভাবে এমন একটি বিশ্বাসের প্রবল চাহিদা রয়েছে, যা তার মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। তার মন কখনো শূন্য থাকতে পারে না। এই চাহিদা মানব রচিত কোনো দর্শন বা মতবাদ দ্বারা পূর্ণ হতে পারে না। কেননা এ চাহিদাটা আসলে কোনো না কোনো ইলাহ বা উপাস্যের চাহিদা, যা কেবল কোনো ইলাহ বা খোদা সংক্রান্ত বিশ্বাস দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে।

অনুরূপভাবে, যারা আল্লাহকে কেবল বিশ্বাসের পর্যায়ে মান্য করে কিন্তু সেই সাথে আধুনিক সমাজের সেই সব নীতি, আদর্শ, আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থার আনুগত্য করে, যা আল্লাহর বিধানের একেবারেই বিরোধী, অর্থ উপার্জন ও সফলতা লাভের সেই সব পথ অনুসরণ করে, যা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা আচরণ-বিধি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী, তারাও অস্থিরতা, হতাশা ও তীব্র মানসিক অশান্তিতে ভুগতে বাধ্য।

আজকের পৃথিবীর গোটা মানব জাতি, চাই তারা বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী মতবাদের অনুসারী হোক, অথবা ধর্ম ও পার্থিব জীবনকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার পক্ষপাতী হোক, ধর্ম আল্লাহর ও জীবন মানুষের এই মতবাদে বিশ্বাসী হোক, অথবা ধর্মকে শুধু বিশ্বাস, উপাসনা, অনুভূতি ও নৈতিকতার সমষ্টি এবং জীবনকে আইন কানুন, রাষ্ট্র, সমাজ, উৎপাদন ও শ্রম ইত্যাদির সমষ্টি মনে করুক– একই অস্থিরতা ও মানসিক অশান্তিতে ভুগছে।

মানব জাতি এই অস্থিরতা, অশান্তি ও হতাশায় ভুগছে শুধু এ কারণে যে, তারা আল্লাহর সেই বিধানকে মনে প্রাণে গ্রহণ করছে না, যা দুনিয়া ও আখেরাতে পার্থক্য করে না বরং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। দুনিয়ার সুখ সমৃদ্ধি ও আখেরাতের সুখ শান্তিকে পরস্পর বিরোধী মনে করে না, বরং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।

যে সব জাতি আল্লাহর বিধানে ঈমান আনে না, অসততা ও দুষ্কৃতি পরিত্যাগ করে না, অথচ তা সত্তেও তারা উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী, তাদের এই বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাঁকজমক দেখে প্রতারিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। কেননা এই চোখ ধাঁধানো উন্নতি ও সমৃদ্ধি একেবারেই সাময়িক। আল্লাহর শাশ্বত নীতি একদিন ওই সব জাতির জীবনে প্রযুক্ত হবেই। আল্লাহর বিধানের সাথে দুনিয়াবী আবিষ্কার উদ্ভাবনের দুঃখজনক বিভেদ ও বিচ্ছেদের অশুভ পরিণাম একদিন প্রকাশ পাবেই। ইতিমধ্যে এর কিছু কিছু আলামতও বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যথা, এই সব জাতিতে সম্পদের অসম বন্টনের কারণে সমাজে এক ধরনের অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ বঞ্চনা, হিংসা বিদ্বেষ ও এর পরিণতিতে সম্ভাব্য বিপ্লবের আতংকে প্রায় দিশাহারা। শত প্রাচুর্যের মধ্যেও এ এক মহা দুর্যোগ বটে। যে সব জাতি কিছুটা সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা দিতে ইচ্ছুক, তাদের মধ্যে উক্ত অস্থিরতা দমন নীতি, সন্ত্রাস ও একনায়কত্বের আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা সুষম বন্টনের খাতিরেই তারা এসব পদক্ষেপ নিতে চেয়েছে। এটা এমন এক আপদ, যা থেকে মানুষ বিন্দুমাত্রও নিরাপত্তা বোধ করে না এবং একটি রাতও শান্তিতে ঘুমাতে পারে না।

মানসিক ও নৈতিক অধপতন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ধীরে হোক, দ্রুত হোক, তা গোটা জীবনকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছে। উৎপাদন, শ্রম ও বন্টন– এই তিনটে জিনিসের সব কটির জন্যেই নৈতিক গ্যারান্টির প্রয়োজন। শুধুমাত্র আইন দিয়ে যে শ্রম ও উৎপাদনের প্রক্রিয়া সচল রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, সেটা আমরা সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি।

রকমারি ব্যাধি ও স্নায়বিক অস্থিরতা বিশ্বের বিশেষত উন্নত জাতিগুলোকে ধ্বংস করার উপক্রম করেছে। এর ফলে মেধা ও সহনশীলতার মান ও সেই সাথে উৎপাদন ও শ্রমের মানও নেমে যাচ্ছে। পরিশেষে তা অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। এসব আলামত এখন এত স্পষ্ট যে, তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ।

বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে এ আশংকায় মানুষ সর্বক্ষণ উৎকন্ঠার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। বিশ্ব এমনিতেই উত্তেজনায় তটস্থ। তার চারদিকে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের হুমকি বিরাজ করছে। সচেতনভাবেই হোক আর অসচেতনভাবেই হোক, যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলার ভয়ে প্রতিটি মানুষের স্নায়ুতে ক্রমাগত চাপ পড়ছে এবং সেই চাপের দরুন রকমারি স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। তাই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরন ও আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু ইদানীং উন্নত দেশগুলোতে যে রূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, অনুন্নত দেশগুলোতেও তদ্রূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেনি।

কোনো কোনো জাতির ধ্বংস ও অবলুপ্তির দিকে ঝুঁকে পড়ার মধ্য দিয়ে এই আলামতগুলো আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইদানীং এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হয়ে দেখা দিয়েছে ফরাসী জাতি। বস্তুগত কার্যকলাপ ও আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের মধ্যে ভেদাভেদ করা, দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে পার্থক্য করা, ধর্ম ও কর্মে পার্থক্য করা, আখেরাতের মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছ থেকে বিধান গ্রহণ ও দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে মানব রচিত বিধান গ্রহণ এবং আল্লাহর বিধান ও মানুষের পার্থিব জীবনের মাঝে বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার কী পরিণতি হতে পারে ফরাসী

জাতির বর্তমান অবস্থা তারই উদাহরণ এবং অন্যদের সেই মহাসত্য সংক্রান্ত কোরআনের বর্ণনা সম্পর্কে বর্তমান আলোচনা শেষ করার আগে আমি ঈমান, খোদাভীতি ও মানুষের বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের সাথে উন্নয়ন, উৎপাদন, শ্রম ও পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের সমন্বয় সাধনের ওপর ঈমান কতখানি গুরুত্ব দিয়েছে সেটা পুনরায় জোর দিয়ে উল্লেখ করতে চাই। এই সমন্বয় শুধু আহলে কেতাব নয়, বরং প্রত্যেক মানব সমাজের পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তির জন্যে আল্লাহর নির্ধারিত শর্ত পূরণ নিশ্চিত করে। এ দ্বারাই মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গা বেহেশত তথা শান্তি, নিরাপত্তা, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির লীলাভূমিতে পরিণত হয়।

কিন্তু এ কথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো ঈমান, খোদাভীতি ও বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন। এই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই পার্থিব উন্নতি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য লাভ নিশ্চিত হয়। উপরন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ জীবনের সমস্ত স্বাদ ও রুচি পাল্টে দেয় এবং জীবনের সমস্ত মূল্যবোধকে উন্নত ও মার্জিত করে। ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিতে এটাই মূলকথা। অন্য সব কিছু আনুষঙ্গিকভাবে অর্জিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মাঝে এভাবেই পূর্ণ সমন্বয় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ঈমান, খোদাভীতি, এবাদত, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং মানব জীবনে আল্লাহর শরীয়তের বাস্তবায়নের যা কিছু সুফল পাওয়া যায়, তার সবই কেবল মানুষেরই প্রাপ্য এবং মানব জীবনেই তা উপভোগ্য। এ সবের আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলামী বিধান যখন ঈমান, খোদাভীতি ও আল্লাহর বিধান প্রভৃতি মৌলিক জিনিসের ওপর গুরুত্ব দেয়, এগুলোকে সমস্ত কর্মকান্ডের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণের ওপর জোর দেয় এবং এগুলোর সাথে সাঞ্জস্যপূর্ণ নয়-এমন প্রতিটি কাজকে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে, তখন তার কারণ এটা নয় যে, বান্দাদের ঈমান, এবাদত ও খোদাভীতিতে এবং ইসলামী বিধান বাস্তবায়নে আল্লাহর কোনো লাভ বা উপকার সাধিত হয়। বরং এর একমাত্র কারণ এই যে, এই বিধান বাস্তবায়ন ছাড়া মানুষের কোনো কল্যাণ সাধিত হতে পারে না বলে আল্লাহ তায়ালা জানেন।

এক হাদীসে কুদসীতে হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘হে আমার বান্দারা, আমি যুলুম করা নিজের ওপর হারাম করেছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও হারাম করেছি। কাজেই তোমরা একে অপরের ওপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা, আমি যাকে হেদায়াত করি, সে ছাড়া তোমাদের সবাই বিপথগামী। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়াত চাও। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত করবো। হে আমার বান্দারা, আমি যাদেরকে খাওয়াই, তারা ছাড়া তোমরা সবাই অনাহারে থাকতে বাধ্য। কাজেই তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও। আমি তোমাদেরকে খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা, আমি যাদেরকে পোশাক পরাই, তারা ছাড়া তোমরা সবাই উলংগ থাকতে বাধ্য। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে পোশাক পরাবো। হে আমার বান্দারা, তোমরা দিনরাত পাপচারে লিপ্ত। আর আমি সমস্ত গুনাহ মাফ করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। হে আমার বান্দারা, তোমরা কখনো আমার ক্ষতি সাধনেও সক্ষম হবে না, উপকার সাধনেও সক্ষম হবে না। হে আমার বান্দারা, তোমাদের পূর্বসূরীরা ও উত্তরসূরীরা, তোমাদের জ্বিনেরা ও মানুষেরা যদি তোমাদের সবচেয়ে আল্লাহভীরু ব্যক্তির সমান সৎ লোক হয়, তাহলেও

তাতে আমার রাজ্যের কোনো কিছু বৃদ্ধি পায় না। হে আমার বান্দারা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তিগণ তোমাদের জ্বিনেরা ও মানুষেরা সবাই যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে পাপিষ্ঠ লোকটির মতো দুর্বৃত্ত হয়, তথাপি তাতে আমার রাজ্যের কোনো ক্ষতি হয় না। হে আমার বান্দারা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তিগণ, তোমাদের জ্বিনেরা ও মানুষেরা যদি একই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আমার কাছে কিছু চায় এবং আমি প্রত্যেক প্রার্থীকে যা চেয়েছে তা দেই, তবে তাতে সমুদ্রে একটি সুঁচ ঢুকালে যতোটুকু পানি তার সাথে উঠে আসে, ততোটুকু ব্যতীত কোনো কমতি হয় না। হে আমার বান্দারা, তোমাদের কৃতকর্মগুলোই আমি গুনে গুনে সংরক্ষণ করি, অতপর তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেই। সুতরাং যে ব্যক্তি ভালো প্রতিদান পায়, তার আল্লাহর শোকর করা উচিত। আর যে ব্যক্তি খারাপ ফল পায়, তার নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ধিক্কার দেয়া উচিত নয়।' (মুসলিম)

এই হাদীসের আলোকেই আমাদের বুঝা উচিত ঈমান, এবাদত, খোদাভীতি, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে দেশ শাসনের উপকারিতা কী। এগুলো আমাদের তথা মানব জাতিরই কাজে লাগবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরই কল্যাণ সাধন করবে এবং এগুলো দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্যেও জরুরী।

একথা না বললেও চলে যে, আহলে কেতাবের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে শর্ত আরোপ করেছেন, তা শুধু আহলে কেতাবের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। আহলে কেতাবের জন্যে আরোপিত শর্তের মধ্যে রয়েছে ঈমান, আল্লাহভীতি ও শেষ নবীর পূর্বে তাদের ওপর তাওরাত, ইনজীল সহ যা কিছু নাযিল হয়েছে তার বাস্তবায়ন। কাজেই যাদের ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে, তাদের বেলায়ও এ সব শর্ত প্রযোজ্য। তাদেরকে তো শুধু কোরআন নয়, বরং পূর্ববর্তী কেতাবসমূহের মধ্যে যা যা রহিত হয়নি, তাও কার্যকরী করতে হবে। শেষ নবীর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর এ বিধান ছাড়া এখন আর কোনো বিধান গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই সর্বশেষ দ্বীন বা ধর্ম।

কাজেই উক্ত ঈমান, খোদাভীতি ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের ওপরও শর্ত হিসাবে আরোপিত আছে। আল্লাহ তায়ালা যাতে সন্তুষ্ট সেই ইসলাম তাদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করতে হবে। তবেই তারা গুনাহ মাফ, দুনিয়ার সুখ শান্তি ও প্রাচুর্য, আকাশ ও পৃথিবী থেকে অঢেল জীবিকা এবং আখেরাতে বেহেশত লাভের যোগ্য হবে।

আজকের সারা মুসলিম জাহানে যে ক্ষুধা, দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি, ভীতি,সন্ত্রাস ও দুর্যোগ দুর্ভোগ বিরাজ করছে, তা থেকে মুক্তি পেয়ে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে হলে এ শর্তগুলো পূরণ করতেই হবে। এ শর্ত অক্ষুণ্ন রয়েছে এবং কিভাবে তা পূরণ করতে হবে, তার পথও মুসলমানদের জানা রয়েছে। প্রয়োজন কেবল নতুন করে উপলব্ধি করা ও সচেতন হওয়া।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ
وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ
اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ
اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ
بِمَا لَا تَهْوٰىٓ اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوْٓا اَلَّا

রুকু ১০

৬৭. হে রসূল, যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা তুমি (অন্যের কাছে) পৌঁছে দাও, যদি তুমি তা না করো তাহলে তুমি তো (মানুষদের কাছে) তার বার্তা পৌঁছে দিলে না! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষের (অনিষ্ট) থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো অবাধ্য জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৬৮. তুমি (তাদের) বলো, হে আহলে কেতাবরা, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের প্রতি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (মনে করতে হবে,) তোমরা কোনো কিছুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত নেই; তোমার মালিকের কাছ থেকে যা কিছু তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরী বাড়িয়ে দেবে, সুতরাং তুমি এই কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে মোটেই আফসোস করো না। ৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ছিলো ইহুদী, সাবেয়ী, খৃষ্টান– (এদের) যে কেউই এক আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের কোনো ভয় নেই, (পরকালেও) তাদের কোনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে না। ৭০. বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে আমি (আনুগত্যের) অংগীকার আদায় করে নিয়েছিলাম এবং (সে মোতাবেক) আমি তাদের কাছে রসূলদের প্রেরণ করেছিলাম; কিন্তু যখনি কোনো রসূল তাদের কাছে এমন কোনো বিধান নিয়ে হাযির হয়েছে, যা তাদের পছন্দসই ছিলো না, তখনি তারা (এই রসূলদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আরেক দলকে তারা হত্যা করেছে। ৭১. তারা ধরে নিয়েছিলো, (এতো কিছু করা

تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ۚ
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ
ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ
اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۚ وَمَا
لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا
مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۚ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ ۚ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۚ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۚ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ

সত্ত্বেও) তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় আসবে না, তাই তারা (সত্য গ্রহণ করার ব্যাপারে) অন্ধ ও বধির হয়ে থাকলো, তারপরও আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন, তাদের অনেকেই আবার অন্ধ ও বধির হয়ে গেলো; তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তায়ালা তা পর্যবেক্ষণ করছেন। ৭২. নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে যারা (একথা) বলেছে, আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহ; অথচ মাসীহ (নিজেই একথা) বলেছে যে, হে বনী ইসরাঈল, তোমরা এক আল্লাহর এবাদাত করো, যিনি আমারও মালিক, তোমাদেরও মালিক; (মূলত) যে কেউই আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার (স্থায়ী) ঠিকানা হবে জাহান্নাম; এই যালেমদের (সেদিন) কোনো সাহায্যকারীই থাকবে না। ৭৩. তারাও কুফরী করেছে যারা বলেছে, তিন জনের মধ্যে তৃতীয় জন হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তারা যদি এখনো তাদের এসব (অলীক) কথাবার্তা থেকে ফিরে না আসে, তবে তাদের মাঝে যারা (একথা বলে) কুফরী করেছে, তাদের অবশ্যই কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবে পেয়ে যাবে। ৭৪. তারা কি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না? (কখনো কি) তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। ৭৫. মারইয়াম পুত্র মাসীহ তো রসূল ছাড়া কিছুই ছিলো না, তার আগেও (তার মতো) অনেক রসূল গত হয়েছে; তার মা ছিলো এক সত্যনিষ্ঠ মহিলা; তারা (মা ও ছেলে) উভয়ই (আর দু'দশটি মানুষের মতো করেই) খাবার খেতো; তুমি লক্ষ্য করে দেখো, আমি কিভাবে (আমার) আয়াতগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করছি,

ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ
ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا
فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا
كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ
اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا
يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا
يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ
لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾
وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ
اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾

তুমি দেখো, কিভাবে তারা সত্যবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। ৭৬. তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর এবাদাত করছো যা তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখেনা; (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ তায়ালা (সব কিছুই) শোনেন এবং (সব কিছুই) জানেন ৭৭. তুমি বলো, হে আহলে কেতাবরা, তোমরা কখনো নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না, (মাসীহের ব্যাপারে) তোমরা সেসব জাতির খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক লোককেই গোমরাহ করে দিয়েছে, আর তারা নিজেরাও সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

রুকু ১১

৭৮. বনী ইসরাঈলদের আরো যারা (মাসীহের ব্যাপারে আল্লাহর এ ঘোষণা) অস্বীকার করেছে, তাদের ওপর দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখ থেকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে; কেননা, তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালংঘন করেছে। ৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করতো না, তারা যা করতো নিসন্দেহে তা ছিলো নিকৃষ্ট। ৮০. তুমি তাদের মাঝে এমন বহু লোককে দেখতে পাবে, যারা (ঈমানদারদের বদলে) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতেই বেশী আগ্রহী, অবশ্য তারা নিজেরা যা কিছু অর্জন করে সামনে পাঠিয়েছে তাও অতি নিকৃষ্ট, এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন, এ লোকেরা চিরকাল আযাবেই নিমজ্জিত থাকবে। ৮১. তারা যদি সত্যিই আল্লাহ তায়ালা, (তাঁর) নবী ও তাঁর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি যথাযথ ঈমান আনতো, তাহলে এরা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না, কিন্তু তারা তো অধিকাংশই হচ্ছে গুনাহগার।

তাফসীর

আয়াত-৬৭-৮১

এ আয়াতগুলোতে আহলে কেতাব তথা ইহুদী এবং খৃষ্টানদের অবস্থা, তাদের আকীদা বিশ্বাসের বক্রতা এবং বিশেষ করে ইহুদীরা গোটা ইতিহাসে যা অকল্যাণকর কাজ করেছে তা বিবৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে তাদের এবং রসূল (স.) তথা গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার সম্পর্কের ধরন এবং তাদের সাথে রসূল (স.) এবং মুসলমানদের কি ধরনের আচরণ শোভনীয় তাও বর্ণিত হয়েছে। আর এ আলোচনার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারীদের ব্যাপারে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আচার আচরণের মূলনীতি এবং তাদের বোধ বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার মূলনীতি সম্পর্কে কতগুলো মৌলিক সত্য প্রতিষ্ঠা করা।

এখানে আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-কে রসূল হিসাবে সম্বোধন করে তাঁর ওপর নাযিল করা গোটা কোরআন তথা পুরো জীবন বিধানকে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং মানুষের কামনা বাসনার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল করা কোরআনের কিছু অংশ প্রচার করা থেকে বিরত থাকা অথবা বিলম্বে প্রচার করা থেকে এ বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি রসূল (স.) এমনটি না করেন তবে তিনি যেন তাঁর ওপর অর্পিত পয়গাম কিছুই পৌঁছাননি।

আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে এরপর যে সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পরিষ্কারভাবে একথা বলে দেয়া যে, আহলে কেতাবরা কখনোই কোনো মূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। যতোক্ষণ না তারা তাওরাত, ইনজীল ও তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের কাছে নাযিল করা অন্যান্য কেতাবগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে। অর্থাৎ সততা ও নিষ্ঠার সাথে তারা তাদের অনুসরণ করবে এবং যেগুলোকে নিজের জীবনে গ্রহণ করে নেবে। এটা খুবই স্পষ্ট বাক্য। অপর দায়িত্বটি হচ্ছে ইহুদীদের ওয়াদা ভংগ এবং নবীদের হত্যার দরুন তাদের কাফের হিসাবে ঘোষণা করা এবং খৃষ্টানদেরকেও একই উক্তির জন্যে কাফের ঘোষণা করা

'নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম অথবা আল্লাহ হচ্ছেন তিন জনের (খোদার) একজন।'

অনুরূপভাবে তিনি একথার ঘোষণাও দিয়েছেন যে, মসীহ ঈসা (আ.) বনী ইসরাইলকে এই শেরেকের পরিণতি সম্পর্কে এবং আল্লাহ তায়ালা এই মোশরেকদের জন্যে জান্নাতকে হারাম করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। আরো সতর্ক করে দিয়েছেন যে, বনী ইসরাইল তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের জন্যে হযরত দাউদ (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর মুখে অভিশপ্ত হয়েছে।

আহলে কেতাবদের সঠিক অবস্থান উন্মোচনের মাধ্যমে এ অধ্যায়ের সমাপনী টানা হয়েছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোশরেকদের সাহায্য করেছিলো। অনুরূপভাবে এখানে একথার ঘোষণাও দেয়া হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর নবীর ওপর তাদের ঈমান না আনার দরুন সৃষ্টি হয়েছে। পরিশেষে তাদেরকে নবী মোহাম্মদ (স.) কর্তৃক আনীত জীবন বিধানের ওপর ঈমান আনার জন্যে আহবান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় তারা মোমেন থাকবে না বরং ফাসেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করার পর আমি এবার তার বিস্তারিত আলোচনা পেশ করছি।

দাওয়াতের কাজে কোনো আপোষের সুযোগ নেই

এখানে রসূলুল্লাহ (স.)-কে এ মর্মে চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পুরো বিধান পুংখানুপুংখ জনসাধারণের কাছে তিনি যেন পৌঁছে দেন। আর তিনি এ হকের বাণী প্রচার করতে গিয়ে পার্থিব কোনো বিবেচনাকে যেন সামনে না রাখেন। অন্যথায় মনে করতে হবে তিনি যেন রেসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি আঞ্জাম দেননি এবং তার পয়গাম সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাননি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মানুষের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করবেন। যার হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং রব্বুল আলামীন নিজ হাতে গ্রহণ করেন অন্য মানুষ তার কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারে না।

নিসন্দেহে ঈমানের বাণী প্রচারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগা সমুচিত নয়; বরং তা পুরোপুরি নিসঙ্কোচে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া উচিত। এতে বিরুদ্ধাচরণকারীরা যা বলার বলুক এবং দ্বীনের শত্রুরা যা করার করুক। কারণ আকীদার সত্য বাণী কামনা বাসনার তোষামোদ ও তাবেদারী করে না। অনুরূপভাবে তা মনের অনাকাংখিত ইচ্ছার প্রতি ও ভ্রূক্ষেপ করে না, বরং তা একমাত্র এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখে যে, ঈমানের প্রচার এমনভাবে হোক যেন তা মানব অন্তরের অন্তস্তলে কার্যকরী অবস্থায় পৌঁছে।

আকীদার এই সত্যবাণী বলিষ্ঠ ও চূড়ান্তভাবে প্রচার করার অর্থ কর্কশতা ও নিষ্ঠুরতা নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে হেকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে তাঁর পথে আহবান করার জন্যে নির্দেশ করেছেন। এক্ষেত্রে কোরআনে হাকীমের বিভিন্ন নির্দেশের মাঝে পারস্পরিক কোনো বিরোধিতা ও সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়নি। হেকমত এবং উত্তম উপদেশ স্বয়ং বর্ণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ও অকাট্য সত্য নির্দেশের পরিপন্থী নয়। প্রচারের মাধ্যম এবং পদ্ধতি আর খোদ প্রচার ও তার বিষয়বস্তু এক জিনিস নয়। এক্ষেত্রে কাম্য হচ্ছে পরিপূর্ণ আকীদার হক বাণী, বর্ণনার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, তোষামোদ ও নমনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ না করা। আকীদাগত বাস্তব সত্যের ক্ষেত্রে আংশিক সমাধান এবং আপোষমূলক বক্তব্য বলতে কিছুই নেই। দাওয়াতের সূচনালগ্ন থেকে রসূল (স.) তাবলীগের ক্ষেত্রে হেকমত ও উত্তম উপদেশের পন্থা অবলম্বন করে দাওয়াত দিতেন। তিনি আকীদার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বক্তব্য রাখতেন, কোন প্রকার আপোষমূলক বক্তব্য থেকে বিরত থাকতেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কথা বলার জন্যে আদিষ্ট ছিলেন, 'হে কাফেররা তোমরা যার এবাদাত করো আমি তার এবাদাত করি না।' এখানে রসূল (স.) নাফরমান বান্দাদেরকে বিশেষণসহ (কাফের) সম্বোধন করেন এবং স্পষ্টভাবে উভয়ের কাজের ভিন্নতা বর্ণনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি তাদের উপস্থাপিত আংশিক সমাধান গ্রহণ করেননি এবং তিনি তাদের ইচ্ছা মাফিক তাদের তোষামোদও করেননি। এমনকি তিনি তাদেরকে এমন কথাও বলেননি যে, তিনি তাদের অবস্থানের সামান্য কিছু পরিবর্তন চান। বরং তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, তারা নিসন্দেহে নির্ভেজাল বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তিনি পরিপূর্ণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি হকের বাণী উঁচু, বলিষ্ঠ, পূর্ণাংগ ও চূড়ান্তরূপে এমন বাচনভংগিতে উপস্থাপন করেছেন, যাতে কোনো প্রকার কর্কশতা ও কঠোরতা ছিলো না।

উপরোক্ত আহবান ও নির্দেশ এ সূরার নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। (৬৭ নং আয়াত ও তার অনুবাদ)

উক্ত আহবানের পূর্বাপর প্রসংগ থেকে মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেতাবধারীরা যে অবস্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা যে বিশেষণের উপযুক্ত সে অবস্থান ও

বিশেষণসহ তাদের মুখোমুখি হওয়া। অধিকন্তু এ বলে তাদের মোকাবেলা করা যে, তারা কোনো হক বস্তুর ওপর প্রতিষ্ঠিতই নয় অর্থাৎ তারা দ্বীন, আকীদা এবং ঈমানের দিক থেকে সঠিক কোনো কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ তারা তাওরাত, ইনজীল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে নাযিল করা অন্যান্য কেতাবগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেনি অর্থাৎ তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে এগুলোর অনুসরণ করেনি এবং এগুলোকে তারা নিজের জীবন বিধানে পরিণত করেনি। সুতরাং আহলে কেতাবদের নিজেদেরকে কেতাবধারী, বিশ্বাসী এবং দ্বীনের অনুসারী হিসাবে দাবী করার কিছুই নেই।

ঈমানের দাবী কখন গ্রহণযোগ্য হবে

'পরিষ্কার করে বলে দিন, হে আহলে কেতাবরা, তোমরা কোনো কিছুর ওপরেই নেই, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইনজীল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠিত করো।'

যখন আল্লাহ তায়ালা রসূলে কারীম (স.)-কে আহলে কেতাবদের এ বলে মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা দ্বীন, আকীদা এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়– অর্থাৎ তারা গ্রহণযোগ্য কোনো মূল ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত নয় এবং যখন উপরোল্লিখিত পন্থায় চূড়ান্তভাবে আহলে কেতাবদের মুখোমুখি হওয়া ও মোকাবেলা করার জন্যে রসূল (স.) আদিষ্ট হলেন, তখন তারা তাদের নবীদের ওপর নাযিল করা কেতাবসমূহ তেলাওয়াত করে যাচ্ছিলো এবং অন্যদেরকেও পড়ে শুনাচ্ছিলো। অধিকন্তু তারা নিজেদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টান বলে দাবী করছিলো এবং তারা নিজেদেরকে এক ধরনের মোমেন হিসাবেই দাবী করছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে এ ক্ষেত্রে যেভাবে তাদের মোকাবেলা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে তাদের দাবীর কোনো রকম স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। কারণ 'দ্বীন' এমন কিছু শব্দের নাম নয় যা মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। এমন কিছু গ্রন্থের নামও নয়, যা সুরসহ পঠিত হয়। অনুরূপভাবে তা এমন কোনো বিশেষণের নাম নয়, যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়। নিসন্দেহে দ্বীন হচ্ছে একটি জীবন বিধান, যা অন্তরের গোপন আকীদাকে অন্তর্ভুক্ত করে, আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে প্রদর্শিত এবাদাত এবং ওই এবাদাত যা এই বিধানের ভিত্তিতে পুরো জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করার মাঝে লুপ্ত সেসব বিষয়কেও সন্নিবেশিত করে। যেহেতু কেতাবধারীরা উল্লেখিত বুনিয়াদসমূহের ভিত্তিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেনি, সুতরাং মহানবী রসূল (স.) এ মর্মে তাদের মোকাবেলার জন্যে আদিষ্ট হয়েছেন যে, তারা সঠিক কোন দ্বীন তথা জীবন বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিতই নয়।

তাওরাত, ইনজীল এবং তাদের প্রভুর পক্ষ হতে তাদের ওপর অর্পিত গ্রন্থকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম দাবী হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনে পুরোপুরি অবগাহন করা যা মোহাম্মদ (স.) নিয়ে এসেছেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা আহলে কেতাবদের কাছ থেকে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন যে, তারা প্রত্যেক রসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য সহযোগিতা করবে। মোহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাত এবং ইনজীলে বিদ্যমান ছিলো। যে বিষয়ে সর্বাধিক সত্যবাদী আল্লাহ তায়ালাও আমাদেরকে অবহিত করেছেন। যে, তারা তাওরাত, ইনজীল এবং তাদের প্রভুর পক্ষ হতে তাদের কাছে নাযিল করা গ্রন্থসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেনি। উল্লেখ্য, এখানে তাদের প্রভুর পক্ষ হতে তাদের ওপর অর্পিত গ্রন্থ বলতে বুঝানো হয়েছে কোরআনে হাকীম অথবা অপরাপর অন্যান্য গ্রন্থ যেমন যাবুর যা দাউদ (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি বলবো, তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত, ইনজীল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে

নাযিল করা অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থাবলীকে প্রতিষ্ঠিত ও অনুসরণ করতে পারে না– যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা এ নতুন দ্বীনে প্রবেশ না করবে। এটা এমন এক দ্বীন যা অপরাপর দ্বীনের সত্যতা প্রমাণ করবে এবং তার সংরক্ষণ করবে। অতএব, তারা আল্লাহর সাক্ষ্যানুসারে সঠিক দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা সর্বশেষ দ্বীনে প্রবেশ না করবে। রসূলে মাকবুল (স.) এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছেন যে, তিনি তাদের ক্ষেত্রে খোদায়ী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করবেন এবং তাদের সত্যিকার গুণাবলী এবং অবস্থান তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন। অন্যথায় তিনি যেন তার প্রভুর পক্ষ হতে আনীত রেসালাত পৌঁছাননি। আল্লাহর পক্ষ হতে এটা কত বড়ই না ধমক ও সতর্কবাণী উক্তি।

আল্লাহ তায়ালা এটা ভাল করেই জানতেন যে, উল্লেখিত বাস্তবতা ও বক্তব্যের মাধ্যমে আহলে কেতাবের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা তাদের অনেকেরই কুফুর ও ঔদ্ধত্য এবং গোয়ার্তুমী ও অবাধ্যতাকে বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এটা আল্লাহর ওই নির্দেশকে নিষেধ করে না যে, রসূল (স.) এটা ছাড়া তাদের মোকাবেলা করবে। এই মোকাবেলার দরুন তাদের কুফুর, ঔদ্ধত্য, গোমরাহী ও বিরোধিতা বৃদ্ধি পাওয়াতে রসূল যেন নিরাশ না হন। কারণ আল্লাহর হেকমতের তাগাদা হচ্ছে যে, তিনি সত্যবাণীকে স্পষ্ট করে প্রকাশ ও প্রচার করেন এবং তার প্রভাব মানব অন্তরে যেন বর্তায়। অতপর যে হেদায়াত প্রাপ্ত হতে চায়, সে যেন প্রমাণ সহকারে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। যে গোমরাহ হতে চায়, সে যেন প্রমাণ সহকারে পথভ্রষ্ট হয়। আর যে ধ্বংস হতে চায়, সে যেন প্রমাণসহকারে ধ্বংস হয় এবং যে জীবন ধারণ করতে চায়, সে যেন প্রমাণ সহকারে জীবন ধারণ করে।

'আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।'

আল্লাহ তায়ালা ওপরোক্ত নির্দেশাবলীর মাধ্যমে দাওয়াতের পন্থা অংকন করছেন। এ পন্থায় কি হেকমত নিহিত আছে তাও তিনি তাকে অবহিত করছেন। তৎসাথে তিনি তাঁকে আহলে কেতাবদের হেদায়াত গ্রহণ না করার দরুন যে করুণ পরিণাম হবে সে ব্যাপারে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, তাদের অবাধ্যতা, গোয়ার্তুমী ও কুফুর এতে করে আরও বেড়ে যাবে। আর তারা এই পরিণামেরই উপযুক্ত! কারণ তাদের অন্তকরণ সত্যের বাণী গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তাদের মাঝে কোনো কল্যাণ ও মংগল নিহিত নেই, আর এই জন্যেই মহান প্রভুর হেকমতের দাবী হচ্ছে তিনি যেন সত্যের এই আপোষহীন বাণীর মাধ্যমে তাদের মুখোমুখি হন, যাতে তাদের অন্তরের অভ্যন্তরে যা সুপ্ত ও লুপ্ত আছে তা প্রকাশ পায় এবং তারা তাদের ঔদ্ধত্য ও কুফর প্রকাশিত হয়। পরিশেষে তারা অবাধ্য এবং কাফেরদের শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে আহলে কেতাবদের ব্যাপারে যে তাবলীগের (প্রচারের) দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তার পরিণাম স্বরূপ তাদের অধিকাংশেরই ঔদ্ধত্য ও কুফুর বৃদ্ধি পেয়েছিলো। যদি এই আলোকে আমরা মুসলমান এবং আহলে কেতাবের মধ্যকার সাহায্য-সহযোগিতা ও হৃদ্যতার বিষয়টির বিচার করি, তবে আমরা দেখতে পাবো যে, আল্লাহ তায়ালা এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেছেন যে, আহলে কেতাব সঠিক বস্তুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়– যতোক্ষণ না তারা তাওরাত, ইনজীল এবং তাদের প্রভুর পক্ষ হতে তাদের কাছে নাযিল করা গ্রন্থকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনার দাবী। কিন্তু অবস্থা দৃশ্যে মনে হচ্ছে তারা আল্লাহর দ্বীনে ফিরে আসবে না এবং ওই দ্বীনের বাহনকারী হবে না যা আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন।

ওপরের বর্ণনার প্রতি গভীরভাবে তাকালে এটা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা এ বাস্তব সত্যটি ভালো করেই জানতেন যে, রসূল (স.) সত্যের আহবান নিয়ে আহলে কেতাবদের কাছে গেলে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও না-ফরমানী বেড়ে যাবে। তা সত্তেও তিনি তাঁর রসূলকে কোনো প্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাদের মুখোমুখি হতে বলেছেন এবং তাদের অধিকাংশের যে পরিণাম হবে, সে পরিণামের জন্যে কোনো প্রকার দুঃখ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

যদি আমরা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণীকে চূড়ান্ত বাণী হিসাবে ধরে নেই, আর এটা অবশ্যই চূড়ান্ত, তবে আহলে কেতাবদেরকে আহলে দ্বীন (অর্থাৎ সঠিক দ্বীনের অনুসারী) হিসাবে ধরে নেয়ার কোনো পথই অবশিষ্ট থাকে না। যে অজুহাতে মুসলমানরা তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে নাস্তিক্য এবং নাস্তিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। আর এরই দিকে কতক প্রতারিত এবং কিছু সংখ্যক প্রতারক ব্যক্তি আহবান করছে। কেতাবধারীরা তাওরাত, ইনজীল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল করা অপরাপর গ্রন্থকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেনি এবং তার অনুসরণ করেনি, যাতে মুসলমানরা তাদেরকে সঠিক দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হিসাবে ধরে দিতে পারে। আর মুসলমানদের আল্লাহর সিদ্ধান্তের উর্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অধিকার নেই। সূরা আহযাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা এবং তার রসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দেয়ার পর কোনো মোমেন নর এবং নারীর এ ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার নেই।' আল্লাহর বাণী চিরন্তন। পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং পারিপার্শ্বিকতা তার কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন করতে পারে না।

আর যখন আমরা আল্লাহর বাণীকে চূড়ান্ত বাণী হিসাবে ধরে নিয়েছি, আর এটাই হচ্ছে চিরন্তন সত্য। সুতরাং এ চিরন্তন মহাসত্যের মাধ্যমে তাদের মুখোমুখি হলে তারা আমাদের ওপর ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে এ ভেবে কোনো নমনীয়তা প্রকাশ করা আমাদের জন্যে কিছুতেই শোভনীয় নয়। অনুরূপভাবে এটাও আমাদের জন্যে শোভনীয় নয় যে, আমরা তাদেরকে সঠিক দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত একথার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে তাদের ভালোবাসা কুড়াতে চেষ্টা করবো এবং আমরা তাদের থেকে সে দ্বীন গ্রহণ করবো এবং সেই দ্বীনের স্বীকৃতি দেবো। সর্বোপরি আমরা ও তারা মিলে ওই দ্বীন থেকে নাস্তিক্য দূর করার জন্যে চেষ্টা করবো। যেমনিভাবে আমরা আমাদের এ দ্বীন থেকে নাস্তিক্য দূর করতে চেষ্টা করি- যা হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা মানুষ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা থেকেই গ্রহণ করবে।

নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ধরনের দিক নির্দেশনা দেননি। আমাদের থেকে এ ধরনের স্বীকৃতিও তিনি কবুল করবেন না। তেমনটি করলে আমরা আমাদের জন্যে ওই সমস্ত বিষয়ের স্বীকৃতি দেবো যা আল্লাহ তায়ালা দেননি, আমরা আমাদের জন্যে এমন বিষয় পছন্দ করব, যা তিনি করেননি। সর্বোপরি আমরা পরিবর্তিত আকীদা-বিশ্বাসকে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে যাবো। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রসংগে বলেছেন, তারা যতোক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত, ইনজীল ও অপরাপর গ্রন্থকে প্রতিষ্ঠিত না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা কিছুর ওপরেই নেই। আর এ কাজ তারা কখনো করবে না।

আহলে কেতাবদের মধ্য হতে যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবী করে কিন্তু আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে না, তারাও ওই সমস্ত কেতাবধারীদের মতো, যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আর আল্লাহর বাণী চিরন্তন, সর্বযুগের সর্বকালের আহলে

কেতাবদের জন্যে এই একই নীতি প্রযোজ্য। যারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে না তাদের ঈমানের দাবী ভন্ডামো বৈ কিছু নয়। যারা সত্যিকার মুসলমান হতে চায় তাদের উচিত আল্লাহর কেতাবকে নিজেদের অন্তরে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার পর ওই সমস্ত ধর্মব্যবসায়ী আহলে কেতাবদের এ বলে মোকাবেলা করা যে, তারা যতোক্ষণ পর্যন্ত ওই গ্রন্থকে প্রতিষ্ঠিত না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা কিছুতেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাদের ভ্রান্ত দাবী এই দ্বীনের সার্বভৌম মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজেই অস্বীকার করছেন। এক্ষেত্রে সর্বদা চূড়ান্ত বক্তব্য পেশ করা ওয়াজেব। তাদেরকে ইসলামের দিকে নতুন করে আহবান করা ওই মুসলমানের কর্তব্য যে আল্লাহর কেতাবকে নিজের আত্মা ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মুখে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলামের দাবী করলে কেউ প্রকৃত মুসলমান বা মোমেন হয়ে যায় না, তাকে সত্যিকার দ্বীনের অনুসারী হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয় না।

আহলে কেতাবদের মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তার জীবন বিধানকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে মুসলমানরা দ্বীন এবং দ্বীনের অনুসারীদের থেকে নাস্তিক্য ও নাস্তিকদের প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করতে পারে। তার পূর্বে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা অনর্থক বৈ আর কিছুই নয়। আর তার নাম হচ্ছে বক্রতা প্রতারক ও প্রতারিত ব্যক্তিরা সব সময় যার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

নিসন্দেহে আল্লাহর দ্বীন কোনো পতাকা, নিদর্শন, মূল বিষয় ও উত্তরাধিকারত্বের নাম নয়। আল্লাহ দ্বীন একটি বাস্তব সত্য, যা অন্তর ও বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হয়। যা প্রতিফলিত হয় আকীদা বিশ্বাসে, যা অন্তরকে আবাদ করে তাকে নতুন জীবন দান করে, এই দ্বীনের প্রতিষ্ঠা পুরো জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আল্লাহর দ্বীন এ সকল কিছুর মাঝেই পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মানুষ আল্লাহর দ্বীনের ওপর ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতোক্ষণ না ওপরে বর্ণিত সবকিছু তাদের অন্তর ও জীবনে প্রতিফলিত হবে। এ ছাড়া যাবতীয় বিবেচনা আকীদাকে বিনষ্ট করা এবং অন্তরের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুসলমানরা কখনো এ পথে এগুতে পারে না।

একজন মুসলমানের উচিত এ সত্যকে প্রকাশ করা এবং তারই ভিত্তিতে সকল মানুষকে পৃথক করা। এ পৃথকীকরণের পরিণামের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। আল্লাহ তায়ালা একমাত্র হেফাযতকারী, তিনি কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

দায়ী (আহবানকারী) ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বাণীকে সঠিক ভাবে পৌছিয়ে দিয়েছে এবং মানুষের কাছে আল্লাহর দ্বীনকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছে বলে দাবী করতে পারে না, যতোক্ষণ না সে পূর্ণাংগ দাওয়াত তাদের কাছে পৌছে দেবে এবং কোনো প্রকার আপোষের আশ্রয় না নিয়ে তাদের কাছে কোনো প্রকার তোষামোদ ও নমনীয়তা ছাড়াই উপস্থাপন করবে। যদি সে তাদের সামনে এ সত্য বক্তব্য প্রকাশ না করে যে তারা সঠিক দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যার ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং সে তাদেরকে সম্পূর্ণ সঠিক দ্বীনের দিকে আহবান করছে তাহলে তা আদৌ ঠিক হবে না। সে তাদেরকে সুদূর পদক্ষেপ দীর্ঘ ভ্রমণ এবং তাদের চিন্তা চেতনা, অবস্থা, নিয়ম পদ্ধতি এবং নীতি নৈতিকতার মৌলিক পরিবর্তনের দিকে আহবান করছে। সর্বসাধারণের উচিত দায়ী থেকে এ বিষয়টি জেনে নেয়া যে, তারা 'হকের' কতটুকু দূরত্বে অবস্থান করছে যার প্রতি সে তাদেরকে আহবান করছে। এরশাদ হচ্ছে,

'যাতে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হয় প্রমাণ পাওয়ার পর এবং যাদের বাঁচার তারাও বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর।'

পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করেএবং মানুষের বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে দায়ী যদি কৃত্রিমতা ও অস্পষ্ট বক্তব্যের আশ্রয় নেয়, বাতিল ও সত্যের মাঝে বিদ্যমান মৌলিক পার্থক্য জনসমক্ষে তুলে না ধরে, যদি সে হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী বিষয়টি না বলে, তবে সে জনগণের সাথে প্রতারণা করলো এবং সত্যিকার অর্থে সে তাদেরকে কষ্টই দিলো। কারণ সে তাদের পুরোপুরি কাম্য ও প্রাপ্য জিনিসটি তাদের কাছে পৌঁছায়নি অর্থাৎ সে দায়িত্ব পুরোপুরি আঞ্জাম দেয়নি। অধিকন্তু দায়ী হিসাবে আল্লাহর পক্ষ হতে যে গুরু দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে, তা সে সঠিকভাবে পালন করেনি।

দাওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নম্রতা কোমলতার পদ্ধতি অবলম্বন অবশ্যই জয় করতে হবে। পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে হেকমত ও উত্তম উপদেশের মূলনীতির ভিত্তিতে 'দায়ী' তার দাওয়াত পেশ করবে। কখনো কঠোর, কখনো কোমল হবে, কিন্তু সে মূল দাওয়াত ও দাওয়াতের মর্মকথা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শৈথিল্য ও অস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পারবে না।

উদাহরণ স্বরূপ আমাদের মধ্য হতে যদি কেউ আজকের বিশ্বের দিকে তাকায়, তাহলে সে দেখতে পাবে যে, আহলে কেতাবরা সংখ্যার দিকে অধিক এবং অনেক বৈষয়িক শক্তির অধিকারী। অনুরূপভাবে বিভিন্ন রকমের মূর্তিপূজকের সংখ্যা কোটি কোটি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদেরই আধিপত্য চলছে। তদ্রূপ জড়বাদীদের সংখ্যাও অগণিত। আর তারাই বিশ্ব জুড়ে বিধ্বংসী আণবিক শক্তির অধিকারী। আর যদি কেউ বিশ্বজুড়ে মুসলমান দাবীদারদের দিকে তাকায় তাহলে সে দেখবে এরাও সঠিক জীবন ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা প্রভুর কাছ থেকে নাযিলকৃত মহাগ্রন্থকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করছে না। সুতরাং দ্বীনের দায়ী চিরন্তন সত্য বাণী নিয়ে এ বিরাট ভ্রান্ত জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি হওয়াকে খুবই কঠিন মনে করে। অধিকন্তু সে এ বিরাট জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়ে তারা যে ভ্রান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত, একথা বলা এবং তাদের জন্যে সঠিক দ্বীন বর্ণনা করাকে সে অনর্থক বলে মনে করে।

এটা দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার সত্যিকার পন্থা নয়। কারণ জাহেলিয়াত জাহেলিয়াতই, যদি সমগ্র বিশ্ববাসী তার অনুসারীও হয়ে যায় সমগ্র মানবতা ততোক্ষণ পর্যন্ত হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতোক্ষণ না আল্লাহর প্রদত্ত সঠিক দ্বীনের ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত হবে। দায়ী যদি মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক পদ্ধতিতে পালন করে তবে এই সমাজ অবশ্যই প্রচন্ড জোরে ঝাকুনি খাবে। পথভ্রষ্টের সংখ্যার আধিক্য এবং বাতিলের ব্যাপকতা ও বিশালতা তাতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। কারণ, বাতিল সর্বদাই লয়প্রাপ্ত। সমগ্র বিশ্ববাসীকে একথা বলার মধ্য দিয়ে দাওয়াতের সূচনা হয়েছিলো যে, তারা কেউই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। দাওয়াতের কাজ নতুন করে সূচনা করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা নবী মোহাম্মদ (স.)-কে রেসালাতের দায়িত্ব দিয়ে যখন নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেদিনের মতো এখনো অবস্থা একই রকম আছে। এরশাদ হচ্ছে,

হে রসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিন। .... এবং যে গ্রন্থ আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন করুন।

নিম্নে ওই দ্বীনের বর্ণনা করা হবে যা আল্লাহ তায়ালা জাতি, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বযুগের ও সর্বকালের মানুষ থেকে গ্রহণ করবেন।

এখানে চারটি সম্প্রদায়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে 'আল্লাযিনা আ'মানু' অর্থাৎ মোমেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় হচ্ছে, 'আল্লাযিনা হাদু' অর্থাৎ ইহুদী, তৃতীয় সম্প্রদায় হচ্ছে 'আস্-সাবিয়ুন', অধিকাংশের মতে ওই সম্প্রদায় যারা রসূলে কারীম (স.)-এর নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছিলো এবং বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়েই আল্লাহর এবাদত করেছে। এ সম্প্রদায়ভুক্ত লোক আরবে খুব কমই ছিলো, আর চতুর্থ সম্প্রদায় হচ্ছে খৃষ্টান জাতি।

এ আয়াত ইংগিত করে যে, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে যে ব্যক্তি বা যারা আল্লাহর প্রতি, কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারাই মোমেন। অন্যান্য আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে যারা সর্বশেষ রসূল (স.) আনীত দ্বীনানুসারে উপরোক্ত কার্যসমূহ আদায় করে, তারাই পরকালে মুক্তি পাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।'

পূর্বে তারা কোন ধর্মের ওপর ছিলো এবং কোন ধরনের নাম ও ঠিকানা তারা বহন করতো, তা বিবেচ্য বিষয় নয়, বরং বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে তাদের সর্বশেষ নাম ও ঠিকানা।

কোরআনের এই আয়াতটি একথাটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যে, এই বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের স্বতঃসিদ্ধ এবং মৌলিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। এ বিশ্বাস থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মোহাম্মদ (স.) সর্বশেষ নবী, তাঁকে সমগ্র মানবতার কাছে রসূল করে পাঠানো হয়েছে। জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, দেশ এবং আকীদা বিশ্বাস নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতি তাঁর আনীত 'সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত' সকল বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে আদিষ্ট। যে ব্যক্তি তাঁকে রসূল হিসাবে মানবে না এবং তাঁর আনীত জীবন-বিধানের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোনো বিষয়ের ওপর ঈমান আনবে না, সে পথভ্রষ্ট। ইতিপূর্বে সে যে কোনো দ্বীনের ওপর থাকুক না কেন, তা তার কাছ থেকে কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না। 'তাদের কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই', একথা বলে আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা সে দলের অন্তর্ভুক্তও হবে না।

এটাই হচ্ছে মৌলিক সত্য, যা ইসলাম ধর্মের স্বতসিদ্ধ বিষয়। কোনো মুসলমানের জন্যে এটা কখনও শোভনীয় নয় যে, সে বিশাল বিদ্যমান জাহেলী অবস্থা যাতে গোটা বিশ্বমানব নিমজ্জিত হয়ে আছে তার সামনে অস্পষ্ট ও কৃত্রিম ভাষণ পেশ করবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ঐক্য করার জন্যে এ বাস্তব সত্যকে ভুলে যাওয়াও ওই মুসলমানদের জন্যে শোভনীয় নয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত জাহেলী শক্তির চাপে ইসলাম বিবর্জিত আকীদার এমন কোনো অনুসারীকে সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলে মানুষকে বলা, যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট নন এবং তার সাহায্য সহযোগিতা করা এবং তার সাথে বন্ধুত্ব করা বৈধ, এমনটি মনে করা কিছুতেই ঠিক নয়।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন বন্ধু। কোরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।' একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল প্রদর্শিত জীবন বিধানানুযায়ী যারা আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের বাহ্যিক অবস্থান যাই হোক না কেন, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই, বাতিল ও স্তূপীকৃত জাহেলী শক্তির ব্যাপারে তাদের কোনো ভয় নেই। অনুরূপভাবে তারা সৎকর্মশীল ও মোমেন হওয়ার কারণে আখেরাতেও তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই চিন্তিত হওয়ারও কোনো কারণ নেই।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ

অতপর আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইল তথা ইহুদীদের খানিকটা ইতিহাস বর্ণনা শুরু করেছেন। যার মাধ্যমে এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তারা বাতিলের ওপর

প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাদের কাছে তাবলীগ করা এবং সুমহান ইসলামের দাওয়াত পেশ করা অতীব জরুরী, যাতে তারা আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীনের দিকে ফিরে আসতে পারে। অতপর মুসলমানদের কাছে তাদের বীভৎস চেহারাটি ফুটে ওঠে, দ্বীন বিকৃত করা ও আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে মুসলমানদের চোখে তারা হীন ও নীচ প্রমাণিত হয় এবং মুসলমানরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা করাকে ঘৃণা করে। হক এবং দ্বীনের ক্ষেত্রেও তারা এ ধরনের অবস্থায়ই অবস্থান করছে।

নিসন্দেহে এটা তাদের পুরাতন অভ্যাস। রসূলদের সাথে তাদের এ ভূমিকা প্রথম বা শেষ নয় তারা সব সময়ই কঠোর না-ফরমানী ও অবাধ্যতাতে অনড়। তারা ওয়াদা ভঙ্গের ক্ষেত্রেও পটু। তারা আল্লাহর দ্বীন এবং রসূলদের হেদায়াত পায়ে দলে তাদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে মনিব হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সর্বদাই অবিচল। অধিকন্তু তারা হক এবং আল্লাহর পথে আহবানকারীদের সাথে বেয়াদবী হঠকারীতা ও অবাধ্যাচরণ করতে অভ্যস্ত।

নবীদের সাথে বনী ইসরাইলদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর পুরোটাই সত্য, মিথ্যা সাব্যস্ত করা, তার অবাধ্য হওয়া, নবীদের হত্যা করা, সীমালংঘন করা এবং মনের কামনা বাসনাকে নিজেদের নিয়ামক বানানোর ঘটনায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাদের ইতিহাস।

সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলদের ইতিহাস মুসলমানদের কাছে বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। যাতে মুসলিম সম্প্রদায় বনী ইসরাইলদের মতো আচরণ থেকে বিরত থাকে। তারা যেন পদস্খলন থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনকারী সচেতন বক্তিরা উক্ত পদস্খলনসমূহ সাধারণ জনগণকে সতর্ক করার ব্যাপারে বনী ইসরাইলের নবীদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করবে। তারা যেমন নানা প্রকার নির্যাতনের সম্মুখেও ধৈর্য ধারণ করেছেন, তারাও এমনটি করবে। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মুসলমানদের সন্তান সন্ততিদের মধ্য থেকে কিছু প্রজন্মের অবস্থা বনী ইসরাইলদের সদৃশ হয়ে গেছে। তারা প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে জীবনের নিয়ামক মানে, হেদায়াতকে অস্বীকার করে, সত্যের পথে আহবানকারী একদলকে তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে এবং অপর দলকে তারা হত্যা করে। দীর্ঘ ইতিহাসে বনী ইসরাইলদের অবাধ্যরা এমনটিই করেছিলো।

উল্লেখিত অপরাধসমূহ বনী ইসরাইলরাই করেছিলো। তাদের ধারণা ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কখনো পরীক্ষা করবেন না, তাদেরকে এ জন্যে কখনো শাস্তি দিবেন না। তারা এও ধারণা করেছিলো আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা করার পরও তাদের কিছুই হবে না কারণ তারা আল্লাহর বাছাই করা জাতি।

‘তারা ধারণা করেছে যে, তাদের কোনো অনিষ্ট হবে না। ফলে তারা (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে) আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেলো।’

আল্লাহ তায়ালা তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিয়েছেন সুতরাং তারা যা দেখে তা বুঝতে সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের শ্রবণশক্তিও হরণ করেছেন সুতরাং তারা যা শুনে, তা থেকে তারা উপকৃত হতে পারে না।

‘অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করলেন।’

আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপার রহমতের দ্বারা তাদেরকে বেষ্টন করেন, তথাপি তারা তা থেকে উপকৃত হয়নি এবং তার সংরক্ষণ করেনি।

‘এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে গেলো।’

‘তারা যা কিছু করে আল্লাহ তায়ালা দেখেন।’

তিনি তাদের কৃতকর্ম দেখে তার প্রতিদান দেবেন। তিনি তাদের সকল বিষয়ই ভালো করে অবগত আছেন। তারা কেউই তাঁর হাত থেকে পালাবার ক্ষমতা রাখে না।

ইহুদীদের পুরাতন ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান অবস্থা মোমেনদের ভালো করে জানা উচিত। মোমেনরা যেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে ঘৃণা করে, যেমনিভাবে হযরত ওবাদা বিন সামেত (রা.) ঘৃণা করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলের মতো মোনাফেকরা ছাড়া কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেনি।

খৃষ্টবাদের ভ্রান্তি

ওপরে আহলে কেতাবদের মধ্য থেকে ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে কোরআনে হাকীম অত্যন্ত দৃঢ়তা ও গুরুত্ব সহকারে খৃষ্টানদের অবস্থা বর্ণনা করেছে– যা সূরার প্রকৃতি ও খৃষ্টানদের বাস্তব অবস্থানের সাথে একান্তভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইতিপূর্বে এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে, যারা মসীহ বিন মরিয়ম (হযরত ঈসা আ.)]-কে আল্লাহ হিসাবে মেনেছে তারা কাফের। এখানেও এ কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করে বলা হচ্ছে যে, যারা বলে আল্লাহ তায়ালা তিন মাবুদের এক মাবুদ এবং যারা বলে আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন মসীহ বিন মারিয়াম, তারা কাফের। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈসা (আ.) স্বয়ং এদেরকে কাফের হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এবং তিনি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে আখ্যায়িত করা থেকে সতর্ক করেছেন। স্বয়ং তিনি নিজেও এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ও তাদের সকলেরই প্রভু। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত উক্তির দরুন কাফের অবস্থায় নিমজ্জিত থাকা থেকে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। আর যারা আল্লাহ তায়ালা এবং সঠিক দ্বীনের ওপর ঈমান এনেছে, তারা কখনো এ ধরনের উক্তি করতে পারে না।

ইতিপূর্বে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি যে, এ সমস্ত বিচ্যুতি ও ভ্রান্ত উক্তিসমূহ কখন ও কিভাবে ধর্মসভা থেকে খৃষ্টীয় আকীদা বিশ্বাসে অনুপ্রবেশ করেছে। যে আকীদা বিশ্বাস নিয়ে মারিয়াম তনয় ঈসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল হিসাবে তাদের এই বিকৃত আকীদার সাথে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। অপরাপর রসূলরা যেমনিভাবে খাঁটি তাওহীদের বাণী নিয়ে আগমন করেছিলেন তিনিও সেই একই বানী নিয়ে এসেছিলেন। তার কথায় বিন্দুমাত্রও শেরেকের লেশ ছিলো না, কারণ আল্লাহর যমীনে তাওহীদের বাণী প্রতিষ্ঠা ও শেরেকের অসারতা উচ্ছেদের মিশন নিয়েই সকল নবীর আগমন হয়েছিলো।

ত্রিত্ববাদ এবং ঈসা (আ.)-এর উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে খৃষ্টীয় ধর্মীয় কাউন্সিলসমূহের মতপার্থক সংক্ষেপে আমি এখানে উল্লেখ করছি।

'নাওফেল বিন নেয়মত উল্লাহ বিন জারজিস নামক জনৈক খৃষ্টান কর্তৃক প্রণীত 'সুসনা সুলাইমান' নামক গ্রন্থে এসেছে, 'খৃষ্টানদের যে সকল আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে গির্জাসমূহের মাঝে কোনো প্রকার মতদ্বৈধতা নেই, সেগুলো হচ্ছে এর মূল সংবিধান, যা নিকিয়া কাউন্সিল বর্ণনা করেছে। সেই আকীদাগুলো হচ্ছে–

১. এক উপাস্যের ওপর ঈমান আনা যিনি এক পিতা, সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক এবং আকাশ পাতাল, দৃশ্য ও অদৃশ্যমান বস্তুর স্রষ্টা।

২. এক প্রভু যীশু (ঈসা আ.)-এর ওপর ঈমান আনা, যিনি আল্লাহর জ্যোতি থেকে দীর্ঘযুগ পূর্বে পিতা থেকে জন্ম প্রাপ্ত একমাত্র পুত্র। অর্থাৎ হক উপাস্য থেকে হক উপাস্যের উৎপত্তি। অসৃষ্ট নবজাতক যিনি মূল পদার্থের দিক থেকে পিতার সমকক্ষ, যে পিতা থেকে সকল বস্তুর উৎপত্তি, যার কারণে আমরাও মানুষ। আমাদের ভুল ভ্রান্তির দরুন তিনি আকাশ থেকে নিচে নেমে এসেছেন। যিনি পবিত্র আত্মা থেকে সশরীরে রূপান্তরিত হয়েছেন। যিনি কুমারী মরিয়ম থেকে মানুষের আকার ধারণ করেছেন। বিলাতীসের যুগে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি ব্যথা অনুভব করেছেন, অতপর তাকে কবরে দাফন করা হয়। পরবর্তি বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনানুসারে দাফন করার তৃতীয় দিনে তিনি মৃতদেহের মাঝ থেকে উঠে আকাশ পানে আরোহণ করে প্রভুর ডানপার্শ্বে

বসেন, পুনরায় তিনি মর্যাদাসহকারে দুনিয়াতে আগমন করবেন এবং জীবিত ও মৃত সকলকে তার বশ্যতায় আনবেন, তাঁর রাজত্বের কোন লয় নেই।

৩. পবিত্র আত্মার প্রতি ঈমান, যিনি জীবনদানকারী পিতা থেকে উৎপন্ন, পুত্রের সাথে যে পিতার সেজদা করা হয় এবং বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয় এটা এই নীতির প্রতিফলন। যিনি অপরাপর নবীদের নবুওতের স্বীকৃতি দানকারী।

ডক্টর বোষ্ট পবিত্র গ্রন্থ (বাইবেল)-এর ইতিহাসে লিখেন, আল্লাহ, প্রকৃতি ও সমকক্ষ তিনটি স্বর্গীয় সত্ত্বার নাম, ১. পিতার মাঝে আল্লাহ ২. পুত্রের মাঝে আল্লাহ এবং ৩. পবিত্র আত্মার মাঝে আল্লাহ।

ওপরোক্ত যাবতীয় উক্তি কুফরী। কারণ এগুলোর দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মরিয়ম পুত্র মসীহই আল্লাহ তায়ালা অথবা আল্লাহ তিনজনের একজন এ ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্যের পর কোনো বক্তব্যেই আর যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। তিনি সত্য কথা বলেন এবং সঠিক রাস্তা প্রদর্শন করেন।

এমনিভাবে মসীহ (আ.) তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করে গেছেন। কিন্তু তারা সে সতর্কতা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারেনি। বরং তারা তার ওফাতের পর সতর্ক করা বিষয়ের মধ্যেই পতিত হয়। তিনি তাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এবং জাহান্নাম তাদের স্থায়ী আবাসস্থল হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা মসীহ (আ.)-এর নির্দেশ বেমালুম ভুলে গিয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব ও তোমাদের ও রব।'

এখানে ঈসা (আ.) তার সাথীদেরকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ও তারা আল্লাহর এবাদাত করার ক্ষেত্রে সকলেই সমান, কেননা তারা সকলেই আল্লাহর বান্দা।

তাদের যাবতীয় কুফরী উক্তিকে কেন্দ্র করে কোরআনে হাকীম নির্দেশ করছে

'নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ তায়ালা তিনজনের মধ্যে একজন।'

নিম্নে কোরআনে করীম ওই চিরন্তন সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার ওপর সকল নবী রসূলদের আকীদা প্রতিষ্ঠিত।

'অথচ এক ইলাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই।'

অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কুফরী বক্তব্য ও আকীদার পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছেন।

'যদি তারা এসব কথাবার্তা থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।'

তাদের কথানুযায়ী সমস্ত সৃষ্টিজগত পিতার সাথে সম্পৃক্ত, পুত্রের সাথে তার আত্মা সম্পৃক্ত, আর পবিত্র আত্মার সাথে পবিত্রতা সম্পৃক্ত। একই সত্ত্বার মাঝে তিন স্বর্গীয় সত্ত্বার অন্তর্ভুক্তির চিন্তা করা এবং একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদের মাঝে একত্রীকরণ করা দুষ্কর ও কঠিন বিধায় খৃষ্টান ধর্মবিদ্যার লেখকরা এ বিষয়ে বুদ্ধিভিত্তিক বিবেচনা পেশ করতে চেষ্টা করে। তবে এগুলো যে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা এ কথা এসব মতবাদের প্রাবক্তারাই স্বীকার করেছে। এদের মধ্যে ধর্মযাজক বোটর অন্যতম। তিনি তার 'মূল এবং শাখা' নামক গ্রন্থে বলেন, 'আমরা এটা আমাদের বিবেকের সাধ্যানুসারে বুঝেছি। আমরা এ বিষয়টি ভবিষ্যতে আরও স্পষ্টভাবে বুঝার আশা করছি। যখন আকাশ ও যমীনের সবকিছু থেকে পর্দা আমাদের জন্যে উন্মোচিত হয়ে যাবে তখন আমরা এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারবো। তবে বর্তমানে যতোটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছি তাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট হবে।

.... কাফের সম্প্রদায় এ ধরনের ভ্রান্ত উক্তিসমূহ থেকে নিবৃত্ত থাকে না, তাই স্পষ্টভাবে তাদেরকে কাফের হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ধমকি ও ভীতি প্রদর্শন করার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উৎসাহিত করছেন।

'তারা কি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তায়ালা যে অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।'

তাদের জন্যে তাওবার দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকবে। সুতরাং সময় শেষ হওয়ার পূর্বে তাদের আল্লাহর মাগফেরাত ও রহমত কামনা করা উচিত।

অতপর রাব্বুল আলামীন সঠিক যুক্তি তাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে তারা সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। এ সমস্ত সঠিক যুক্তি ও প্রমাণাদি তাদের সামনে সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দরুন তাদের কর্মকান্ডের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।

মসীহ (আ.) ও তাঁর মাতা মারিয়াম (আ.)-এর জীবনে খাবার গ্রহণ করা একটি স্বাভাবিক মানবীয় বাস্তব ঘটনা ছিলো। আর এটা অস্থায়ী জীবিত প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য। এটাই হযরত ঈসা ও তাঁর সত্যনিষ্ঠ মাতার মানুষ হওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

শারীরিক প্রয়োজনের তাকীদে খাবার গ্রহণ করার মাঝে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু বাঁচার তাকীদে যে পানাহারের মুখাপেক্ষী সে কখনো ইলাহ বা উপাস্য হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও অমুখাপেক্ষী। সুতরাং তাঁর অস্তিত্বে খাবারের মতো ক্ষণস্থায়ী বস্তু প্রবেশও করতে পারে না, অনুরূপভাবে তাঁর থেকে তা বেরও হতে পারে না।

এটি এমন একটি সুস্পষ্ট বাস্তব যুক্তি তর্ক– যাতে কোনো বিবেকবান ব্যক্তির মতবিরোধীতার অবকাশই নেই। বিষয়টি খোলাখুলি তাদের সামনে উপস্থাপন করার পরও যখন তারা হক থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের এ গর্হিত কাজের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'দেখো আমি কিভাবে তাদের সামনে সত্যের নির্দশনগুলো সুস্পষ্ট করি। তারপরও দেখো তারা কিভাবে উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে।'

নিসন্দেহে হযরত ঈসা (আ.)-এর দাওয়াত উপেক্ষা করে যারা তাঁর শিক্ষাকে উপেক্ষা করে তাঁকে ইলাহ বা উপাস্য বানাতে চেয়েছিল। তারা মসীহ (আ.)-এর ইলাহ এবং মানুষ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য বাক-বিতন্ডা ও মতানৈক্যের মুখোমুখী হয়েছিলো। আমি ইতিপূর্বে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি।

পক্ষান্তরে কোরআনে হাকীমের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বর্ণনায় তাদের এসব ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৭৫ নং আয়াতে 'মান' শব্দের পরিবর্তে 'মা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ 'মান' (যে) শব্দটি বোধ সম্পন্ন সত্ত্বার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, আর 'মা' (যা) শব্দটি বোধহীন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এখানে আল্লাহ তায়ালা 'মা' শব্দটিকে 'মান' শব্দের পরিবর্তে ইচ্ছাকৃত ব্যবহার করেছেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপাস্য সকল সৃষ্টি– যাতে বোধ-শক্তি সম্পন্ন মানবীয় সত্ত্বাও রয়েছে। এর উভয়টাকেই একই সূত্রে আবদ্ধ করা। কারণ 'মা' শব্দটি আল্লাহর তাৎক্ষণিক সৃষ্ট প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে। অতএব, ঈসা (আ.) পবিত্র আত্মা ও মারিয়াম (আ.) সকলেই 'মা' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলো প্রকৃতি সহকারে আল্লাহর সৃষ্টির ভেতরে পড়ে। এ বর্ণনার মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তাঁর সৃষ্ট কোনো জীবই উপাস্য হতে পারে না, কারণ সে মানব জাতির উপকার বা অনিষ্ট কোনোটাই করার ক্ষমতা রাখে না।

'অথচ আল্লাহ সব শোনেন, জানেন।'

তিনি শুনেন ও জানেন। অতপর তিনি ক্ষতি ও উপকার দুটোই করেন। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাঁর বান্দাদের দোয়া ও উপাসনা শুনেন এবং তিনি তাদের অন্তরের গোপন আকুতি মিনতি এবং দোয়া ও এবাদাতের যা কিছু লুকিয়ে আছে তাও ভালো করে জানেন। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ শোনা, জানা এবং দোয়া কবুল করার ক্ষমতা রাখে না।

উপরোক্ত আলোচনার সমাপনী টানা হয়েছে একটি সার্বজনীন আহবানের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূল মোহাম্মদ (স.)-কে আহলে কেতাবদেরকে লক্ষ্য করে সেই আহবান পেশ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'হে আহলে কেতাবরা! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না .... পথভ্রষ্টদের অনুসরণ করো না ....

হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা থেকেই মূলত যাবতীয় বক্রতা উৎপত্তি হয়েছে। অনুরূপভাবে গ্রীক শাসক- যারা তাদের পৌত্তলিকতা সহকারে খৃষ্টান ধর্মে প্রবেশ করেছে- এবং সংঘর্ষ ও কলহে লিপ্ত খৃষ্টান ধর্মীয় কাউন্সিলের কামনা-বাসনা সর্বস্ব ভ্রান্ত উক্তিসমূহ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছে তারাও এর জন্যে অনেকটা দায়ী। আল্লাহ তায়ালা মসীহ (আ.)-কে এ ধরাতে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনি তার আমানত যথাযথভাবে বনী ইসরাইলদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তিনি যে তার আমানত যথাযথভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, সে কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ দিয়ে কোরআন বলেছে,

'এবং মসীহ তাদের বললো, হে বনী ইসরাইল, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো' যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।'

এ নতুন আহবানটি হচ্ছে আহলে কেতাবদের মুক্তি ও উদ্ধারের জন্যে সর্বশেষ আহবান। যার মাধ্যমে তারা যাবতীয় বক্রতা, মতবিরোধ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রেবৃত্তি ও খেয়ালখুশীর অনুসরণ করেছিলো ওই সমস্ত সম্প্রদায়, যারা পূর্বে একবার পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেককে তারা পথভ্রষ্টকে করেছে, অতপর এভাবেই তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

কোনো মতবাদের সাথেই ইসলামের ঐক্য সম্ভব নয়

আহবান সম্বলিত শব্দগুচ্ছের দিকে তাকালে আমরা তিনটি বৃহৎ ও বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হই, আর সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমাদের নিতান্ত দরকার।

১. প্রথম সত্য হচ্ছে, সেই বৃহৎ প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানা যার দিকে ইসলামী বিধি বিধান ধাবিত হয়। বিশ্বাস ও আকীদা সম্পর্কিত চিন্তা চেতনাকে বিশুদ্ধ করা, তাকে নিরংকুশ একত্ববাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা, তাকে পৌত্তলিকতা এবং শেরেকের মিশ্রণ থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা- যা আহলে কেতাবদের আকীদা বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। উলুহিয়াতের মর্মকথা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা এবং আল্লাহকেই এই বৈশিষ্ট্যের সাথে নির্দিষ্ট করা এবং মানুষ সহ গোটা সৃষ্ট জীবকে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করা।

আকীদা সংক্রান্ত চিন্তা চেতনার বিশুদ্ধকরণ এবং তাকে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ একত্ববাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার প্রতি এই গুরুত্বারোপ করা মানব জীবনকে গড়া ও কল্যাণের চিন্তা চেতনাকে বিশুদ্ধকরণ করার সর্বশেষ গুরুত্বের পরিচায়ক। কারণ আকীদা হচ্ছে সকল মানবিক কর্মকান্ড ও সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু ও ভিত্তি।

২. কোরআনে কারীম ওই সমস্ত লোককে কাফের হিসাবে ঘোষণা দেয়, যারা বলে আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম তনয় মসীহ অথবা আল্লাহ তিনজনের একজন। সুতরাং আল্লাহর ভাষ্যের পর কোনো মুসলমানের আর নিজেদের ভাষ্য থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে ওই সমস্ত লোককে আল্লাহর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধরে নেয়াও কোনো মুসলমানের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, তারা তাদের ভ্রান্ত উক্তির জন্যে কাফের হয়ে গেছে।

যেমনিভাবে ইসলাম কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে তার পূর্বের আকীদা বিশ্বাসকে নিয়ে মাথা ঘামায়না ঠিক তেমনি বিধর্মীরা যার ওপর প্রতিষ্ঠিত তাকে ইসলাম কোনো দ্বীন হিসাবে আখ্যায়িত করে না, যার ওপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট নন। ইসলাম তাকে কুফুর হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। আর কুফর কখনো আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হতে পারে না।

৩. এ বাস্তব সত্যটি ওপরে দুই সত্য থেকে উৎপন্ন। আর তা হচ্ছে, একজন কেতাবধারী এবং ওই মুসলমানের সাথে কখনো বন্ধুত্ব ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, যে দ্বীন ইসলাম মোতাবেক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং হযরত মোহাম্মদ (স.) আনীত ইসলামকে যে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসাবে বিশ্বাস করে।

অতএব, নাস্তিকতাকে জিইয়ে রেখে আহলে কেতাব তথা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে পারস্পরিক সাহায্যের আহবান ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারেই গুরুত্বহীন ও নিরর্থক। সুতরাং আকীদার ভিন্নতার ক্ষেত্রে এদের উভয়ের মিলনের কোনো পথ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের প্রত্যেকটি বস্তু আকীদা বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শুধু ওয়ায নসীহত দিয়ে পাপাচার নির্মূল হবে না

বনী ইসরাইলের কাফেরদের ব্যাপারে তাদের নবীরা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার সার্বিক চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ভূমিকার উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের উভয়েই বনী ইসরাইলীদের অপরাধপ্রবণতা, সীমালংঘন, সামাজিক অধোপতন, খারাপ কাজের ব্যাপারে নীরবতা পালন, কাফেরদের সাথে সখ্যতা ইত্যাদির কারণে উক্ত সম্প্রদায়ের ওপর লানত বর্ষণের বদ দোয়া করেন, যা আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নেন। এভাবেই তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিপতিত হয়ে চিরন্তন আযাবের উপযোগী হয়ে যায়।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাইলদের কুফরী, সীমালংঘন এবং অভিশপ্ততার ইতিহাস অনেক পুরনো। বনী ইসরাইলদের নবীরা, যারা মূলত তাদের পথ প্রদর্শক এবং রক্ষাকারী হিসাবে এসেছিলেন, তারাই অতপর বনী ইসরাইলদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্যে দোয়া করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সে নবীদের দোয়া কবুল করে বনী ইসরাইলদের ওপর স্বীয় অসন্তুষ্টি ও অভিসম্পাত অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছেন। আর এ বনী ইসরাইলদের কাফেররাই আল্লাহর প্রেরিত কেতাবসমূহের বিকৃতি সাধন করেছে এবং তাঁর প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসারে নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করেনি, -যেমনটা কোরআন শরীফের এ সূরা এবং অন্য সূরার বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে- রসূলদের সাহায্য সহানুভূতি এবং অনুসরণ সংক্রান্ত আল্লাহকে প্রদত্ত ওয়াদা তারা বারবার ভংগ করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা নবীদের লানতের অন্তর্ভুক্ত এ জন্যেই হয়েছে যে তারা নাফরমান এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী ছিলো।'

তাদের নাফরমানী ও ঔদ্ধত্য বনী ইসরাইলদের বিশ্বাস, স্বভাব ও আচরণের সব দিকে ব্যাপৃত ছিলো। বনী ইসরাইলীদের ইতিহাস এই না-ফরমানী এবং ঔদ্ধত্যের দৃষ্টান্তে ভরপুর, যা আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। বনী ইসরাইলদের সমাজে পাপাচার এবং

ঔদ্ধত্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমিত ছিলো না, বরং এ সব সমষ্টির চরিত্রে পরিণত হয়েছিলো, যেখানে সমাজ এসব নীরবে মেনে নিতো এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতো না।

নাফরমানী ও সীমালংঘনের এই অপরাধ সব দুশ্চরিত্র, বিশৃংখল এবং পথভ্রষ্ট সমাজেই সৃষ্টি হয়। এই পৃথিবী কখনো একেবারে খারাবীমুক্ত হয় না এবং এই সমাজও অসামাজিক কর্ম থেকে কখনো একেবারে খালি হয় না। কিন্তু মঙ্গলকামী সমাজ কখনো খারাবী এবং অনাকাংখিত বিষয়কে স্বাভাবিক বিষয়ে রূপ নিতে দেয় না বা সবার জন্যে সহজলভ্য হতে দেয় না। আর যখন কোনো সমাজে ভালো কাজের চেয়ে মন্দকাজ করা অধিকতর কঠিন হয়, যখন মন্দ কাজের শাস্তি সমষ্টির পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক হয়ে থাকে, যার ফলে মন্দ কাজ নিরুৎসাহিত হয়ে আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে আসে এবং তখনই সমাজের বন্ধন দৃঢ় হয়। অপরদিকে অপরাধ বা ফেতনা ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং পুরো সমাজের পক্ষ থেকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর বিপরীত সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না বা সাধারণ নিয়মে পরিণত হতে পারে না।

ইসলামী বিধান বা শিক্ষা ইসরাইলী সমাজ ব্যবস্থার এই নিন্দনীয় চিত্র তুলে ধরে। মুসলমানরা আশা করে যে এ সমাজ মযবুত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। যে সমাজ পাপাচার ও সীমালংঘনের মূলক সামাজিক অপরাধ সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হওয়ার পূর্বেই উপড়ে ফেলে। যে সমাজ প্রকৃত অর্থেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মযবুত সমাজ হয় এবং অন্যায়ের মোকাবেলায় যা সদা জাগ্রত থাকে। তেমন ধরনের ইসলামী সমাজ জীবন দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে গচ্ছিত আমানতের সঠিক আদায় কামনা করে। কামনা করে তারা যেন পাপাচার, দুর্নীতি, সীমালংঘন ও আগ্রাসনের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াবে, আর এ ব্যাপারে সমালোচকদের কথায় যেন ভ্রূক্ষেপ না করে। আর এ অন্যায় কর্ম ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার উৎস থেকে আসুক বা সম্পদশালীদের সম্পদের মাধ্যমে আসুক অথবা কুকর্মকারীদের যন্ত্রণা থেকে উৎসারিত হোক, নতুবা নফসের গোলামীতে নিমজ্জিত সাধারণ জনসমষ্টি থেকে প্রকাশিত হোক, এটা অন্যায়ই থাকবে। কেননা আল্লাহর বিধান আল্লাহর বিধান হিসাবেই থাকবে। আর এ বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের হুকুম সর্বদা একই রকম চাই তারা উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হোক অথবা হোক সমাজের নিম্ন শ্রেণীর।

ইসলাম এ সকল যিম্মাদারী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিপালনের ওপর জোর দেয়। আর এ অবস্থায় সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিই সাধারণ আযাবের উপযুক্ত হয়, যখন তারা সমাজে প্রচলিত অন্যায়ের ব্যাপারে নীরবতা পালন করে। অপরদিকে ইসলাম ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের ওপরই দায়িত্ব অর্পণ করে–

ইমাম আহমদ স্বীয় সূত্রের বরাত দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন, বনী ইসরাইল সম্প্রদায় যখন অসংখ্য পাপকর্মে লিপ্ত হতে লাগলো, তখন তাদের আলেমরা তাদেরকে সে কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দিলো, কিন্তু তারা বিরত থাকলো না বরং তারা আদেশ অমান্য করে এই খারাপ কাজ করতে লাগলো এবং এসব বৈঠকে একে অপরকে আপ্যায়ন করাতে লাগলো। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাদের একের মাধ্যমে অপরকে শাস্তি দিতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে হযরত দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করেন।

‘এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করতো এবং সীমালংঘন করতো।’

একদা রসূল (স.) হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'আমার প্রাণ যার হাতে তার শপথ, আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় অবস্থায় থাকবো, যতোক্ষণ না তোমরা তাদেরকে হকের ওপর আসতে বাধ্য করবে।'

ইমাম আবু দাউদ (র.) স্বীয় সূত্রের বরাত দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, রসূল (স.) এরশাদ করেছেন, নিসন্দেহে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ে প্রথম ক্রটি এভাবে প্রবেশ করেছিলো যে, তাদের মধ্য হতে একজন অপরজনের সাথে দেখা হলে বলতো, 'ওহে, আল্লাহকে ভয় করো, যা করছো তা ছেড়ে দাও, কারণ তা তোমার জন্যে বৈধ নয়।' অতপর যখন উক্ত ব্যক্তি হুবহু অপর ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতো, তখন সে তাকে নিবৃত না করে তার সাথে খাওয়া-দাওয়া ও ওঠা-বসা শুরু করতো। তাদের সাথে মেলা মেশা থেকে বিরত থাকতো না। তাদের কথা এবং কাজে সাদৃশ্য না থাকার দরুণ আল্লাহ তায়ালা তাদের একের অন্তরকে অপরের মাধ্যমে শাস্তি দেন এবং লাঞ্ছিত করেন।

অতপর তিনি তেলাওয়াত করেন, 'বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে .... কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।' অতপর তিনি বলেন, কখনো নয়, খোদার কসম। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখবে। যালেমের হাতকে শক্ত করে ধরবে অর্থাৎ যালেমকে প্রতিরোধ করবে এবং তোমরা তাকে হকের ওপর আনতে বাধ্য করবে অথবা তাকে তোমরা হকের ওপর সীমাবদ্ধ করবে।

এখানে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের মধ্যেই বক্তব্য সীমিত নয় বরং যারা অন্যায়, বিপর্যয়, যুলুম ও সীমালংঘনের মাঝে লিপ্ত, তাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিতে হবে এবং তাদেরকে বয়কট করতে হবে যতোক্ষণ না তারা সত্যের পথে ফিরে আসবে।

ইমাম মুসলিম (র.) স্বীয় সূত্রের বরাত দিয়ে আবু সাঈদ আল খুদরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলে মাকবুল (স.) এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে হতে যে কেউ গর্হিত কাজ করতে দেখবে, সে হাতের মাধ্যমে তার প্রতিরোধ করবে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তবে সে মুখের দ্বারা বাধা দেবে। আর যদি সে এটাও করতে সক্ষম না হয়, তবে সে অন্তরে সে কাজকে ঘৃণা করবে এবং তার প্রতিরোধের জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। আর এই সর্বশেষ স্তরটি হচ্ছে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।

ইমাম আহমদ স্বীয় সনদে আর্দী বিন উমাইয়া থেকে রেওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা বিশেষ লোকের কাজের দ্বারা সর্বসাধারণকে তখনই শাস্তি দেবেন, যখন সাধারণ লোক তাদের চোখের সামনে গর্হিত কাজ হতে দেখে এবং তা অস্বীকার ও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হওয়া সত্তেও তা না করে। অতপর যখন তারা উক্ত কাজ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা সাধারণ তথা সর্বস্তরের মানুষের ওপর শাস্তি নাযিল করেন।

আবু দাউদ এবং তিরমিযী স্বীয় সনদে আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, রসূল (স.) এরশাদ করেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা হচ্ছে সর্বোত্তম জেহাদ।

অসংখ্য কোরআনের আয়াত এবং হাদীস এ মর্মে অবতীর্ণ হয়। কেউ যেন অপরকে গর্হিত কাজে লিপ্ত দেখে এ কথা না বলে, 'এতে আমার কি আসে-যায়?'

কেউ সমাজে বিপর্যয় চলতে ও প্রসার লাভ করতে দেখে চুপ করে বসে থেকে এ কথা বলবে না, আমি এ ক্ষেত্রে কী করতে পারি? ফেতনা ফাসাদ এবং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে গেলে আমার ক্ষতি হতে পারে। এ ধরনের আত্মসম্মানবোধ আল্লাহর পবিত্র বস্তুর প্রতি, তার হেফাযতের সরাসরি আদিষ্ট হওয়ার অনুভূতি এবং আল্লাহর কাছে নাজাত পাওয়ার লক্ষ্যে তার পক্ষ হতে

প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন। এসবগুলো হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্তম্ভ। এগুলো ছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

এসব কিছুর দাবী হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আনা, ঈমান আনার পর যে সমস্ত নির্দেশনাবলী নিজের ওপর বর্তায় তাকে ভালো করে জানা, আল্লাহর বিধানকে বিশুদ্ধভাবে অনুধাবন করা, এ কথা ভালোভাবে জানা যে, আল্লাহর বিধান জীবনের প্রত্যেকটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, সক্রিয়ভাবে আকীদা বিশ্বাসকে শক্ত করে ধরা এবং উক্ত আকীদা থেকে উৎসারিত জীবন বিধানকে গোটা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা। মুসলিম সমাজ তার যাবতীয় বিধান আল্লাহর বিধান থেকে সংগ্রহ করে এবং সে তার পুরো জীবনকে উক্ত বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। এটা এমন সমাজ যেখানে একজন মুসলমান সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের গুরু দায়িত্ব সুন্দর ও সুচারুপে আঞ্জাম দিতে পারে এবং নির্বিঘ্নে তার চর্চা করতে পারে। এটাকে ব্যক্তিগত কাজে পরিণত করে সমুদ্রের তলদেশে তলিয়ে যাবে না, আর এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব কোনো কাজে রূপান্তরিত হবে না। যেমনটা হচ্ছে আজ সারা বিশ্বের জাহেলী সমাজের ক্ষেত্রে। যে জাহেলী সমাজ তার জীবনকে সামাজিক এমন কিছু নিয়ম নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে না– যেখানে একের কাজে অন্যের হস্তক্ষেপকে নিকৃষ্ট মনে করা হয়। অনুরূপ জাহেলী নিয়ম নীতি ও কুপ্রথা ফাসেকী ও পাপকাজকে গন্য করে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে। সুতরাং কারো তাতে হস্তক্ষেপ করা কাম্য নয়। এমনকি তার অধিকারও নেই। তদ্রূপ জাহেলী কুপ্রথা অত্যাচার, কঠোরতা, নির্যাতন ও যুলুমকে সন্ত্রাসের অমীমাংসিত তরবারি হিসাবে নির্ধারণ করে। যে তরবারি পরে মানুষের মুখকে বন্ধ করে দেয়। জিহবাকে জটিল করে ফেলে এবং ওই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় যে সীমালংঘনকারীদের সামনে হক ও সত্য কথা বলে।

সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রচেষ্টা ও কোরবানী ব্যয়িত হওয়া উচিত। কল্যাণধর্মী সমাজ হলো সেই সমাজ যা আল্লাহর বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের মাধ্যমে ব্যক্তি সংশোধন ও সংস্কারের জন্যে, কোরবানী, আত্মত্যাগ ও প্রচেষ্টা ব্যয়িত হওয়ার পূর্বেই এ উদ্যোগ নেয়া উচিত।

যখন পুরো সমাজ নষ্ট হয়ে যায়, তাকে জাহেলিয়াত বেস্টন করে ফেলে, সমাজ অনৈসলামী বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যখন আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধানকে জীবন বিধান হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়, তখন আংশিক সংস্কার ও সংশোধন কোনো কাজে আসে না। বরং তখন এর গোড়া ও মূল থেকে ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করা উচিত। আর এ চেষ্টা ও প্রচেষ্টা আল্লাহর যমীনে তাঁর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিবেদিত হওয়া উচিৎ। যখন বাস্তবে আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার কাজ মূল বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করেই করতে হবে।

এ বিষয়টা সঠিক জীবন বিধান, সত্যিকার ঈমান, তার হাকীকত ও ক্ষেত্রসমূহ অনুধাবনে নিতান্ত প্রয়োজন। এ স্তরের ঈমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং কল্যাণের জন্যে তার সাহায্যের প্রতি পূর্ণ আস্থাকে নির্ধারণ করে। এ পথ যতো দীর্ঘ ও বন্ধুরই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় সে তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে যে নিজকে নিয়োজিত করবে, সে কখনো পার্থিব প্রতিদান, ভ্রান্ত সমাজের মূল্যায়ন এবং জাহেলিয়াতে নিমজ্জিতদের সাহায্য কামনা বা তার অপেক্ষা করতে পারে না।

সকল সামাজিক অপরাধের উৎস

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ সম্বলিত কোরআন এবং সুন্নাহর কথাসমূহ মুসলিম সমাজে একজন মুসলমানের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগেই বর্ণিত হচ্ছিলো।

যে সমাজ শুরু থেকে আল্লাহর কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং বিচার ফয়সালায় তাঁর বিধানের মুখোমুখি হয় সেখানে এ অবস্থা চলতে থাকে, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনে কিছু কিছু সীমালংঘন পরিলক্ষিত হয় উপরোক্ত বক্তব্য নিম্নোক্ত হাদীস অধ্যয়ন করলেই আমরা অনুধাবন করতে পারি। রসূল (স.) এরশাদ করেন, 'সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে যালেম ইমাম (শাসক)-এর সামনে হক কথা বলা।' ইমাম ততোক্ষণ পর্যন্ত ইমাম হতে পারে না, যতোক্ষণ না সে আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং তাঁর শরীয়ত (বিধান-কে) বিচারক হিসাবে স্বীকৃতি না দেবে। যে আল্লাহর বিধানকে বিচারক হিসাবে না মানে, তাকে ইমামই বলা যায় না। তার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ করেন, যারা আল্লাহর দেয়া বিধানানুসারে বিচার ফায়সালা করবে না, তারা কাফের।

যে জাহেলী সমাজ বিচার ফায়সালার জন্যে আল্লাহর বিধানের কাছে ধরণা দেয় না, তাতে সর্বাধিক গুনাহর গর্হিত কাজ সকল গর্হিত কাজের উৎস হলো আল্লাহর জীবন বিধানের অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। এ বৃহৎ গুনাহর কাজ থেকে উৎসারিত ছোটখাটো অশ্লীল কাজকে নির্মূল করার পূর্বে মূল গর্হিত কাজকেই অস্বীকার করা উচিত।

এ বড়ো অশ্লীল কাজ থেকে উৎপন্ন ছোটখাটো গর্হিত কাজকে প্রতিরোধ করতে সত্যপন্থী ভালো লোকদের প্রচেষ্টা কখনো বিনষ্ট হতে পারে না। সে বড়ো গুনাহর কাজ হচ্ছে আল্লাহর ওপর বাহাদুরী করা, খোদায়ী বৈশিষ্ট্যের দাবী করা এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা।

মানুষ অহরহ যে সমস্ত পাপ কাজ করছে সে ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে বিচার ফয়সালার জন্যে কিসের শরণাপন্ন হতে বলবো।' কোন মানদন্ডে তাদের এই গর্হিত কাজকে মেপে আমরা তাদেরকে বলবো– এটা গর্হিত কাজ, সুতরাং তোমরা এ কাজ থেকে বিরত থাকো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি তুমি বলো, নিসন্দেহে এটা গর্হিত কাজ, তখন অসংখ্য লোক তার প্রতিবাদ করে বলে উঠবে, কখনো নয়, এটা গর্হিত কাজ হতেই পারে না। এটা এক কালে গর্হিত কাজ হিসাবে গন্য ছিলো, কিন্তু এখন দুনিয়া পাল্টে গেছে। এ পৃথিবী প্রত্যহ উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে পা বাড়াচ্ছে, সমাজ উন্নত হচ্ছে। তার সাথে সাথে চিন্তার দিকও পাল্টাচ্ছে। মূল্যায়নের মাপকাঠিও বদলাচ্ছে। তাই এখন আর এটা কোনো অপরাধ নয়।

সুতরাং এমন একটি স্থায়ী মানদন্ডের প্রয়োজন, যেখানে আমরা আমাদের আমলনামা ওযন করার জন্যে তাকাতে পারি। অনুরূপভাবে স্বীকৃত মূল্যবোধের প্রয়োজন, যেখানে আমরা আমাদের ভালো ও মন্দ কাজের তুলনা করতে পারি। আমরা উপরোক্ত মূল্যবোধ কোথা থেকে গ্রহণ করবো? এবং সেই মানদন্ড কোথা থেকে আমরা সংগ্রহ করবো?

এগুলো কি আমরা মানুষের নিরূপণ, তাদের প্রচলিত প্রথা এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে গ্রহণ করবো? যা দৈনন্দিনই পরিবর্তিত হচ্ছে, কোনো অবস্থাতেই এক অবস্থায় থাকছে না। এমনটি করলে আমরা এমন ধ্বংস ও গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হবো, যেখানে পথ দেখাবার গাইড হিসাবে কেউ থাকবে না। অনুরূপভাবে আমরা এমন মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাবো, যেখানে মাইলফলক বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

সুতরাং এমন এক স্থায়ী মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করা দরকার, যা প্রবৃত্তির কামনা বাসনার দ্বারা প্রকম্পিত হয় না। আর সেই স্থায়ী মানদন্ড হচ্ছে আল্লাহর মানদন্ড।

যদি কোনো সমাজ আল্লাহর কর্তৃত্বের স্বীকৃতি না দেয়, আল্লাহর বিধানের কাছে বিচার ফয়সালার জন্যে শরণাপন্ন না হয়, যদি সে সমাজ আল্লাহর বিধানের প্রতি আহবানকারীকে বিদ্রূপ, ঠাট্টা ও অস্বীকার করে, অধিকন্তু যদি সে সমাজ ওই দায়ীকে (আহবানকারীকে) শাস্তি প্রদান করে, তবে তার পরিণাম কী হতে পারে?

এটা কি একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং উপহাস্য অনর্থক বস্তুতে পরিণত হবে না যদি সে সমাজে জীবনের ছোটখাটো বিষয়ে তুমি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের কাজ করতে থাকো।

নিসন্দেহে এ ক্ষেত্রে নীতিগত দিক থেকে বিচার, মানদন্ড, কর্তৃত্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর একমত হওয়া উচিত, যেদিকে মত ও প্রবৃত্তিতে মতবিরোধকারীরাও দরকার হলে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

সুতরাং বড়ো ধরনের কল্যাণের কাজ তথা সৎকাজের আদেশ আজ নিতান্ত প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধানের প্রতি স্বীকৃতি দেয়া। দ্বিতীয়ত সবচাইতে বড়ো গুনাহর কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা, আর সে বড়ো পাপ হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকে অবজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। কোনো কিছুর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই সেখানে ইমারত (বাড়ীঘর) তৈরি করা সম্ভব, সুতরাং এই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাকে যদি একস্থানে একত্রিত করে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিয়োজিত করা যায় তাহলে তার ওপর ভিত্তি করে একটা স্থায়ী ইমারত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

মানুষ কখনো হা-হুতাশ করে এবং ওই সমস্ত ভালো লোকের জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করে, যারা 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহয়ি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ)-এর শাখা প্রশাখায় যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করে। অথচ যে মূল ভিত্তির ওপর মুসলমানদের সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত এবং সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ প্রতিষ্ঠিত সে দিকে কোন প্রচেষ্টাই ব্যয় করে না এমনকি সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, এমন সমাজে মানুষদেরকে হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়ার মাঝে কি উপকারিতা থাকতে পারে? যার অর্থনীতি সূদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে তার সমস্ত সম্পদ এমনিই হারামে পর্যবসিত হয়ে আছে। সেখানে কোনো ব্যক্তি হালাল খাওয়ার চেষ্টা করলেও খেতে পারবে না। কারণ তার পুরো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আল্লাহর বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কেননা সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা শুরুতেই আল্লাহর জীবন বিধানকে অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে।

অনুরূপভাবে এ কাজের মধ্যে কি কল্যাণ থাকবে? তুমি এমন সমাজে মানুষদেরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে, যে সমাজের নিয়ম কানুন জোরজবরদস্তি ছাড়া উভয়ের সম্মতিতে যিনা করাকে কোনো অপরাধ হিসাবেই গণ্য করে না। এমনকি বলপূর্বক ধর্ষণ করার অবস্থাতেও তাকে আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি দেয়া হয় না। কারণ সে সমাজ আল্লাহর জীবন বিধানকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌমত্বকে শুরুতেই অস্বীকার করে রেখেছে।

অনুরূপভাবে ওই সমাজে নেশাগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশে কি কল্যাণ নিহিত থাকবে? সমাজের নিয়ম কানুন মদপান করা এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করাকে বৈধ মনে করে। একমাত্র প্রশস্ত রাস্তায় প্রকাশ্যে জনসম্মুখে নেশাগ্রস্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো অবস্থাতে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয় না। এমনকি সেই শাস্তিও আল্লাহর বিচার অনুসারে করা হয় না। কারণ সে সমাজ আল্লাহর শাসনের স্বীকৃতি দেয় না।

এমনিভাবে ওই সমাজে দ্বীনকে গালি দেয়া থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখার মাঝেই বা কী উপকারিতা? যে সমাজ আল্লাহর কর্তৃত্বের স্বীকৃতিই দেয় না এবং যেখানে আল্লাহর যথার্থ এবাদাত করা হয় না। বরং সে সমাজ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অসংখ্য প্রভুকে গ্রহণ করে, যারা তাদের জন্যে নিয়ম কানুন, বিধি বিধান এবং মাপকাঠি ও মূল্যবোধ তৈরী করে। সে সমাজে গালিদাতা ও গালিপ্রাপ্ত এ উভয়ের কেউই আল্লাহর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং তারা উভয়ই এবং তাদের

গোটা সমাজ ওই অসংখ্য প্রভুর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা তাদের জন্যে বিধি-বিধান ও নিয়ম কানুন বানায় এবং তাদের জন্যে সে মোতাবেক মূল্যবোধ ও মাপকাঠি নির্ধারণ করে।

ওপরে বর্ণিত অবস্থায় সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের আসলেই কোনো মূল্য আছে কি? যেখানে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত রাখার কোনো উপায় নেই, সেখানে ছোটখাটো গুনাহ থেকে নিষেধ করার মাঝে কি কোনো উপকারিতা থাকতে পারে? উল্লেখ্য যে, সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকে অবজ্ঞা করার মাধ্যমে আল্লাহকে অস্বীকার করা।

যে সব সৎ ও ভালো লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রকল্পে তাদের প্রচেষ্টা, শক্তি সামর্থ নিয়োগ করে তাদের এ বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে। নিসন্দেহে এ বিষয়টি উপেক্ষা করার মতো তুচ্ছ কোনো বিষয়ও নয়। কারণ আল্লাহর বিধি বিধান একমাত্র তাঁর শাসনের স্বীকৃতির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যদি সে স্বীকৃতি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, যদি তা প্রতিফলিত না হয় আল্লাহর বিধানকে বিধান রচনার একমাত্র উৎস হিসাবে এবং তাঁর প্রভুত্ব ও অভিভাবকত্বকে কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস হিসাবে, তাহলে শাখা প্রশাখার মাঝে সমস্ত চেষ্টা বিনষ্ট এবং সকল প্রচেষ্টা অনর্থক ও বেহুদা বৈ আর কিছুই নয়। সমস্ত পাপ কাজের মধ্যে সর্ববৃহৎ পাপ কাজকে প্রতিরোধ করার জন্যে যাবতীয় চেষ্টা ও প্রচেষ্টা আগে ব্যয়িত হওয়া উচিত। রসূল (স.) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ গর্হিত কাজ দেখবে, সে হাতের মাধ্যমে তার পরিবর্তন করবে। যদি সে তাতে সক্ষম না হয়, তবে সে মুখের দ্বারা তার পরিবর্তন ঘটাবে। আর যদি সে তাতেও সক্ষম না হয় তবে, সে অন্তরে তাকে ঘৃণা করবে এবং তার পরিবর্তনের জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। আর এটা হচ্ছে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।'

কখনো কখনো মুসলমানদের সামনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন তারা হাতের (শক্তির) দ্বারা গর্হিত কাজকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না। এমন কি মুখের দ্বারাও সক্ষম হয় না। তখন শুধু মুখের দ্বারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো পন্থা তার সামনে অবশিষ্ট থাকে না। যাকে হাদীসের ভাষায় দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ অন্তরের মাধ্যমে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যদি মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এ পরিবর্তন এবং পরিবর্তনকারীদের মাঝে কেউ প্রতিবন্ধক হিসাবে আসতে সক্ষম হবে না।

এটা পাপ কাজের নীতিবাচক অবস্থান নয়, যা বাহ্যত এবং রসূলের বক্তব্যের মাধ্যমে মনে হতে পারে, আসলে এটা পরিবর্তন সাধনের ইতিবাচক কাজ হওয়ারই পরিচায়ক। অন্তরের মাধ্যমে গর্হিত কাজকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, অন্তরে পাপ কাজের ইতিবাচক দিকগুলোকে অস্বীকার করে। নিসন্দেহে অন্তর তাকে অস্বীকার করবে, অপছন্দ করবে, তার সামনে আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত থাকবে এবং সে অন্তর কখনো তাকে শরীয়তের বিধান হিসাবে গন্য করবে না। অন্তরের কোনো পাপকে অস্বীকার করা সেই কাজকে বিনষ্ট করা, প্রথম সুযোগে সৎকাজকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সুযোগমত গর্হিত কাজকে বন্ধ করার জন্যে ওঁত পেতে থাকাই হচ্ছে– এর ইতিবাচক দিক। এসব কিছু পরিবর্তনের নামই ইতিবাচক কাজ। যদিও এটা দুর্বলতম ঈমান বৈ আর কিছুই নয়। একজন মুসলমানকে তার ন্যূনতম দুর্বলতম ঈমানের সংরক্ষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাস্তবতা ও ব্যাপক চাপের মুখে গর্হিত কাজের সামনে আত্মসমর্পণ করা ইসলামের গন্ডি থেকে বহিষ্কৃত হওয়া এবং দুর্বলতম ঈমান থেকেও সম্পর্কচ্ছেদ করার নামান্তর। যে সমাজে এ অবস্থার সৃষ্টি হবে, সে সমাজে আল্লাহর পক্ষ হতে অভিশাপ অবতীর্ণ হবে যেমনটা হয়েছিল বনী ইসরাইলের ক্ষেত্রে।

ইহুদীদের অবাধ্যতার কারণ

পরিশেষে ষষ্ঠ পারার শেষ প্রান্তে এসে বনী ইসরাইল সংক্রান্ত সমাপনী বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে। এখানে কোরআনে কারীম রসূলের যুগে এদের অবস্থা কী ছিলো তা বর্ণনা করছে। মূলত বনী ইসরাইলদের অবস্থা সর্বযুগে সর্বকালে একই ছিলো, তারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতো এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতো। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তারা আহলে কেতাব হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনেনি। সর্বোপরি তারা আল্লাহর সর্বশেষ দ্বীনেও প্রবেশ করেনি, সুতরাং তারা মোমেন নয়। যদি তারা ঈমানদার হতো, তবে কাফেরদের সাথে কখনো বন্ধুত্ব করতো না।

কোরআনের এই ভাষ্যটি যেমনিভাবে রসূলের যুগে ইহুদীদের বেলায় প্রযোজ্য, ঠিক তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্ব যুগেই তাদের ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে উপরোক্ত ভাষ্য আজকের বিশ্বের আহলে কেতাবের অপর দলটির ওপরও প্রযোজ্য।

অতীতে ইহুদীরাই মোশরেকদের সাথে বন্ধুত্ব করতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করত। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

'তারা (কেতাবধারীরা) কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।'

কোরআনে হাকীমের বিভিন্ন আয়াতে তাদের পুরোপুরি অবস্থা বর্ণনা এসেছে। আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়, তার পূর্বে এবং পরে এমনকি বর্তমান যুগের ঘটনাবলীর মাধ্যমেও এটা পরিস্ফুটিত হয়েছে। নাস্তিক জড়বাদী নব্য কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমেই এই বনী ইসরাইলরা অবশেষে আজ ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে কেতাবদের অপর দলটি মুসলমানদের কোনো কোনো বিষয়ের ব্যাপারে নাস্তিক জড়বাদীদের সাথে সাহায্য সহযোগিতা করে। অনুরূপভাবে তারা মোশরেক পৌত্তলিকদেরও সহযোগিতা করে। যখন মোশরেক এবং মুসলমানদের মাঝে কোনো যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়– যদিও ওই সমস্ত মুসলমানরা সত্যিকার ইসলামের প্রতিনিধিত্ব না করে নামকা ওয়াস্তে মুসলমান হয় তবুও তাদের এ হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা দ্বীন ইসলাম এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে কখনো বন্ধ হবে না। এমনকি যদি তারা দ্বীনের সত্যিকার অনুসারী না হয় তবুও। মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যিই বলেছেন,

'আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে।' 'তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে।'

নিসন্দেহে তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে আস্তে আস্তে যে পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তার প্রতিফলন হচ্ছে তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ এবং চিরকাল শাস্তি ভোগ করা। সুতরাং ওই পরিণাম কতই না নিকৃষ্ট এবং ওই উপঢৌকন কতই না খারাপ, ইহুদীদের কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার পরিণতি কি এক আশ্চর্য ব্যাপার?

আমাদের মধ্য থেকে যে কেউ উপরোক্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহর বাণী শুনবে, সে নিজ থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা তাকে দেননি। যেমন ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং তাদের শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের মাঝে বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালা কখনো আমাদের এ অনুমতি দেননি।

যদি প্রশ্ন করা হয় ওই সম্প্রদায়ের কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার কারণ কী হতে পারে? জবাবে বলা হবে একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান না আনা। (আয়াত নং ৮১

এটাই হচ্ছে মূলত: সত্যিকারের কারণ। নিসন্দেহে তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনেনি। তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসেক। তারা অনুভূতি ও গতিপথের দিক থেকে কাফেরদের সমকক্ষ। সুতরাং তারা মোমেনদের সাথে বন্ধুত্ব না করে কাফেরদের সাথেই করবে।

এখানে কোরআনে কারীমের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে তিনটি উল্লেখযোগ্য বাস্তব সত্য পরিস্ফুটিত হয়েছে।

১। আহলে কেতাবদের সকল লোকই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি। তারা তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান আনেনি। কোরআনে করীমের কথানুযায়ী তারা শুধু সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান আনাকেই অস্বীকার করেনি, বরং আল্লাহর প্রতি সঠিক ঈমান আনাকেও তারা অস্বীকার করেছে।

‘যদি এ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, নবী এবং নবীর ওপর যা নাযিল হয়েছিল তা মেনে নিতো, তাহলে কখনো (ঈমানদারদের মোকাবেলায়) কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতো না।’

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট বর্ণনা, যা কোনো প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে তাদের দাবী যাই হোক না কেন বিশেষ করে যদি আমরা তাদের এই ভূমিকাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত চিন্তা চেতনার বিকৃতি ধরে নেই তাহলে বিষয়টা আরো পরিস্কার হয়ে যাবে এর বিস্তারিত বিবরণ এ অধ্যায়ের আয়াতসমূহ এবং কোরআনে হাকীমের অসংখ্য আয়াতের বর্ণনায় দেয়া হয়েছে।

২। সমস্ত আহলে কেতাবদের মোহাম্মদ (স.)-এর ভাষায় আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করার জন্যে আহবান করা হয়েছে। যদি তারা মোহাম্মদ (স.)-এর আহবানে সাড়া দেয়, তবে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে। আর যদি তারা তা থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহর বর্ণনানুসারে তারা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আহলে কেতাব ও মুসলমানদের মাঝে বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহযোগিতা হতে পারে না। কারণ মুসলমানদের কাছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র হবে তার নিজের দ্বীনের অনুগত।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে আহলে কেতাবদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও আচরণ করতে ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের জান মাল ও ইযযত আবরু হেফাযত করতে তাদেরকে তাদের নিজস্ব আকীদা বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দিতে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত উত্তমরূপে পৌছে দিতে, তাদের সাথে উত্তমভাবে কথা বলতে সর্বোপরি তাদের সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং সন্ধির শর্ত পূরণ করে চলতে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের ওপর বল প্রয়োগ করা যাবে না।

আর এটাই হচ্ছে ইসলামের স্পষ্টতা, ইসলামের অনুগ্রহ।

আল্লাহ তায়ালা সদা সত্য কথা বলেন এবং হামেশা মানব জাতিকে সঠিকপথের সন্ধান দেন।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج
وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ط
ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَاِذَا
سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا
عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا
لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ لا وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮২. অবশ্যই তোমরা ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে ইহুদী ও মোশরেকদেরই বেশী কঠোর (দেখতে) পাবে, (অপরদিকে) মোমেনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তোমরা সেসব লোককে (কিছুটা) নিকটতর পাবে, যারা বলেছে আমরা খৃষ্টান; এটা এই কারণে যে, (তখনো) তাদের মধ্যে ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তি ও সংসারবিরাগী ফকীর-দরবেশরা মজুদ ছিলো, আর এ ব্যক্তিরা (সাধারণত) অহংকার করে না। ৮৩. রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা যখন এরা শোনে, তখন সত্য চেনার কারণে তুমি এদের অনেকের চোখকেই দেখতে পাবে অশ্রুসজল, (নিবেদিত হয়ে) তারা বলে ওঠে, হে আমাদের মালিক, আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের (নাম) সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের দলে লিখে নাও। ৮৪. (বিশেষ করে) আমরা যখন এই প্রত্যাশা করি যে, আমাদের মালিক আমাদের সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত করে দেবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর কাছ থেকে আমাদের কাছে যা কিছু সত্য এসেছে তার ওপর আমরা ঈমান আনবো না কেন? ৮৫. অতপর তাদের এ উক্তির কারণে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে (পরকালে) তাদের এমন এক জান্নাত দান করবেন, যার তলদেশ দিয়ে (অমীয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী; আর এটা হচ্ছে নেককার লোকদের (যথার্থ) পুরস্কার। ৮৬. অপরদিকে যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারা সবাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

তাফসীর

আয়াত-৮২-৮৬

এখন আমরা দলীল প্রমাণাদিসহ সূরাটির ওপর বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

'অবশ্যই ইহুদী ও মোশরেকদেরকেই মোমেনদের সব থেকে বড় দুশমন হিসাবে দেখতে পাবে ..... আর যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করবে ও এগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবে, তারাই হবে দোযখবাসী।' (৮৬)

এটাই হচ্ছে ইহুদী, নাসারা ও মোশরেকদের সম্পর্কে আলকোরআনের দৃষ্টিভংগি এবং শেষ নবী মোহাম্মদ (স.) ও মুসলিম উম্মাহ্ সম্পর্কে তাদের তৎপরতার মুখ্য বিষয়। সূরাটির এক চতুর্থাংশের মধ্যে যে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে তার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ইহুদী ও নাসারাদের ভ্রান্ত মতের এই কথাগুলো, বিশেষ করে ইহুদীদের নিকৃষ্ট ধারণা-বিশ্বাস ও জঘন্য আচরণ, যার থেকে নবী রসূলরাও রেহাই পাননি এবং অবশেষে শেষ রসূল (স.) তাদের চরম দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন- এ সকল হিংস্র পদক্ষেপে মোশরেকরা তাদের দোসর হিসাবে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। ইহুদী ও নাসারারা তাদের নবীদের থেকে যে আকীদ-বিশ্বাসের অধিকারী হয়েছিলো এবং শিক্ষা লাভ করেছিলো তা পরিত্যাগ করার কারণে তাদের ওপর 'কুফর' কথাটি প্রযোজ্য হয়েছে এবং অত্যন্ত জোরের সাথে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, তারা তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত আল্লাহর কেতাবের অনুসারী বলে যে দাবী তারা করে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়, বরং এ কেতাবদ্বয়ের কোনো কিছুর ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত নেই বলে এখানে স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর এ কারণেই তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোনো বিধানের ওপর টিকে নেই বলে আল কোরআন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে। এ জন্যে তাদের সবার প্রতি সমভাবে ইসলামের আহবান যেন তারা নতুনভাবে ইসলাম কবুল করে। এই কারণে উম্মাতে মুসলিমাকে সতর্ক করতে গিয়ে বলা হয়েছে যেন তারা আল্লাহ, রসূল ও মোমেনদেরকেই একমাত্র বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে- ইহুদী ও নাসারাদেরকে নয়। তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু ও দরদী, বিশেষ করে ইহুদীরা কাফেরদেরকেই তাদের বন্ধু বলে মনে করে এবং তাদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই কারণেই হযরত দাউদ (আ.)-এর যবানীতে (ভাষায়)তাদের প্রতি লা'নত বর্ষিত হয়েছে।

এখন এইসব ভ্রান্ত ইহুদীরা নবী (স.) ও মোমেনদের সাথে যে জঘন্য আচরণে লিপ্ত ছিলো তার বিশদ বিবরণ আসছে এবং এসব আচরণের পরিণতিতে তারা কী করুণ শাস্তির সম্মুখীন হবে এখানে আসছে তার খোলাখুলি বর্ণনা।

মুসলিম জাতির আসল শত্রু

উম্মতে মোহাম্মাদী সদা সর্বদা আল কোরআনকে জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই অধ্যয়ন করেছে। এ পাক কালামের লক্ষ্য ও শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করার সাধনায় তারা সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়েছে এবং আল কোরআনের শিক্ষার আলোকেই তারা রচনা করেছে বিশ্ব কল্যাণের পথ। বরাবরই তাদের প্রেরণা ও উৎসাহ উদ্দীপনার উৎস থেকেছে এই পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন। এরই ফলে তারা পৃথিবীর বুকে বিজয়ী জাতি হিসাবে পরিচিত থেকেছে, বিজিত নয়। তাদের এই বিজয়ের পিছনে মূখ্য যে হাতিয়ার শক্তি জুগিয়েছে তা হচ্ছে তারা তেমনি করে সরাসরি আল্লাহর পরিচালনা গ্রহণ করেছে যেমন করে তাদের নবী মহান আল্লাহ পাকের বাণীর আলোকে সত্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। নবী মোহাম্মদ (স.) যেমন আল্লাহর সরাসরি নির্দেশে

কাজ করেছেন, তেমনি পরবর্তী উম্মতদের পরিচালনার জন্যে এ মহান কোরআন আজও জীবন্ত পরিচালক হিসাবে দন্ডায়মান। এর শিক্ষা আজ যেমন আমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিচ্ছে, তেমনি ভবিষ্যতেও জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পথ পরিক্রমায় পথ এ মহান কোরআন দেখাতে থাকবে। এমনিভাবে আমরা আল কোরআন থেকে সর্বদা পথ-নির্দেশ লাভ করতে থাকবো এবং দেখতে পাবো জটিল যে কোনো সমস্যায় এ মহান কালাম আমাদেরকে সরাসরি ডেকে তাৎক্ষণিকভাবে তার সঠিক সমাধানের পথ বাতলে দিচ্ছে। এই ভাবে আমরা আধুনিক জাহেলিয়াতের ঘনঘটায় আল কোরআনের রওশনীতেই স্বচ্ছ সুন্দর পথের সন্ধান পেতে থাকবো, হারাতে হবে না আমাদেরকে সত্য সঠিক পথ বিভ্রান্তিকর বিভিন্ন মতবাদ ও নানা প্রকার দার্শনিক চিন্তা ভাবনার ঘূর্ণাবর্তে। আজ ও আগামী দিনে গড়ে উঠবে নানা লক্ষ্যে নানা সংগঠন– সেখানেও আল কোরআন হবে আমাদের সুদৃর দিশারী। কেয়ামত পর্যন্ত এই ভাবে আমরা এমহান কেতাবের আলোকে পথ চলতে থাকবো।

দেখুন, ইহুদী ও মোশরেকদের সম্পর্কে কোরআনে করীমের লিপিবদ্ধ কত চমৎকার ও সুস্পষ্ট কথা, 'অবশ্যই তুমি ইহুদী ও মোশরেকদেরকে মোমেনদের সব থেকে কঠিন শত্রু হিসেবে পাবে।'

এখানে বাক্যটির বাচনভংগিতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করেই কথাটি বলা হয়েছে। সাধারণভাবে সব মানুষকে লক্ষ্য করে কথাটি বলা হলে বাক্যটির ভংগিও সেই ভাবেই আসতো, কিন্তু আরবী ভাষার প্রচলিত ভংগিতেই কোরআন নাযিল হওয়ায় এ ভাষার নিজস্ব পদ্ধতিতেই একথাটির অর্থ বুঝতে হবে। অবশ্য পাঠকও এ সম্বোধনের লক্ষ্য হতে পারে, যেহেতু তাতে উদ্দেশ্য নষ্ট হয় না। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, রসূল (স.) মানব জাতির নেতা হিসেবে, এ সম্বোধনের প্রথম লক্ষ্য এবং পরবর্তীকালে নেতা হওয়ার কারণে ইসলামী জামায়াতের যে কোনো নেতা এ সম্বোধনের লক্ষ্য হবেন। উপরন্তু, আল কোরআন চাইছে, প্রত্যেক ব্যক্তিও এ কথার লক্ষ্য হওয়ার কারণে ইহুদী ও মোশরেকদেরকে তারা যেন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মুসলিম জন সমষ্টির শত্রু হিসাবে মনে করে। সুতরাং, কোরআনের ভাষায় চিরশত্রু এ দুই জাতিকে কোনো দিন যেন মুসলমানেরা বিশ্বাস না করে।

এক্ষেত্রে আর একটি লক্ষ্যযোগ্য বিষয় হচ্ছে মোশরেকদের পূর্বে ইহুদীদের কথা উচ্চারিত হয়েছে। বাহ্যিকভাবে এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহুদীরা পয়লা নম্বর শত্রু। এদের শত্রুতা কোনো দিন থেমে যায়নি এবং কোনো দিন থেমে যাবেও না। এ হিংস্র মানব দুশমনদের ইসলামের দুশমনী সর্বজন বিদিত এবং সর্বদা ও সর্বত্র বিরাজমান। তাদের দুশমনী এত কঠোর যা একটু চিন্তা করলে যে কোনো মানুষ সহজে বুঝতে পারে। আয়াতের শব্দগত বিষয়টিও খেয়াল করুন, 'ওয়াও' (এবং) দ্বারা ইহুদী ও মোশরেকদেরকে যুক্ত ভাবে মুসলমানদের শক্ত দুশমন বলে উল্লেখ করে আল কোরআন জানাতে চেয়েছে যে, শত্রুতায় এরা আসলে সমান; কেউ বেশী তীব্র এবং কেউ কম তীব্র, তা নয়। বরং স্বার্থান্ধ ও পার্থিব জীবন সর্বস্ব হওয়ার কারণে এরা উভয়েই আখেরাতমুখী জাতি মুসলমানদের চিরশত্রু অতএব, এদের শত্রুতার দংশন থেকে মুক্ত থাকার জন্যে মুসলমানদেরকে সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের বাহ্যিক কোনো চাটুকারিতায় বা বাহ্যিক সুদর্শন খোলসে যেন মুসলমানেরা কখনই ভুলে না যায়। বরং, 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টি আরবী ব্যবহার রীতিতে পরবর্তী ব্যক্তির গুরুত্ব অধিক বুঝাতে গিয়েও কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়ে এবং তাতে অর্থ দাঁড়ায়, মোশরেকরাই শত্রুতায় ইহুদীদের থেকে বেশী। এর অন্য একটি কারণও বুঝা যায়, আর তা হচ্ছে এরা মূলত কেতাবধারী এবং মোশরেকরা (আল্লাহর কেতাব বলে

পরিচিত) কোনো কেতাবধারী নয়। তাই, আরবী ভাষার ব্যবহার রীতি অনুযায়ী মোশরেকেরা ঈমানদারদের শত্রুতায় ইহুদীদের থেকে অগ্রগামী বলেই বুঝা যায়। মূল শত্রু হচ্ছে মোশরেকেরা এবং ইহুদীরা স্বার্থান্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তারাও মোশরেকদের মতোই হয়ে গেছে। সূদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক লেন দেনে ইহুদীদের যে চরিত্র ফুটে ওঠে তাতে তারাই যে মুসলমানদের, বরং মানুষের পয়লা নম্বর শত্রু এ কথাও একেবারে ফেলে দেয়া যায় না।

যুগে যুগে ইহুদী চক্রান্ত

আবার যখন ইসলামের সূচনা যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস মন্থন করি, তখন দেখতে পাই মোশরেকদের তুলনায় ইহুদীরাই যেন ঈমানদারদের শত্রুতায় বেশী কঠোর, বেশী গভীর, অধিক দীর্ঘস্থায়ী। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে এদের দুশমনী যেন কখনও শেষ হবার নয়। এদের নিরন্তর জিদ যে মোমেনদের সাথে শত্রুতা করতেই হবে। মোমেনদের বিরুদ্ধে এ শত্রুতা করাটাই যেন তাদের সব থেকে পুণ্যের কাজ বলে তারা মনে করে। এ কথাটির সপক্ষেই কোরআনুল করীম বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করেছে, পেশ করেছে রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের নানা প্রকার ষড়যন্ত্র ও তাদের পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের নযীর। এসব ন্যক্কারজনক ষড়যন্ত্র তারা বারবার করেছে এবং এখনও নিরন্তর করে চলেছে।

আর এটাও লক্ষণীয় যে, মদীনায় মুসলমানদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পরই ইহুদীদের এসব শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের চেহারা উলংগ হয়ে দেখা দিয়েছে। মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকুক, প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী এটা ওদের সহ্যের বাইরে। তাই এ জাতির সূচনা লগ্ন থেকে তাদেরকে উৎখ্যাত ও নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র অবিরাম গতিতে চলছেই চলছে। চৌদ্দ শত বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যেও এ শত্রুতা থামেনি এবং বিশ্বব্যাপী সবখানেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো রয়েছে। (১)

রসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় পদার্পণের সাথে সাথেই মদীনার মধ্যে ও উপকণ্ঠে অবস্থিত ইহুদীদের সাথে সহ অবস্থান চুক্তি করেন এবং সেই চির শান্তির ব্যবস্থা ইসলামের দিকে তাদেরকে আহবান জানান, যার খবর তাদের কেতাব তাওরাতের মধ্যে দেয়া হয়েছে। এ কেতাব তারা পড়ছে, দেখতে পাচ্ছে স্পষ্টভাবে রসূল (স.)-এর আগমন বার্তা তাদের কাছে উপস্থিত কেতাবের মধ্যে। কিন্তু আফসোস, তাদের নিজেদের এই কেতাবের কথা আজ তারা নিজেরাই মানতে রাযি নয়। তাদের এই কালিমালিপ্ত চরিত্র ইতিপূর্বেও একইভাবে ফুটে উঠেছে অন্যান্য নবীদের আগমন কালে এবং এভাবে আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তিকে তারা বারবার ভংগ করেছে। অবশেষে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর চূড়ান্ত কথা নাযিল হলো।

'আর আমি অবশ্যই তোমার কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (আমার নিদর্শনসমূহ) পাঠিয়েছি, কিন্তু ওই মহা অপরাধী জাতি ব্যতীত এআয়াতগুলোকে আর কেউ (চূড়ান্তভাবে জেনে বুঝে) অস্বীকার করেনি। (ওই মহা অপরাধী জাতির অবস্থা হচ্ছে এই যে,) ওরা যতবারই আনুগত্যের চুক্তি করেছে, ততবারই তাদের মধ্য থেকে একটি দল তা ভংগ করেছে এবং ওই চুক্তিকে পেছনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বরং, প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তাদের অধিকাংশই ঈমান আনতে প্রস্তুত নয়। আর যখনই তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো রসূল এসেছে, এবং তাদের নিকটে অবস্থিত কেতাবের সত্যতা ঘোষণা করেছে, তখন ওই আহলে কেতাবদের মধ্য থেকে একদল (ওই রসূলের আনীত) আল্লাহর কেতাবকে পেছন দিকে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে যেন তারা জানেই না যে, এখানো আল্লাহরই একখানা কেতাব। (২) যে দিন আল্লাহ তায়ালা

---

(১) পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এ বিষয়ে আরও বেশী কিছু ইংগিত ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

(২) দেখুন সূরায়ে বাকারাহ, ৯৯-১০১ আয়াত।

আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত করলেন সেই দিন থেকেই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে চলেছে। এরপর মুসলমানদের পক্ষে ইহুদীদের সারিতে প্রবেশ করার বা ওদের নিজেদের পক্ষেও তাদের সারি থেকে বেরিয়ে এসে বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করার কোনো সুযোগ কখনও আসেনি। কিন্তু নবী কারীম (স.) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই মুসলিম উম্মাহর হাতে নেতৃত্ব এসে গেছে এবং তার নিয়ন্ত্রণ বরাবরই রসূল (স.)-এর হাতেই থেকেছে। এই দীর্ঘ বহু শতাব্দী ব্যাপী কোনো কালেই ইহুদীরা কোনো এলাকাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করেনি বা করতে পারেনি।

ক্ষমতা লাভের জন্যে তারা সর্বপ্রকার হাতিয়ার ও উপায় উপকরণ ব্যবহার করেছে এবং সব থেকে বড় অস্ত্র যা ইহুদী চক্রান্ত নামে পরিচিত তা সর্বত্র নিক্ষেপ করেও তারা চেয়েছে দুনিয়ার কোনো ভূমিখন্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে। অবশ্য এই চক্রান্ত জাল ছড়িয়ে ব্যবিলনে সিব্বিদের আমলে, মিসরে দাস আমলে এবং রোম সাম্রাজের পতনের সময়ে সামান্য কিছু আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। অতপর বহু যুগ ধরে সংকীর্ণ অবস্থায় থাকার পর মুসলমানরাই তাদের জন্যে কিছু প্রশস্ততা লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে; কিন্তু এর বিনিময়ে অদ্যাবধি তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক শুধু চক্রান্তই করে চলেছে। তারা আরব উপদ্বীপের সকল মোশরেক শক্তিকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে এবং বিচ্ছিন্ন কাবীলাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্যে একত্রিত করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা দেখুন, 'ওরা কাফেরদেরকে বলে, সত্যপথ লাভের প্রশ্নে মোমেনদের তুলনায় ওরা অনেক ভালো।(৩)

মুসলমানদের সংখ্যা যখন বেড়ে গেলো এবং তারপর সত্যের শক্তি বলে ইসলাম যখন তাদের ওপর বিজয় লাভ করলো, তখন তারা তাদের সাহিত্যের সাহায্যে হীন চক্রান্ত জাল ছড়ানো শুরু করলো এবং সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করলো। একমাত্র আল্লাহর কেতাব আল কোরআন ব্যতীত অন্য সকল বই পত্রের মধ্যে তাদের চক্রান্ত বিষ অনুপ্রবেশ করলো, বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তারা ইসলামকে আধুনিকীকরণের জন্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকলো এবং সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান মতপার্থক্যগুলোকে একত্রিত করে সেগুলোকে এতো বড় করে দেখাতে থাকলো যে, মুসলমানদের মধ্যে একতা ফিরে আসা অসম্ভব হয়ে গেলো এবং পৃথিবীর সকল অংশে মুসলমানরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে গেলো। আর এই সকল যুদ্ধে প্রকারান্তরে খৃষ্ট মতবাদ ও পৌত্তলিকতা প্রসারের খেদমত হতে লাগলো। আর আজকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারাই মুসলমানদেরকে ব্যবহার রীতি শেখাচ্ছে এবং মুসলমানদের দ্বারাই সর্বপ্রকার অন্যায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তারা এই পবিত্র দ্বীনকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্যে যায়নিষ্ট (চরমপন্থী ইহুদীবাদের) ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ!) চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই, দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন, 'তুমি ইহুদী ও মোশরেকদেরকে মোমেনদের চরম শত্রু হিসেবে দেখতে পাবে।

মদীনাতে উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরবের বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে একত্রিত করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করেছে যারা, যারা বনী কুরায়যা ও অন্যান্য ইহুদী গোত্রগুলোকে মক্কার কোরায়শদের সাথে একত্রিত করেছে এবং যারা আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন কাবীলাকে একতাবদ্ধ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তুলেছে– তারা কারা? তারা অবশ্যই এই ইহুদী জাতি।

---

(৩) দেখুন সূরায়ে নেসা।

আবার দেখুন, হযরত ওসমান (রা.)-এর আমলে সংঘটিত অস্থিতিশীলতার সময় তার বিরুদ্ধে জনগণকে একত্রিত করা, ছোট ছোট মত পার্থক্য সৃষ্টিকারী দলগুলোকে একতাবদ্ধ করে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে তাঁকে হত্যা করার জন্যে সবাইকে সংঘবদ্ধ করার যে খেদমতটি আঞ্জাম দেয়া হয়েছিলো, তা করেছিলো কারা? তাও এই হিংস্র ইহুদী সম্প্রদায়।

আরো দেখুন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর ও তাঁর জীবনীর মধ্যে মিথ্যা কথা প্রবেশ করানো এবং ভুল ও মিথ্যা হাদীস তৈরী করার জন্যে ভুল বর্ণনাকারী পরিচালনা করার যে কাজ করেছিলো তারা এই ইহুদী জাতি।

তুরস্কের শেষ খলীফা আবদুল হামিদের আমলে তুরস্ক জাতীয়তাবাদের ধ্বনি তুলে যে বিপ্লবের ডাক দেয়া হয়, সেখানে শরীয়তের বিধি বিধানকে উৎখাত করে শাসনতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব তুলে ধরা হয় এবং পরিশেষে কামাল আতাতুর্ক নামের ভ্রান্ত এক স্বৈর শাসক খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে নিজ হাতে ক্ষমতা তুলে নেয়। এ সব কাজের পেছনে কাদের ষড়যন্ত্র কার্যকর ছিলো? সেও এই ইহুদী জাতির নিকৃষ্ট চক্রান্ত। পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের বিজয় অভিযানের সময় এর বিরুদ্ধে যে সব যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তার পেছনেও রয়েছে এই ইহুদী চক্রান্ত।

এরপর পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ যতো আন্দোলন হয়েছে তার পেছনেও রয়েছে এই ইহুদী চক্রান্ত। যৌন স্বাধীনতার নামে যেসব পাশবিক বিপ্লব ঘটেছে তার পেছনেও এই ইহুদী চক্রান্ত কাজ করেছে। তারপর দেখা যায়, প্রত্যেক পবিত্র স্থান ধ্বংস ও প্রত্যেকটি শৃংখলা বিনষ্টকারী কাজের পেছনেও রয়েছে এই ইহুদী চক্রান্ত।

ইহুদীদের এই ইসলাম বৈরিতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী চলছে তাদের এই হীন আক্রমণ। অতীত ও বর্তমানে কোনো সময়েই মোশরেক ও পৌত্তলিকদের শত্রুতা এতো ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আরবে মোশরেকদের দুশমনী সর্বোচ্চ এবং সব মিলিয়ে বিশ বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি। এমনি করে প্রথম দিকে পারস্যের বিরোধিতাও মোশরেকদের বিরোধিতার মতো দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবশ্য বর্তমানে ভারতে হিন্দুদের শত্রুতাও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, কিন্তু যায়নিষ্ট (চরমপন্থী ইহুদীদের) বিদ্বেষের মতো বিশ্বব্যাপী তাও এতো কঠিন নয় এর তুলনা একমাত্র মার্কসবাদীদের সাথে করা যায়, বরং বলা যায় এ শত্রুতা মার্কসীয় হিংস্রতারই দোসর। এক কথায় বলা যায় যায়নিষ্টদের এই ইসলাম বৈরিতা ও হিংস্রতা ব্যাপকতা ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের দিক দিয়ে ক্রুসেড যুদ্ধের সাথে তুলনীয়, যার আলোচনা পরবর্তী আয়াতে আসছে,

আবারও এখানে আমরা আল্লাহর বাণী শুনতে পাই,

‘অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে মুসলমানদের শত্রুতায় সারা পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশী অগ্রগামী ও হিংস্র জাতি হলো ইহুদী ও মোশরেক জাতি।’

এখানে বাক্যের মধ্যে ইহুদীদের দুশমনীর কথা মোশরেকদের দুশমনীর আচরণ থেকে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করার পর আমরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যখন পর্যবেক্ষণ করি, তখন ইহুদীদের কথা আগে উচ্চারিত হওয়ার তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে পারি এবং উপলব্ধি করতে পারি কেন আল্লাহ তায়ালা এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহুদীদের কথা আগে উল্লেখ করেছেন।

এই ইহুদী জাতি হচ্ছে চরম হিংস্র ও নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। এরা মানবতার কলংক, চিরদিন এরা ইসলাম ও ইসলামের বাহক নবীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে এসেছে। তাই আল্লাহ তায়ালাও এদের বিরুদ্ধে তাঁর নবী মোহাম্মদ (স.)-কে ও তাঁর অনুসারী উম্মতকে বারবার সতর্ক করেছেন। এই নিকৃষ্ট মানব-কীট দল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনও জয়ী হতে পারেনি এবং মুসলমানরা ইসলামের শাণিত ক্ষুরধার অস্ত্র দ্বারা তাদেরকে বারবার দমন করতে সক্ষম হয়েছে যা আজ পর্যন্ত আর কেউ পারেনি।

খৃষ্টানদের সাথে শত্রুতা ও মিত্রতা প্রসংগে

এরপর বলা হয়েছে খৃষ্টানজাতি সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

‘অবশ্যই দেখতে পাবে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের দিক দিয়ে নিকটতর নাসারাদেরকে। তাদের শত্রুতা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্যে বহু ধর্মজাযক ও দরবেশ ধরনের আল্লাহভক্ত লোক আছে এবং তারা (অন্যদের মতো) অহংকারীও নয়। এই সকল ব্যক্তিকে দেখতে পাবে, মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর যখনই কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে বলে তারা শুনতে পায়, তখন তাদের চোখগুলোতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে যায়, যেহেতু তারা ওই আয়াতগুলোর মধ্যে সত্যের আলো দেখতে পায় এবং তখন তারা বলে ওঠে, ‘হে আমাদের রব প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি (একথাগুলোর উপর)। অতএব, সত্যের সাক্ষীদের সাথে আমাদের নাম লিখে নিন। আর কি হয়েছে আমাদের! কেন আমরা ঈমান আনব না আল্লাহর ওপর এবং ওই সকল জিনিসের ওপর যে ‘হক’ (সত্য) আল্লাহর কাছে থেকে এসেছে; আর আমরা কামনা করি ও আশা করি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নেককার জাতির সাথে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন। তাদের এই (আশা ও) কথার প্রতিদানে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ওই সব ফুলে ফলে সুশোভিত জান্নাতে (বাগ-বাগিচায়) প্রবেশ করাবেন, যার নীচু (ও পাশ) দিয়ে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। চির দিন তারা সেখানে থাকবে, আর এই হচ্ছে এহসানকারীদের সঠিক প্রতিদান। আর যারা সত্য অস্বীকার করেছে এবং আমার সত্য আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, তারাই হচ্ছে দোযখবাসী।’

উপরোক্ত আয়াতগুলো বাস্তব অবস্থার জীবন্ত চিত্র অংকন করেছে এবং সকল সম্প্রদায়ের অবস্থা বিবেচনায় সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে। চিত্র এঁকেছে ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের। যারা বলেছে, ‘আমরা নাসারা’ এবং এ কথা দ্বারা তারা সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, তারা বন্ধুত্ব ও মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপনে মোমেনদের অনেক বেশী কাছাকাছি।

এখানে উল্লেখিত আয়াতগুলোর বর্ণনা পরম্পরাতে একথা নিসন্দেহে বুঝা যাচ্ছে যে, একটি বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো, যা ওই অবস্থার সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এই প্রেক্ষাপট বুঝতে অনেকে ভুল করে এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর শিবিরের সাথে মৈত্রী চুক্তি করে মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়ন ও অগ্রগতির আশা করে এবং তাদের মধ্য থেকে বিশেষ করে এই হিংস্র ইহুদী সম্প্রদায়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদক্ষেপগুলোকে পৃথক করে দেখতে পারে না। এই কারণেই আমরা প্রয়োজন বোধ করছি, এই তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’এর মধ্যে ওই বিশেষ হুকুম যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিলো তা বুঝানোর জন্যে একটু সূক্ষ্ম ভাবে বর্ণনা আলোচনা করা। যে অবস্থার চিত্র আঁকতে গিয়ে এই সব আয়াতের অবতারণা করা হয়েছে, তার লক্ষ্যবিন্দু হচ্ছে বিশেষ এক জনগোষ্ঠী; তারা বলতো ‘আমরা নাসারা’– এরা মহব্বতের সম্পর্কের দিক দিয়ে মোমেনদের কাছাকাছি বেশী। ‘আর তাদের এই অবস্থার কারণ হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে বহু ধর্মযাজক ও আল্লাহমুখী (দরবেশ শ্রেণীর) মানুষ আছে এবং তারা অহংকারও করে না।’

তাদের মধ্যে যারা, নাসারাদের 'দ্বীন' বা জীবন বিধান জানে, তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হলে তারা মোটেই অহংকার করে না।

কিন্তু আল কোরআনের বর্ণনাধারা এতোটুকুতে থেমে যায়নি এবং বিষয়টিকে অস্পষ্ট অবস্থায়ও ছেড়ে দেয়নি, এমনকি যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে দাবী করেছে, তাদের কথাকে ভাসা ভাসা ভাবেও গ্রহণ করেনি, বরং একথার মধ্যে যে লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে আল কোরআন তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেছে,

'তারা যখন রসূলের কাছে অবতীর্ণ কথা (আয়াত) গুলো শোনে, তখন তাদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে, 'সত্য সঠিক বিষয়টি জানতে ও বুঝতে পেরে দরদ বিগলিত ধারায় তাদের অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং তারা বলে ওঠে,

'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান আনলাম, অতএব, আমাদেরকে সত্যপন্থী (সত্যের সাক্ষী)দের সাথে শামিল করে নিন। আর কি হলো আমাদের! কেন আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনবো না এবং যে সত্য আজ সমাগত, তা কেন গ্রহণ করব না! অবশ্যই আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককার লোকদের দলভুক্ত করবেন।

এ হচ্ছে কোরআন কারীমে অংকিত এই সব সত্যপন্থী লোকদের এক জীবন্ত ছবি, যারা বন্ধুত্বের সম্পর্কের দিক দিয়ে মোমেনদের বেশী কাছাকাছি। রসূলের ওপর অবতীর্ণ আল কোরআনের এই কথাগুলো যখন তারা শোনে তখন তাদের শিরা উপশিরা ও ইন্দ্রিয়গুলো প্রকম্পিত হতে থাকে, বিগলিত হয় তাদের অন্তরগুলো এবং সত্যকে গভীরভাবে হৃদয়ংগম করার কারণে এবং কোরআন পাকের আয়াতগুলোতে বর্ণিত সঠিক 'দ্বীন'-এর সন্ধান লাভ করায় ভক্তি ও আনন্দে তাদের চোখগুলো অশ্রুবিগলিত ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। সত্য সন্দর্শন ও সত্য উপলব্ধির প্রথম বহিপ্রকাশ তাদের অশ্রুসিক্ত নয়ন, যা তাদের হৃদয়ের গভীর অনুভূতির কথা জানায় এবং সত্যকে সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে তারা যে গ্রহণ করতে পেরেছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়। আসলে ঈমানের অভিব্যক্তিতে তাদের এ অবস্থা তাদের মুখের স্বীকৃতি থেকে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক। তাদের অশ্রুধারা তাই প্রকাশ করে, যা মানুষের ভাষা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। আসলে অশ্রুর ভাষা, হৃদয়ের গভীরে সঞ্চিত অনুভূতিকে নীরবে, নিঃশব্দে প্রকাশ করতে থাকে, যা অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়।

এরপর কোরআন পাকের কথাগুলো শুনে তার দ্বারা প্রভাবিত এবং অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার পর শুধু অশ্রু বিসর্জন দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি এবং সত্য থেকে তারা দূরেও অবস্থান করেনি, বরং আল কোরআনের গভীর আকর্ষণীয় শক্তি তাদেরকে এমন ভাবে কাছে টেনে নিয়েছে যে, তাদের অন্তরের কলুষ কালিমা ও জাহেলিয়াতের আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা মহান এ দ্বীনের দিকে এগিয়ে এসেছে। এর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, হৃদয় প্রাণ দিয়ে ঈমান এনেছে, এর দুর্বার শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং ইসলাম কবুল করার কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে তারা বলে উঠেছে,

'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি; অতএব আমাদেরকে সত্যের সাক্ষীদের দলভুক্ত করে নিন। আর কি হলো আমাদের! সত্য সমাগত হওয়ার পর কেন আমরা ঈমান আনবো না? আমরা তো সর্বান্তকরণে চাই যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।'

প্রথমত তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান আনার কথা ঘোষণা দিয়েছে এবং ইসলামই সঠিক জীবন ব্যবস্থা তা তারা ভালো ভাবে বুঝতে পেরেছে। তারপর তারা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া

তায়ালাকে কাতর কণ্ঠে ডেকে নিবেদন করে বলেছে যেন তাদেরকে সত্যের ধারক, বাহক ও সত্যের সাক্ষীদের সাথে শরীক করে নেয়া হয় এবং তাদের পথে যেন চালিত করা হয় যারা পৃথিবীর বুকে সত্যের নিশানবর্দার হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে জাতি অবশ্যই মুসলিম জাতি যারা নিজেদের জীবনকে সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে বিপন্ন করেছে ও বিলিয়ে দিয়েছে। এইভাবে কথা, কাজ ও ব্যবহার দ্বারা তারা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে শুরু করেছে এবং জানিয়ে দিয়েছে যে, এই দ্বীন ইসলামই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সত্য জীবন ব্যবস্থা এবং মানব জীবনের সর্বত্র এ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা সচেষ্ট হয়েছে। এইভাবে সত্যের এই নতুন সাক্ষীরা মুসলিম উম্মাহর সাথে শামিল হয়ে গেছে, সত্য সত্যই যে তারা ঈমান এনেছে, সে ব্যাপারে তাদের রবকে তারা সাক্ষী রেখেছে এবং তাঁর কাছে দোয়া করতে থেকেছে যেন তাদেরকে তাঁর নিজস্ব রেকর্ড বইয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছিলো, তা গ্রহণ করার ব্যাপারে ঐ ছিলো ওই সত্যাশ্রয়ীদের প্রকাশ্য ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ। এ গ্রহণ ছিলো হৃদয়ংগম ও সঠিক উপলব্ধির বহিপ্রকাশ। এ গ্রহণ দ্বারা একাধারে তাদের অন্তরের গভীরে সত্যের প্রভাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যভাবে ঈমানের প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর এসেছে ইসলাম গ্রহণ ও মুসলমানদের সাথে শরীক হয়ে যাওয়ার পর্যায় এবং তারপরই এসেছে মহান আল্লাহর কাছে তাদের কাতর কণ্ঠের দোয়া যেন সত্যের সেই কাফেলার সারিতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, যারা ব্যবহার, কাজ ও জেহাদী তৎপরতার দ্বারা পৃথিবীতে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, যারা মানুষের জীবনে এ সত্যকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রাম করেছিলো। এরপর তারা একমাত্র এই ব্যবস্থার মধ্যেই নিজেদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিলো এবং কোনো দিন এ ব্যবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তনের খেয়াল করেনি। তারা জীবনের একমাত্র ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহর ওপর এই ঈমানের পথকেই গ্রহণ করেছে, গ্রহণ করেছে সেই সত্যকে যা তাঁর রসূলের কাছে তিনি নাযিল করেছেন এবং এরপর তাঁর কাছেই ঈমান কবুল করার জন্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যে দোয়া করেছে।

নাসারা (খৃষ্টান)-দের মধ্যে যারা বলেছে 'আমরা নাসারা', তাদের মধ্য থেকে কারা মোমেনদের বেশী কাছে এ কথা বলার সময় আল কোরআনের বর্ণনা ধারা থেমে যায়নি, থেমে যায়নি রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর আল্লাহর প্রেরিত সত্যের বাণীর সাথে আচরণ সম্পর্কে কথা বলা। ঈমানের ঘোষণা দ্বারা যখন তারা রসূলের আহবানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে এবং নিজেদেরকে মুসলমানদের সারির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, তখনও তাদের সম্পর্কে আল কোরআন নিশ্চুপ থাকেনি। যখন তারা কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং আল্লাহর পথে মযবুতির সাথে টিকে থাকার জন্যে প্রচেষ্টা করেছে, ধন সম্পদের কোরবানী স্বীকার করেছে এবং সত্যের সাক্ষ্যদানকারীদের সারিতে এবং নেককার লোকদের দলে তাদেরকে স্থান দেয়ার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করতে থেকেছে, তখনো আল কোরআন নীরব থাকেনি।

বন্ধুত্বের প্রশ্নে তারা যে মুসলমানদের নিকটতর– একথা বলেও আল কোরআন চুপ থাকেনি, বরং এর পরিণতিতে তারা কি পাবে এবং অবশেষে তারা কোথায় থাকবে তাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে,

'আল্লাহ তায়ালা প্রতিদানে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচু দিয়ে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে এবং এই হচ্ছে এহসান (সদ্ব্যবহার)-কারী লোকদের সমুচিত পুরস্কার।

আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাদের অন্তরের সত্যতা জেনে নিয়েছেন। তাদের মুখে উচ্চারিত কথাগুলোকেও গ্রহণ করেছেন এবং সত্য পথে দৃঢ়তার সাথে চলতে থাকার জন্যে তাদের সংকল্প কতো দৃঢ় তাও বুঝে নিয়েছেন। আরও জেনে গেছেন, যে নতুন দ্বীন তারা কবুল করেছে, তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে তাদের মযবুত মনোবলের কথা। তারা যে মুসলমানদের সারিতে থাকাটা পছন্দ করেছে এবং সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে মানসিক, শারীরিক, অর্থনৈতিক ও বস্তুগত যে প্রস্তুতি তারা গ্রহণ করেছে তাও আল্লাহর অজানা নেই। নেক লোকদের শ্রেণীতে আশ্রয় পাওয়ার কামনা বাসনাসহ তাদের দৃঢ়তা কবুল হয়েছে। এসকল বিষয় বিবেচনায় অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে নেক প্রতিদানের ওয়াদা ঘোষিত হয়েছে। মহা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্রুটি- বিচ্যুতিগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তাদের আনুগত্যের বদলায় উত্তম পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

তাদের সকল অবস্থাই আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। তাই তিনি তাদের সব কিছুকে কবুল করেছেন এবং প্রতিদানে জান্নাত দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এইভাবেই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা নেক লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন, যেহেতু তারাও তো এহসানকারী। 'সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যা তারা বলেছে, তার প্রতিদানে সেই সব জান্নাত দান করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার নীচু দিয়ে ছোট ছোট নহর প্রবহমান থাকবে। আর এটিই এহসানকারীদের প্রতিদান।'

ঈমান ও ইসলামের সর্বোত্তম স্তর হচ্ছে এহসান। আর আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মানুষের মধ্যে তারাই এহ্সানকারী।

এরা হচ্ছে সেই বিশিষ্ট দল, যাদের সম্পর্কে কোরআনে করীম বলছে,

'আর অবশ্যই মুসলমানদের ভালোবাসার পাত্র হিসাবে তুমি তাদেরকে সব থেকে কাছে পাবে, যারা বলেছে, 'আমরা নাসারা।'

এ হচ্ছে এমন একটি দল, যারা সত্য দ্বীন সম্পর্কে ডাক শোনার পর অহংকার করে দূরে সরে থাকেনি বরং গভীর হৃদয়াবেগের সাথে সে ডাকে সাড়া দিয়েছে, পরিষ্কারভাবে নিজেদের মোমেন হওয়ার কথা জানিয়েছে। এ হচ্ছে এমন একটি দল, যারা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধা করেনি, মুসলমানদের সারিতে নিজেদের গণ্য করতেও পিছপা হয়নি বরং এই নতুন আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করায় যে সব ঝুঁকি রয়েছে তা উপেক্ষা করে তারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়েছে, মযবুতির সাথে তারা সত্যের সাক্ষ্য দান করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে এবং এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার ও মযবুত বানানোর জন্যে সর্বপ্রকার জেহাদে অংশ নিতেও প্রস্তুত হয়ে গেছে। এ হলো এমন একটি দল, যাদের কথার সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যকভাবে অবগত আছেন এবং তিনি তাদেরকে ইসলামের জন্যে কবুল করে নিয়েছেন এবং মুসলমানদের সারিতে তাদের জায়গা করে দিয়েছেন।

কিন্তু কোরআনে কারীম তাদের ইসলামপ্রীতির স্বীকৃতি দিতে গিয়ে এই কথাগুলো বলেই ক্ষান্ত হয়নি যে, 'তুমি তাদেরকে মোমেনদের বন্ধু হিসাবে অন্যদের তুলনায় বেশী কাছে পাবে, বরং যারা নিজেদের সম্পর্কে বলেছে, 'আমরা নাসারা', তাদেরকে সেই সব ব্যক্তি থেকে পৃথক করে দেখিয়েছেন, যারা এই সত্যের বাণী শুনেছে এবং অস্বীকার করেছে, উপরন্তু এ সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টাও চালিয়েছে। তারা সত্যের ডাকে সাড়া দেয়নি, মুসলমানদের দলে শামিল হয়নি।

এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা (ওদের মধ্যে যারা) অস্বীকার করেছে এবং সত্যকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে, তারাই হচ্ছে দোযখবাসী।'

এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে বলতে চাওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে, ওদের মধ্যে যে সব ব্যক্তি বললো, 'আমরা নাসারা', তারপর ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের সারিতে জায়গা করে নিলো এবং সর্বপ্রকার জ্বালা যন্ত্রণা ও নির্যাতনকে উপক্ষো করে ঈমানের পরকাষ্ঠা দেখালো, সেই সব লোকদের কথা অন্যান্য খৃষ্টান ও ইহুদী থেকে স্বতন্ত্র, যারা শুনলো, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো ভাবান্তর ঘটলো না, বরং তারা এই মহা সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিহত করার জন্যে সর্বপ্রকার তৎপরতা চালালো। আহলে কেতাব হওয়া সত্তেও তারা মোশরেকদের মতো একই ভূমিকা গ্রহণ করলো, রসূলের কাছে আল্লাহর প্রেরিত সত্যকে অস্বীকার করলো, মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্যেও সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালালো এবং দ্বীন ইসলামকে প্রতিহত করার ব্যাপারে তাদের মতো হয়ে গেলো যাদের সম্পর্কে সূরায়ে বায়্যিনাহ্তে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, 'সত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন সমাগত হওয়ার পরই আহলে কেতাব ও মোশরেকরা এ সত্য থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।'

পরবর্তী অন্য আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা (সত্যকে) অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে, চিরদিন থাকবে তারা সেখানে, এরাই হচ্ছে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।'

'এদের মধ্যে একটি দল এমন আছে, যারা বলে নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন তিন জনের একজন– অবশ্যই এদল কুফরী করেছে। তারাও কুফরী করেছে যারা বলে, 'মসীহ ইবনে মরিয়মই হচ্ছে আল্লাহ' এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম এর যবানীতে লানত বর্ষণ করা হয়েছে বনি ইসরাইলের সেই সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে যারা কুফরী করেছে।'

এই হচ্ছে আল কোরআনের প্রচলিত পদ্ধতি ও বর্ণনাভংগি এবং এই হতভাগ্য জাতির ভূমিকা সম্পর্কে কোরআনের মধ্যে উল্লেখিত ব্যাখ্যা ও চূড়ান্ত ফয়সালা। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে খৃষ্টানদের মধ্য থেকে উল্লেখিত দুটি দলের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দেখানো হয়েছে, যারা বলেছে 'আমরা নাসারা এবং তারা সত্যের সংস্পর্শে এসে তার প্রভাব যথাযথভাবে গ্রহণ করে ঈমানের মহামূল্যবান নেয়ামত গ্রহণে ধন্য হয়েছে, ফলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্ত যে অবশ্যই তারা জান্নাতবাসী এবং তারা চিরদিন জান্নাতে থাকবে। অপর দলটি হচ্ছে তারা, যারা সত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কুফরীর পথ ধরেছে এবং সত্যকে প্রতিহত করার জন্যে সর্বপ্রকার জঘন্য অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। ফলে আল্লাহর সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

'আমরা নাসরা'– একথাটি 'তাদেরকে মোমেনদের সাথে মহব্বতের সম্পর্কের দিক দিয়ে বেশী কাছে পাবে' এই বাক্যের অংশ নয় বলে যারা দাবী করেছে, তারা ঠিক বলেনি, কারণ তারা বলতে চেষ্টা করে যে 'ইন্না নাসারা'– 'আমরা নাসারা' কথাটি দ্বারা তাদের নাসারা ধর্মে টিকে থাকার কথাই তো তারা বলে। সম্পূর্ণ আয়াতটি একই সাথে উচ্চারণ করে একটি পূর্ণাংগ অর্থ ব্যক্ত হবে তা নয়। তারাতো বলতে চায় যে, এ আয়াতটি একটি নির্দিষ্ট অবস্থা তুলে ধরেছে– না, কোরআনের আয়াত এইভাবে কোনো আয়াতকে অস্পষ্ট অবস্থায় ছেড়ে দেয়নি, তার সময় কালও অজানা নয় এবং তাঁর ভূমিকাও কোনো আধিক্য এবং কম হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে মহান আল্লাহ একটি বাক্য পূর্ণাংগ অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন।

অবশ্যই, এ আয়াতে ব্যক্ত 'নাসারা কারা' একথার অর্থ অন্যান্য আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। মোফাসসের কুরতুবী তাঁর তাফসীর 'আল কুরতুবী'তে উল্লেখ করেছেন যে এ আয়াতটি নাজ্জাশী ও তাঁর সংগী-সাথীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো, যখন মুসলমানরা প্রথম হিজরত করে তাদের

কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যাটি ইবনে ইসহাক রচিত বিখ্যাত সীরাতের কেতাব (সীরাতে ইবনে হিশাম)-এ উল্লেখিত কথার সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। মোশরেকদের (অত্যাচারের) ভয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। এর কিছু দিন পর রসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় হিজরত করেন এবং ওই মোশরেকরা তাঁকে ধরতে সক্ষম হয় না। তারপরই কিছু সময়ের ব্যবধানে মোশরেক ও রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা বদররের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে কোরায়শদের বড় বড় নেতা নিহত হলে কোরায়শের কাফেররা বললো, ওরা আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর কাছে আশ্রয় নিয়েছে, সুতরাং নাজ্জাশীর কাছে কিছু হাদিয়া (নজরানা) পাঠিয়ে ওদেরকে ফিরিয়ে আনা হোক। আর এ কাজের জন্যে বুদ্ধিমান দেখে দুইজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয়া হোক, যাতে করে ওই পলাতক মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে এনে তোমরা বদরের নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পার। অতপর এই পরামর্শের ভিত্তিতে কোরায়শরা আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ ইবন আবী রাবীয়াকে বেশ কিছু উপঢৌকনসহ নাজ্জাশীর কাছে পাঠালো। একথাটি শুনে রসূলুল্লাহ (স.) আমর ইবনে উমাইয়া আদ দামরীকে নাজ্জাশীর কাছে একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নাজ্জাশীর কাছে এসে চিঠিখানি পড়ে শোনালে। নাজ্জাশী মুসলমানদের মধ্য থেকে জা'ফর ইবনে আবু তালিব ও অন্যান্য কিছু মোহাজের মুসলমানকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আরো কিছু খৃষ্টান ধর্মযাজক ও ইনজীলের আলেমদেরও ডেকে সবাইকে একত্রিত করলেন। তারপর জাফরকে কোরআন পড়ে শোনাতে বললে তিনি সূরায়ে মারিয়াম পড়লেন। এতদশ্রবণে ভক্তিতে গদগদ হয়ে নাজ্জাশী উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তখন তাঁর দুই গন্ড বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিলো। এই হচ্ছে সেই সকল ব্যক্তি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'অ-লাতাজিদান্না আক্বারাবাহুম মাওলাদ্দাতান লিল্লাযীনা আমানুল্লাযীনা ক্বালূ, ইন্না নাসারা'.... পর্যন্ত তিনি অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন জাফর পড়লেন। সুনানে আবু দাউদ-এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণাংগ হাদীসটি বেশ দীর্ঘ, তার সামান্য একটি অংশমাত্র এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

বায়হাকী ইবনে ইসহাকের বর্ণিত কথাটি এই ভাবে পেশ করেছেন, নবী (স.)-এর নবুওতের খবর প্রকাশিত হলে তাঁর কাছে আবিসিনিয়া থেকে নাসারাদের বিশ জন প্রতিনিধি আগমন করে। এ সময়ে নবী (স.) মক্কায় মাসজিদে (কাবা শরীফে) উপবিষ্ট ছিলেন। সেখানেই তারা নবী (স.)-এর সাথে কথা বলে এবং কিছু প্রশ্ন করে। এ সময়ে কোরায়শদেরও কিছু লোক আশেপাশে দাঁড়িয়ে এই কথোপকথন শুনছিলো। কথা শেষে ওই প্রতিনিধিদল বিদায় নেয়ার সময় রসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কোরআনে পাক থেকে কিছু তেলাওয়াত করে শোনান। এই সমধুর বাণী শুনে তাদের চোখগুলো থেকে অশ্রুধারা জারি হয়ে যায়। এরপর তারা এ দাওয়াত কবুল করে, ঈমান আনে এবং নবী (স.)-এর সত্যতার সাক্ষ্য দেয় এবং তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, এতো সেই একই দাওয়াত যা তাদের কেতাব ইনজিলের মধ্যে তারা পেয়েছে। তারপর এই প্রতিনিধি দল যখন প্রত্যাবর্তনের জন্যে রওয়ানা হলো, তখন আবু জাহল কোরায়শদের একটি দলসহ তাদের কাছে এগিয়ে এসে বললো, ধিক তোমাদের, হে কাফেলার লোকেরা। তোমাদের লোকেরা তোমাদেরকে সুদূর আবিসিনিয়া থেকে একটি খবর জানার জন্যে পাঠিয়েছিলো আর তোমরা কিনা এসে নিজেদের 'দ্বীন' পরিত্যাগ করে এই নবাগত লোকটির কথামতো এমন একটি দ্বীন গ্রহণ করলে যা তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিলো। সে যা বললো, তোমরা তাই মেনে নিলে? ছি., তোমাদের মতো আহম্মক তো আর দেখিনি, অথবা এই ধরনের আরও কিছু কথা বললো। তখন তারা বললো, সালাম তোমাদেরকে, আমরা তোমাদেরকে জাহেল বলছি না, তবে আমাদের কাজের জন্যে আমরা দায়ী হবো, আর তোমাদের কাজের জন্যে

তোমরা দায়ী। আমাদের জন্যে এতে কোনো কল্যাণ যদি না থাকে, তো তাই হোক। অতপর বলা হয়েছে, নাসারাদের এ দলটি নাজরান থেকে আগত ছিলো, আবার এও কথিত আছে, ওদের সম্পর্কে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, 'অর্থাৎ এরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি যাদের কাছে ইতিপূর্বে যে কেতাব নাযিল হয়েছিলো সে কেতাবের প্রতি এরা বিশ্বাসী' এ আয়াতটি, 'লা নাবতাগিল জাহিলীন' পর্যন্ত বিস্তৃত।

আরও বলা হয়েছে, জাফর ও তাঁর সংগীরা যখন নবী (স.)-এর কাছে আসলেন, তখন তাঁর সংগীরা সর্বমোট সংখ্যায় ছিলো ৭০ জন। আর তারা পশমী বস্ত্র পরিহিত ছিলেন। এদের মধ্যে ৬২ জন ছিলেন আবিসিনিয়ার এবং ৮ জন ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। এরা হচ্ছেন পাদ্রী বাহীরা, ইদ্রীস, আশরাফ, আবরাহা, তামামা, কাসাম, দুরাইদ এবং আয়মন। অতপর তাদেরকে রসূলুল্লাহ সূরায়ে য়্যা-সীন শেষ পর্যন্ত পড়ে শোনালেন। তারা আল কোরআনের মহাবাণী যখন শুনছিলেন, তখন তাঁরা অনবরত কেঁদে চলেছিলেন। তারপর তাঁরা ঈমান আনলেন ও বলে উঠলেন, আহ ঈসা (আ.)-এর কাছে যা কিছু নাযিল হয়েছিলো তার সাথে এ পাক কালামের কথাগুলোর কী চমৎকার মিল! আর তখনই তাদের সম্পর্কে নাযিল হল ইন্না নাসারা– অর্থাৎ এরা ছিলেন নাজ্জাশীর প্রতিনিধি দল– আর ছিলেন নির্জন গৃহে ধ্যান মগ্ন দরবেশ দলের সদস্য। আর সাঈদ ইবন জোবায়র বলেন, তাদের সম্পর্কে আরও নাযিল হয়েছে, আল্লযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা মিন ক্বাবলিহী হুম বিহী ইউমিনূন।' ....আয়াতের শেষ পর্যন্ত। আর মুকাতিল কালবী বলেন, এরা ছিলেন নাজরানবাসী বনি হারস ইবন কাব-এর ৪০ জন ব্যক্তি, ৩২ জন আবিসিনিয়ার এবং সিরিয়ার ৬৪ জন। আবার কাতাদা বলেন, এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে যাদের সম্পর্কে তারা হচ্ছেন, আহলে কেতাবদের সেই সব লোক, যারা ঈসা (আ.)-এর আনীত হক দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর যখন মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) প্রেরিত হলেন, তখন তাঁরা (জানতে পেরে) সংগে সংগে ঈমান আনলেন, যার কারণে এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

আর এই ঘটনাটিই আমরা আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝেছি এবং বর্ণনা প্রসংগে নিজেও এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করেছি। আর যতো রেওয়ায়াত এখানে করা হয়েছে, সে সবগুলোও এ কথার সমর্থন দেয় এবং সূরার অবশিষ্ট অংশে আহলে কেতাবদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, সে সবের সাথে এগুলো পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। এ আহলে কেতাবরা হচ্ছে ইহুদী ও নাসারা। তাদের দ্বীন ও তাদের অনুসারীরা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, যাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ১৪ শত বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ জেনে এসেছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী খৃষ্টানদের যৌথ ষড়যন্ত্র

আলোচ্য সূরাটিতে ইহুদী ও নাসারা জাতির ইতিহাস সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে এবং এ সূরাটি তাদের রীতি নীতি, আচার অনুষ্ঠান লক্ষ্য ও কার্যকলাপের বিবরণ পেশ করেছে। আর অবশ্যই এ কথা সত্য যে আল্লাহর কালামের কোনো অংশ অপর কোনো অংশের সাথে সংঘর্ষশীল নয়। এ বিষয়ে আল কোরআনের ভাষ্য দেখুন,

'আর এ কেতাব যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, তাহলে তারা এর মধ্যে বহু মতভেদ দেখতে পেতো।'

আর অবশ্যই এ সূরাটির মধ্যে বহু আয়াত ও ভাষণ দ্বারা আলোচ্য বক্তব্যের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়, যার মধ্যে কয়েকটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি,

'হে ঈমানদাররা, ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না।' তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু, আর তোমাদের মধ্য থেকে তাদের-কউকে যে কেউ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই লোক বলে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যালেম জাতিকে সঠিক পথ দেখান না।'

'বলে দাও (হে রসূল) তাওরাত ও ইনঞ্জীল এবং অন্য যা কিছু তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, তা যদি বাস্তবে তোমরা প্রতিষ্ঠা না করো, তাহলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা) কোনো জিনিসের ওপরেই তোমরা নেই; আর (হে রসূল) যা কিছু তোমার রবের কাছ থেকে তোমার কাছে নাযিল হয়েছে, তা তাদের অহংকার (বা সীমালংঘনকর কাজ) এবং কুফরীই আরো বেশী বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং, কাফের জাতির বিষয়ে তুমি হতাশ হয়ো না।'

এমনি করে সূরায়ে বাকারাতেও এসেছে,

'ইহুদী ও নাসারারা কিছুতেই তোমার ওপর খুশী হবে না যতোক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করো। বলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা পথই হচ্ছে (আসলে) সঠিক পথ আর তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পর ওদের খোশ-খেয়ালের অনুসরণ যদি করো, তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত কোনো বন্ধু এবং সাহায্যকারী পাবে না।'

এমনি করে, মুসলমানদেরকে যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করেছেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও সাক্ষ্য দিয়েছে এবং বাস্তব ঘটনাবলী দ্বারা জানিয়েছে যে (মুসলমানের দুশমনীতে) ইহুদী ও নাসারারা একই প্রকারের কঠোর। আবার যেমন ঐতিহাসিক ও বাস্তব ঘটনার নিরিখে দেখা যায় যে, মদীনার ইহুদীদের কাছে সেই প্রথম যুগ থেকে নিয়ে ইসলাম পেশ করার পর থেকে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যে হীন চক্রান্ত করে আসছে, যা এক মুহূর্তের জন্যেও অদ্যাবধি থামেনি এবং পৃথিবীর সর্বত্র অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মুসলমানদেরকে তারা আক্রমণ করে আসছে, সেই একইভাবে নাসারারা বিভিন্ন সময়ে ক্রুসেডের যুদ্ধ চালিয়ে ইসলামের বাতিকে চিরদিনের জন্যে নিভিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের পর থেকে এই শক্রতা অবিরাম গতিতে চলে আসছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম সেই সব সত্যাশ্রয়ী নাসারা, যাদের সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এদের অন্তর ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলো, বিগলিত হয়েছিলো এদের হৃদয় ইসলামের সমুজ্জল আভায় এবং তারা সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলো। এর কারণ ছিলো এই যে, নাসারাদের কোনো কোনো দলের বে-ইনসাফী ও যুলুমে ক্লান্ত হয়ে যখন তারা ইসলামের সুবিচার দেখতে পেয়েছিলো, তখন স্বতর্স্ফূতভাবে ইসলামের এই সুশীতল ছায়াতলে তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। সাধারণভাবে নাসারাদের দুশমনীর যে তীব্র স্রোত রোমকদের সাথে ইয়ারমুকের জনাকীর্ণ ময়দানে যুদ্ধকালে শুরু হয়েছিলো, তার বহ্নি শিখা কখনই নিভে যায়নি এবং পরিশেষে তা রূপান্তরিত হয়েছে ক্রুসেড যুদ্ধে।

দীর্ঘ দুটি শতাব্দী ধরে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনা করে ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে। একইভাবে আন্দালুসিয়াতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ক্রুসেড যুদ্ধ চালানো হয়েছে। তারপর আক্রমণ চালানো হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও মানবতার প্রবক্তাদের পক্ষ থেকে প্রথমে আফ্রিকার ইসলামী দেশগুলোতে, তারপর সারা পৃথিবীতে।

এইভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বিশ্বজনীন চরমপন্থী যায়েনিষ্টরা ক্রুসেডওয়ালারা পরস্পর দোসর হিসাবে কাজ করেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোতে তারা সমান ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে ওয়াকেফহাল আল্লাহর ভাষ্যে জানা যায় যে, তারা পরস্পর সহযোগী ও বন্ধু হিসাবে কাজ করেছে। অবশেষে তুরস্কের শেষ খেলাফত ভিত্তিক রাষ্ট্র তারা ভেংগে দিতে সক্ষম হয়। এরপর তারা মুসলমানদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার কূটনৈতিক চাল চালিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করে। তারপর তাদেরকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিয়ে ইসলাম বা ধর্মীয় কর্মকান্ডকে নামাযের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

অতপর এই নাসারারাই প্রাচীন ইহুদীদের মতো একই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে মুসলমান ও পৌত্তলিক মোশরেকদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেয় আর অদ্যাবধি যেখানেই তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পেয়েছে, তাদেরকে সাহায্য করে চলেছে। এ সাহায্য কখনো সরাসরি করছে আর কখনো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে। এমনকি পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে কাশ্মীর প্রশ্নে যে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছে এবং দীর্ঘকাল যে বিরোধ চলে আসছে, তাতে এই নাসারাদের কূটনীতিই যে মুখ্য ভূমিকা রাখছে, তা মনে করা খুব দূরের বিষয় নয়।

আর এ শত্রুতা তখন থেকে শুরু হয়েছে যখন থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে, দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের পুনরুজ্জীবন হওয়াতে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন এসেছে, বাতিল ব্যবস্থার মধ্যে একদল লোকের অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতার জালে আবদ্ধ জীবন যখন মুক্তিলাভ করে ইসলামের সম্মোহনী পোশাক পরতে পেরে ধন্য হয়েছে এবং মানুষের ঘৃণিত জীবন সুন্দর জীবনে পরিণত হয়েছে, তখনই আহলে কেতাবদের উক্ত দুটি দল পর্যায়ক্রমে পুনরায় মানুষের জীবনকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

১৪ শত বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামের ওপর ইহুদী ও ক্রুসেডওয়ালাদের আক্রমণ এইভাবে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি এসেছে। এই দুই সম্প্রদায়ের লোকদের শত্রুতার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় নাই। এই দুই যুদ্ধবাজ পক্ষের মধ্য থেকে চক্রান্ত, ঘৃণা ছড়ানো ও পর্যায়ক্রমে কিছু দিন পরপর নিয়মিত আক্রমণ হতেই থেকেছে। এ সকল বিষয়েই লোকদের আজও যেমন সতর্ক থাকতে হবে, আগামী দিনও একইভাবে সতর্ক থাকতে হবে। সুতরাং তারা যেন কারো ধোকাবাজিপূর্ণ নরম কথায় গলে গিয়ে ওদের পিঞ্জরে আবদ্ধ না হয়ে যায় এবং তাদের সাথে আপোষ করে না বসে। আল কোরআন নাযিল হওয়ার সময়ও ঐ বাতিল পন্থীরা আপোষের ডাক দিয়েছে; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানরা তখন অন্যায় ও অসত্য পথের পথিকদের সাথে কখনও কোনো বিষয়ে আপোস করেনি; আজও কোনো আপোস করবে না। আল কোরআন হককে বাতিলের সাথে কোনো দিন আপোস করতে বলেনি এবং এ সূরাতেও যে কোনো প্রকার আপোস করতে নিষেধ করা হয়েছে। একবার এই সব হক বিরোধিদের সাথে কোনো আপোসে আসলে তারা মুসলমানদেরকে এমন ফাঁদে আবদ্ধ করে ফেলবে যার থেকে মুক্তি লাভ করা দুরূহ হয়ে যাবে এবং বিনষ্ট হয়ে যাবে মুসলমানদের মূল আকীদা বিশ্বাস।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান এই একতা ও সতর্কতা ভাবকেই ওই যুদ্ধবাজ শিবিরগুলো সব থেকে বেশী ভয় করে। কারণ সত্যাশ্রয়ী এই হুঁশিয়ার জনগোষ্ঠী ইসলামের ধারক ও বাহক হওয়ার কারণে তারা সবাই আল্লাহর রহমত প্রত্যাশী এবং এই কারণে তারা একতাবদ্ধ হতে ও থাকতে পারে। সংখ্যায় তারা যাই হোক না কেন, এই একতাই তাদের মধ্যে শক্তি জোগায়। সুতরাং যারা এই একতার শক্তিকে বৃদ্ধি করে, তারাই তাদের আকীদাকে মযবুতভাবে ধারণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু কেউ কেউ এই ধোকাবাজদের জালে আবদ্ধ হয়ে যায়, এর ফলে যে ক্ষতির সম্মুখীন তাদেরকে হতে হয়, তা অন্য কোনো ক্ষতি থেকে কোনো অংশে কম নয়, এই ধোকাগ্রস্ত ব্যক্তিরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়।

অবশ্যই এই কোরআন এর অনুসারীদেরকে সব থেকে মজবুত পথেই পরিচালিত করে, যার কোনো অংশ অপর কোনো অংশকে নাকচ করে না, সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমাদের আল কোরআন অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

পরবর্তী অধ্যায়ে ৮৭ থেকে ১০৮ পর্যন্ত আয়াতগুলোর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص
وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ
اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ج فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط
وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

৮৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করে দিয়েছেন, তোমরা সেগুলো (নিজেদের জন্যে) হারাম করে নিয়ো না, আর কখনো (হারামের) সীমা লংঘন করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের অপছন্দ করেন। ৮৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রেযেক দান করেছেন তোমরা তা খাও এবং (এ ব্যাপারে) সে আল্লাহ তায়ালা (-র সীমারেখা)-কে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো। ৮৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যে শপথ তোমরা জেনে-বুঝে করো তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন এবং তার কাফফারা হচ্ছে দশ জন গরীব মেসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো, যা তোমরা (সচরাচর) নিজেদের পরিবার পরিজনদের খাইয়ে থাকো, কিংবা দশ জন মেসকীনকে পোশাক দান করা, অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়া; যে ব্যক্তি (এর কোনোটাই) পাবে না, তার জন্যে (কাফফারা হচ্ছে) তিন দিন রোযা (রাখা); শপথ ভাঙলে তোমাদের (শপথ ভাংগার) এ হচ্ছে কাফফারা; (অতএব) তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো। ৯০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (তোমরা জেনে রেখো), মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা (সম্পূর্ণরূপে) বর্জন করো।

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (৯১)
وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا أَنَّمَا
عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (৯২) لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّأَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (৯৩) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ أَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ
اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (৯৪)

রুকু ১২

৯১. শয়তান এই মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে চায় এবং এভাবে (এ চক্করে ফেলে) সে তোমাদের আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তোমরা কি (এ কাজ থেকে) ফিরে আসবে না? ৯২. তোমরা (সর্ববিষয়ে) আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, (মদ ও জুয়ার ব্যাপারে) সতর্ক থেকো, আর তোমরা যদি (রসূলের নির্দেশনা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, আমার রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে (আমার কথাগুলো) পৌঁছে দেয়া। ৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) তারা যা কিছু খেয়েছে তার জন্যে তাদের ওপর কোনোই গুনাহ নেই, (হাঁ, ভবিষ্যতে) যদি তারা সাবধান থাকে, (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার নিষেধ থেকে) তারা সতর্ক থাকে, (একইভাবে যতোক্ষণ পর্যন্ত) তারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে ও সততার নীতি অবলম্বন করতে থাকবে (আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দেবেন, কেননা); আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

রুকু ১৩

৯৪. হে ঈমানদার লোকেরা, (এহরাম বাঁধা অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এমন কিছু শিকারের বস্তু দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেবেন, যেগুলো তোমরা সহজেই নিজেদের হাত ও বর্শা দ্বারা ধরতে পারো (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), যেন আল্লাহ তায়ালা এ কথা ভালো করে জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখে ভয় করে, সুতরাং এর পরও যদি কেউ সীমালংঘন করে, তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ
مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا
بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ
اَمْرِهٖ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ع
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ، ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ

৯৫. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় কখনো শিকার হত্যা করো না, যদি তোমাদের কেউ (এ অবস্থায়) জেনে-বুঝে কোনো শিকারী (জন্তু) হত্যা করে (তার জন্যে এর বিনিময় হচ্ছে), সে যে জন্তু হত্যা করেছে তার সমান পর্যায়ের একটি গৃহপালিত জন্তু কোরবানী হিসেবে কাবায় পৌঁছে দেবে, (যার) ফয়সালা করবে তোমাদের দু'জন ন্যায়বান বিচারক ব্যক্তি, কিংবা (তার জন্যে) কাফফারা হবে (কয়েকজন) গরীব -মেসকীনকে খাওয়ানো অথবা সমপরিমাণ রোযা রাখা, যাতে করে সে আপন কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) যা কিছু গত হয়ে গেছে আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দিয়েছেন; কিন্তু (এর পর) যদি কেউ (এর) পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন; আর আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল শক্তিমান। ৯৬. তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে এবং তার খাবার হচ্ছে তোমাদের জন্যে ও (সমুদ্রের) পর্যটকদের জন্যে (উৎকৃষ্ট) সম্পদ, (মনে রাখবে), যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (শুধু) স্থলভাগের শিকারই তোমাদের জন্যে হারাম থাকবে; তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যাঁর সমীপে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে। ৯৭. আল্লাহ তায়ালা (খানায়ে) কাবাকে সম্মানিত করেছেন মানব জাতির জন্যে ভিত্তি হিসেবে, একইভাবে তিনি সম্মানিত করেছেন (হজ্জের) পবিত্র মাসগুলোকে, কোরবানীর জন্তুগুলোকে এবং (এ উদ্দেশে বিশেষ) পট্টি বাঁধা জন্তুগুলোকে, এসব (বিধান) এ জন্যেই (দেয়া হয়েছে) যাতে করে তোমরা (এ কথা) জেনে নিতে পারো যে, আকাশমালা ও পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৯৮. তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ

اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا
الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ
وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ
لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا
اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا
بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ
وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে (যেমনি) কঠোর, (তেমনি পুরস্কারের বেলায়) আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৯৯. রসূলের দায়িত্ব (হেদায়াতের বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো, যা কিছু গোপন রাখো, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন। ১০০. (হে রসূল,) তুমি বলো, পাক এবং নাপাক জিনিস কখনো সমান হতে পারে না, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতোই তোমাকে চমৎকৃত করুক না কেন! অতএব হে জ্ঞানবান মানুষেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, (আশা করা যায়) তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

রুকু ১৪

১০১. হে ঈমানদার লোকেরা, (আল্লাহর নবীর কাছে) এমন সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করো না, যার জবাব প্রকাশ করা হলে (তাতে) তোমাদেরই কষ্ট হবে, অবশ্য কোরআন নাযিল হবার মুহূর্তে যদি তোমরা সে প্রশ্ন করো, তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে; (এ বিধান জারির) আগে যা কিছু হয়ে গেছে তা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন: কেননা আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল। ১০২. তোমাদের আগেও কিছু সম্প্রদায় (তাদের নবীকে এ ধরনের) প্রশ্ন করতো, কিন্তু এর পরক্ষণেই তারা তা অমান্য করতে শুরু করলো। ১০৩. দেবতার উদ্দেশে প্রেরিত (কান ছেঁচড়া) 'বহীরা', (দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত) 'সায়েবা', (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারী) 'ওয়াসীলা' ও (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া দশ বাচ্চা প্রসবকারিণী উষ্ট্রী) 'হাম'- এর কোনোটাই কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট করে দেননি, বরং কাফেররাই (এসব কুসংস্কার দিয়ে) আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, আর এদের অধিকাংশ লোক তো (সত্য-মিথ্যার তফাৎটুকুও) উপলব্ধি করে না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا
مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا

১০৪. যখন এদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা সেদিকে এসো, (এসো তাঁর) রসূলের দিকে, (তখন) তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যে বিধানের ওপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট; যদিও তাদের বাপ-দাদারা (সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে) কিছুই জানতো না এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও ছিলো না। ১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের ওপর, অন্য (কোনো) ব্যক্তি যদি গোমরাহ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা সঠিক পথের ওপর চলতে থাকবে; তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (সেদিন) বলে দেবেন তোমরা কে কী করছিলে! ১০৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের কারো যখন মৃত্যু (সময়) এসে উপনীত হয়, অসিয়ত করার এ মুহূর্তে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মানুষকে সাক্ষী বানিয়ে রাখবে, আর যদি তোমরা প্রবাসে থাকো এবং এ সময় যদি তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তখন বাইরের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নেবে; (পরে যদি এ ব্যাপারে) তোমাদের কোনো সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে (সাক্ষী) দু'জনকে নামাযের পর আটকে রাখবে, অতপর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা কোনো স্বার্থের খাতিরে এ সাক্ষ্য বিক্রি করবো না, (এর কোনো পক্ষ আমাদের) ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও (নয়), আমরা আল্লাহর (জন্যে এ) সাক্ষ্য গোপন করবো না, (কেননা) আমরা যদি তেমন কিছু করি তাহলে আমরা গুনাহগারদের দলে শামিল হয়ে যাবো। ১০৭. পরে যদি একথা প্রকাশ

إِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ز اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ
الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠٧ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ
تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝١٠٨

পায়, এ (বাইরের) দু'জন সাক্ষী অপরাধে লিপ্ত ছিলো, তাহলে আগে (যাদের) স্বার্থহানি ঘটেছিলো তাদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, তারা (এসে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা বেশী সত্যভিত্তিক (হবে), আমরা (সাক্ষ্যের ব্যাপারে) সীমালংঘন করিনি (আমরা যদি তেমনটি করি), তাহলে আমরা যালেমদের দলভুক্ত হয়ে পড়বো। ১০৮. এ (পদ্ধতি)-তে (মানুষদের) ঠিকমতো সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনা আছে, অথবা তারা অন্ততপক্ষে এ ভয় করবে যে, তাদের কসম করার পর আবার অন্য কোনো কসম দ্বারা তা বাতিল করে দেয়া হবে; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (রসূলের কথা) শোনো; আল্লাহ তায়ালা কখনো পাপী লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

তাফসীর

আয়াত ৮৭-১০৮

আলোচ্য এ অধ্যায়টিতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামের বেশ কিছু বিধান পেশ করা হয়েছে। বিষয়গুলো বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তা একটি মূলনীতি বা দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে দর্শন হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁর যাবতীয় আইন-কানুন মানা ও তা চালু করা। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হারাম হালাল বিধানদাতা। তিনিই অবৈধ করেন এবং কোনো কিছুকে তিনিই বৈধ করেন। আবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা বা নির্দেশ দান একমাত্র তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই ইসলাম ছোট-বড় সকল সমস্যার সমাধান দেয়। অতএব, এক কথায় বলতে গেলে মানব জীবনের যাবতীয় বিষয়গুলোকে এই মূলনীতির ওপর চালু করতে হবে– ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা কোনো সরকারের মনগড়া কোনো নীতি অনুসারে নয়।

শরীয়তের বিধানের ওপর যে কোনো আলোচনা হবে সেখানে একথাটি সর্বদা মনে রাখতে হবে, অর্থাৎ সব কিছুর মূলে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে হবে। এ অধিকার আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কারো নয়। অন্য কারো সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার অর্থ হবে আল্লাহর ওপর খোদকারী এবং তাঁর ক্ষমতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। এই ভাবে যারা সীমা লংঘন করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই ভালোবাসেন না এবং কিছুতেই পছন্দ করেন না। এই সার্বভৌমত্বের কোনো একটি অংশও যদি মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, অভ্যাস ও রীতি নীতির কারণে লংঘিত হয়, তাহলে তার এ কাজগুলোকে বাতিলের সাথে আপোষ করে আল্লাহর ক্ষমতা ভাগাভাগির শামিল বলে গণ্য

হবে যেহেতু এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের কাছে পরিষ্কার বিধান নাযিল করেছেন। আর এই ভাগাভাগি করতে গিয়ে সে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং দ্বীন ইসলামের মধ্যে তার অবস্থানকে স্বীকার করা হবে না। এই কারণেই দেখুন প্রতিটি বাক্য শুরু করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা মোমেনকে একই ভাবে সম্বোধন করে বলছেন,

'হে ঈমানদাররা'। হে ঈমানদাররা, যে সব জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা হালাল করেছেন, সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না এবং সাবধান এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না।'

'হে ঈমানদাররা, নিশ্চয় জেনে রেখো, মাদক দ্রব্য, জুয়া, দেব-দেবীর বেদীতে উৎসর্গী করা কোনো বস্তু বা জীব-জানোয়ার এবং তীর নিক্ষেপ দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ এসব কিছু অপবিত্র এবং শয়তানী কাজ। অতএব এসব থেকে দূরে থাকো।'

'হে ঈমানদাররা, তোমাদের হাত ও তীর দ্বারা যে সব পশু পাখি তোমরা শিকার করো, সেগুলো দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন, যাতে করে তিনি সেই সকল ব্যক্তিকে জেনে নেন (এবং পরখ করে নেন) যারা না দেখে আল্লাহর অস্তিত্বে এবং অন্যান্য অদেখা জিনিসে বিশ্বাসী।'

'হে ঈমানদাররা, এমন সব জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করো, না যে বিষয়গুলো তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দিলে তোমাদের কাছে খারাপ লাগবে।'

'হে ঈমানদাররা, নিজেদের যাবতীয় আচার আচরণের ব্যাপারে সাবধান থেকো। তোমরা নিজেরা যদি সঠিক পথে থাক, তাহলে কে ভুল পথে চললো বা না চললো তাতে তোমাদের কিছু আসে যায় না।'

'হে ঈমানদাররা, তোমাদের কেউ যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর যদি কিছু ওসীয়ত করতে চায়, তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে ভারসাম্যপূর্ণ (যাদের মধ্যে ঈমান-ইনসাফ আছে এ রকম) দুইজন ব্যক্তিকে যেন সাক্ষী রাখা হয়। আর তোমাদের নিজেদের লোক যদি একান্তই কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে অন্য (ধর্মের) কাউকেও সাক্ষী রাখা যায়।'

আর বিভিন্ন প্রসংগে এইভাবে ডাকের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যে শরয়ী বিধানগুলো দিয়েছেন, সেসব কিছুর মধ্য দিয়ে আল্লাহরই সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর প্রতি ঈমানের কথাগুলো প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে এই দ্বীন ইসলামের যৌক্তিকতার কথা। ঈমানের নামে নামানিত করে যখন কাউকে ডাকা হয়, তখন সে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী তা অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র শাসনকর্তা এ কথারও স্বীকৃতি এসে যায়। আসলে ঈমানের নামে ডেকে একজন মোমেনকে যেমন ঈমানের পথে দৃঢ়তা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করা হয়, তেমনি ঈমানের মূলনীতিগুলোকে গ্রহণ করার ব্যাপারেও তাকে উৎসাহিত করা হয়– এ প্রসংগে এ কথাটিই বলতে চাওয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য সম্পর্কেও একথাগুলোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলতে চাওয়া হয়েছে, সতর্ক করা হয়েছে যেন শরীয়তের কোনো বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেওয়া হয় বা অমান্য না করা হয় এবং আল্লাহর কঠিন শাস্তি ও তাঁর অনুগতদের জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের লোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।

এরপর দেখানো হয়েছে ঈমানদাররা ও তাদের পথ থেকে সরে যাওয়া লোকদের মধ্যে বিরাজমান মৌলিক পার্থক্য। আরও দেখানো হয়েছে, আল্লাহর বিধানের মধ্যে ছোট বড় যে কোনো বিষয় পরিত্যাগ করার করুণ পরিণতি এবং আল্লাহর হক ও তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব

স্বীকারের ফায়দা। তাই পুনরায় আল্লাহর এরশাদের কথা উল্লেখ করে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্যের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকো ও নিজেদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করো। তোমরা যদি হেদায়াতের পথে চলো, সঠিক পথ গ্রহণ কর এবং আল্লাহর না-ফরমানীর কাজ ও আচরণগুলো পরিহার কর, তাহলে অন্যরা ভুল পথে চললেও তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তোমাদের সবকেই তো আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে সেই সব বিষয়ে অবহিত করবেন, যা তোমরা পৃথিবীর বুকে করতে থেকেছো।

গোটা মুসলিম জাতি তো একটি মাত্র দল, যেহেতু তাদের কাছে রয়েছে তাদের একই জীবন ব্যবস্থা, জীবনে চলার একটি মাত্র পথ, একটিই আইন ব্যবস্থা। আর শরীয়তের উৎস হচ্ছে সেই মহাশক্তি যিনি ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভুল ব্যবস্থা পাওয়ার জন্যে নির্ভর করা যায় না। আর, অন্য জাতির কাছে যখন এই শরয়ী বিধানের সত্যতা ও যৌক্তিকতা প্রকাশিত হয়ে যায়, তখন এ মুসলিম জাতি অন্যান্য কোনো ভুল পন্থা যেন গ্রহণ না করে বা তার ওপর চলতে রাযি না হয়। তাদের জানা দরকার যে, পরপর সব কিছু আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে।

এই হচ্ছে সেই মূল খুঁটি যাকে কেন্দ্র করে এই অধ্যায়ের সকল বিষয় আবর্তিত হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে ওপরে আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলো আলোচনা করতে চাই।

বৈরাগ্যবাদ নয় ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধানই কাম্য

‘হে ঈমানদাররা, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু হালাল করেছেন, সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না এবং .... বে-খেয়ালীর সাথে তোমরা যে সব কসম খাও, সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, বরং বুঝে-শুনে এবং গুরুত্ব সহকারে যে সব কসম খাও, সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে ধরবেন। অতপর ওইসব কসম ভংগ করলে তার কাফফারা .... আর তোমাদের কসমগুলোকে (যথাসাধ্য) পূরণ করবে। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলোকে তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বয়ান করছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।’

‘হে ঈমানদার’ বলে ডাক দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিধান জানাচ্ছেন যে, তোমাদের এই কসম ভংগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান তোমাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করো না, কারণ তোমরা তো মানুষ– আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিস, যা তাঁর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। অতএব, পবিত্র যে সব জিনিস তিনি তোমাদের জন্যে হালাল বলে জানিয়েছেন, সেগুলোকে হারাম করা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবন ধারণ সামগ্রীর মধ্য থেকে যে সব জিনিসকে হালাল করেছেন, সেগুলোকে নিজেরা হারাম করে নিয়ো না। আবার সেগুলোকে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা মতে ভোগ করবে– তাও করো না, আল্লাহ তায়ালাই এগুলোকে তোমাদের জন্যে হালাল ও পবিত্র করে দিয়েছেন আর একমাত্র তিনিই কোনো জিনিসকে হালাল আর কোনো জিনিসকে হারাম বানানোর অধিকারী (অর্থাৎ তিনিই বলতে পারেন, এটা হারাম এবং এটা হালাল)। তাই তাঁর হুকুম, ‘হে ঈমানদাররা, পবিত্র যে সব জিনিস আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম করে নিয়ো না, আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর খাও সে সব কিছু থেকে যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে হালাল ও পবিত্র হিসাবে তোমাদেরকে দান করেছেন এবং ভয় করো আল্লাহকে– যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

আইন প্রণয়ন সামগ্রিকভাবে সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তায়ালারই অধিকার। মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও জীবন ধারণের যাবতীয় সামগ্রীর সরবরাহকারী মালিক হিসাবে মানুষের জীবনের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা তাঁরই অধিকার ও এখতিয়ারভুক্ত। তিনিই একমাত্র তাঁর বান্দার জন্যে হালাল হারাম বিধানকারী এবং তিনিই যা ইচ্ছা হালাল করেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করার অধিকারী। মানুষ নিজেও এই যুক্তিটি স্বীকার করে। অতএব, এটা সত্য, যিনি রাজ্যের মালিক, তিনিই একমাত্র সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী। আর এই সাধারণ যুক্তি যে মানতে চায় না, সে অবশ্যই সীমালংঘনকারী। আর, স্বভাবতই ঈমানদাররা আল্লাহর ওপর এইভাবে সীমালংঘন করে না, যেহেতু তাঁর ওপর ওরা বিশ্বাসী। আর এটাও সত্য কথা, একই অন্তরে ঈমান ও আল্লাহর ওপর মত খাটানোর প্রবণতা এক সাথে বাস করতে পারে না।

এই বিষয়টিকে আলোচ্য আয়াত দুটি যুক্তি সহকারে বিস্তারিত ভাবে পেশ করছে, যা একমাত্র সীমা লংঘনকারী কোনো ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ অমান্য করতে পারে না। তাই, বলা হয়েছে,

'তিনি সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

বান্দার ওপর সর্বশক্তিমান আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত সাধারণ এ বিষয়টিকে একটি সাধারণ মূলনীতি হিসাবে এখানে পেশ করা হয়েছে। এটা আল্লাহর ওপর ঈমানের দাবীর সাথেও সম্পর্কযুক্ত, যা মোমেনদের গুণ হিসাবে এখানে বিবৃত হয়েছে। এই কথাটিই কোনো কোনো হাদীসে, এ আয়াত দুটিতে এবং পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে, বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানায় মোমেনদের এক বিশেষ গুণ হিসাবে এই ঈমানের কথাটি পেশ করা হয়েছে। কিন্তু, শিক্ষা নিতে হবে সাধারণভাবে আল কোরআনের আয়াত থেকে, কোনো বিশেষ যুক্তি বা প্রসংগ থেকে নয়, যদিও বিশেষ কোনো ঘটনা অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়তা করে।

ইবনে জারীর রেওয়ায়াত করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ বসে লোকদেরকে কিছু উপদেশ দিচ্ছিলেন। তারপর তিনি উঠে এক দিকে চলে গেলেন। এতে সাহাবারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তখন তারা কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, কিছু কিছু জিনিস নিজের থেকে আমল করার অধিকার কি আমাদের নাই! নাসারারা তো কিছু জিনিস নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছে। এসো না, আমরাও নিজেদের ওপর কিছু জিনিস হারাম করে নেই। এরপর, তাদের মধ্যে কেউ গোশত খাওয়া নিজের ওপর হারাম করে নিলো। কেউ রানের গোশত খাওয়া বন্ধ করলো, কেউ দিনে খাওয়া এবং আর কেউ স্ত্রীদেরকে নিজের ওপর হারাম করে নিল। এ ব্যাপারটি রসূল (স.)-এর কানে গেলে তিনি বলে উঠলেন, কি হলো এসব লোকের, যারা নারী সংস্পর্শ, খাদ্য ও ঘুমকে নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছে? শোনো, আমি তো ঘুমাই, রাত্রি জেগে নামায পড়ির কখনও রোযা ভাংগি, আবার কখনও (নফল) রোযা রাখি এবং স্ত্রীলোকদের বিয়েও করি এই তো নবী হিসাবে আমার সুন্নত (প্রদর্শিত নিয়ম)। অতপর যে আমার এ নিয়ম ভংগ করবে সে আমার দলভুক্ত (উম্মত) নয়। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হলো,

'হে ঈমানদাররা এনেছ, আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, সেগুলোকে তোমরা নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়ো না, আর (এইভাবে) সীমা লংঘন করো না।'

আনাস (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীরও এই হাদীসটির সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। বলেছেন,

'একদিন তিনজন ব্যক্তি, রসূলুল্লাহ (স.) কিভাবে এবাদত করেন তা জানার জন্যে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর বাড়ীগুলোতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। বাড়ীগুলো থেকে তাঁর এবাদতের বর্ণনা দেয়া হলে ওই সাহাবাদের কাছে তা খুবই কম মনে হল। তারা বলে উঠলেন, তাহলে আমরা রসূলুল্লাহ

(স.)-এর থেকে কিসে কম হলাম? অথচ তাঁর তো পূর্বাপর সব গুনাহ-খাতা মাফ করে দেয়া হয়েছে! (এরপর) ওদের একজন বললো, আমি ঠিক করেছি, এখন থেকে আমি সারা রাত জেগে নামায পড়তে থাকবো। আর একজন বললো, আমি এখন থেকে সারা বছর রোযা রাখতে থাকবো, আর কখনও রোযা ভাংগবো না, রোযা রাখা ছাড়বো না। অপর জন বললো, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন থেকে আমি বরাবর স্ত্রীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবো কখনও আর তাদের সংস্পর্শে যাবো না এবং বিয়েও করবো না।' এরপর রসূলুল্লাহ তাদের কাছে এসে বললেন, 'তোমরাইকি একথাগুলো বলছিলে! শোনো, তোমাদের মধ্যে আমিই সব থেকে আল্লাহভীরু এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে আমিই সব থেকে বেশী বাছ বিচার করে চলি, এতদসত্তেও আমি যেমন (নফল) রোযা রাখি, রোযা রাখা ছেড়েও দেই; কখনো রাত জেগে (নফল) নামায পড়ি, আবার কখনও ঘুমিয়েও থাকি এবং স্ত্রীলোকদের বিয়েও করি (এটিই আমার প্রদর্শিত সুন্নত)। অতএব, আমার এই পদ্ধতি থেকে যে দূরে সরে যাবে, সে আমার লোক (বা উম্মত) নয়।

তিরমিযীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স.)-এর কাছে এসে বললো, 'আমি গোশত খেলে নারী ভোগের জন্যে উন্মত্ত হয়ে পড়ি, আমার উত্তেজনা খুবই বেড়ে যায়, এজন্যে নিজের ওপর আমি গোশতকে হারাম করে নিয়েছি।' তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'হে ঈমানদাররা, আল্লাহ তায়ালা যে সব পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, তা তোমরা নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়ো না'– আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

এর পরের আয়াতটি হলফ ও ঈমান সম্পর্কিত। পরবর্তী আরও কিছু আয়াত এ প্রসংগে উদ্ধৃত হলো,

আল্লাহ তায়ালা হেলায় ও খেলায় করা তোমাদের কসম সম্পর্কে তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না ... এমনি করে তিনি তাঁর আয়াতগুলোকে সাফ সাফ করে বর্ণনা করছেন যেন তোমরা শোকরগোযারি করতে পারো।

সুতরাং বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত ঘটনাও এই রকম আরও কিছু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো। বর্তমান যে ঘটনার ওপর আয়াতটি এসেছে তা হচ্ছে, উপরোক্ত ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের ওপর কিছু হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়ার হলফ (কসম) করেছিলো। অতপর রসূলুল্লাহ (স.) তাদের এই নিষিদ্ধকরণ-এর হলফটি নাকচ করে দিলেন এবং কোরআনে কারীমও ওই লোকদের হালাল হারাম সম্পর্কিত পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত বাতিল বলে ঘোষণা করলো। তাদেরকে জানানো হলো যে, এধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তাদের নেই। বরং এটা হচ্ছে, অর্থাৎ মোমেনদের জন্যে হালাল হারামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহর। এখন এসব সিদ্ধান্ত কোনো কল্যাণের চিন্তা করেই হোক বা অকল্যাণের চিন্তা করে হোক। সুতরাং, প্রত্যেক কসমের ব্যাপারে একজন মোমেনকে চিন্তা করতে হবে যে, এটা পূরণ করার মতো কিনা, যদি ওই কসম আল্লাহর হুকুম বিরোধী অথবা অকল্যাণকর হয়, তাহলে তা ভেংগে ফেলে কাফফারা আদায় করতে হবে, যা ওপরে বর্ণিত আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রওয়ায়েত পেশ করা হলো,

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতটি ওই সব ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কিছু কিছু খাদ্য, খাবার, পোশাক এবং নিজেদের জন্যে বিয়ে-শাদীকে হারাম করে নিয়েছিলো। এই

লক্ষ্যে তারা হলফও করেছিলো। তারপর যখন এসব হলফ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হলো, তখন ওরা বললো, আমরা আমাদের হলফ করার সমস্যার কি সমাধান করবো?' যার কারণে এ আয়াত নাযিল হলো।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বে-খেয়ালীতে অথবা হেলায় ও খেলায় করা হলফের জন্যে পাকড়াও করবেন না, বরং তিনি তোমাদেরকে ওই হলফের জন্যে পাকড়াও করবেন যা তোমরা বুঝে-সুঝে এবং ...... এমনি করেই তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন যেন তোমরা শোকরগোযারি করতে পারো।'

উপরোক্ত নির্দেশের মধ্যে অবশ্য একথা রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হেলা ভরে কোনো কসম খাওয়ার কারণে পাকড়াও করবেন না।

'সুতরাং দশ জন মেসকীনকে সেই ধরনের মধ্যম খানা খাওয়ানো, অথবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দেয়া অথবা গোলাম (বা বন্দী) আযাদ করা; আর যে (আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে) এগুলোর কোনোটিও পারবে না, সে তিনটি রোযা রাখবে- এটিই তোমাদের হলফ ভাংগার কাফফারা।'

দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের সেই খাবার খাওয়ানো যা হলফকারী নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাওয়ায়। এখানে মধ্যম ধরনের খাবার খাওয়ানোর অর্থ দুটিই হতে পারে! উত্তম খাবার অথবা 'মধ্যম ধরনের' খাবার। এখানে উচ্চারিত শব্দের মধ্যে দুটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। এ দুটি অর্থ ব্যবহার করলে 'মধ্যম ধরনের' কথার ব্যতিক্রম হয় না। এতে বরং ভালো খাবার অর্থটিই বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয় যেহেতু ইসলামে মধ্যম পথকেই উত্তম পথ মনে করা হয়। অথবা পরিধেয় বস্ত্র দিতে হবে বলায় উত্তম বস্ত্রই বেশী বুঝায়। অথবা গোলাম (বা বন্দী) মুক্ত করার কথায় আল কোরআন ওই বন্দী সম্পর্কে 'মোমেন' হওয়ার শর্ত লাগানো নাই। আর এরপর বলা হয়েছে, এগুলোর কোনো একটি করতেও যদি হলফকারী সক্ষম না হয়, তাহলে তিন দিনের রোযা ওই হলফকারীর হলফ ভংগ করার কাফফারা হিসাবে কবুল করা হবে। এখন তিন দিন একাদিক্রমে রাখতে হবে, না যে কোনো সময়ান্তরে রাখা যাবে আল কোরআন তা পরিষ্কারভাবে বলে না দেয়ায় উভয় নিয়মেই এ হুকুম পালন করা যাবে বলে বুঝায়। তবে, এ দুটি অর্থের মধ্যে কোন্‌টি বেশী গ্রহণযোগ্য এই 'ফী যিলালিল কোরআন' সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করতে চায় না। এটা ফেকাহ কেতাবের আলোচ্য বিষয় হতে পারে, যেহেতু কাফফারা আদায় করা প্রয়োজন, তা যেভাবেই হোক না কেন। এক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখা প্রশ্ন তোলা অবান্তর বৈ কি! আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে, তা যে কোনোভাবে পালন করলেই হলো। এতে একটু ত্রুটি বিচ্যুতি হলে হালাল হারামের পার্থক্যের মতো বড় কোনো পার্থক্য হবে না বা ওই বিধান অমান্যকারীর মতো বড় কোনো গুনাহের ভাগীও হতে হবে না।

এরপর আসুন, আমরা আসল বক্তব্যের দিকে ফিরে যাই, যা এ প্রসংগে আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে 'বিশেষ যে কথাটি' বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু হালাল করেছেন তা সবই পবিত্র, আর যা কিছু হারাম করেছেন, তা অবশ্যই অপবিত্র, ঘৃণ্য ও ক্ষতিকর জিনিস। সুতরাং, আল্লাহ তায়ালা যেসব জিনিসকে ভাল মনে করেননি, কোনো মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করা দুটি কারণে ভালো হতে পারে না। এক, হালাল হারাম বিধান দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর যিনি রেযেকদাতা- এ ক্ষমতা তাঁরই বৈশিষ্ট। এটা অমান্য করার অর্থই হচ্ছে

মালিকের সাথে বাড়াবাড়ি বা বিদ্রোহ করা, যা আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই পছন্দ করেন না এবং এই ধরনের আচরণে কখনোই ঈমান মযবুত হতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র (বা উপকারী) জিনিসগুলোকেই হালাল করেছেন, সুতরাং কেউ যেন এসব পবিত্র জিনিসকে নিজের জন্যে হারাম না করে নেয়। কারণ এগুলোর মাধ্যমে মোমেন দুনিয়াতে আরাম ও কল্যাণ লাভ করবে। মানব কল্যাণে নিয়োজিত জিনিসগুলোকে মহা বিজ্ঞানময় ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা যিনি পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল করেছেন, তিনি সেগুলোকে জানেন, মানুষের চোখ সে যেভাবে সবগুলোকে দেখতে সক্ষম নয়। সেগুলোকে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর বা অকল্যাণকর জানলে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই সেগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন এবং তাঁর বান্দাদের তিনি ওইসব ক্ষতিকর জিনিস থেকে বাঁচিয়ে নিতেন, এমনকি হারাম জিনিসগুলো যদি আংশিকভাবেও উপকারী হতো, তবু আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে হালাল করতেন না।

অবশ্য অবশ্যই এ'দ্বীন' সার্বিক কল্যাণ ও সংশোধনের জন্যেই এসেছে, এসেছে মানব জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে, পরিপূর্ণভাবে কল্যাণ দিতে; জীবনের কোনো বিশেষ বিভাগের জন্যে শুধু নয়, গোটা জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যেই এই কল্যাণ কাম্য। আর আল্লাহর খেয়াল থেকে মানুষের জীবনের কোনো দিকই বাদ পড়ে থাকে না আর না সব কিছু দেখতে, জানতে, বুঝতে এবং তার সমাধান দিতে তিনি অক্ষম। সর্বাধিক কল্যাণ থেকে মানুষ দূরে থাকুক, তাও তিনি চান না, আর এই জন্যেই তো কেউ সংসার বিরাগী হয়ে আত্মনির্যাতন করুক, তা কিছুতেই তিনি চান না আর এই জন্যেই তো তিনি এই সন্যাস ব্রত গ্রহণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ এর অর্থ হচ্ছে জীবন সংগ্রামের কাছে পরাজয় স্বীকার করে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করা, নিজ শক্তিকে আবদ্ধ করে ফেলা আর যে জীবনের উন্নতি, কল্যাণ ও সংস্কার তিনি চান, সেই কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করা। আল্লাহ তায়ালা এজীবনকে ক্রমোন্নতির পথে চালিত করতে চেয়েছেন ও নিত্য নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে জীবনকে পূর্ণত্ব দান করতে চেয়েছেন, যাতে করে তারা আল্লাহর পথে চলে তাঁর নেয়ামতসমূহ লাভে ধন্য হয়। আর বৈরাগ্য ও পবিত্র এবং উপকারী দ্রব্যটি বর্জন দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের সাথে সংঘর্ষই বাধানো হয়। আল্লাহ প্রদত্ত এ জীবনে, পতন ও উত্থান অংগাংগিভাবে জড়িত এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে জীবন যাপন পদ্ধতি শিখিয়েছেন তার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল।

আর এরপরও বিশেষ কোনো একটি কারণ আল কোরআনের বিধানকে সংকুচিত করে দিতে পারে না। আর, ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ এই নিয়ম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর আইনের সাথে ওৎপ্রোতোভাবে জড়িত। এ এমন একটি বিষয়, যা খাদ্য পানীয় ও বিয়ে শাদীর বিধানকে কোনোভাবেই কাট-ছাঁট করে না। এ হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এক সঠিক ব্যবস্থা, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

আর আমরা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এই বিশেষ অর্থটিকে বারবার উল্লেখ করছি এবং গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ জীবনকে ইসলামী ব্যবস্থা মতে পরিচালনার ধারা বহু দিন থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং শাসন ক্ষমতা ইসলামী চরিত্রের লোকদের হাতে না থাকায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আসল রূপ ও যথার্থতা বুঝতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। কোরআনে কারীম ও দ্বীন ইসলামের মধ্যে সত্য প্রকাশে এই বাক্যটির অবদানকে কোনোভাবে ছোট করে দেখা যায় না। হালাল হারাম বিধান এতোই স্পষ্ট যে, মানুষের অন্তরে পুঞ্জীভূত অনেক অন্ধকারকেই তা দূর করে দেয়, এমনকি জীব-জানোয়ার কিভাবে জবাই করতে হবে, কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হবে, কোন

পোশাক আশাক পরতে হবে এবং বিয়ে শাদী কিভাবে সম্পাদন করতে হবে সবই স্পষ্টভাবে আল কোরআন বলে দিয়েছে। এই সব বিষয়ে ইসলামের সিদ্ধান্ত বা রায় জানার জন্যে মানুষ বারবার এসে রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করতো, এটা কি হালাল এটা কি হারাম? গণমানুষের জীবনের সংগে জড়িত এই সব ছোট বড় মসলা মাসায়েলের ওপর ইসলামের সিদ্ধান্তএবং আইন কানুন কি তা মানুষ জানতে চাইত, যেহেতু প্রচলিত অনেক নিয়মই ইসলাম পরিবর্তন করে ফেলেছিলো বরং আরো বড় সত্য হচ্ছে, আল্লাহর বিধান মানব রচিত সকল বিধানকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছিলো, সুতরাং সামগ্রিকভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়েই ইসলাম বিধান দিয়েছে, বরং মানব জীবনের সকল বিষয়ের এবং পৃথিবীর সব কিছুর ভোগ ব্যবহারের ওপর ইসলাম বিধান দিয়েছে। এসব বিষয়ে, এক কথায় বলা যায় যে, যে কোনো বিষয়ে ইসলাম এতো বিধান দিয়েছে যে, তা গুণে শেষ করা যাবে না।

ইসলাম হচ্ছে গোটা জীবনের ব্যবস্থা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে এ বিধানকে প্রয়োগ করেছে এবং পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করেছে সেই মোমেন এবং সেই আল্লাহর দ্বীনের ওপর টিকে আছে। আর যে ব্যক্তি কোনো একটি বিষয়েও অন্য কোনো কিছুর আনুগত্য করেছে, সে অবশ্যই ঈমান পরিত্যাগ করেছে ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ওপর সীমালংঘনকর কাজ করেছে এবং (বাস্তবে) সে দ্বীন ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে, তা সে যতই বলুক না কেন যে, সে এই আকীদাকে সম্মান করে এবং সে মুসলমান। আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইনের আনুগত্য তার দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিচ্ছে এবং তার দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রমাণ পেশ করছে।

এই সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকেই আল কোরআনের এই আয়াতগুলো তুলে ধরতে চেয়েছে এবং এ বিষয়টিকে আখ্যায়িত করেছে মূল ঈমানের বিষয় বলে, অথবা আল্লাহর বিরুদ্ধে সীমা লংঘন বলে। আর কোরআনুল কারীমের আয়াতগুলোর লক্ষ্যই হচ্ছে, সকল বস্তু স্পষ্টভাবে জানানো এবং এই দ্বীন, এই কোরআন, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং ঈমানের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্যকে তুলে ধরা।

এখন এখানে হালাল হারাম বিধানটিই হচ্ছে মুখ্য আলোচ্য বিষয় এবং এর দ্বারা মদীনার মুসলমানদেরকে ইসলামের শিক্ষা দান, এই সত্য দ্বীনের সাথে তাদের মহব্বত ও আন্তরিকতা গড়ে তোলা এবং জাহেলিয়াতের সাথে সম্পর্কের শেষ রেশটুকু মুছে ফেলে দেয়া। তাদের পূর্ব জীবনের সব কিছু থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এই চূড়ান্ত আয়াতগুলো এসেছে, যাতে মদ, জুয়া, দেব দেবীর বেদীতে ভেঁট চড়ানো এবং তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ ইত্যাদি শেরকের কাজগুলো থেকে মুসলমানদেরকে বিরত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে,

কু-সংস্কার ও সামাজিক অপরাধ দমনে কোরআনের নীতি

'হে ঈমানদারগণ, মদ, জুয়া, দেব-দেবীর বেদীতে ভেঁট চড়ানো, তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় এ সব কিছু অপবিত্র ও শয়তানী কাজ ..... আর আল্লাহ তায়ালা মুহ্সিনদেরকেই পছন্দ করেন।'

ওপরে বর্ণিত এই সব গর্হিত কাজ– মদ, জুয়া দেব-দেবীর বেদীতে ভেঁট দান, তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় ইত্যাদি এগুলো সবই জাহেলিয়াতের জীবনের প্রতীক এবং জাহেলী সমাজের অন্ধ অনুকরণের চিহ্ন এবং এ সকল ভ্রান্ত আচরণের প্রত্যেকটি অতীতের রীতি নীতি ও রসম রেওয়াযের সাথে গভীর সম্পর্কের কথা জানায়। আর যে সমাজেই এগুলো থাকবে, বুঝতে হবে তারা এই অন্ধ অনুকরণ এবং শেরক থেকে মোটেই মুক্ত নয়। অতীতে ওরা প্রচুরভাবে শরাব পান করতো এবং বিভিন্ন জায়গায় কে কতো বেশী শরাব পান করতে পারে বা পান করাতে পারে তার

প্রতিযোগিতা চলতো এবং এর ওপর বড়াই করা হতো। ওই সব আসরে, কাব্য চর্চা ও কবিতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই সব বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হতো। এ শরাবের আসরে পশু যবাই করে গোশত রোষ্ট করা হতো এবং তা মদ্যপায়ীদের বিলি করা হতো এবং মদ বন্টনকারী, ঘোড় সওয়ার ও আশপাশ থেকে আসা এসব আসরে যোগদানকারী সবাইকে দেদার পান-আহার করানো হতো। তাদের দেব দেবীদের নামে এবং ওই সব দেব দেবীদের বেদীতেই পশুগুলো বলি দিয়ে সেগুলোর রক্ত বেদীতে ছিঁটানো হতো (যেমন করে দেবতাদের নামে উৎসর্গীকৃত পশুদের রক্ত ছিঁটানো হতো)। তাদের বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে এই সব মদেব মজলিসের আয়োজন করা হতো। তার দ্বারা জুয়া খেলা হতো। সেখানে পাখনাবিহীন এইসব তীর নিক্ষেপ করে তারা তাদের গোশতের অংশ নির্ধারণ করতো। প্রত্যেকে তার তীরের দূর নিক্ষেপণ অনুসারে তার অংশ পেতো। যার তীর সর্বাধিক দূরে যেতো, সে সব থেকে বেশী পেতো। এমনি করে কেউ হয়তো একেবারে কিছুই পেতো না। অনেক সময় পশুটির মালিককেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো। এমনিভাবে জাহেলিয়াতের বিভিন্ন প্রচলন অনুযায়ী তাদের সামাজিক উৎসবগুলো চলতো এবং প্রাচীন জাহেলী প্রথা মোতাবেক তাদের আনন্দ উৎসব সংঘটিত হতো।

ইসলামী আন্দোলনের প্রথম দিকে এই সব জাহেলী রীতি-নীতি উৎখাতের জন্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, কারণ এই সব ভুল প্রথা তাদের বিশ্বাসের গভীরে দীর্ঘকাল ধরে এমন ভাবে শেকড় গেড়ে ছিলো যে, তা উৎপাটন করা খুব সহজ ছিলো না। হুকুম দ্বারা হয়তো বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন আনা যেতো, কিন্তু অন্তরের গহীনে যে ভুল আকীদা বিশ্বাস বাসা বেঁধেছিলো সেগুলো উপড়ে না ফেলে বাহ্যিক চিকিৎসা হতো নিষ্ফল প্রচেষ্টার শামিল। একমাত্র আল্লাহর শাশ্বত পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে এই কঠিন সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব ছিলো। তাই দেখা যায়, ইসলাম বাহ্যিক চিকিৎসার দিকে প্রথমে নযর না দিয়ে মানুষের অন্তরের গভীরে যে সব ভুল ধারণা বিশ্বাস দীর্ঘ বহু বছর ধরে শিকড় গেড়েছিলো সেগুলো উপড়ে ফেলার দিকে নযর দিয়েছে সর্বাগ্রে এবং ইসলামের সত্য সুন্দর আকীদার বীজ বপন করেছে। সেই স্বাভাবিক বীজ বপন করেছে যা গ্রহণ করা মানুষের প্রকৃতির পক্ষে সহজ। তাদের অন্তর থেকে মিথ্যা দেব-দেবীর মহব্বত দূর করার জন্যে তাদের পূজা অর্চনার অসারতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মানো হয়েছে এবং সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সকল ক্ষমতার মালিক ও ত্রাণকর্তা– এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ করা হয়েছে। তারপর সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের বিবেক যখন জেগে উঠেছে এবং মূল মালিককে তারা চিনতে পেরেছে, তখনই অতীতের ভ্রান্ত রীতি নীতির অসারতা, অকার্যকারিতা এবং অযৌক্তিকতা তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আর তখনই চিরঞ্জীব ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি তাদের মহব্বত গড়ে উঠেছে, তাঁর কথায় তারা কান দিয়েছে, তাঁর ক্ষমতা বুঝতে পেরেছে এবং তখনই তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য করা সহজ হয়েছে আর তিনি যা কিছু অপছন্দ করেন সেগুলো বর্জন করতে তারা প্রস্তুত হয়েছে। অথচ, এর পূর্বে তাদের বদ্ধমূল ধারণা বিশ্বাসের কোনো সমালোচনাই তারা শুনতে রাযি ছিলো না অথবা কোনো সদুপদেশেও তারা কান দেয়নি, রাযি হয়নি 'জাহেলি যামানায় কোনো ভুল করেছে' এ কথার ওপর চিন্তা করতে। আসলে অন্তরের গভীরে বিশ্বাসের যে গিঁঠ দানা বেঁধে থাকে সেটিই আসল জট। এই জট না খোলা পর্যন্ত কোনো ভাল কথা, ব্যবহার ও সামগ্রিক শিক্ষা সংশোধনী বা প্রচেষ্টা, সবই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই অন্তরের মণিকোঠায় রয়েছে মানব প্রকৃতির চাবি-কাঠি। অন্তরের গভীরে রক্ষিত এ ভান্ডারের তালা বিশ্বাসের দৃঢ়তার চাবি দ্বারা না খোলা পর্যন্ত কিছুতেই সে ধন ভান্ডার খোলা সম্ভব নয়। ওই

ভান্ডারের দিকে যাওয়ার জন্যে একটি সুড়ংপথ যদি একবার খুলে দেয়া যায়, তাহলে পর্যায়ক্রমে তার গভীরে পৌছানোর জন্যে অসংখ্য পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং একবার যদি ওই আঁধার কুঠরীতে আলোর রেখা প্রবেশ করতে পারে তো ধীরে ধীরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আচ্ছন্ন কোটরগুলো একটির পর একটি উদ্ভাসিত হতে থাকবে। এজন্যে ইসলাম জাহেলী যুগের প্রচলিত নিকৃষ্ট ভাবধারা ও সত্য পথ পরিহারজনিত কার্য কলাপের সার্বিক সংশোধনে প্রথম প্রচেষ্টা চালায়নি। সর্বপ্রথম আরবের ওই জনপদের ভুল আকীদা বিশ্বাসের দুয়ারে করাঘাত করেছে, শুরু করেছে কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য দানের আহবান জানিয়ে। আর এই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো দীর্ঘ তেরটি বছর ধরে। এই সময়ের মধ্যে 'আল্লাহ ছাড়া সর্বময় ক্ষমতার মালিক আর কেউ নেই,-

একথাটি মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল করা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিলো না। এ কথার উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে তাদের প্রকৃত মালিক ও মুনিব সম্পর্কে জানানো, তাঁর দাসত্ব সর্বাবস্থায় তাঁর নিরংকুশ আনুগত্য এবং জীবনের সব কিছুর ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়ার প্রবণতা গড়ে তোলা। তারপর যখন তাদের অন্তর আল্লাহর জন্যে নিবেদিত হয়ে গেলো এবং তাদের জীবনে আল্লাহর পছন্দ ছাড়া পছন্দনীয় আর কিছুই রইলো না, তখনই তাঁর হুকুমে বিভিন্ন কাজ করার নির্দেশ নাযিল হলো। এই সব হুকুম পালনের মাধ্যমেই তাদের নিরংকুশ আনুগত্যের প্রমাণ তারা পেশ করতে লাগলো আর সেই সময় থেকেই জাহেলী জীবনে গড়ে ওঠা তাদের সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক লেন দেন, নৈতিক অবক্ষয় এবং চারিত্রিক ও ব্যবহারগত দূষণ থেকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হলো ও একের পর এক তা চলতে থাকলো। এসব সংস্কার তখনই শুরু হলো, যখন আল্লাহর প্রতি আনুগত্যবোধ পাকা হলো এবং হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর বান্দারা নির্বিবাদে তা পালন করতে লাগলো। কারণ তখন তারা জেনে ও বুঝে গিয়েছিলো যে, আল্লাহর হুকুম ও নিষেধাজ্ঞা আসার পর সেই বিষয়ে মতামত খাটানোর কোনো অধিকারই তাদের নাই।

অন্যভাবে বলতে গেলে, ইসলাম বা আত্মসমর্পণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরই বিধিনিষেধ জারি করা হলো। এসব বিধি নিষেধ নাযিল হলো তখন, যখন মানুষ বুঝে গিয়েছিলো যে, আল্লাহর কথার ওপর হিসাব নিকাশ করা, ওইসব বিষয়ে ভালো মন্দ চিন্তা বা গ্রহণ করা ভালো না মন্দ, তা চিন্তা করার কোনো অধিকার মানুষের নাই। অথবা ব্যাপারটি ছিলো তেমন, যেমন মওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী তাঁর কেতাব 'মা যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতুল মুসলেমীনের 'ইনহাল্লাতিল উক্দাতুল কুবরা' শিরোনামে (খুলে গেল সর্ব প্রধান গিঁঠটি) এসেছে। অর্থাৎ শেরক ও কুফরের গিঁঠ .... খুলে গেলেই অন্য সব জটিলতার জট খুলে গেলো।' এই ভাবে রসূলুল্লাহ (স.) তাদের ব্যাপারে প্রথম সংগ্রামে বা কঠিন চেষ্টায় সকল হলেন। এরপর অন্য কোনো বিধি নিষেধকে কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের কাছে আবেদন করতে গিয়ে তাঁকে আর তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। জাহেলিয়াতকে উৎখাত করার প্রথম এই সংগ্রামে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। এই বিজয়ই পরবর্তী সফল বিজয়ের পক্ষে সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রকৃত পক্ষে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে তৎকালীন আরববাসী সর্বান্তকরাণ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের অংগ-প্রত্যংগ এই আনুগত্যের যথার্থ সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাদের অন্তরাত্মা রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি এই আনুগত্য দানে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। তাদের কাছে হেদায়াতের কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তাঁর এসব সাথীরা আর কোনো বিরোধিতা করেনি এবং তিনি

কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেয়ার পর তা গ্রহণ করায় তারা তাদের অন্তরের মধ্যে আর কোনো সঙ্কোচ বোধ করেনি। আর কোনো বিষয়ে নির্দেশ বা নিষেধ করলেও তা মানার ব্যাপারে তারা কোনো ইচ্ছা খাটায়নি। অন্তরের মধ্যে কোনো অস্‌অসা বোধ করলে বা মানুষের অগোচরে কোনো অন্যায় করে ফেললে তারা নিজেরাই এগিয়ে এসে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে অকপটে স্বীকার করেছেন এবং যখনই শাস্তিযোগ্য কোনো সীমালংঘনকর কাজ হয়ে গিয়েছে, তখনই শারীরিক কঠিন শাস্তি গ্রহণ করার জন্যে তারা নিজেরাই এগিয়ে এসে নিজেদেরকে পেশ করেছেন। মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত এমন সময়ে নাযিল হলো, যখন মদ-ভর্তি পেয়ালা নিয়ে তারা আনন্দে মেতেছিলো, মতোয়ারা হয়েছিলো তাদের মন মগয, আর কানায় কানায় ভরা মদিরার পাত্রগুলো তাদের ঠোঁট ছুঁইছুঁই করছিলো, এমন সময় আল্লাহর তরফ থেকে মদের নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয়ে, তাদের সূরা সাগরে অবগাহনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু দেখুন, ঈমানের কী সম্মোহনী শক্তি! সংগে সংগে আল্লাহ নিবেদিত এই প্রাণগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলো এসব ভর্তি পেয়ালা। ঢেলে ফেললো কানায় কানায় ভরা পিপাগুলো। ভেংগে ফেললো সকল পান-পাত্র। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একবার চেয়ে দেখুন সেই দৃশ্যের দিকে ভেসে চলেছে মদীনার গলি পথগুলো।

এর সাথে একথাও সত্য যে মদ ও জুয়া সংক্রান্ত যাবতীয় আপত্তিকর দ্রব্যাদির নিষিদ্ধকরণ (হারাম ঘোষণা) হঠাৎ করে একদিনে হয়নি। চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা দেয়ার পূর্বে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। যেহেতু এই সামাজিক ব্যাধিগুলো দীর্ঘ দিন ধরে সমাজের ভিত্তিমূলে শেকড় গেড়েছিলো। এগুলো তাদের অভ্যাসের মধ্যে ও মনের গভীরে মিশে ছিলো, আর এই কারণেই এসব বদ অভ্যাসের সাথে অর্থ ও পোশাক আশাকও জড়িত ছিলো।

মাদকদ্রব্য হারামের বিভিন্ন পর্যায়

তাই দেখা যায়, ইসলামী সমাজের মধ্যে এই মদ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে একে পুরোপুরি হারাম ঘোষণা তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে এসেছে। প্রথম পর্যায়ে মদের অকল্যাণের একটি অংশ তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

‘খেজুর ও আংগুর দ্বারা তোমরা মাদক দ্রব্য বানাও এবং এগুলো থেকে চমৎকার খাদ্যও লাভ করো।’

এখানে মুসলমান ব্যক্তিদের অন্তরে মাদকদ্রব্যের কথা প্রথমে বলে পরবর্তী খাবারটিকে চমৎকার ঘোষণা দান দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে পূর্ববর্তীটা ভালো নয়। এটা মৃদু সমালোচনা হলেও সুকৌশলে মদের সমালোচনাই করা হয়েছে যেহেতু এটা ‘মাদকতা আনয়নকারী’। পরবর্তীটা উত্তম ও চমৎকার রিযিক বিধায় তার থেকে এটা নিকৃষ্ট। অর্থাৎ এটি একটি জিনিস এবং সুন্দর রেযেক, অন্যটি আর একটি জিনিস।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বীনী আবেগকে জাগিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে মুসলমানদের অন্তরে শরীয়তের যুক্তি বুদ্ধিপূর্ণ কথা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে,

‘ওরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বলো, এগুলোর মধ্যে মানুষের জন্যে বহু ক্ষতিকর দিক এবং কিছু উপকারও আছে, তবে এর ক্ষতির দিকটি উপকারের দিক থেকে অনেক বেশী।’

এখানেও বলা হয়েছে, অপকারের দিকটি যখন উপকারের দিক থেকে বেশী, তখন এটা পরিত্যাগ করাই উত্তম। আর কোনো জিনিস গ্রহণ বা বর্জনের কারণ সে জিনিসটির উপকারী বা অপকারী হওয়ার ওপর নির্ভর করে। এখানেও বিবেকের কাছে আবেদন রাখা হচ্ছে যে, উপরোক্ত

ওই দুটি জিনিস বর্জনই ভালো, যেহেতু এগুলোর মধ্যে উপকারের তুলনায় অপকারই বেশী। কারণ ওগুলোর মধ্যে উপকারের কিছু অভাব অবশ্যই আছে আর হালাল হারাম নির্ভর করে উপকার বা অপকারের ওপর।

তারপর, মদের অভ্যাস পরিত্যাগ করানোর জন্যে তৃতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এই মদ পান ও নামাযের মধ্যে সময় অত্যন্ত সীমিত আর নামায হচ্ছে ফরয। একথা জানাতে গিয়ে সূরায়ে নিসাতে এরশাদ হয়েছে,

‘হে ঈমানদাররা, নামাযের নিকবর্তী হয়ো না যখন তোমরা মদ পান করে মাতাল অবস্থায় থাকো। অর্থাৎ ততোক্ষণ পর্যন্ত নামায থেকে দূরে থাকবে যতোক্ষণ জ্ঞান ফিরে না আসে ও যা বলছো তা তোমরা বুঝতে না পারো।’

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বেশীর ভাগই হচ্ছে খুব কাছাকাছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে মদমত্ত হওয়া এবং সুস্থতা লাভ করে নামাযে যাওয়ার জন্যে যে সময়টুকু থাকে তা সুস্থতা লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। আর মদের আসক্তি থাকায় এই সংকট নিরসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও জটিল ব্যাপার অর্থাৎ, নামায ও মদের নেশার মধ্যে যখন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা যাচ্ছে না, তখন মদ ছাড়বো, না নামায ছাড়বো– এ প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। এজন্যে এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর এই মদাসক্তরা সকালে এক চুমুক, আসরের পর এক চুমুক অথবা মাগরিবের পরে এক চুমুক পান করতে থাকে। কিন্তু এই মদাসক্তিতে নামাযের ব্যাপারে যে সংকট হচ্ছিলো তা মুসলমানদের আনুগত্যপূর্ণ হৃদয়ে বেশ পীড়া দিচ্ছিলো। এ ছিলো এক উভয় সংকট। নামাযও ফরয আবার মদের অভ্যাসও ঠিক রাখতে হবে– এ দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য করতে না পারা সেও তো এক সংকট– এখন কী করা যায়? এ প্রশ্নটা অনেকের মনে ধাক্কা দিচ্ছিলো।

তাই, এরপরই অবতীর্ণ হলো চতুর্থ পর্যায়ে চূড়ান্ত নিষিদ্ধকরণ আয়াত। এমন সময় এ আয়াত নাযিল হলো যখন উপরোক্ত উভয় সংকটের কারণে মদ পরিত্যাগ করার জন্যে বহু মুসলমানের মন ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই যখন হারাম ঘোষণার আয়াত নাযিল হলো, তখন সংগে সংগেই তা পালন করা সম্ভব হলো।

ওমর (রা.) রেওয়ায়াত করেন, তিনি নিজেই বলছিলেন, ‘হে আল্লাহ, মদ সম্পর্কে আমাদেরকে তৃপ্তিজনক কোনো কথা জানিয়ে দিন। (১)

হযরত ওমর (রা.)-এর ওই কথার পর সূরায়ে বাকারার আয়াত নাযিল হলো,

‘ওরা মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বলে দাও এদুটি জিনিসের মধ্যে মানুষের জন্যে বিরাট অপকার রয়েছে, আর কিছু উপকারও আছে, তবে উপকার থেকে অপকারই বেশী।’

এ আয়াত নাযিল হলে ওমর (রা.)-কে ডাকা হলো। তার সামনে এ আয়াতটি পড়া হলো, তখন তিনি বলে উঠলেন, ‘হে আল্লাহ, মদের ব্যাপারে আমাদের তৃপ্তিজনক কোনো কথা বলে দাও।’

---

(১) মদ-জুয়া সম্পর্কিত সূরায়ে ‘নাহ্‌ল’-এর মধ্যে অবতীর্ণ প্রথম আয়াতটিই সম্ভবত হযরত ওমর (রা.)-এর মনে কিছুটা সংকট সৃষ্টি করেছিলো। তিনি ইসলামের সারিতে নিজেকে তালিকাভুক্ত করার পূর্বে বেশ মদ খেতেন। আল্লাহর বাণীতে এটা খারাপ ও ক্ষতিকর জেনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন উপরের হাদীসটি তারই অভিব্যক্তি। –সম্পাদক

তারপর নাযিল হলো সূরায়ে নেসার আয়াত,

‘হে ঈমানদাররা, মদমত্ত অবস্থায় যখন থাকো, তখন জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত এবং যা বলছো তা না বুঝা পর্যন্ত নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না।’

এরপরও ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহ, মদের ব্যাপারে আমাদেরকে পরিষ্কার ও তৃপ্তিদায়ক কোনো কথা জানিয়ে দাও।’ অতপর সূরায়ে মায়েদার আয়াত নাযিল হলো,

‘অবশ্যই শয়তান চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা ছড়াতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও নামায থেকে দূরে রাখতে সুতরাং তোমরা কি এগুলো থেকে বিরত হবে।’

এরপর ওমর (রা.)-কে ডেকে আয়াতটি শোনানো হলো; তখন তিনি বলে উঠলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, নিষেধ করা হয়েছে (সিহাহ সিত্তার কিছু রেওয়ায়াতকারী এটা বর্ণনা করেছেন)।ওউহুদ যুদ্ধের পর ৩য় হিজরীতে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত এ আয়াত নাযিল হলে, অধিকাংশের নিকট ঘোষণাকারীর ডাক ব্যতীত অন্য কোনো কথা পৌছানোর প্রয়োজন হয়নি; অমনি তারা এ হুকুম তামিল করতে শুরু করেছে। ঘোষক মদীনায় হাঁক দিয়ে বলে বেড়াচ্ছিলো, ‘হে (মুসলিম) জাতি, অবশ্যই মদ, নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।’ এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে যার হাতে মদের পেয়ালা ছিলো সে তা ভেংগে চুরমার করে ফেললো। যার মুখের মধ্যে মদ ছিলো, সে ওয়াক ওয়াক করে তা বের করে ফেললো, আর মদের বোতল ও পিপাগুলো ভেংগে চুরমার করে ফেললো। এই সকল বিষয় এমন সুচারুভাবে সম্পন্ন হলো যেন কারো কোনো নেশাই ছিলো না বা কেউ মদ পানই করছিলো না। আর এখন আমরা দেখছি, আল কোরআনের বর্ণনাভংগি যুক্তি পেশ করার ধারা এবং সেই আইন যা প্রশিক্ষণ ও কারণ প্রদর্শন করতে গিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে,

‘হে ঈমানদাররা, অবশ্যই মদ, জুয়া, দেব দেবীর বেদীতে ভেঁট চড়ানো এবং তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ অপবিত্র কাজ ও শয়তানী কাজ, অতএব .... রসূলের দায়িত্ব তো শুধু (আল্লাহর কথাগুলোকে তোমাদের কাছে) স্পষ্ট ভাবে পৌছে দেয়া।’

এখানে দেখুন, আল্লাহ তায়ালা কতো আদর-মহব্বতের সাথে ডাক দিচ্ছেন, ‘হে ঈমানদাররা।’

এইভাবে ডাক দিয়ে এক দিকে যেমন আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের অন্তরকে একমুখী করতে চেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে ঈমানের দাবী অনুসারে চেয়েছেন তাদেরকে গড়ে তুলতে এবং আনুগত্যের রশিতে তাদেরকে মযবুত ভাবে বাঁধতে।

তাই, এই সঞ্জীবনী ও হৃদয়স্পর্শী সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ অর্থ-ব্যঞ্জক ভাষণ নীচে আসছে,

‘অবশ্য অবশ্যই মদ, জুয়া, বেদীতে ভেঁট চড়ানো এবং তীর নিক্ষেপ দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ সবই অন্যায়, অপবিত্র এবং শয়তানের কাজ।’

এ এমন এক পংকিলতা যার থেকে কোনো ভালো গুণ পয়দা হতে পারে না, যাকে আল্লাহ তায়ালা হালাল করতে পারেন। এগুলো সবই শয়তানী কাজ। আর শয়তান তো মানুষের পুরাতন দুশমন। আর একজন মোমেনের এটা জানাই যথেষ্ট যে, শয়তানের কাজ বলে যেটা সে বুঝবে তার থেকে নিজ অনুভূতিকে সে অবশ্যই দূরে সরিয়ে নেবে, ওই জিনিসের ওপর তার মন বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং তার গোটা অস্তিত্ব ওই জিনিস থেকে পালাতে চাইবে, ভয়ে দূরে সরে যেতে চাইবে এবং শয়তানের কাজ থেকে বাঁচতে চাইবে।

কিছু শয়তানী কাজের চিত্র

এখানে মদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে মোমেনের অন্তরে জাগিয়ে দেয়া হচ্ছে সাফল্যের এক অদম্য পিপাসা– এই নিষেধাজ্ঞাটি গভীরভাবে তার অন্তরাত্মাকে উজ্জীবিত করার এক প্রেরণা জাগাচ্ছে,

'অতএব, বেঁচে থাকো এসব কদর্য জিনিস থেকে, তাহলেই হয়তো সফলকাম হবে।'

এরপর খোলাখুলিভাবে এ প্রসংগে দেখানো হচ্ছে যে, ওই সব কদর্য জিনিসের পরিণতিতে রয়েছে প্রতি পদে পদে শয়তানের হাতছানি।

অবশ্যই শয়তান চায় এই মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা ছড়াতে এবং বিরত করতে চায় আল্লাহর সার্বক্ষণিক স্মরণ ও নামায থেকে।

এইভাবে ধীরে ধীরে মোমেনের বিবেকের কাছে শয়তানের লক্ষ্য ধরা পড়ে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং তার কদর্যতার পরিণতি।

অবশ্যই শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে মোমেনদের সারিতে শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করতে, একই ভাবে মোমেনদেরকে সে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকেও দূরে সরিয়ে নিতে চায়। হায়! এর থেকে বড় ষড়যন্ত্র আর কি হতে পারে!

যে সব লক্ষ্য অর্জনের দিকে সে মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে চায়, তার কদর্য চেহারা মুসলমানরা কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর শাশ্বত ও সম্মোহনী আয়াতসমূহের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। এজন্যে মদ ও জুয়ার দ্বারা শয়তান কেমন করে ও কি কি ভাবে মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ রোপণ করে, তার বিস্তারিত বিবরণ মোমেনদের জন্যে আর প্রয়োজন হয় না। মদের খেদমত হচ্ছে, এ বিষাক্ত পদার্থটি মানুষের বিবেক বুদ্ধি বিবেচনার শক্তি যে 'জ্ঞান', তাকে বিলুপ্ত করে দেয় (তাকে হুঁশহারা করে ফেলে)। এসবের সাথে উত্তেজক খাদ্য দ্রব্যাদি, যেমন শক্ত গোশত ও রক্ত খেয়ে উত্তেজিত হওয়া ও টলে টলে পড়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তার স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। এর সাথে যোগ হয় জুয়া খেলা এবং আরও এমন অনেক জিনিস যা তাকে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি, ঘৃণা ও হিংস্রতার দিকে নিয়ে যায়। কারণ জুয়াতে হেরে যাওয়া,'জিতে যাওয়া' ব্যক্তির প্রতি ভেতরে ভেতরে ক্রোধ জাগায়, কারণ সে দেখতে পায় তার সামনেই তার টাকা পয়সা দ্বারা অপর ব্যক্তি অন্যায় ভাবে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছে। কাজেই এসব খেলা ধুলায় হিংসা বিদ্বেষ প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও প্রতিশোধস্পৃহা গড়ে ওঠে এবং বাহ্যত এ খেলাগুলো মজাদার হলেও এর পরিণতিতে আসে মারামারি, কাটাকাটি ও খুনখারাবি– এর থেকে বড় বিপর্যয় মানবতার জন্যে আর কি হতে পারে!

আর আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার ক্ষতি যতো ব্যাপক তা বুঝার জন্যে বড় রকমের চিন্তা ভাবনার কোনো দরকার নাই। সুতরাং মদ অবশ্যই মানুষকে বুদ্ধি-হারা করে ফেলে আর জুয়া মানুষকে বেফায়দা জিনিস গ্রহণ করার জন্যে মাতিয়ে তোলে। জুয়া যারা খেলে, তারা জুয়ায় হেরে গেলে মদ থেকে তো আর দূরে সরে যেতে পারে না, বরং পরাজয়ের গ্লানি ভুলে থাকার জন্যে আরও বেশী করে তারা মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে যায়। আর জুয়ার ওস্তাদ মদ্যপায়ীর ওস্তাদেরই মতো পালকবিহীন তীরকে সঠিক স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না।

এইভাবে শয়তানের এই কদর্য লক্ষ্যের দিকে ইংগিত করার পর মোমেনদের ওই মরদুদ শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে যখন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়, তখন এমন প্রশ্ন জাগে যার উত্তর হযরত ওমরের উত্তর ছাড়া আর খুঁজে পাওয়া যায় না আর তখনই তারা যেন গায়বী আওয়ায শোনে, তোমরা কি 'থেমে যাবে?'

তখন নিবেদিতপ্রাণ মোমেনগণ জওয়াব দেয়, 'হাঁ, হাঁ, আমরা থেমে গিয়েছি।' এরপরও দেখা যায়, আরও বড় কিছু ঘটনার প্রতি ইংগিত করতে গিয়ে প্রাসংগিক আলোচনা এগিয়ে চলেছে।

'আর আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের এবং সতর্ক হয়ে যাও। এরপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাও তো জেনে রেখো, আমার রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে সত্যকে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।'

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য বোধ এমন এক মূলনীতি যার দিকে ইসলামের সব কিছু ফিরে যায়, যেহেতু ইসলামের অর্থই হচ্ছে সকল কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিরংকুশ আনুগত্য এবং এই আনুগত্যের বিরোধী যা কিছু তার থেকে বেঁচে থাকা; তাই এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং বিরোধীদেরকে এই বলে তিরস্কারও করা হয়েছে যে,

'যদি এর পরও মুখ ফিরিয়ে চলে যাও তো জেনে রেখো, আমার রসূলের কাজ তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।'

আর তিনি অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন এবং পরিষ্কারভাবে সব কিছু বুঝিয়েও দিয়েছেন, কিন্তু সব কিছু স্পষ্টভাবে জানানোর পরও বিরোধীদের জন্যে আনুগত্য করা কঠিন হয়ে যায়।

তাদের এই যুক্তিহীন আচরণ, সত্য বিরোধী ভূমিকা ও হঠকারিতার কারণে অত্যন্ত কঠিন ভাবে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। এর সাথে মোমেনদের প্রতিও কড়া ইংগিত এসেছে। বিরোধীরা যখন আনুগত্য করার পরিবর্তে না-ফরমানী ও বিরোধিতা করে, তখন প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেদের ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষতি হয় না, যেহেতু রসূলও সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়ে তাঁর কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাদের সম্পর্কে যা কিছু করণীয় তা করার পর তাঁকে, তাদের কোনো আচরণের জন্যে আর দায়ী করা হবে না বা তাদের কোনো শাস্তিও তিনি বন্ধ করার জন্যে এগিয়ে আসবেন না, যেহেতু তারা তাঁর আনুগত্য না করে বিরোধিতা করেছে। এখন তাদের বিষয়গুলো আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার ওপর ন্যস্ত। তিনি এই সব নাফরমান ও সত্য প্রত্যাহারকারীদেরকে শাস্তি দিতে পুরোপুরিই সক্ষম।

সকল প্রকার মাদকদ্রব্যই হারাম

আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে অন্তরসমূহকে সঠিক পথ দেখানো ও তাদের মনের দুয়ারের তালা খুলে দেয়া, যার ফলে বিভিন্ন পথ ও দুর্গম গিরি সংকটগুলো তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়।

এখানে অবশ্য যে 'খামর' সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা যে কি জিনিস সে বিষয়ে কিছু পরিষ্কার কথা আসা দরকার বলে মনে করি।

এ বিষয়ে আবু দাউদের একটি হাদীস থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জবানীতে জানা যায়, 'খামর' সেই সব জিনিস যা বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়...... এবং মাদকতা আনে যে সব জিনিসে সেগুলো সবই হারাম।

নবী (স.)-এর মেম্বার-এর ওপর দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রা.) (তাঁর খেলাফত আমলে) একদল সাহাবাকে সম্বোধন করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ,

'হে জনগণ, 'খামর' সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয়েছে, আর তা হচ্ছে পাঁচ প্রকারের জিনিস থেকে তৈরী মদ। ওই পাঁচ প্রকারের জিনিসগুলো হচ্ছে, আংগুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। প্রকৃতপক্ষে তাই 'খামর' যা বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। হাদীসটি কুরতুবী তার তাফসীর 'আল কুরতুবী'তে উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং, সর্বদিক ও সর্ব অর্থ বিবেচনায় বুঝা গেলো যে, প্রত্যেক বুদ্ধি বিনষ্টকারী জিনিস যা মাদকতা আনে, তা সবই হারাম। 'খামর' বলতে কোনো বিশেষ পদের মদকে হারাম করা হয়েছে একথা ঠিক নয়। কাজেই, যা কিছু মাদকতা আনে তাই হারাম।

কোনো মাদক দ্রব্যের মধ্যে যদি মাদকতা নাও থাকে, তবু তা পান করলে একজন মুসলিমের মধ্যে ইসলামের কাংখিত গুণ– সদা জাগ্রত থাকা এবং সদা সজাগ থাকার এ গুণটি নষ্ট হয়ে যায় আর প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে পৌছানো বা তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখা ও তাঁর নযরে থাকার মানসিকতাকে বিপদগ্রস্ত করে দেয়। এরপর এটাও বুঝতে হবে, একজন দায়িত্ব-বোধ সম্পন্ন মানুষের জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে সদা জাগ্রতাবস্থা অবশ্যই বড় জরুরী এবং একটি ইতিবাচক গুণ। এই গুণটিই তার মানবসুলভ দুর্বলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। এর ফলে রক্ষা পায় তার ব্যক্তিত্ব, তার সম্পদ ও তার সম্ভ্রম। আরও রক্ষা পায় সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহাত্মক কাজ থেকে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনের নিরাপত্তা, শরয়ী বিধান ও সামাজিক জীবনের সাংগঠনিক কাঠামো। এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, মুসলমান সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে সে পুরোপুরি স্বাধীন এবং তার ব্যাপারে বাইরের কারো নাক গলানোর অধিকার নেই এমন নয়। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর নযরে রয়েছে, এজন্যে তাকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। তাকে যেমন নিজের কাছে দায়ী থাকতে হবে, তেমনি দায়ী থাকতে হবে পরিবারের কাছে, যে মুসলিম সমাজে সে বাস করে তার কাছে এবং গোটা মানব জাতির কাছেও। যেহেতু তাদের মধ্যে তাকে দাওয়াতী কাজ করতে হবে, আহবান জানাতে হবে তাদেরকে সত্যের দিকে এবং দিতে হবে তাদেরকে সত্য সঠিক পথের দিশা। এ সমস্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই তাকে সদা সর্বদা সজাগ ও জাগ্রতাবস্থায় থাকতে হবে। এমনকি যখন সে হালাল জিনিসগুলোও ভোগ-ব্যবহার করবে, তখনও তার কাছে ইসলামের দাবী হচ্ছে যেন সে পুরোপুরি সজাগ থেকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে আল্লাহর এসব নেয়ামত ভোগ-ব্যবহার করে, যাতে কারো কষ্ট না হয় এবং কারো হক না মারা যায়। সে যেন ইন্দ্রিয়ের বে-সামাল গোলামে পরিণত না হয় অথবা লাগামহীন বিলাসী না হয়ে ওঠে। অবশ্যই তাকে তার হৃদয়াবেগের ওপর খবরদারী করতে হবে এবং সদা সর্বদা নিজ মালিকের কাছে জওয়াব-দিহির খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু, মাদকতা এমন এক অবস্থা যা কিছুতেই এ গুণগুলোর সমাবেশ ঘটতে দেয় না।

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত নিকৃষ্ট দ্রব্যগুলোর মাদকতা থেকে এই দূরত্ব বজায় রাখার অর্থ হচ্ছে জীবনের অনেক দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং সেই সব খারাপ ধ্যান ধারণা থেকে সরে আসা যা এই সব নেশাপূর্ণ জিনিস বনাম 'খামর' মানুষের মধ্যে গড়ে তোলে। আর ইসলাম মানুষকে সকল ভুল পথ থেকে বাঁচাতে চায় এবং চায় মানুষকে প্রকৃত সত্য পথে এগিয়ে দিতে। ইসলাম চায় মানুষ আল্লাহমুখী হয়ে যাক, সত্য সঠিক পথে থেকে জীবন যাপন করুক এবং জীবনের সব কিছুকে গড়ে তুলুক বাস্তব সত্যের নিরিখে। শুধু ধারণা-কল্পনা অথবা প্রবৃত্তির তাড়নে তারা চলুক– এটা ইসলাম কিছুতেই বরদাশত করতে রাযি নয়। সত্য পথে চলার জন্যে প্রয়োজন প্রবল মনোবল ও দৃঢ় ইচ্ছার। তাই, ইসলাম সদা সর্বদা মানুষের মধ্যে সত্য পথে চলার দৃঢ় মনোবল গড়ে তুলতে চায় এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেয়, মুক্ত করতে চায় তাকে অভ্যাসের গোলামী থেকে অর্থাৎ তার বদ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করাতে চায়। এই দিকটি বিবেচনায় যদি মদ নিষিদ্ধকরণ ও অন্যান্য নেশাকর দ্রব্যাদি বন্ধ করার যৌক্তিকতা চিন্তা করা হয়, তাহলে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বুঝা সহজ হবে। এই জন্যে বলা হয়েছে এগুলো ঘৃণ্য অপবিত্রতা এবং শয়তানী কাজ যা মানব জীবনের জন্যে ধ্বংসাত্মক। 'খামর' বস্তুটি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘৃণ্য বস্তুর মতই অপবিত্র ও ঘৃণ্য। অথবা হারাম হওয়ার কারণেই এগুলো খারাপ– এ বিষয়ে ফকীহ বা ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। ফকীহগণ সাধারণভাবে এ বিষয়ে একমত যে,

এ বস্তুটি নিজেই অপবিত্র (যেমন মলমূত্র) আর দ্বিতীয় মত, অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক হারাম হওয়ার কারণে এগুলো নিষিদ্ধ। এই মতে রয়েছেন শাফেয়ী, ইমাম মুযানী, রাবিয়া এবং সাদ প্রমুখ ব্যক্তিরা। ফী যিলালিল'– এ আমরা এই দ্বিতীয় মতটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে পেশ করেছি।

মাদকদ্রব্য হারামের প্রতিক্রিয়া ও প্রাসংগিক কিছু ভাবনা

কথিত আছে, মদের হারাম হওয়া সম্পর্কে যখন আয়াত নাযিল হলো এবং ওই আয়াতে একে অপবিত্র ও নোংরা জিনিস ও শয়তানী কাজ বলে অভিহিত করা হলো, তখন ইসলামী সমাজে খামর বা মদ সম্পর্কে ও এর নিষিদ্ধ ঘোষণার লক্ষ্য সম্পর্কে মুখ্যত দুটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। সাহাবাদের মধ্যে যারা এ বিষয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামাচ্ছিলেন তাঁরা চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, হায় হায়, আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তারা ত মদ খেতো, তাদের কী হাশর হবে? অথবা এ কথা বলতে শোনা গেছে, কী হবে তাদের যারা ওহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছে অথচ তাদের পেটে এই হারাম বস্তুটিও বর্তমান (অর্থাৎ একে হারাম ঘোষণা করার পূর্বে তারা মদ খেয়েছে)।

আর একদল ছিলেন দোদুল্যমান বা সন্দেহবাদী, যারা মদ হারাম ঘোষণায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং বুঝতে পারছিলেন না যে, কি করে পূর্বেকার মদ্য পায়ীরা রেহাই পাবে। তারা অত্যন্ত বেশী হয়রান হয়ে এ কথাগুলো বলছিলেন। আসলে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণগুলো ভালোভাবে বুঝতে না পারার কারণেই তারা এসব কথা বলছিলেন। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যারা অক্ষম হচ্ছিলেন, সেই সব অস্থিরচেতা ও সন্দেহবাদীরা মানুষের মনে এই বলে সন্দেহ ছড়াচ্ছিলেন, 'যারা মারা গেছে তাদের অন্তরে কি সত্যিই ঈমান ছিলো? কি করে ঈমান থাকে তারা তো শয়তানী কাজে লিপ্ত ছিলো।' আসলে এই সন্দেহবাদীরা এতোই অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন যে, তারা কি বলবেন, কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারছিলেন না, আর তখনই নীচের আয়াতটি নাযিল হলো,

'যে ঈমানদার ব্যক্তিরা সকল প্রকার ভালো কাজ করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলেছে এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের ঈমান ও ভালো কাজ করার মানসিকতা প্রমাণিত হয়েছে, তারা তাদের ঈমানের প্রমাণ দিতে এহসান করেছে, অর্থাৎ কর্তব্য পালন করার পর আরও অতিরিক্ত ভালো করেছে। অতপর হারাম (ঘোষণার পূর্বে) তারা যা কিছু খেয়েছে তাতে কোনো অসুবিধা নাই। আল্লাহ তায়ালা এহসানকারীদেরকে ভালোবাসেন।'

একথাটিই বুঝানোর জন্যে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো অর্থাৎ, কোনো জিনিস সম্পর্কে যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো নিষেধাজ্ঞা নাযিল না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল। অতএব হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বে, ওই জিনিস সেবনের জন্যে কাউকে দায়ী করা হবে না। কাজেই মদের হারাম হওয়ার পূর্বে যারা এ পদার্থ খেয়েছে, তাদের পেটে হারাম জিনিস রয়েছে, বা তারা শয়তানী কাজে লিপ্ত ছিলো একথা মনে করার কোনো কারণ নাই। তাদেরকে হারাম ভক্ষণকারী বা হারাম অমান্যকারীও মনে করা যাবে না। এজন্যে তাদেরকে দুনিয়াতে দোষারোপ বা শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না, আখেরাতেও তাদেরকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। একথা ভালোভাবে হৃদয়ংগম করা প্রয়োজন যে, কোরআনে পাকে হারাম ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত সকল জিনিসই হালাল, যেহেতু আল কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে, এ ছাড়া অন্য কোনো কারণেই কোনো জিনিস হারাম হয় না।

মু'তাযিলাদের মতো আমরা এ বিতর্কে লিপ্ত হতে প্রস্তুত নই যে, খামর বা মদ নিজে কোনো অপবিত্র জিনিস বা নোংরা পদার্থ কিনা, এ জিনিসটি শরয়ী বিধানের মধ্যে মৌলিক জিনিস কি না যার কারণে এটাকে হারাম ঘোষণার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। অথবা স্বাস্থ্যগত বা নৈতিকতার দিক দিয়ে এর মধ্যে এমন কোনো জিনিস আছে কি না, যার কারণে হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এসব চুল-চেরা ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন নাই। এসব অদ্ভুত কষ্ট চিন্তা খামাখা অনুভূতির ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি করে। এতোসব দার্শনিক চিন্তার মধ্যে না গিয়ে আমরা সহজে এটা বুঝি, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নিষেধ করেছেন তা আমরা পরিত্যাগ করব। আর নিষিদ্ধ ঘোষণার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন হয়ে গেছে। কাজেই নিষিদ্ধ বলে জানার পর আমরা আনুগত্য ভরে তা মেনে যাব, অর্থাৎ তা আর ভোগ-ব্যবহার করবো না। এতে কোরআন হাদীসে নিষিদ্ধ হওয়ার 'কারণ' বা ক্ষতি বর্ণিত হোক বা না হোক। বান্দা হিসাবে মালিকের হুকুম পালন করাই আমাদের কাজ– এইভাবে বিনা দ্বিধায় আল্লাহর কথা মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমেই আমাদের এবাদতের প্রমাণ দিতে হবে। এতে ব্যক্তিগত বা দলীয় মতামতের কোনো দখল পাই। ভালো মন্দ জেনে, আল্লাহর হুকুম পালন করবো তা নয়। মুনিবের হুকুম জানার সাথে সাথে, কোনো চিন্তা ভাবনা না করেই আমরা তা পালন করবো এটাই আমাদের জন্যে ফরয এবং এইভাবে আনুগত্যের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর বান্দা রূপে স্বীকৃতি পাবো এবং দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণের অধিকারী হতে পারবো। এটা যদি নিজেই খারাপ অথবা ক্ষতিকর জিনিস হয়ে থাকে, তাহলে হারাম ঘোষণার পূর্বে কিভাবে এটা হালাল ছিলো? এসব প্রশ্ন থেকেও আমাদের দূরে থাকা দরকার। শরীয়তের বিধান কখন এবং সামাজিক জীবনের কোন পর্যায়ে কিভাবে প্রয়োগ করা হবে তা শরীয়তের মালিক যিনি, তিনিই জানেন। আল্লাহর হুকুমের তাৎপর্য জানতে ও বুঝতে চাওয়াটা অপরাধ নয়, তবে জেনে-বুঝে পালন করবো এটা অনুগত বান্দার কথা হতে পারে না। বান্দা হিসাবে আমাদের কাজ হচ্ছে কোনো নির্দেশের মধ্যে ভাল বা মন্দ কি আছে তা বুঝতে পারি বা না পারি, যখনই স্পষ্টভাবে জানতে পারবো এটা আল্লাহ তায়ালা বা তাঁর রসূলের হুকুম, তখন সংগে সংগে তা পালন করবো।

আল্লাহর বিধানের দাবী হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে, হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে অনুগত চাকরের মতো তা পালন করবো। এভাবে হুকুম পালন করার নামই ইসলাম। যেহেতু আত্মসমর্পণের দাবী এটাই। হাঁ, আনুগত্যের পরে আল্লাহর হেকমত বুঝার জন্যে যথাসম্ভব তাঁর বিধি-নিষেধের ব্যাপারে মাথা ঘামানো অবশ্যই জায়েয আছে। এতে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত কোনো তাৎপর্য পাওয়া যাক বা না যাক তাতে কিছু আসে যায় না। তবে কোনো ব্যাপারে মানবীয় বুদ্ধিতে কোনো কিছুর তাৎপর্য যদি নাও বুঝা যায় তবু আনুগত্য করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, অবশ্যই এর মধ্যে ফায়দা আছে, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারণেই আমরা তা হয়তো বুঝতে পারছি না। অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হুকুম বা ফয়সালা দেয়ার মালিক, অতএব যখন তিনি কোনো বিষয়ে তাঁর হুকুম জানিয়ে দেবেন, তখন আর কোনো যুক্তিতর্ক নয়, মেনে নেওয়াই কাজ। কোনো বান্দা, সে যেই হোক না কেন, তাকে হুকুম বা ফয়সালাদাতা বলে মেনে নেয়ার অর্থই হচ্ছে, তাকে শরীয়তের বিধান দেয়ার চূড়ান্ত অধিকারী বলে স্বীকার করা। কোনো মানুষ এবং তার কাছেই ওই বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণের জন্যে যেতে হবে এটাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব আর এই সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে কেমন করে থাকবে।

তাকওয়ার পরিধি

এ আলোচনার মাধ্যমে আয়াতের অর্থ ও দাবী সুনির্দিষ্টভাবে পেশ করা হলো। দেখুন এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত দিতে গিয়ে পরবর্তী আয়াত কি বলছে,

'যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজসমূহ করেছে, তাদের জন্যে (নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে) যা কিছু তারা ভক্ষণ করেছে সে ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। (কারণ) যখন তারা আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে তাকওয়া (আল্লাহর ভয়ে বাছ-বিচার) করে চলেছে এবং ভালো কাজসমূহ করেছে, তারপর ওই সকল কাজের মধ্যেও তারা তাকওয়া ও ঈমানের প্রমাণ দিয়েছে, এরপর আবারও আল্লাহভীতির পরিচয় দিয়েছে এবং এহসান করেছে (সুন্দরভাবেই তারা তাকওয়ার প্রমাণ দিয়েছে)। আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এহসানকারীদেরকে ভালবাসেন।'

এ বিষয়ে অবতীর্ণ আল কোরআনের আয়াত-এর মধ্যে তাকওয়া কথাটির বারবার উল্লেখ- একবার 'ঈমান ও নেক আমল'-এর সাথে, একবার 'ঈমান'-এর সাথে এবং একবার 'এহসান'-এর সাথে- কেন এসেছে সে বিষয়ে কোনো মোফাসসের এমন কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি যা অন্তরকে তৃপ্তি দিতে পারে। আমার নিজের রচিত এই তাফসীরেও 'তাকওয়া' শব্দটির বারবার উল্লেখ কেন করা হয়েছে তা বুঝানোর মতো কোনো তৃপ্তিদায়ক কথা এ তাফসীরের প্রথম সংস্করণে এসেছে বলে আমার মনে হয়নি। অবশ্য, এরপর আরও ভালোভাবে ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছি, তাতেও যে খুব বেশী তৃপ্তিদায়ক তাৎপর্য জানতে বা বুঝাতে পেরেছি তা জোর করে বলতে না পারলেও কিছু রহস্য যেন বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয় এবং আমার এ ব্যাখ্যার সাথে ইবনে জারীর আততাবারীর তাফসীরে উল্লেখিত ব্যাখ্যারও বেশ মিল আছে। ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ,

'আয়াতে বর্ণিত প্রথম 'তাকওয়া' শব্দটির তাৎপর্য সর্বান্তকরণে ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর হুকুমকে মেনে নেয়া এবং আনুগত্য ভরা মন নিয়ে সে হুকুম সাথে সাথে এবং যথাযথভাবে পালন করা। দ্বিতীয় বারে উল্লেখিত 'তাকওয়ার' তাৎপর্য আল্লাহকে ভয় করবো বলে স্বীকার করার পর (তাঁকে হাযির নাযির জেনে) স্থায়ীভাবে তাঁকে ভয় করা ও তার প্রমাণ পেশ করা এবং 'তাকওয়ার' তৃতীয় বারে উল্লেখের ব্যাখ্যা আমি বুঝেছি, ভয় তো করবোই, সর্বতোভাবে ও সর্বদা ভয় করবো, শুধু তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যেই ভয় করবো না, বরং তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যেই তাকে ভয় করবো এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বেশী বেশী নফল বা অতিরিক্ত এমন কাজ করবো যাতে তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়।

এ তাফসীরের এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা প্রথম সংস্করণে আমি দিয়েছিলাম তা হচ্ছে, 'সংক্ষেপে বলার পর, বিস্তারিত ভাবে বলতে গিয়েই এই 'তাকওয়া' কথাটিকে বারবার আনা হয়েছে। অবশ্য, ঈমানের সাথে ভালো কাজ করে 'তাকওয়া'কে সুন্দরভাবে পেশ করা যায়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা: ঈমান (আল্লাহ ও যাবতীয় হুকুমকে সত্য ও যথার্থ জেনে বিশ্বাস) ও সাথে সাথে তাঁর ভয় অন্তরে রেখে তাঁর সমস্ত হুকুম পালন করা। তৃতীয় ব্যাখ্যা: আল্লাহকে ভয় করার সাথে সাথে তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর স্থায়ী আইন কানুন অনুযায়ী সকল কাজ এমনভাবে করা যার মধ্যে ভয়ের গোপন এক অনুভূতি থাকবে- আল্লাহর এমন ভয় যা তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তার অনুভূতিতে সর্বদা জাগরূক থাকবে এবং প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর সাথে মিলনাকাংখায় তাকে উদগ্রীব করে তুলবে, তাঁর ওপর ঈমান ও তাঁর বিধি-নিষেধগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ এবং অন্তরে বিরাজমান লুক্কায়িত বিশ্বাসের বহিপ্রকাশ স্বরূপ ভাল কাজ এবং গোপন বিশ্বাসকে বাস্তব কাজ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা- এইগুলো হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের লক্ষ্য- বাহ্যিক

কোনো কাজ ও কোনো জটিল পদক্ষেপ নয়- এই কারণেই গুরুত্ব দান করতে গিয়ে বারবার উল্লেখ ও বারবার বলা।

অবশ্য এই মুহূর্তে যে ব্যাখ্যাটি পেশ করা হলো, তাও পুরোপুরি আমার মনোপূত নয় কিন্তু কি করব, আমার মাথায় তো এর থেকে বেশী আর কিছু আসছে না। আল্লাহ তায়ালাই আমার সহায়।

হালাল হারামের কিছু বিধান ও আল্লাহর পরীক্ষা

এরপর এ প্রসংগে আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে হারাম ও হালালের অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে। এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা হারাম, এ সময়ে কোনো জীবন হত্যা করলে তার কাফফারা আদায় করা, আরও আলোচনা আসছে বায়তুল্লাহর চতুর্দিকের একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের এলাকাকে সংরক্ষিত (বা হারাম) এলাকা ঘোষণার তাৎপর্য সম্পর্কে, নিষিদ্ধ মাসগুলো (যে সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ হওয়া এবং কোরবানীর পশুদের কতল করা ও ওই পশুদের হত্যা করা যাদের গলায় (মানত করে) কণ্ঠহার বেঁধে দেয়া হয়েছে- এসব বিষয়ের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেসব বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা আসছে। ওপরে উল্লেখিত পশুগুলো হত্যা করা সম্পর্কে সূরার শুরুতেই নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তারপর এই বাক্যটির দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে যেন এ বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয় সে বিষয়ে একটি মাপকাঠি বর্ণনা করে এ প্রসংগ শেষ করা হচ্ছে। সে মাপকাঠিটি হচ্ছে, যে জিনিস বেশী হওয়ার কারণে দূষিত ও ক্ষতিকর হয়, তা যদি কমও হয় তবু তা ক্ষতিকর মনে করতে হবে এবং সেইভাবেই তা বর্জন করতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তো পরীক্ষা করবেন তোমাদের হাত ও তীর দ্বারা শিকার করা কোনো পশুর দ্বারা ....অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা, আল্লাহকে ভয় করো, তাহলেই হয়তো তোমরা সাফল্য মন্ডিত হবে।' আয়াত ৯৪-১০০

এ সূরাটির শুরুতে আল্লাহ তায়ালা তো বলেই দিয়েছেন (কোন্ কোন্ চতুষ্পদ পশু হালাল), 'হে ঈমানদাররা, (আল্লাহর সাথে করা) তোমাদের চুক্তিগুলো পূরণ করো। তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু, সেইগুলো বাদে .... তারপর, এহরাম ভংগ করা হলে (হারাম শরীফের বাইরে আসার পর) শিকার করো (করতে পার)।

মোহরেম থাকাবস্থায় শিকার করতে মানা করা হয়েছে, মানা করা হয়েছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অসম্মান করতে, হারাম মাসসমূহের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করতে, কোরবানীর পশু, কণ্ঠহার হিসাবে চামড়ার প্রতীক পরিহিত মানত করা পশু অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের দিকে রওয়ানা হয়ে আসা মানুষের সম্ভ্রমকে নষ্ট করতে। এই নিষেধ অমান্য করলে দুনিয়ায় কি শাস্তি দেয়া হবে তার উল্লেখ না করে গুনাহ হবে বলা হয়েছে এবং এখানে (দুনিয়ার) শাস্তির কথা, অর্থাৎ কাফফারা আদায় করতে বলা হয়েছে, যাতে করে তারা তাদের অন্যায় কাজের সঠিক শাস্তি পেতে পারে। অবশ্য তারপর তাদেরকে পূর্বকৃত ওইসব জিনিসের সম্ভ্রম হানিজনিত অপরাধ মাফ করে দেয়া হবে এজন্যে আখেরাতে কোনো শাস্তি দেয়া হবে না এবং এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর যারা এ আইন অমান্য করবে তাদের থেকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশোধ নেবেন বলে ভয় দেখানো হয়েছে।

এ বাক্যটিও শুরু হয়েছে এখানে একইভাবে মোমেনদেরকে স্নেহের সাথে ডাক দিয়ে যেমন করে অধ্যায়ের অন্যান্য বাক্যতে মোমেনদেরকে (আদরের সাথে) ডাক দিয়ে কথা বলা হয়েছে

'অর্থাৎ হে ওইসব ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছো,' তারপর তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, মোহরেম থাকাবস্থায় নিষিদ্ধ শিকার করার বিষয়ে এবং তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা নেয়া হবে।

'হে ঈমানদাররা, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাত ও তীর দ্বারা যে সব পশু পাখি তোমরা শিকার করো, সেই সব বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যাতে করে তিনি জেনে নেন, কে আল্লাহ এবং অন্যান্য অদেখা জিনিসগুলোকে বিশ্বাস করে। এরপর, যে ব্যক্তি অন্যায় করবে (সীমা লংঘন করবে) তার জন্যেই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'

যে শিকার নিষিদ্ধ বলে এখানে জানানো হয়েছে তা হচ্ছে খুব সহজ শিকার, যা খুবই কাছাকাছি (হাতের কাছে) পাওয়া যায় এবং অনায়াসে পাওয়া যায় বল্লমের মাথায়। কথিত আছে যে, শিকারের এই পশু-পাখীগুলোকে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসেন যে ইচ্ছা করলে হাত দিয়েই ধরা যায় বা বল্লম দিয়ে আঘাত করা যায়, কারণ কাছে আসতে আসতে একেবারে তাদের তাঁবু এবং বাসস্থানের চতুষ্পার্শে চরতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই লোভনীয় জিনিসের দ্বারাতেই পরীক্ষা করা হয়। এই ধরনের লোভনীয় জিনিস দিয়েই তো বনি ইসরাইল জাতিকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো অর্থাৎ অত্যন্ত সহজলভ্য জিনিস গ্রহণ করা থেকে তাদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। সে সময়ে মূসা (আ.) একটি ছুটির দিন নির্ধারণ করে সেই দিনে নামায ও আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে সেই দিনে জীবিকা অর্জনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এবাদত করার জন্যে শনিবারের দিনটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো। তারপর আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের মাছগুলোকে টেনে আনতেন ঝাঁকে ঝাঁকে কিনারার দিকে, যা শনিবারে অতি সহজে তাদের চোখে পড়তো এবং তাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে যেতো। শনিবার পার হয়ে গেলে স্বভাবতই মাছগুলো পালিয়ে যেতো। কিন্তু বনি ইসরাইল জাতি এতো সহজ-লভ্য মাছের লোভ সংবরণ করে আল্লাহর হুকুম পালন করতে পারলো না এবং আল্লাহর সাথে আনুগত্যের যে ওয়াদা তারা করেছিলো তা তারা ভংগ করলো। তারা এবং এইভাবে তারা তাদের চিরাচরিত নাফরমানীর বদ-অভ্যাস অনুসারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করলো যে, শনিবারের দিন তারা মাছগুলোর আসার পথে বাঁধ দিয়ে মাছগুলোকে ঘেরের মধ্যে আটকে ফেলতো। সে দিন তারা মাছ ধরতো না বটে কিন্তু পর দিনই ভোর বেলায় সেই ঘেরের মধ্যে আটকে পড়া মাছগুলোকে বিনা কষ্টে এবং অতি সহজে শিকার করে নিতো। কৌশলের সাথে তাদের এই আল্লাহর নাফরমানীর কথাই তিনি তাঁর শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে তুলে ধরে ওই ইহুদী জাতিকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত এলাকাবাসীদের সম্পর্কে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো দেখি যখন, তারা ওই মাছগুলো সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিলো। মাছগুলো শনিবারে শুঁড় উঁচু করতে পরতে ঝাঁকে ঝাঁকে কিনারায় এসে হাযির হতো, আর ওই নাফরমান জাতি সেই দিনটিতে তাদেরকে না ধরে ঘের দিয়ে রাখতো এবং পরের দিন ভোরে মনের আনন্দে সে মাছগুলো শিকার করতো। এইভাবে চালাকী করে তারা ভাবতো যে আল্লাহকে ফাঁকি দিয়ে তারা কাজ উদ্ধার করে নিয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তো সব কিছু অবগত; তাই তিনি বলছেন, 'এমনি করে এই অপরাধে জড়িয়ে পড়ার মাধ্যমেই তাদেরকে আমি পরীক্ষা করেছি।'

মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা (উপরোক্ত বর্ণনামতে) অবিকল এই একই ধরনের লোভনীয় দ্রব্যাদি ও অবস্থা দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। অতপর, ইহুদী জাতি যে পরীক্ষায় ব্যর্থ হলো মুসলিম উম্মাহ সেই পরীক্ষায় সফলকাম হলো। আর এইভাবে তারা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের নিম্নবর্ণিত উপাধির উত্তম নমুনা হিসাবে নিজেদেরকে পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, গোটা মানবজাতির জন্যে তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে কল্যাণকর কার্যাবলীর নির্দেশ দেবে এবং ....

আর অবশ্যই একথা সত্য যে, পৃথিবীর বহু দেশে এ উম্মত সাফল্য লাভ করেছে যেখানে বনী ইসরাইল জাতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আর এই কারণেই ওদের হাত থেকে খেলাফতের দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের কাঁধে এই গুরু দায়িত্ব তুলে দিলেন এবং পৃথিবীতে তাদের এতো বিশাল এলাকায় ক্ষমতার অধিকারী বানালেন যা ইতিপূর্বে আর কেউ পায়নি। তারপর, মুসলিম উম্মাতের হাতে খেলাফাত থাকাকালে যেভাবে ইসলামের পূর্ণাংগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিলো এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিব্যাপ্ত হয়েছিলো, সেইভাবে আজ পৃথিবীর কোথাও ইসলাম তার পূর্ণাংগ রূপ নিয়ে উপস্থিত নাই এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম না থাকায় এ ব্যবস্থার সম্মোহনী শক্তির সংস্পর্শে আসা থেকে মানুষ বঞ্চিত রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর জীবনে আবার কখনও যদি সেই দিন ফিরে আসে যে, তারা নিজেরা বুঝতে পারে যে, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা এবং গোটা মানব মন্ডলীর জীবন পরিচালনার ও তাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ ও ত্রুটিহীন আইনমালা, তাহলে তারা আবার এই বিধানকে কায়েম করার জন্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

আর এহরাম বাঁধা অবস্থায় এতো সহজ শিকারের লোভ সংবরণ করার নির্দেশ ছিলো অবশ্যই এক কঠিন পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় এই মুসলিম উম্মাহ অতি সুন্দরভাবে পাশ করেছে। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতেই এটা সম্ভব হয়েছে। এইভাবে ট্রেনিং দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরও অনেক বড় বড় পরীক্ষায় পাশ করার যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন এবং এইভাবে তাদেরকে গোটা বিশ্বের পরিচালকের দায়িত্ব বহন করার যোগ্য বানিয়েছেন।

আলোচ্য এই ঘটনার মাধ্যমে মোমেনদের জন্যে এই পরীক্ষার তাৎপর্য বুঝাকে আল্লাহ তায়ালা খুবই সহজ করে দিয়েছেন,

'যাতে করে আল্লাহ তায়ালা জেনে নেন, কে তাঁকে ও অদেখা অন্যান্য (ভীতিজনক) জিনিসকে বিশ্বাস করেছে।'

একজন মুসলমানের বিবেকের মধ্যে অবস্থিত আকীদা বিশ্বাসের মূল ভিত্তিই হচ্ছে এই 'না দেখে বিশ্বাস' ঈমান বিল গায়ব। এটিই হচ্ছে সেই শক্ত ভিত যার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আকীদা বিশ্বাসের গোটা ইমারত ও ব্যবহারিক জীবনের প্রাসাদ। আর এরই ওপর নির্ভর করছে আল্লাহর দেয়া সুদৃঢ় ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে খেলাফাতের আমানত বহন করা।

মানুষ আল্লাহকে দেখে না সত্য, কিন্তু তাদের অন্তরের মধ্যে তাঁকে ওরা তখনই খুঁজে পায় যখন তারা ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। বাহ্যিক চোখে তাঁকে দেখতে না পারলেও তাদের অন্তর তাঁকে বুঝে এবং ভয় করে।

আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করা ও একমাত্র তাঁকেই ভয় করার তাৎপর্য হচ্ছে তাঁর যমীনে তাঁর প্রভুত্ব কায়েমের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা। দিব্য দৃষ্টিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে কিনা বা পঞ্চেন্দ্রিয়

দ্বারা তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কিনা একজন মোমেনের কাছে এ প্রশ্নের কনামাত্র মূল্য নাই। তার জন্যে তাঁকে অন্তরের মধ্যে অনুভব করাটাই যথেষ্ট, বরং এই অনুভবই আসল আর এরই নাম শাহাদাত।

কারো অন্তরের মধ্যে যখন এই শাহাদাত গড়ে ওঠে, তখনই তার মুখে উচ্চারিত হয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।, অথচ এ সময় সে আল্লাহকে দেখে না! এইভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং এইভাবে সত্যকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানব জীবনের কল্যাণ ও অগ্রগতি সম্ভব। এরই মাধ্যমে তার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে এবং তার মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাবনাগুলো পূর্ণতা লাভ করে। আর এরই সাথে তার মধ্যে বিরাজমান সেই পাশব বৃত্তি দূরীভূত হয় যা গায়েবের খবর রাখে না এবং ঐ গায়েবের ওপর বিশ্বাসই মানুষের বৈশিষ্ট্য। এই বিশ্বাসের কারণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের উর্ধের অনেক কিছু সে অনুভব করে এবং এক বিশেষ সীমা পর্যন্ত তার অনুভূতি অগ্রসর হয়। এইভাবে বস্তুগত দ্রব্যের ব্যবহারে সে পশুর স্তর থেকে অনেক উর্ধের জীব বলে নিজেকে প্রমাণিত করে।

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষার তাৎপর্য জানিয়েছেন এবং মোমেনদের কাছে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়েছেন।

আর, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ভান্ডারের রহস্য থেকে তাকে সামান্য কিছু জ্ঞান দান করেন, যার ফলে সে আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। তবে আল্লাহ প্রদত্ত এই বিশেষ জ্ঞানের জন্যে তিনি কাউকে পাকড়াও করবেন না। সাধারণভাবে মানুষকে আল কোরআনের মাধ্যমে তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন, তার ওপরই মানুষের হিসাব নিকাশ হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

‘যে এই সীমা অতিক্রম করবে তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।’

আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষকে অনেক কিছুই জানিয়েছেন এবং এই পরীক্ষা করার কারণও তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। সতর্ক করেছেন তাকে এই পরীক্ষার বস্তুগুলোতে পতিত হওয়ার বিষয়ে এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন তার কাছে এর মধ্য থেকে কি কি ভাবে সাফল্য লাভ করা সম্ভব। এর পরেও যদি তারা সীমালংঘন করে, তাহলে তাদের পাওনা হয়ে যাবে ‘আযাবে আলীম (বেদনাদায়ক শাস্তি) এবং এটাই তাদের উচিত প্রতিদান। সে জেনে বুঝে এই অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে বলেই আল্লাহ তায়ালা তাকে শাস্তি দেবেন।

এহরাম বাধা অবস্থায় শিকারের কাফফারা

এসব নিষেধ অমান্য করে যে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কাজ করবে, তাকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার জন্যে আর একবার বিস্তারিতভাবে কাফফারার বর্ণনা আসছে,

‘হে ঈমানদাররা, শিকারের জীবজন্তু বা পাখীগুলোকে এহ্রাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না। যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করে এগুলোকে হত্যা করবে তার কাফফারা হচ্ছে, যে পশুকে সে হত্যা করবে তার মতোই একটি জীবকে কোরবানী করা। ঠিক কোন পশুটি তার বধ করা পশুটির সমান হবে তা তোমাদের মধ্য থেকে কোনো বিচার বিবেচনা ওয়ালা ব্যক্তি নির্ধারণ করে দেবে এবং এ পশুটিকে কোরবানী করার জন্যে কাবা শরীফে পৌছাতে হবে, অথবা কয়েকজন (দশজন, যেহেতু ইতিপূর্বে দশ জনের কথাই হয়েছিলো) মেসকীনকে খাওয়াতে হবে অথবা ৩ দিনের রোযা রাখতে হবে। (এ শাস্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে), যেন তার (নাফরমানীমূলক) কাজের মন্দ পরিণতি সে অনুধাবন করতে পারে।

পূর্বে করা ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে হয়তো আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেবেন; কিন্তু পুনরায় এ ধরনের অপরাধ করলে অবশ্যই তিনি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

এখানে খেয়াল করুন, মোহরেম ব্যক্তির প্রতি নির্দেশ হচ্ছে কোনো জীব-জন্তুকে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার না করা; তবে যদি কেউ ভুলক্রমে এরকম কোনো জীব হত্যা করে বসে সে অবস্থায় তার কোনো অপরাধ হবে না, তাকে কোনো কাফফারাও দিতে হবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলেই যে বস্তুকে হত্যা করবে তার সমমানের জীব কাফফারা হিসাবে সে কোরবানী করবে। সুতরাং উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোনো হরিণ শিকার করলে তার বদলে কোনো ছাগল বা ভেড়া, আর লাল উঁট হত্যা করলে তার বদলে কোনো গরু কোরবানী করা যেতে পারে। কোনো উঁটপাখি এবং জিরাফের বদলে কোনো হৃষ্টপুষ্ট উঁটনী এবং খরগোশ বিড়াল ইত্যাদির জন্যে অনুরূপ কোনো খরগোশ কোরবানী করা যাবে। আর হত্যা করা জীবের সমমানের কোনো জীব জন্তু যদি পাওয়া না যায়, সেগুলোর সমমানের মূল্য সদকা করতে হবে।

এই কাফফারার ফয়সালা করবে মুসলমানদের মধ্য থেকে দু'জন বিবেচক ব্যক্তি। অতপর এভাবে জবাই করার ফয়সালা করা হলে কাফফারার এই পশুকে কাবা শরীফের দিকে রওয়ানা করে দেয়া হবে এবং সেখানে পৌঁছুনোর পরই যবাই করে মেসকীনদেরকে খাইয়ে দেয়া হবে। কোনো জীব কাফফারা হিসাবে দেয়া যদি ফয়সালা না হয়, তাহলে মধ্যস্থতাকারীরা কাফফারা স্বরূপ নিহত জীবের সমান যে অংক নির্ধারণ করবেন তাই দিয়ে মেসকীনদের খাওয়ানো হবে। কোনো কোনো ফকীহ ব্যক্তির মতে কাফফারা স্বরূপ কোনো পশু যবাই করার ফয়সালা না হলে ৩ দিনের রোযা রাখতে হবে। অর্থাৎ শিকার করা জীব-জন্তুর মূল্য নির্ধারণ করে সেই মূল্য দিয়ে যে কয়জন মেসকীন খাওয়ানো যায় তাই খাওয়াতে হবে। আর এক দিনের রোযার বদলে একজন মেসকীন খাওয়ানো চলে; কিন্তু এ ফয়সালা অকাট্য নয়; স্থান-কাল পাত্র ভেদে এ ফয়সালার পরিবর্তন হতে পারে। কি কারণে এ কাফফারা দেয়া হবে, তা জানাতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'যেন তার কাজের মন্দ পরিণতি সে বুঝতে পারে।'

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, দোষী ব্যক্তি যেন বুঝে যে এ নিষেধ অমান্য করা কতো ক্ষতিকর। কারণ এখানে দোষ হচ্ছে কারো হুরমত বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, যার গুরুত্ব ইসলাম এতো বেশী দিয়েছে এবং এতো কঠিনভাবে দিয়েছে। অতীতের এসব অপরাধ মাফ করে দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে এবং যে এই অপরাধ করা থেকে বিরত না হবে, তার থেকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন।

'যা পূর্বে সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন, আর পুনরায় যে এই অপরাধ করবে তার কাছে থেকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশোধ নেবেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রতিশোধ নিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।'

এটা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর নির্ধারিত এই পরিপূর্ণ নিরাপদ এলাকায় কোনো ব্যক্তি যদি কোনো জীবের নিরাপত্তা নষ্ট করার শক্তি রাখতে পারে তো আল্লাহ তায়ালাও অবশ্যই তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন।

এতো গেলো মুহরিম এহরাম বাঁধা অবস্থায় কোনো ব্যক্তির স্থলভাগে শিকার করার প্রসংগ। এখন দেখা যাক সামুদ্রিক প্রাণী শিকার সম্পর্কে আল্লাহর বিধানে কি বলা হয়েছে। এহরাম বাঁধা থাকাবস্থায় অথবা এহরাম না বাঁধা থাকাবস্থায় উভয় অবস্থাতেই এ শিকার হালাল। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের জন্যে এবং অন্যান্য মুসাফিরদের জন্যে সামুদ্রিক জীব-জন্তু শিকার করা ও খাওয়াকে হালাল করা হয়েছে।'

অতএব, জানা গেলো সামুদ্রিক জীব জন্তু মোহরেম ও হালাল ব্যক্তি উভয়ের জন্যেই একইভাবে শিকার করাও হালাল আর খাওয়াও হারাম। আবার দেখুন যেখানে সামুদ্রিক জীব জন্তু শিকার ও খাওয়াকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে মোহরেমদের জন্যে ভূচর জীব জন্তুকে শিকার করাকে হারাম করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'যতোদিন তোমরা মোহরেম থাকবে, ততোদিন তোমাদের জন্যে ভূচর প্রাণীকে শিকার করা হারাম করা হয়েছে।'

যদিও মুহ্‌রেমদের জন্যে ভূচর প্রাণী হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী জ্ঞানের পন্ডিতদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে, কিন্তু মোহরেম ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পশু শিকার করে, তাহলে সেই পশুর গোশত কোনো মোহরেমের জন্যে খাওয়া হালাল কিনা সেই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবার 'শিকার' শব্দের অর্থ করতে গিয়েও এসব পন্ডিত বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁরা এ বিষয়েও মতভেদ করেছেন যে, সাধারণভাবে যে সব জীব জন্তুকে শিকার করা হয় শিকার করা দ্বারা সেইগুলোকে হত্যা করা বুঝানো হয়েছে, না এই অর্থের মধ্যে সর্বপ্রকার জীব জন্তু অন্তর্ভুক্ত, যদিও 'সয়দ' বা শিকার শব্দটির প্রয়োগ করা হয় সেই সব জীব জন্তুর জন্যে, যাদেরকে প্রকৃতপক্ষে 'শিকার' করা হয়। শিকার শব্দটি সবপ্রাণীর জন্যে ব্যবহৃত হলে তো 'সয়দ বা শিকার' শব্দটি ব্যবহার করা হতো না। পরিশেষে একটি হৃদয়গ্রাহী বাক্য ব্যবহার করে হালাল হারাম সম্পর্কিত এ প্রসংগটি শেষ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, অন্তরের মধ্যে তাকওয়ার অনুভূতি গড়ে তোলা এবং একদিন অবশ্যই আল্লাহর কাছে যেতে হবে এবং সকল কাজের জন্যে তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে-একথা জানিয়ে দেয়া।

'আর ভয় করো আল্লাহকে, যাঁর কাছে তোমরা একদিন একত্রিত হবে।'

কাবাও হারাম মাসের নিরাপত্তা বিধানের তাৎপর্য

এরপর, জানা দরকার এইসব নিরাপত্তার বিধান কেন?

এর কারণ হচ্ছে, একথা জানিয়ে দেয়া যে, এই হারাম শরীফের এলাকা গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে আল্লাহর ঘোষিত পরিপূর্ণ নিরাপদ এলাকা, যাতে করে মানুষ এই এলাকাতে প্রবেশ করে যুদ্ধ বিগ্রহের কষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। আর সেই এলাকা হচ্ছে পবিত্র কা'বা শরীফ এবং হারাম মাসগুলো হচ্ছে সেই মাসগুলো, যা যুদ্ধ-বাজ দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালেই যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। এ মাসগুলোতে দুনিয়ার যে কোনো দেশে, যে কোনো জাতি, যুদ্ধ, ঝগড়া, মতবিরোধ, যাতেই লিপ্ত থাকুক না কেন, এ মাসগুলোর আগমনে, সংগে সংগে থেমে যাবে, অস্ত্র সংবরণ করবে, হাত গুটিয়ে নেবে প্রতিপক্ষের ওপর থেকে। এ পক্ষদ্বয় যে কোনো উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করতে থাকুক না কেন, কোনো অর্থের লোভে, দেশ জয়ের মনোভাব নিয়ে, কোনো নারী ঘটিত ব্যাপারে, যাই হোক না কেন, এ মাসগুলোর আগমনে সর্বাবস্থায় অস্ত্র সংবরণ করবে। যে কোনো প্রয়োজনেই হোক না কেন, এমনকি কোনো মতভেদকে কেন্দ্র করেও কোনো ঝগড়া, তর্কবিতর্ক ইত্যাদি কিছুই করা যাবে না। এর ফলে, এ মাসগুলো আসার সাথে সাথে নানা মতে বিভক্ত অশান্ত ও যুদ্ধ-বিগ্রহে শ্রান্ত-ক্লান্ত মানবতা ভয়ের পরিবতে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে থাকে। ঝগড়ার পরিবর্তে লাভ করে শান্তি, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব। নিরাপত্তা ও শান্তির পায়রারা যেন এ সময়ের মধ্যে ডানা মেলে মানুষকে তার নীচে আশ্রয় দান করে এবং বাস্তবে মানুষকে শান্তির জন্যে প্রশিক্ষণ দেয়। শুধু দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে বা একটি মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই, অনুভূতির

মধ্যে পোষণ করা কোনো চিন্তা বা সুখ স্বপ্নও এটা নয়। প্রকৃতপক্ষে মানব কল্যাণের জন্যে এটা এমন এক বাস্তব পদক্ষেপ, যা কেউ কোনো দিন উপেক্ষা করতে পারেনি। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা কা'বাকে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে নিরাপদ এলাকা বানিয়েছেন এবং বানিয়েছেন তিনি হারাম মাসগুলো। সম্মানিত নিরাপদ করেছেন মানতের পশুগুলো ও আল্লাহর পথে ছেড়ে দেয়া এবং গলায় পট্টিবাঁধা জন্তুগুলোকে। এ ব্যবস্থা এই জন্যেই করা হয়েছে যেন তোমরা জেনে নাও যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সে সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং তিনি সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা কঠিনভাবে পাকড়াও করনেওয়ালা এবং তিনি ক্ষমাশীল মহা দয়াময়। রসূলের কাজ পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, আর, তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ সবই তিনি জানেন।'

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা শুধু মানুষের জন্যেই করেন নাই। বরং পশু পাখি, জীব জন্তু, পোকা মাকড় যারাই এই হারাম শরীফের এলাকায় আশ্রয় নেবে, তারা সবাই নিরাপত্তা লাভ করবে। আর এহরাম-এর মধ্যে মোহরেমদের জন্যে কিছু বিরতির সুযোগও রয়েছে, যেমন ৪টি হারাম মাসের মধ্যে রয়েছে কিছু বিরতি। আর এমাসগুলো হচ্ছে, যুলকা'দা যুল হজ্জ, মোহাররাম ও এরপর (কয়েকমাস বিরতির পর) রজব-এই সময়ের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ, ঝগড়া ফাসাদ মারামারি, হানাহানি সবই হারাম। আরবদের অন্তরে এমনকি জাহেলিয়াতের আমলেও এই মাসগুলোর প্রতি আল্লাহ তায়ালা শ্রদ্ধাবোধ পয়দা করে দিয়েছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তারা কাউকে ভয় দেখাতো না বা কাউকে হত্যাও করতো না অথবা কোনো এলাকা দখলের জন্যে তারা কোনো পরিকল্পনাও তৈরী করতো না বা কোনো আশাও পোষণ করতো না; এমনকি মানুষ তার নিজের বাপ, ছেলে ও ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখেও হত্যা করা দূরে থাকুক তাকে কোনো কষ্টও দিতো না। সুতরাং এ মাসগুলো পর্যটক, বাণিজ্য যাত্রী ও তীর্থ যাত্রী সবার জন্যে ছিলো সমান নিরাপত্তার সময়। এ সময়ে মানুষ দেশ বিদেশে নিরাপদে ভ্রমণ করতো। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা কাবাকেও মানুষের কাছে শ্রদ্ধার স্থান বানিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন এই এলাকাটি পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির এলাকা হোক এবং হোক সবার জন্যে নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে এসে মানুষ শান্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে এবং সর্বপ্রকার ভয় ভীতি ও সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে পারে। আর ঠিক একইভাবে (কাবা শরীফ যেমন ছিলো নিরাপত্তা ও শান্তির স্থান) হারাম মাসগুলোকেও আল্লাহ তায়ালা নিরাপত্তার সময় কাল বানিয়েছিলেন, এমনকি মোশরেকদেরকেও এ মাসগুলোতে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করা হয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে নিরাপত্তা সময়ও স্থানের গন্ডি পেরিয়ে বাইরেও পৌঁছে গেছে এবং অন্যান্য স্থান ও মাসে মানুষ শান্তিকামী ও শান্তিপ্রয়াসী হয়ে উঠেছে। আর এর অবশ্যম্ভাবী যে নেয়ামত মানুষ লাভ করেছে তা হচ্ছে, পরবর্তী কালে হেদায়াতপ্রাপ্তির জন্যে মানুষ কাবার দিকে দলে দলে ছুটে এসেছে, কাবামুখী হজ্জ বা ওমরা যাত্রীদেরকে তারা এতোটা শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে যে, তাদেরকে পথে কেউ কখনও আক্রমণ করেনি। এমন কি হারাম শরীফের গাছের কোনো ডাল যদি কোনো পশুর গলায় বেঁধে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাকেও কেউ স্পর্শ করেনি। তারা বুঝেছে এ পশুকে কাবা শরীফের জন্যে মানত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কাজেই তাকে কিছুতেই কষ্ট দেয়া যাবে না।

কাবা শরীফ ও হারাম মাসগুলোর প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ.)-এর হাতে এই পবিত্র ঘর নির্মিত হওয়ার দিন থেকেই গড়ে উঠেছিলো। সেই দিন থেকেই এঘর মানুষের আশ্রয় ও নিরাপত্তার স্থানরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। অথচ এর আশপাশ থেকে লোকদেরকে ছোঁ

মেরে নিয়ে যাওয়া হতো। অথচ একই সময়ে এই ঘরের মধ্যে দাখেল হতে পারলে, অথবা এর দিকে রওয়ানা হতে পারলেই মানুষ নিরাপদ হয়ে গেছে। এদতসত্তেও, হায়রে অকৃতজ্ঞ মানুষ! এই পবিত্র ঘরের ওসীলায় আল্লাহর এতো সব নেয়ামত লাভ করার পরেও তারা আল্লাহর শোকরগোযারী করা ভুলে গেছে এবং তাঁর হুকুম মানা থেকে বিরত থেকেছে এবং বরাবর তাঁর নাফরমানী করেই চলেছে, এমনকি খোদ বায়তুল্লাহকেও একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্যে তারা খাস রাখতে পারেনি। তাওহীদ (আল্লাহকে এক মাবুদ বলে মেনে নেয়া) আমাদের আহবানে তারা রসূলকে বলেছে, আমরা যদি তোমার সাথে হেদায়েতের পথ ধরি, তাহলে আমাদেরকে এলাকা থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই নিরাপত্তা লাভ ও ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার মোকাবেলা তারা যেভাবে করেছে এবং যে কথা বলেছে সেইগুলো উদ্ধৃত করে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আর তারা বললো, আর আমরা যদি তোমার সাথে হেদায়েতের অনুসরণ করি, তাহলে আমাদেরকে আমাদের এলাকা থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। অথচ, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি তাদেরকে এই নিরাপদ হারাম শরীফের মধ্যে বাসস্থান করে দেইনি, যেখানে আমার পক্ষ থেকে এবং আমি নিজ দায়িত্বে (দুনিয়ার) সকল এলাকা থেকে তাদের জন্যে সব কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী টেনে নিয়ে এসেছি এবং তাদের সর্বপ্রকার প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না (এবং বুঝার চেষ্টাও করে না)।

বোখারী ও মুসলিম– হাদীসের এ বিশুদ্ধ কেতাব দুটিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীস এসেছে, যাতে তিনি বলছেন, রসূলুল্লাহ (স.) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, অবশ্যই এ শহর পবিত্র ও সম্মানী, এর কোনো গাছ কাটা হবে না এবং এর চারা গাছকেও সাফ করে দেয়া হবে না, কোনো শিকারকে এখান থেকে তাড়ানো হবে না এবং কারো ফেলে যাওয়া জিনিসকে, শনাক্ত করে, যার মাল তার কাছে পৌঁছে দেয়া ছাড়া, কিছুতেই তুলে নেয়া হবে না।'

এখানে জীবন্ত কোনো বিশেষ বিশেষ প্রাণীর নাম নিয়ে বলা হয়নি, যাদেরকে হারাম শরীফের মধ্যে হত্যা করা যেতে পারে পারে, তবে উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে হযরত আয়শা (রা.)-এর বর্ণনায় আর একটি হাদীস পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর (যা মানুষকে কামড়ায়)-এই প্রাণীগুলো হত্যা করা যাবে। হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ,

রসূলুল্লাহ (স.) হেরেম শরীফ ও অন্যান্য (হালাল) এলাকায় নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি ক্ষতিকর প্রাণীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

'কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর (যা মানুষকে কামড়ায়)।'

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াতে সাপের কথাও বলা হয়েছে।

এইভাবে হযরত আলী (রা.) থেকে পাওয়া একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা জানা যায়, 'মদীনা হচ্ছে 'হারাম' এলাকা, অর্থাৎ 'ঈর'ও 'ছওর' পর্বত গুহাদ্বয়ের মধ্যবর্তী এলাকাটি সম্পূর্ণ নিরাপদ এলাকা। আব্বাদ ইবনে তামীমের একটি হাদীস বোখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ইবরাহীম (আ.) মক্কানগরীকে নিরাপদ (বা হারাম) এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন এবং তার জন্যে দোয়াও করেছেন, আর আমি মদীনা মোনাওয়ারাকেও হারাম (বা নিরাপদ) এলাকা বলে ঘোষণা করলাম– যেমন করে ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে ঘোষণা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে, শুধু সময় ও এলাকার মধ্যেই এই নিরাপত্তা সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং, নিরাপদ এই শহর দুটির অসীলায় মানুষের মন মগযের মধ্যেও নিরাপত্তার অনুভূতি পয়দা হয়ে গেছে।

আরব ভূখন্ডের মধ্যে যারা লুটতরাজ করতো এবং কাফেলার মানুষের সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে যেতো, মানুষের ওপর জবরদস্তি করতো, যাদের যুলুম নির্যাতনে গণ-মানুষের জীবন ছিলো দুর্বিষহ, তারা ইসলাম গ্রহণ এবং মদীনাকে 'হারাম' ঘোষণা করার পর শান্ত, ভদ্র ও মানুষের উপকারী বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলো, বরং এক কথায় বলতে গেলে এ দুটি শহর ও এ দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানের লোকদের মধ্যে দয়া-মায়া-মমতার প্রস্রবণ এমনভাবে প্রবাহিত হতে লাগলো যে, তাদের সংস্পর্শে যারা আসতে লাগলো তারাও সোনার মানুষে পরিণত হতে শুরু করল। বস্তুত নির্দিষ্ট নিরাপদ মাসগুলোতে পূর্ণ প্রশান্ত মন নিয়ে আল্লাহর যমীনের এদুটি শহর ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো যে নিরাপত্তা ও শান্তি পেলো তার প্রভাবে দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও এই অনুভূতি ছড়িয়ে ছিলো। দেখুন, নিগৃহীত, নিপীড়িত ও ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের জন্যে এবং ওই গোত্রীয় কোন্দলপূর্ণ এলাকায়, এই নিরাপত্তার কতো প্রয়োজন ছিলো! যারা ভ্রাতৃঘাতী বিবাদ-বিসম্বাদে সর্বস্বান্ত হতে চলেছিলো সেই কঠিন এলাকায় দ্বীন ইসলামের কল্যাণে প্রবাহিত হয়েছিলো শান্তির বন্যা, যার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'ওই (শান্তিপূর্ণ মাস ও স্থানের) নিরাপত্তা বিধান এই জন্যে করা হয়েছিলো যেন তোমরা জানতে পারো যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে এবং অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।'

আলোচ্য মূল বিষয়ের সমাপ্তিতে এ কথাগুলো অত্যন্ত বিস্ময়কর ও রহস্যাবৃত হলেও একটু চিন্তা করলেই এর অর্থ বেশ বুঝা যায়! নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল আইনই দিয়েছেন এবং ওই পবিত্র ভূমির বুকে স্থাপন করেছেন মহামানবের মহা সম্মেলন ক্ষেত্র, যাতে করে মানুষ ভালো ভাবেই জেনে নেয় যে, সকল জ্ঞানের আধার একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সব কিছু সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত। এই কথাগুলো বলে তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে, মানুষের প্রকৃতি কী চায়, তাদের প্রয়োজন কী এবং তাদের অন্তরের মধ্যে কোন কথা লুকিয়ে রয়েছে এবং তাদের আত্মার ডাক কী তা সবই মহান আল্লাহর জানা। সকল কিছু সম্পর্কে তাঁর এই পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি রচনা করে দিয়েছেন তাদের জন্যে যাবতীয় বিধান, যাতে করে তাদের সকল প্রকার প্রয়োজন মেটে, তাদের অন্তরের গোপন চাহিদা পূরণ হয় এবং তাদের আগ্রহের জিনিসগুলো তারা তৃপ্তির সাথে কাছে পেতে পারে। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে মানুষ যখন সকল শরয়ী বিধান জানতে পারে এবং আল্লাহর রহমত অনুভব করে এবং মানব প্রকৃতি ও আল্লাহর বিধানের মধ্যে এই চমৎকার সামঞ্জস্য দেখতে পায়, তখন সে সঠিকভাবেই বুঝতে পারে যে কিসে কি হবে। আর মানব প্রকৃতির সার্বিক শান্তি ও কল্যাণের জন্যে কি প্রয়োজন তা আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানেন এবং সেই সর্বব্যাপী জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি সকল ব্যবস্থা দেন।

অবশ্যই, প্রকৃতির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে এবং তার সকল চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আল্লাহর দেয়া এই 'দ্বীন' বড়ই চমৎকার। শরীয়তের সিদ্ধান্তগুলো মানব প্রকৃতির সিদ্ধান্ত ও চাহিদা অনুযায়ী রচিত। এইভাবে মানুষের বুকের মধ্যে যখন আল্লাহর দ্বীনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তৃপ্তি গড়ে ওঠে, তখন এই দ্বীনের সৌন্দর্য ও মানুষের জন্যে এর কার্যকারিতার অনুভূতি তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর তখনই দ্বীন ইসলামের সকল ব্যবস্থা তার কাছে এতো ভালো লাগে, যা সে ব্যক্তি কখনো বুঝবে না, যে এই দ্বীনের ছায়াতলে আশ্রয় পায়নি।

এহরামে থাকাবস্থায় এবং এহরাম ভাংগার পর হালাল ও হারামের যে বিধান রয়েছে এখানে তার আলোচনা শেষ করা হচ্ছে এই কথার ওপর যে, এই সীমা লংঘন করলে তারা বেদনাদায়ক

শাস্তি পাবে এবং এই সীমা যারা মেনে চলবে, তারা আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য হবে এবং ক্ষমা পাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর জেনে নাও যে, আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তি দেয়ার মালিক এবং তিনি মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান।'

সতর্ক করা দ্বারা যেমন উৎসাহিত করা হয়, তেমনি বিরোধীদের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আল্লাহর হুকুম পালন করা সহজ হয়ে যায়। অথচ আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে কেউ কোনো উপকারই পেতে পারে না। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে,

'রসূলের দায়িত্ব পৌঁছে দেয়া ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সব জিনিস জানেন, যা তোমরা প্রকাশ করছো অথবা গোপন করছো।

মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী

'তারপর এ কথাটি শেষ করা হচ্ছে একটি বিশেষ মাপকাঠির দিকে ইংগিত করে, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর মূল্যায়ন করেন। মুসলমানরাও ওই ভাবেই প্রতিটি জিনিসের মূল্যায়ন করে এবং সর্ব বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এই মাপকাঠির দ্বারাতেই পবিত্র জিনিসগুলোকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এবং মন্দ জিনিসগুলোকে বর্জন করা হয় যাতে করে মুসলমানেরা কোনো সময় এবং কোনো অবস্থাতে বাতিল শক্তির আধিক্য দেখে ধোকা না খায়।

'বলে দাও, অপবিত্র ও পবিত্র (মন্দ ও ভালো বা মিথ্যা ও সত্য) কখনো সমান নয়, যদিও অনেক সময় বাতিল শক্তির আধিক্য বা বাতিলপন্থীদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের চোখে চমক লাগিয়ে দেয়। অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা (একমাত্র) আল্লাহকেই ভয় করো, তাহলেই তোমরা সাফল্যমন্ডিত হবে।'

এ প্রসংগে, যে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে মিথ্যার সাথে সত্যের তুলনা করা হয়েছে অথবা মন্দের সাথে ভালোর পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা হচ্ছে, শিকার করা ও খাদ্য খাবারের মধ্যে হালাল হারাম পার্থক্য করা। যা কিছু হারাম করা হয়েছে তাই মন্দ বা অপবিত্র এবং যা কিছু হালাল করা হয়েছে তাই ভালো বা পবিত্র। মন্দ ও ভালো কখনও বরাবর হয় না, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাদেরকে অনেক সময় মুগ্ধ করে দেয় বা তোমাদের চোখে চমক সৃষ্টি করে। জেনে রেখো আল্লাহর অনুমোদিত হালাল বা ভালো জিনিসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্যে সমূহ কল্যাণ ও উপকার, যার পরিণতিতে লজ্জিত হওয়ার বা কোনো কিছুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই, নেই কোনো ব্যাধি-নিরাময়ের পর অবশ্যম্ভাবী দুর্বলতার মতো কোনো প্রতিক্রিয়া। আর মন্দের মধ্যে উপস্থিত যে ভালো দিকটি দেখা যায় বা তাৎক্ষণিকভাবে যে স্বাদ পাওয়া যায়, তা মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অবশ্যই ভালো বা হালাল জিনিসের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ভারসাম্য বিরাজ করে; সাথে সাথে মন্দ প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্যে নিরাপত্তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাও থাকে। এ নিরাপত্তা যেমন পার্থিব জীবনে, তেমনি আখেরাতেও। আর কুপ্রবৃত্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে একটু বুদ্ধি খরচ করলে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করতে পারলে যে কোনো ব্যক্তির জন্যে মন্দ বা হারাম জিনিস পরিহার করে হালাল জিনিস গ্রহণ সহজ হয়ে যাবে। এর ফলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হওয়া সম্ভব হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো হে বুদ্ধিমানেরা, তাহলেই তোমরা সাফল্য মন্ডিত হবে।'

মন্দের ওপর ভালোর বিজয় অবশ্যম্ভাবী– এটিই এখানকার আলোচনার মূল বিষয়। কিন্তু এরপরও আল কোরআনের লক্ষ্য আরও অনেক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। যা গোটা জীবনকে

সামনে রেখে কথা বলে এবং এই জন্যেই আল্লাহর কালামের বহু স্থানে এ বিষয়ের ওপর ব্যাপকভাবে কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই উম্মতকে বের করেছেন (গোটা মানব মন্ডলীর মধ্য থেকে) এবং বানিয়েছেন তাকে এমন এক আদর্শ উম্মত যারা সকল মানুষের জন্যেই সর্বপ্রকার ভালো জিনিস পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।'

তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আমানত বহন করার দায়িত্ব পালন করা, অর্থাৎ তারা দুনিয়ার সর্বত্র এ বিধান চালু করার চেষ্টা করে যাবে যাতে এমন শান্তি ও কল্যাণের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয় যা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি এবং মানব জীবনের সর্বত্র এ বিধানকে এমনভাবে কায়েম করবে যা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি, অর্থাৎ পূর্ণাংগভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর এ দ্বীন কোনো যামানায় বা কোনো দেশে পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুসলিম উম্মাহ এ জীবন বিধানকে কায়েম করার জন্যে দীর্ঘ যে সময়কাল ধরে সংগ্রাম করে চলেছে এতো দীর্ঘ সময় ধরে অন্য কোনো উম্মত আল্লাহর বিধান পালনও করতে পারেনি বা প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হয়নি। মুসলিম উম্মাহ তো সর্বপ্রথম জাহেলিয়াতের রীতিনীতি উৎখাত করার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে, তারপর ইসলামের সম্মোহনী মতাদর্শকে দুনিয়ার বুকে কায়েম করে মানুষকে শান্তি ও কল্যাণের ছায়াতলে টেনে নিয়ে এসেছে এবং মুক্ত করেছে তাদেরকে চিন্তার বিপর্যয় ও কদর্য ব্যবহারের পঙ্কিলতা থেকে। মুক্ত করেছে তাদেরকে জাহেলী যামানার সর্বপ্রকার ভ্রান্তি ও মিথ্যা আবেগের জাল থেকে, যার মধ্যে তারা শত শত বছর ধরে আবদ্ধ থেকে কষ্ট পাচ্ছিলো। এরপর সত্যের পতাকা বহন করার জন্যে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যেন এ মহা সত্যের ঝান্ডাতলে আগত মানুষ সর্বাধিক কল্যাণ ও শান্তি পেতে পারে। এইভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই মানুষ অনুধাবন করেছে যে, সত্য আর মিথ্যা, হালাল ও হারাম বরাবর নয়। মিথ্যার চাকচিক্য যতো চমকপ্রদই হোক না কেন, তা ক্ষণস্থায়ী। এইভাবে সত্য সমগত হওয়ার পর, বিশ্ববাসী তা মুগ্ধ নেত্রে অবলোকন করেছে। কিন্তু আফসোস, দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের কারণে এবং সত্যের পতাকাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াস ও প্রচেষ্টা স্তিমিত হয়ে যাওয়ার ফলে সর্বত্র মুসলমানেরা আজ লাঞ্ছিত। যেদিন আবার মুসলমান আল্লাহমুখী হয়ে যাবে, সত্যের ঝান্ডাকে বুলন্দ করার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে এগিয়ে আসবে, উন্নত চরিত্র ও ব্যবহারের সৌন্দর্যে মানুষকে সত্যের সমুজ্জ্বল চেহারা দেখাতে সক্ষম হবে, তখনই স্বল্প সংখ্যক হলেও তারা পৃথিবীর মানুষকে সত্যের দিকে এগিয়ে আনতে পারবে এবং তখনই আল্লাহর ইচ্ছায় তারা পৃথিবীর পরিচালকের পদে নিয়োজিত হবে আর তখনই মানুষ দলে দলে সত্যের দিকে এগিয়ে আসবে এবং তখনই অসত্যের জারিজুরি খতম হয়ে গিয়ে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে, আল্লাহ প্রদত্ত বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এই সত্যকে গ্রহণ করবে এবং বাতিলপন্থীদের সংখ্যাধিক্য দেখে কেউ আর ধোকা খাবে না।

ইসলামের সুবিচার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখনই মিথ্যার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং মানুষকে দলে দলে ইসলামের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যাবে। আর তখনই মুসলমানদের সাফল্য, সংখ্যাধিক্য ও শক্তি নযরে পড়বে। সে সময় সেই সব মোমেন যারা আল্লাহর মানদন্ডে নিজেদেরকে ওযন করেছে, তারা মুগ্ধ নয়নে দেখতে থাকবে মিথ্যা ও অপশক্তির বিপর্যয়। তখন তাদের হাত পেরেশানীতে কাঁপতে থাকবে না। তাদের চোখগুলো আর বিভ্রান্ত হবে না, হবে না

তাদের মানদন্ড ক্ষুণ্ন বরং তখন তারা সেই সত্যের ওপর দন্ডায়মান থাকবে, যা বুদবুদের মত নিভে যাওয়ার নয়, বা তা ক্ষণস্থায়ী কোনো ফেনার মতো নয়, যা মৃদুমন্দ বাত্যা-তাড়িত হয়ে অচিরেই মিলিয়ে যায়, বা এমন কোনো নগণ্য সংখ্যাও তারা হবে না যাকে উপেক্ষা করা যায়। চিরন্তন এ সত্য তার নিজ মূর্তি ও মর্যাদায় সমাসীন হবে, তার নিজের ওযনেই তা হবে ভারী, তার সৌন্দর্য ও ক্ষমতায় তা হবে ক্ষমতাসীন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই উম্মতকে গড়ে তুলেছেন আল কোরআনের আলোকে ও রসূল (স.)-এর পরিচালনায়, যার কারণে তারা এতটা মর্যাদার অধিকারী হয়েছে যা আল্লাহর দ্বীনের ওপর টিকে থাকার ফলেই সম্ভব। অবশ্যই আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারে তাদের এই মর্যাদার কথা বিদ্যমান রয়েছে। এ সেই উম্মত, যারা তাদের অন্তর ও বিবেকের মধ্যেই শুধু এই মহান দ্বীনকে পোষণ করছে না, বরং পৃথিবীতে তাদের জীবন জীবিকার মধ্যে এ দ্বীনকে তারা উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর করে রেখেছে, রেখেছে এ দ্বীনের শিক্ষাকে জীবন্ত করে তাদের আবেগ অনুভূতিতে তাদের, আশা আকাংখার মধ্যে, তাদের নফসের চাহিদার মধ্যে, তাদের জীবনের সংঘাতও সন্ধির মধ্যে, ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে যখন তারা বিজয়ী হয়েছে তখনও এই দ্বীনের মহান শিক্ষাকে ভুলে যায়নি, তারপর যখন তারা বিপুল সংখ্যক জনগণের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করেছে তখনও তাদেরকে পরিচালনা করতে গিয়ে দ্বীনের মনোহারী শিক্ষাকে তারা কখনও উপেক্ষা করেনি।

মর্দে মোমেনকে আল কোরআন আরও বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, প্রভাবিত করেছে তার গোটা সত্তাকে আরও নানা উপকরণ দ্বারা, আরও পরীক্ষা নিরীক্ষায় ফেলে বেঁধেছে তাকে আল্লাহর বজ্র কঠিন আইনের বাঁধনে। আর এ সব কিছুর বন্ধন মযবুত হয়েছে একটি মাত্র রশিতে আর তা হচ্ছে তার মন মগযে, তার ধ্যান ধারণায়, তার চিন্তা ও অনুভূতিতে, তার ব্যবহার ও চরিত্রে, তার জীবনের আইন কানুন ও সাংগঠনিক তৎপরতায় একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা, যা আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনের মাধ্যমে তার সামনে পেশ করেছেন এবং যে দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করাকে তিনি তার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করেছেন সেই দ্বীনের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাকে আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে, সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের লোককে তার পরিচালনা করতে হবে-এটা অবশ্যই তার দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনের মাধ্যমে এই উম্মতকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের দ্বারা তিনি কি চান, আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছাকে চালু করবেন এবং তিনি পৃথিবীর বুকে তাঁর আলোকময় ব্যবস্থাকে অবশ্যই বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেনই করবেন। তিনি মানুষকে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যখন তারা অবিরাম গতিতে সংগ্রামরত থাকবে, তখন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অবিরতভাবে সাহায্য করতে থাকবেন।

বেশী বেশী প্রশ্ন করা একটি মারাত্মক বদঅভ্যাস

এরপর আলোচনা আসছে মুসলিম জামায়াতকে কি ভাবে গড়ে তোলা হবে এবং আল্লাহর রসূল (স.)-এর সাথে তারা কি ব্যবহার করবে সে বিষয়ের ওপর। এই আদব শেখাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, আল্লাহর রসূল নিজে না জানানো পর্যন্ত যেন তাঁকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে পেরেশান না করা হয়। জানানো হচ্ছে, বেশী প্রশ্ন করলে হয়ত এমন কিছু কথা বা সিদ্ধান্ত আসবে যা মুসলমানদের জন্যে ক্ষতিকরই হবে, বা এমন কোনো হুকুম এসে যাবে যা পালন করা তাদের জন্যে কঠিন হয়ে পড়বে অথবা যে সব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ছাড় দিয়েছেন তার মধ্যে সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা এসে যাবে অথবা আল্লাহর রহমত সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, কোনো বিষয় সম্পর্কে বেশি প্রশ্ন করো না, এমন হতে পারে, তোমাদের বেশী বেশী প্রশ্ন করায় এমন কিছু প্রকাশ করে দেয়া হবে, যা তোমাদের জন্যে কষ্টকর হয়ে যাবে। আর কোরআন নাযিল হওয়ার সময়ে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো ওইসব অনাকাংখিত জিনিসকে প্রকাশ করেও দেয়া হতে পারে যাতে তোমাদের কষ্ট হবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (অতীতের ভুল-ভ্রান্তিগুলো) মাফ করুন। অবশ্যই তিনি মাফ করনেওয়ালা বড়ই সহিষ্ণু। তোমাদের পূর্বে এইভাবে বেশী বেশী প্রশ্ন করে কোনো কোনো জাতি কাফেরে পরিণত হয়েছে। যেহেতু প্রশ্নের জওয়াবে যে ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তা তারা পালন করতে সক্ষম হয়নি।

ইসলাম আগমনের প্রথম দিকে (ব্যস্ততাবশত অথবা অতি আগ্রহে) কিছু সংখ্যক সাহাবা রসূলুল্লাহ (স.)-কে এমন সব বিষয়ে বেশী বেশী প্রশ্ন করে বসেছেন যার সম্পর্কে তখনও কোনো বিধি নিষেধ নাযিল হয়নি, অথবা এমন হয়েছে, আল কোরআন যে সব বিষয়ে সংক্ষেপে বা ইংগিতে বলেছে, যার বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তায়ালা দিতে চাননি, কিন্তু এ ব্যস্ত বাগীশ লোকেরা তার বিস্তারিত বিবরণ চেয়ে বসেছে, অথচ ওই সব বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন মানুষ কিছু প্রশস্ততা বা ছাড় পাক। এরপর বারবার প্রশ্ন করায় সে বিষয়ে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসে যাবে, তখন প্রশ্নকারী কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে অথবা মুসলমানদের অন্য কারো ওপর কষ্ট এসে যাবে, এই জন্যে বেশী প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

বর্ণিত হয়েছে, হজ্জ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে একজন জিজ্ঞাসা করে বসল, প্রত্যেক বছরেই কি হজ্জ করতে হবে? রসূল (স.)-এর কাছে কথাটি খারাপ লাগলো। হজ্জ সম্পর্কে আয়াতটি ছিলো সংক্ষিপ্ত।

'যে সব ব্যক্তি পথ খরচ যোগাড়ে সক্ষম তাদের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক।'

এ আয়াতে বুঝা গেলো একবার হজ্জ করাই যথেষ্ট। তবু প্রত্যেক বছরেই হজ্জ করতে হবে না কি? এ প্রশ্ন দ্বারা ব্যাখ্যা চেয়ে কঠিন করে নেয়া হয়, যা আল্লাহ তায়ালা চাননি।

দারা কুতনী তিরমিযী শরীফে একটি মুরসাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে আলী (রা.) বলছেন, 'এই আয়াতটি যখন নাযিল হলো, তখন অনেকে বলে উঠলো ইয়া রসূলাল্লাহ প্রত্যেক বছরেই কি এই হজ্জ করতে হবে? তখন রসূলুল্লাহ (স.) চুপ থাকলেন। আবারও এ লোকগুলো বললো, 'প্রত্যেক বছরেই কি?' রসূল (স.) বললেন, না- আমি যদি বলতাম হাঁ, তাহলে ওদের ওপর প্রত্যেক বছরে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যেতো। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয়।

দারা কুতনীও আবু হোরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে একটি হাদীস এনেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উঠে বললো, 'প্রত্যেক বছরেই কি ইয়া রসূলাল্লাহ?' এতে রসূলুল্লাহ (স.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় দাঁড়িয়ে বললো, প্রত্যেক বছরেই কি ইয়া রসূলাল্লাহ? তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'কে বলছে একথাটি? উপস্থিত সাহাবারা বললেন, 'অমুক।' রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যার হাতে আমার জীবন রয়েছে তার শপথ, যদি বলতাম 'হাঁ' তাহলে এটা বাধ্যতামূলক হয়ে যেতো; আর প্রত্যেক বছরে হজ্জ বাধ্যতামূলক হয়ে গেলে এটা তোমাদের শক্তির বাইরে চলে যেতো। আর শক্তিতে না কুলানোর কারণে আদায় করতে না পারলে অবশ্যই তোমাদের কুফরী করা হয়ে যেতো।' অতপর আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

'হে মোমেনরা, তোমরা এমন কোনো প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট হবে।'

মুসলিম শরীফে আনাস (রা.)-এর বরাতে একটি হাদীস আনা হয়েছে, বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, আমি (আমার নবুওতের) এ দায়িত্বে থাকাকালে, আমি নিজে তোমাদেরকে না জানানো পর্যন্ত কোনো কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। (১)

তখন প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ (এই অবান্তর কথাটি জিজ্ঞাসা করায় যে অপরাধ হয়েছে) তাতে আমার যায়গা কোথায় হবে? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'দোযখ'। তখন আদুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ আমার বাপ কে! তিনি বললেন, তোমার বাপ হুযাফাহ। ইবনে আব্দুল বার বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ হচ্ছেন পুরাতন ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন, তিনি আবিসীনিয়াতে দ্বিতীয়বারে হিজরত করেছেন এবং বদর যুদ্ধেও যোগদান করেছেন। এই কথোপথনের মধ্যে একটু মস্কারি করা হয়েছে! তাঁকে ইরানের বাদশাহ কেসরার কাছে রসূলুল্লাহ (স.)-এর চিঠি নিয়ে দূত হিসাবে পাঠানো হয়েছিলো। যখন তিনি বললেন, আমার বাপ কে ইয়া রসূলাল্লাহ? রসূল (স.) বলেছিলেন তোমার বাপ আবূ হুযাফাহ্-এতে আব্দুল্লাহর মা বললেন, 'আমি আপনার ঔরসজাত কোনো ছেলে আছে বলে শুনিনি। আমি কি নিরাপত্তা পাবো যদি আমি বলি, আপনার মা জাহেলী যামানার মেয়েদের মতো কারো সাথে অবৈধ মেলা মেশা করেছেন এবং তিনি লোকদের মধ্যে এটা প্রকাশ করে দিয়ে নিজেকে বদনাম করেছেন? তখন রসূল (স.) বললেন, আল্লাহর কসম, কোনো কালো ক্রীতদাসও যদি আমাকে তার বাপ বলতে চায় তাকে অবশ্যই আমি ছেলে বলে স্বীকার করে নেবো।

ইবনে জারীর আবূ হোরায়রাহ (রা.) থেকে আর একটি হাদীস পেশ করেছেন, এতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.) একদিন ক্রোধান্বিত অবস্থায় বের হলেন, রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিলো, তিনি মেম্বরে এসে বসলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার অবস্থান কোথায়? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'দোযখ।' আর একজন দাঁড়িয়ে বললো, 'আমার বাপ কে? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'তোমার বাপ হুযাফাহ।' তখন ওমর এবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, আমরা আল্লাহকে রব, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা, মোহাম্মদ (স.)-কে নবী এবং আল কোরআনকে আমাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। ইয়া রসূলাল্লাহ, জাহেলিয়াতের যামানায় আমরা নানা প্রকার পাপ ও শেরকের মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, আর আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কে আমাদের বাপ।' রেওয়ায়াতকারী (আবু হোরায়রা রা.) বলেন, এ কথায় তাঁর (রসূলুল্লাহ স.-এর) রাগ থেমে গেলো এবং নীচের আয়াতটি নাযিল হলো,

'হে মোমেনরা, তোমরা এমন কোনো জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করো না ...... শেষ পর্যন্ত।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মোজাহেদ একটি রেওয়ায়াত এনেছেন, তাতে বলা হয়েছে, এ আয়াতটি একদল লোকের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিলো, যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলো, বাহীরা, সায়েবা, অসীলা ও হাম সম্পর্কে। সাঈদ ইবনে জুবাইরের একটি মতোও একথার সমর্থনে এসেছে। আর তিনি বলেন, তুমি কি দেখছ না যে পরে অবতীর্ণ হয়েছে,

---

(১) ইবনে জারীর হযরত আনাস (রা.) থেকে আর একটি রেওয়ায়েত এনেছেন, তাতে বলা হয়েছে, 'ওরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে এতো বেশী জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে, এক পর্যায়ে বেশ বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো, তখন একজন অন্য একজনকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, এই লোকটি বলেছে। এ বিষয়ে ইবনে জারীর আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে আর একটি হাদীস এনেছেন যা যথা স্থানে পেশ করা হবে।

এসব রিওয়ায়েতের সবগুলোতেই একটি সুর ধ্বনিত হয়েছে, অর্থাৎ মোমেনদেরকে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

কোরআনুল কারীম শুধু মানুষের আকীদা শোধরানোর জন্যে বা কিছু আইনের কথা জানানোর জন্যেই আসেনি, বরং একটি জাতিকে সকল দিক দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং একটি সুসংগঠিতও সুন্দর সমাজ গঠন করে সেই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নৈতিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দান করে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ মানব দল গড়ে তুলেছে। তাই দেখা যায় এখানে প্রশ্ন করার আদব শেখানো হয়েছে, আলোচনার সীমা জানানো হয়েছে এবং জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর এই লক্ষ্যেই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এই শরয়ী বিধান নাযিল করেছেন এবং গায়েবের খবর দিয়েছেন। আদব বা শৃংখলার দাবী হচ্ছে, সে তুচ্ছ একজন বান্দা, মুনিবের কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাওয়ার অধিকার তার নাই, তার কোনো অধিকার নেই মুনিবের অজানা রহস্যের দ্বার উদঘাটনের অপচেষ্টা করা অথবা যেটুকু প্রকাশিত হয়ে রয়েছে তা চাপা দেয়ার জন্যে চেষ্টা করার। সর্বজ্ঞানী এবং সব জিনিস সম্পর্কে আল্লাহর এই সীমানায় যদি কেউ প্রবেশ করার চেষ্টা করে, তাহলে সে শেষ বিচারের দিন কোনো যুক্তি বা দলীল তার পক্ষে খুঁজে পাবে না এবং এটা হবে সম্ভাবনার বাইরের এক প্রচেষ্টা। এমনি করে গায়েবের পর্দা চিরে সেই রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করা যা আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করেন নাই – হবে এক ব্যর্থ প্রয়াস। আর আল্লাহ তায়ালা তো মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। তাই তিনি তার জন্যে সেই আইন দিয়েছেন যা মানা তার শক্তির মধ্যে রয়েছে এবং গায়েবের খবর আল্লাহ তায়ালা তাকে এতোটা দেন যা তার প্রকৃতি বরদাশত করতে পারে। আরও কিছু বিষয় আছে যা সংক্ষিপ্ত অথবা অস্পষ্ট। সুতরাং সে বিষয়ে মানুষের নীরবতা অবলম্বন করাই উচিত– এটিই আল্লাহ তায়ালা চান। কিন্তু, এ সব বিষয়ে নবী (স.)-এর জীবদ্দশায় এবং কোরআনে করীম নাযিল হওয়ার বিরতির সময়ের মধ্যে প্রশ্ন করা মোটেই উচিত নয়। কারণ ওই প্রশ্নের জবাব দিলে সে জবাবের কোনো কোনোটি তাদের কাছে খারাপ লাগবে এবং তাদের সবার কাছে এবং পরবর্তী লোকদের জন্যে তা বড়ই কঠিন হয়ে যাবে।

এই জন্যে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে অনেক জিনিস জিজ্ঞাসা করতে মানা করেছেন, যেহেতু ওই তমসাবৃত কিছু রহস্য প্রকাশিত হলে তাদের কাছে খারাপ লাগবে এবং তাদেরকে এই বলেও তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মানা করা সত্তেও যদি তারা নবী (স.)-এর জীবদ্দশায় এবং ওহী নাযিল হওয়ার সময়ের মধ্যে বেশী কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহলে অবশ্যই তা তাদের জন্যে ক্ষতিকর হবে এবং নানা প্রকার কষ্টের মধ্যে তারা পড়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ওই সব কষ্ট মাফ করুন। আমাদের ওপর তো প্রশ্ন করা জরুরী বানানো হয়নি। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়লে তোমাদের কাছে খারাপ লাগবে। আর কোরআন নাযিল হওয়ার সময়ের মধ্যে (নবুওতের যামানায়) প্রশ্ন করা হলে অবশ্যই তোমাদেরকে তার জবাব দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা মাফ করুন এসব মন্দ অবস্থা থেকে।'

অর্থাৎ, যে সব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি বা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, সে সব বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করে জটিলতার মধ্যে পড়ে যেয়ো না, কারণ সংক্ষিপ্তভাবে বলায় বা অস্পষ্ট রাখায় তোমাদের জন্যে প্রশস্ততা রয়েছে; যেমন হজ্জ সম্পর্কে, যার কথা বিস্তারিত কিছুই বলা হয়নি।

শরীয়তের অতি বিশ্লেষণ করার পরিণাম

এরপর এ বিষয়টিকে পূর্ববর্তী লোকদের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। তারা ছিলো আহলে কেতাব এবং তাদের মধ্যে অনেকে এভাবে বেশী বেশী প্রশ্ন করে নিজেদের ওপর আল্লাহর কঠিন হুকুম চেয়ে নিয়েছিলো, এতে তাদের কষ্টই বেড়েছে, কারণ যখন প্রশ্ন করায় কোনো কিছু বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছিলো তখন তাদের তা পালন করতে অস্বীকার করে তারা কাফের হয়ে গিয়েছিলো। অতিরিক্ত কথা জিজ্ঞাসা না করে তারা যদি চুপ থাকতো এবং বিষয়গুলোকে যদি সেইভাবে সহজভাবে গ্রহণ করতো যেমন আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন, তাহলে তাদের জন্যে সেগুলো পালন করা সহজ হতো এবং তাদের এই ত্রুটি হতো না ও কুফরীর অপরাধে লিপ্তও হতে হতো না।

সূরায়ে বাকারাতে আমরা দেখে নিয়েছি বনি ইসরাইল জাতিকে যখন বিনা শর্তে এবং কোনো প্রকার চিহ্নের উল্লেখ না করে একটি গরু যবাই করতে বলা হয়েছিলো, তখন যে কোনো গরু যবাই করলেই তারা পারতো। কিন্তু তারা এ গরুর গুণ, প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কেমন হবে জানতে চেয়ে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করে এবং এইভাবে গরুর বর্ণনাকে এমন কঠিন করে ফেললো যে, ওই গুণ সম্পন্ন গরু বা গাভী পাওয়া ভীষণ কঠিন হয়ে গেলো। এসব না করে যে কোনো একটি গরু তারা সহজেই যবাই করে দিতে পারতো।

অনুরূপ বিষয় ছিলো সাব্ত বা শনিবারে মাছ না ধরার ব্যাপারটি, যেটা তারা সহজে পালন করতে পারতো। কিন্তু সেখানেও নানা প্রকার টাল বাহানা করে তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর গযব ডেকে নিলো। এইভাবে বনি ইসরাইল জাতি প্রশ্ন করে করে নিজেদের ওপর অনেক জিনিসই হারাম করে নিয়েছিলো এবং সে সব বিধি নিষেধ পালন করতে না পেরে অবশেষে শাস্তিতে পতিত হয়েছিলো। সহীহ বোখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমাদেরকে যে সব জিনিসের ওপর ছেড়ে গেলাম তার ওপরই আমাকে থাকতে দাও, আর বনী ইসরাইল জাতি তোমাদের পূর্বে ধ্বংস হয়ে গেছে বেশী বেশী প্রশ্ন করে এবং নবীর সাথে নানা প্রকার মতভেদে লিপ্ত হতে গিয়ে।

এই সহীহ হাদীসে যে কথাটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে কিছু জিনিস বাধ্যতামূলক করেছেন, সেগুলোকে লংঘন করো না। কিছু জিনিস নিষেধ করেছেন সেগুলোকে তোমরা বৈধ করে নিয়ো না, আর কোনো কোনো বিষয়ে চুপ থেকেছেন তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে গিয়ে, ভুলে গেছেন বলে নয়, সুতরাং জিজ্ঞাসা করে তোমরা সেগুলো নিজেদের ওপর জটিল করে নিয়ো না।'

সহীহ মুসলিম শরীফে সা'দ (রা.) থেকে একটি হাদীস এসেছে, তাতে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মুসলমান সমাজে সেইসব মুসলমান সর্বাধিক অপরাধী, যাদের প্রশ্নের কারণে কোনো জিনিসকে হারাম করে দেয়া হয়েছে, আসলে এগুলো হারাম ছিলো না।'

সম্ভবত কোরআনে কারীমে উল্লেখিত ইসলামের এই সব কথা উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে বুঝা সহজ হয়েছে। ইসলামে বুঝার বিষয় হচ্ছে, এ জীবন ব্যবস্থা আমাদেরকে তাই দিতে চায় যা প্রকৃতপক্ষে আমাদের দরকার। যে বিষয়গুলো এ পাক কালামে বর্ণিত হয়নি, বুঝতে হবে সেগুলো আমাদের শক্তির বাইরে বলেই স্পষ্ট করে না বলে গোপন রাখা হয়েছে। সেগুলো জানানোতে মানুষের কোনো উপকার থাকলে দয়াময় মালিক সেগুলো অবশ্যই সাফ ছাপ করে বলে দিতেন। সুতরাং তিনি যখন নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তখন আমাদের না পাওয়া কোনো জিনিসের জন্যে কৌতূহলী হওয়া উচিত নয়। আমরা স্পষ্টভাবে বর্ণিত কথাগুলো পেয়ে তৃপ্ত না থাকতে পারলে সেটা আমাদের জন্যে অকল্যানকরই হবে এবং অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে আল্লাহর

রহস্যের অজানা জিনিসের সন্ধানে যে চেষ্টা চালাবো, তাতে আমাদের উপকারের পরিবর্তে শুধু ক্ষতিই হবে, কারণ যুক্তিহীন এই প্রয়াস ভুল পথেই নিয়ে যায়।

শরীয়তের বিধানের প্রকৃতিই হচ্ছে এ বিধান আমাদেরকে ততোটুকুই দিতে চায় এবং তখনই দিতে চায় যখন প্রকৃতপক্ষেই বিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়–এটিই ইসলামের সুষম ব্যবস্থা।

বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য, গোটা মক্কী জীবনে বাস্তব জীবন সম্পর্কিত এমন কোনো আইন কানুন নাযিল হয়নি যার দ্বারা কাউকে দৈহিক শাস্তি দেয়া যায় বা কাফফারা (জরিমানা) আদায় করা যায়, যদিও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত কিছু বিধি নিষেধ এসেছে। শাস্তিমূলক ও বাস্তব জীবন পরিচালনা সম্পর্কিত আইন কানুন তখনই নাযিল হয়েছে, যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেছে এবং ক্ষমতাবলে সে সব আইন কানুন চালু করা সম্ভব হয়েছে।

ইসলামের প্রথম যুগে নৈতিক চরিত্রকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপদেশমূলক কথা নাযিল হলেও কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো ফতওয়া বা ফয়সালা দেয়া হয়নি, বা কোনো কিছু অমান্য করলে কোনো শাস্তির নির্দেশও দেয়া হয়নি, যেহেতু খোদ মালিক আল্লাহ তায়ালা ওই সময়ে এই ধরনের কোনো বিধান নাযিল করেননি। এই জন্যে এই সময়ে না জানালে, কিছু জানতে চাওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

ওমর (রা.) তো, কোনো বিষয় উপস্থিত না হলে, সেই বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় লা'নত (ভীষণভাবে তিরস্কার) করেছেন। দারা কুতনী তাঁর রচিত 'মোসনাদ' কেতাবে যুহরী থেকে একটি হাদীস এনেছেন, এতে বলা হয়েছে, আমরা জানতে পেরেছি, কোনো প্রশ্ন সামনে আসলে যায়েদ ইবনে সাবেত বলতেন, এটা কি সত্যিকারে ঘটেছে? যদি না হতো 'হাঁ হয়েছে', তাহলে সে বিষয়ে ততোটুকু বলতেন যতটুকু তিনি জানতেন। যদি বলা হতো, 'না এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি', তখন তিনি বলতেন, 'এটা না ঘটা পর্যন্ত বিষয়টিকে যেমন আছে তেমনি ছেড়ে দাও।' আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তাঁকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, 'এর পরে কিছু ঘটেছে কি? যখন বলা হয়েছে 'না', তখন বলেছেন, তাহলে ছাড়, এ বিষয়ে এখনই মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নাই, যদি সত্যিই কিছু ঘটে তখন গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি ভাববো এবং তখন দেখবো, তোমাদের জন্যে কি করা যায়।

দারেমী বলেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস পেয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.) এর সংগী সাথীদের থেকে ভালো কোনো মানুষ দেখিনি, তারা রসূল (স.)-এর মৃত্যু-দম পর্যন্ত তাঁকে মাত্র তেরটি প্রশ্ন করেছেন এবং এ সব প্রশ্ন আল কোরআনেও উল্লেখিত হয়েছে; যেমন, 'ওরা তোমাকে 'হারাম' মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে।' 'ওরা জিজ্ঞাসা করছে তোমাকে হায়েয সম্পর্কে।' এই রকমই আরও কয়েকটি প্রশ্ন যা প্রকৃতপক্ষে তাদের উপকারে লেগেছে।

ইমাম মালেক বলেন, 'আমি এই মদীনাতে পৌঁছুলাম। গিয়ে দেখি তাদের কাছে আল্লাহর কেতাব এবং রসুল (স.)-এর সুন্নত ছাড়া আর কোনো কেতাব নাই। কোনো সমস্যা হাযির হলে আমীর উপস্থিত আলেমদের একত্রিত করে পরামর্শ করেন এবং কোনো সিদ্ধান্তে তারা সবাই একমত হলে সেইভাবে তিনি রায় দিয়েছেন। আর তোমরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকো যা আল্লাহর রসূল (স.) অপছন্দ করেছেন।

আর কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, মুসলিম শরীফে মুগীরা ইবনে শো'বার বরাত দিয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মাদের প্রতি কর্তব্য পালনে উদাসীন হতে, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিতে এবং দুর্বল কোনো সাহায্য প্রার্থীকে 'না' বলতে। আর তিনি তোমাদের জন্যে তিনটি জিনিস অপছন্দ করেছেন, 'বে ফায়দা গল্প গুজব করতে, বেশী বেশী প্রশ্ন করতে এবং সম্পদের অপচয় করতে।' ওলামায়ে কেরামের অনেকে বলেন, বেশী বেশী প্রশ্ন করার অর্থ হচ্ছে, ফেকহী মসলা মাসায়েলের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা বা অতিরিক্ত পেঁচানো এবং যে বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কথা নাযিল হয়নি, সে বিষয়ে চাপাচাপি করা, ভুল বিষয়াদি নিয়ে মেতে থাকা এবং পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে ভাংগন ধরানো (তাদের একতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। প্রাচীন কালের লোকেরা সাধারণভাবে এগুলো অপছন্দ করতো এবং এগুলো মানুষের জন্যে কষ্টদায়ক বলে তারা মনে করতো আর বলতো, বেশী বেশী প্রশ্নের কারণে আযাব নাযিল হয়।

অবশ্যই এটা বাস্তব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বরাবর সত্যই মানুষের জীবনের জন্যে এতো স্পর্শকাতর বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে। এসব বিষয়ে অবশ্যই শরয়ী বিধান প্রয়োজন ছিলো, যেহেতু এটা আল্লাহর মূল বিধানগুলোর অন্যতম যা বাস্তব জীবনকে স্পর্শে করে। এই প্রশ্ন করার স্বভাবটি এমন বদ অভ্যাস যা জীবনে বহু জটিলতা সৃষ্টি করে, এজন্যে আল-কোরআনে এ বিষয়ে সতর্ক করতে গিয়ে চূড়ান্ত অকাট্য কথার বড়ই প্রয়োজন ছিলো, নচেত মানুষকে বহু কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো। তাই, আল্লাহ তায়ালা আমাদের যাবতীয় সংকট নিরসনে সূক্ষ্মভাবে ও যথাযথভাবে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

যে সব বিষয় এখনও সামনে আসেনি সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার অর্থ হচ্ছে এমন এক বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া যার কোনো সীমা-শেষ নাই। আর কোনো ঘটনা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত সে বিসয়ে কোনো ফয়সালা দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয় এবং সে বিষয়ে কোনো ফতওয়া (সিদ্ধান্ত) দেয়াও অবান্তর ও অসম্ভব। আর এই ধরনের বিষয় নিয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ বা আলাপ আলোচনা করাটাও শরীয়তের বিধানের মধ্যে বাড়াবাড়ির শামিল, বরং এতে শরীয়তের বিরোধিতাই করা হয়।

আর আজ যে সব অঞ্চলে শরীয়তের আইন চালু নাই সেখানে এই ধরনর নানা প্রকার প্রশ্ন এবং সে সব বিষয়ে শরয়ী বিধান জানতে চাওয়াতে আসলে কোনোই ফায়দা নাই। শরয়ী বিধান জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে বিধানকে চালু করা, কিন্তু ফতওয়াপ্রার্থী এবং ফতওয়াদাতা উভয়েই আজ তারা এমন এক এলাকার অধিবাসী, যেখানে আল্লাহর আইন কানুন চালু নাই এবং সেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকেও স্বীকার করা হয় না। সামাজিক জীবনেও যেখানে ইসলামী হুকুম আহকাম মানা হয় না এবং মানুষের জীবনেও ইসলামের অনুসরণ সাধারণভাবে নাই। অর্থাৎ ওই দেশে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয় না এবং আল্লাহর ফয়সালাকে মানাও হয় না। রাষ্ট্রীয়ভাবেও আল্লাহর বিধান চালু করার ব্যবস্থা নাই। অতএব সেখানে শরয়ী বিধান সম্পর্কে জানতে চাওয়ার কী অর্থ হতে পারে? আসলেই কি এর দ্বারা কারো কোনো উপকার হবে? সুতরাং অপ্রয়োজনীয় এসব প্রশ্ন করে প্রশ্নকারী ও যাকে প্রশ্ন করা হয় তারা উভয়ে, বুঝে অথবা না বুঝে সময় ও শ্রমের অপচয় করে।

একইভাবে ফুরুয়ী মসলা মাসায়েল, অর্থাৎ তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় বা শাখা-প্রশাখা প্রশ্ন তোলাও হচ্ছে অবাস্তব এক কাজ, যার বাস্তব কোনো ফায়দা নাই। এমন সব দেশে এইসব কাজে ফেকহী মসলা মাসায়েলের উপর পড়াশুনা ও জ্ঞান গবেষণা চালানো হচ্ছে, যেখানে অফিস আদালতের সবখানে ইসলাম বিরোধী আইন চালু রয়েছে, এটা এক বেফায়দা কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং এটা অবশ্যই এক প্রকার অপরাধ। যারা এই ভাবে বাজে কাজে সময় নষ্ট করে এবং অপরকে এই অপ্রয়োজনীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি ছাড়া কারো কোনো উপকারই করছে না।

অবশ্যই এই দ্বীন বড়ই প্রশস্ত, যা এসেছে মানব জীবনকে সার্বিকভাবে পরিচালনা করতে, এসেছে যাতে মানুষ একমাত্র আল্লাহরই নিরংকুশ আনুগত্য করে এবং যারা আল্লাহর সাম্রাজ্যে থেকে তাঁকে উৎখাত করে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করেছে তাদেরকে অপসারণ করে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব সর্বত্র কায়েম করতে। এর ফলে সকল বিষয় আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলবে, অন্য কারো মনগড়া আইন মোতাবেক নয়। আর অবশ্যই শরীয়তের বিধিবিধান মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রকেই পরিচালনা করতে এসেছে, বাস্তব জীবনের সকল বিষয়কে পরিচালনা দ্বারা আল্লাহমুখী করে দেয়াই এ দ্বীন-এর লক্ষ্য এবং যত সমস্যাই জীবনে আসুক না কেন সকল কিছু সমাধান আল্লাহর বিধান অনুযায়ীই করতে হবে।

এ দ্বীন কোনো একটি সুন্দর কাঠামো বা অনুষ্ঠান সর্বস্ব ব্যবস্থা মাত্র নয়, নয় এটা এমন কোনো মতবাদ ও পুস্তকে লিখিত কোন ব্যবস্থা যার সাথে বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই। না এ ব্যবস্থা আনুমানিক ও অবাস্তব কোনো কল্পনা বিলাস বা এমন কোনো দর্শনও এটা নয় যা নিয়ে দিনের পর দিন শুধু গবেষণাই করা যায়, অথচ বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন ঘটে না।

বরং এ দ্বীন মহা মানবের মহামিলনকে সুগম ও প্রশস্ত করার জন্যে বাস্তব ও যুক্তিপূর্ণ সর্বব্যাপী একমাত্র ব্যবস্থা এবং এটাই ইসলামের জীবন পদ্ধতি। অতএব, এ দ্বীন সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম প্রকৃত পক্ষেই যদি আল্লাহর এ ব্যবস্থার অনুসারী হতে চান, তাহলে বাস্তব জীবনের সকল বিষয়কে এর আইন অনুযায়ীই তারা যেন পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালান। আর এর আলোতেই সকল সমস্যার সমাধান করেন একান্তই যদি তা না পারা যায়, তাহলে ফতওয়াবাজী করে আল্লাহর এ দ্বীনকে যেন তারা হাওয়াতে ব্যবহার না করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.)-এর মাধ্যমে নীচের আয়াতের শানে নুযুল স্বরূপ যে হাদীসগুলো এসেছে তাতে ওপরে বর্ণিত অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

'হে ঈমানদাররা, নানা বিষয়ে এমন অবান্তর ও অনভিপ্রেত প্রশ্ন করো না যার জওয়াব দেয়া হলে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পেয়ে যাবে যা তোমাদের জন্যে অপ্রীতিকর হয়ে যাবে।'

আসলে, জাহেলিয়াতের আমলে যে ভাবে তারা কথা বলতো ও প্রশ্ন করতো সেই পুরাতন অভ্যাস মতই তারা রসূল (স.)-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলো। এখানে ওদের কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না, কিন্তু এখানে বর্ণিত হাদীসটির প্রসংগ হচ্ছে বাহীরা, সায়েবা, অসীলা ও হাম সম্পর্কে (১) তাদের যে রীতি ছিলো, সে বিষয়ে শরীয়তের বিধান

---

(১) বাহীরা সেই উটনীকে বলা হয় যে পাঁচবার বাচ্চা দিয়েছে এবং শেষ বারে নর-বাচ্চা দিয়েছে। আরবরা জাহেলিয়াতের যামানায় এসব উটনীকে কান চিরে কোনো দেবতার নামে ছেড়ে দিতো এবং কেউ একে বধ করতো না। সায়েবা বলা হয় সেই উটকে, যাকে মানত করে ছেড়ে দেয়া হতো এবং দশবার মাদা বাচ্চা প্রসবকারিণী উটনীকেও সায়েবা বলা হতো। ওয়াসীলা– ছাগীর প্রথম নর বাচ্চাকে বলা হতো, এটিকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো। হাম–এ হচ্ছে সেই দাদা উট, যাকে বৃদ্ধাবস্থায় দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হতো এবং এসময় তার নাতি উটটি জওয়ান হয়ে যেতো। –সম্পাদক

স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া সেহেতু প্রশ্ন করতে মানা করার জন্যে অবতীর্ণ আয়াতের পরই এ প্রসংগটি নাযিল হয়েছে।

বাহীরা, সায়েবা, অসীলা ও হাম-এদের ব্যাপারে যে সব কুসংস্কার চালু ছিলো এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো অনুমোদন নাই, বরং কাফেররা আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা আরোপ করে বলতো এগুলো আল্লাহর হুকুম। প্রকৃতপক্ষে ওদের অধিকাংশই সঠিক বুদ্ধি রাখে না। আর যখন তাদের বলা হতো, এসো আল্লাহর প্রেরিত কথা ও রসূলের দিকে, তখন ওরা বলতো, আমরা বাপ দাদার আমল থেকে যে ধর্ম পেয়েছি তাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তাহলে, তাদের বাপ দাদারা মূর্খ, পথভ্রষ্ট থাকলেও কি তাদের অনুসরণ করতে হবে?

মানুষের অন্তর হয় আল্লাহর দেয়া প্রকৃতি অনুযায়ী চিন্তা করবে এবং এক সার্বভৌম মালিককে চিনবে, তাঁকে রব বলে মানবে, তাঁরই আনুগত্য করবে ও তাঁরই আইন মেনে চলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সবার প্রতিপালক হওয়ার দাবীকে অস্বীকার ও তাদের আইন কানুনকে অগ্রাহ্য করবে; আর এর ফলে সহজেই সে তার রবের নৈকট্য লাভ করবে, তাঁর আনুগত্য সবার মধ্যে প্রশস্ততা পাবে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেই সে আরাম পাবে। অথবা সে জাহেলিয়াতের কুসংস্কারপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে এবং এই সব কুসংস্কারপূর্ণ বদ অভ্যাসের মোহে ও পৌত্তলিকতার অন্ধকারে ঠোকর খেয়ে খেয়ে বেড়াতে থাকবে। তার এই ভুল পথের বাঁকে বাঁকে থাকবে না কোনো নিশ্চিত জ্ঞান এবং অন্ধ আবেগ ও কল্পনা বিলাস ছাড়া কোনো যুক্তিগ্রাহ্য পথ সে পাবে না এবং ওই সব মিথ্যা ক্ষমতাধরেরা আদায় করতে থাকবে তার কাছ থেকে তাদের আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্নমুখী ট্যাক্স, উপঢৌকনাদি এবং নানা প্রকার উৎসর্গের সামগ্রী।

ওইসব বাতিল প্রভুরা এতো বেশী অনুষ্ঠানের মধ্যে তাদের ব্যস্ত রাখবে যে সঠিক ভাবে চিন্তা করার, বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করার ও যুক্তি খতিয়ে দেখার মতো অবসর তাদের থাকবে না। এই বাতিল প্রভুরা নানা অলৌকিক ক্ষমতার বিবরণী ও ভেল্কি দেখিয়ে তাদের অনুসারীদেরকে বশীভূত করে রাখবে এবং বহু দেবতার পূজা-পার্বণ করতে তাদেরকে বাধ্য করবে।

অবশ্যই ইসলাম এক আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের জন্যে এসেছে, এসেছে তাঁর বান্দাদের দ্বারা দুনিয়ায় তাঁর আইন চালু করার মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব কায়েম করতে। এরপর ইসলাম চেয়েছে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করতে, চেয়েছে মুক্ত করতে মানুষকে মানুষের মনগড়া মাবুদ ও দেবো দেবীর দাসত্ব থেকে। যতো প্রকারের জাহেলী ধারণা কল্পনা এবং মূর্তি পূজার অভিশাপে ডুবে থেকেছে শত শত বছর ধরে, তার থেকে তাদের উদ্ধার করতে চেয়েছে। তারপর চেয়েছে মানুষকে ফিরিয়ে নিতে সত্য সঠিক পথের দিকে, তার মধ্যে সুপ্ত মানবতা ও বুদ্ধিবৃত্তির দিকে। আর বাঁচাতে চেয়েছে মানুষকে অলীক প্রভুদের যুলুম ও ট্যাক্সের নির্যাতন থেকে। তারপর ইসলাম যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সর্বপ্রকার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং ওই সব ভুল মত ও পথের বিরুদ্ধে, যা পুতুল পূজারীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে তাদের অন্তরের গভীরে অথবা তাদের আনুগত্যের চেতনায়, অথবা জীবনের বিভিন্ন কাজে-কর্মে এবং আইন-কানুন পালনের সময়ে অথবা দলীয় সংগঠন গড়ে তোলার সময়ে।

ইসলামে কু-সংস্কারের কোনো স্থান নেই

রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমনের সাথে সাথে জাহেলী যুগে প্রচলিত সব ধরনের কুসংস্কার ও রীতি নীতির ওপর আঘাত পড়তে লাগলো এবং পৌত্তলিক ধ্যান ধারণা উৎখাত হতে শুরু করলো। সামাজিক এ সব দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ে ইসলামের এই ভূমিকায় জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়লো এবং ভেংগে যেতে লাগলো অতীতের ভ্রান্ত রীতি নীতি, আর প্রতিষ্ঠিত হলো স্বচ্ছ চিন্তা ও

দর্শন, রচিত হলো মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় মৌলিক আইন কানুন ও সমাজ সংগঠনের জরুরী পদ্ধতিসমূহ। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা কোন বাহীরা, সায়েবা, অসীলা অথবা হামের রীতি নীতিকে অনুমোদন করেননি। কিন্তু কাফেররা এসব রীতি নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে আল্লাহর দোহাই পেড়েছে। (প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে তাদের মনগড়া নির্জলা মিথ্যা যা অবলীলাক্রমে তারা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে।) আর ওদের অধিকাংশই সঠিক বুঝ রাখে না।'

বিভিন্ন নামে এই পশুগুলোকে তারা তাদের দেব-দেবতার নামে বিশেষ কিছু শর্তের ভিত্তিতে ছেড়ে দিতো। এসবের মূলে আল্লাহর কোনো নির্দেশ বা কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিলো না। এ নামগুলো ছিলো বাহীরা, সায়েবা, অসীলা ও হাম!!!

বিভিন্ন নামের এ পশুগুলোর নাম কি এবং কে এই ভাবে তাদেরকে ছেড়ে দিতে শিখিয়েছিলো? এগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন কথা পাওয়া যায়। সেগুলোর কয়েকটি এখানে পেশ করা হলো।

সাঈদ ইবনে মোসায়েব থেকে যুহরী রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন,

বাহীরা হচ্ছে সেই উটনী, যাকে কোনো দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হয়, তার দুধ দোহনও বন্ধ করে দেয়া হতো অর্থাৎ দেবতার নামে ছাড়ার পর মালিকের কোনো মালিকানা ওই উটনীর ওপর আর থাকতো না এবং সে তার দুধও দোহন করতো না। তখন ওই দেবতার জন্যে নির্দিষ্ট পুরোহিতই স্বাভাবিকভাবে তা দোহন করতো ও ভোগ ব্যবহার করতো। সায়েবাও দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত উটকে বলা হতো। অসীলা হচ্ছে সেই উটনী যা পর পর মাদী বাচ্চা দেয়। এগুলোকে তাদের দেবতাদের নামে যবাই করা হতো। হাম বলা হয় সেই বাচ্চাকে যার জন্ম হয় একাধিক উট দ্বারা তার মাকে পাল খাওয়ানো দ্বারা। একেও বড় হলে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো।

আরবী ভাষার পন্ডিতরা বলেন, বাহীরা হচ্ছে সেই উটনী যার কান চিরে দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হয়। বলা হয়, কেটে দেয়া হয়েছে উটনীটির কান বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। এই উটনীটিকে বলা হয় মাব্হূরা অথবা বাহীরা, যখন বেশ বড় করেই তার কান কেটে দেয়া হয়। এই বড় করে কাটার কারণে বাহর বা সমুদ্র নাম দেয়া হয়। জাহেলী যামানার লোকেরা এগুলোকে নিজেদের ওপর হারাম করে নিতো। এগুলো পাঁচবার বাচ্চা দেয়ায় শেষ বাচ্চাটি যদি নর হয়, তাহলেই তাকে দেবতার নামে (কান কেটে) ছেড়ে দেয়া হয়। জাহেল আরবরা নিজেদের জন্যে তাদের ওপর আরোহণ করা ও যবাই করা হারাম করে নিতো এবং কারো ক্ষেতে বা পানির স্থানে গেলে তাদেরকে তাড়ানোও হতো না এবং ওরা এই উটনীটিকে দেবতার নামে ছেড়ে দিতো এবং বলা হতো সে মোসাইয়াবাহ। জাহেলী যামানায় কোনো যাত্রীর সফর থেকে ফিরে আসার জন্যে, রোগমুক্তির জন্যে অথবা এই ধরনের অন্য কোনো প্রয়োজনের জন্যে মানত করা হতো, বলা হতো আমার উটনীটি 'সায়েবাহ্'। এমনি করে বাহীরাকেও হারাম মনে করে ছেড়ে দেয়া হতো। অসীলা বলা হতো ওই সব মাদী ছাগল ছানাকে যার সাথে নর ছানাও পয়দা হতো।

আর কেউ কেউ বলেছেন, কোনো উটনী প্রথম মাদী বাচ্চা দিলে সেটা তাদের জন্যে হতো এবং নর বাচ্চা দিলে সেটাকে তাদের মনগড়া দেবতাদের নামে যবাই করে দেয়া হতো। আর যদি নর ও মাদী মিলে এক জোড়া বাচ্চা হতো, তাহলে বলতো 'সে তো (মাদী বাচ্চাটাও) তার ভাই-এর হয়ে গেছে, অতএব তাকে আর যবাই করা চলে না।' 'হাম' সম্পর্কে বলতো হাম হচ্ছে সেই বাচ্চা, যার বাপের ঔরসে দশটি বাচ্চা পয়দা হয়েছে। তার সম্পর্কে বলতো, এর পিঠটি নিরাপদ হয়ে গেছে, সুতরাং তার ওপর আর সওয়ার হওয়া যাবে না এবং তাকে কোনো চারণভূমি বা পানির জায়গা থেকে তাড়ানো যাবে না।(১)

---

(১) জাসসাস- আহকামুল কোরআন গ্রন্থ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৯১ বাহিয়্যা মিসরী দ্রষ্টব্য

প্রভুত্বের মিথ্যা দাবীদাররা যে ট্যাক্স আদায় করতো, তার বর্ণনায় আরও কিছু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। এগুলো কল্পনার উর্ধের জিনিস ছিলো না। আর যে সব কারণে এদেরকে উৎসর্গ করা হতো তা কোনক্রমেই যুক্তিসংগত ছিলো না। যুক্তি ছিলো তাদের একটিই, আর তা ছিলো, কোনো মূর্তির জন্যে উৎসর্গ করার জাহেলী কুসংস্কার। আর যখন এইসব ধারণা ও কল্পনা এবং অন্ধ আবেগ একবার চালু হয়ে যেতো, তখন এটিই তাদের নিয়মে পরিণত হয়ে যেতো। এসব জিনিসের সীমা-শেষ বা চূড়ান্তভাবে ফয়সালা দেয়ার মতো কিছু বা কেউ ছিলো না, কোনো যুক্তি বুদ্ধির কথাও বলা যেতো না বা কোনো মাপকাঠিও ছিলো না। আর খুবই দ্রুতগতিতে এই সব ট্যাক্স আদায় করা হতো এবং কোনো নিয়ম ছাড়াই এইসব ট্যাক্স বাড়ানো বা কমানো হতো। এসব প্রথা ছিলো আরব জাহেলিয়াতের মধ্যে, আর এর অনুসরণে দুনিয়ার আরও বহু অঞ্চলে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার ট্যাক্স আদায় করা হতো। এ কারণেই তাওহীদের দিকে যখন মানুষকে আহবান জানানো হয়েছে, তখন সংগে সংগে তা গৃহীত হয়নি। যদিও এর মধ্যে সত্য পথ পরিহার বা অন্ধত্বের কোনো স্থান ছিলো না। আর আজকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, জাহেলিয়াতের বাহ্যিক চেহারার কিছু পরিবর্তন হলেও মূলত এই জাহেলিয়াতের মন মগয এখন অবিকল আগের মতোই রয়ে গেছে। অর্থাৎ জীবনের সর্ব বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বহু দেবতার সাথে সম্পর্ক আজও বিরাজমান!

জাহেলী যুগ কোনো নির্দিষ্ট যুগের নাম নয়

আসলে জাহেলিয়াত বা অন্ধত্ব বিশেষ কোনো যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ হচ্ছে মানুষের মনগড়া এক কুসংস্কার ও বদ অভ্যাস যা বিভিন্ন রূপে বারবার ফিরে আসে। এক ও একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং নিরংকুশ আনুগত্যই ইসলামের দাবী। তাঁর কাছে আত্ম নিবেদনের সাথে সাথেই সকল ক্ষমতা তাঁর হাতে সোপর্দ করা জরুরী হয়ে পড়ে এবং সকল চিন্তা চেতনা সেই দিকেই কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। জীবনের সকল ইচ্ছা ও কর্মকান্ড, সকল সংগঠন ও অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। সেখানে মানুষ খুঁজে পায় এক অন্য মূল্যবোধ এবং সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের এক নতুন মাপকাঠি, পায় অনুপম এক পদ্ধতি ও আইন কানুন, চিন্তাধারা ও লক্ষ্য।

জাহেলিয়াত বলতে বিশেষ এক জীবন পদ্ধতিকে বুঝায়। এ জীবন পদ্ধতিতে মানুষের দাসত্বে মানুষকে আবদ্ধ করা হয় অথবা এ ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করে। এ দাসত্বের জন্যে কোনো নিদিষ্ট নিয়ম কানুন বা সীমা নাই। কারণ মানুষ যেমন বিভিন্ন চেহারা ছবির, তেমনি তাদের বুদ্ধি ও মন মেযাজও বিভিন্ন। কাজেই তাদের তৈরি পদ্ধতিও বিভিন্ন হতে বাধ্য। সঠিক কোনো আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে না চলার কারণে তারা নানা মত ও পথের অনুসারী হয়ে থাকে। আর মানবীয় বুদ্ধি সাধারণভাবে কু-প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় এবং সমাজের দিকে তাকালেই প্রতিনিয়ত এর নযির দেখতে পাওয়া যায়। দুনিয়ায় মানুষ বিভিন্ন প্রকার চাপ ও প্রভাবে কোনো বিশেষ নীতির ওপর নিজে নিজেই কোনো ভারসাম্যপূর্ণ নীতির ওপর টিকে থাকতে পারে না। যদি উর্ধতন কোনো শক্তির ভয় তার মধ্যে না থাকে।

আর আমরা কোরআন নাযিল হওয়ার চৌদ্দ শত বছর পরেও দেখতে পাচ্ছি, যেখানেই মানুষের মন এক আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেছে, সেখানেই নানা প্রকার সমস্যার জালে তারা আবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তারা এতো বেশী সংকটের সম্মুখীন হয়েছে যে, তার কোনো সীমা শেষ নাই। এক আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে বহু মতবাদ ও তন্ত্রমন্ত্রের আনুগত্যের

মধ্যে আত্মসমর্পণ করে তাদের সমস্যা সমাধান হয় না, আরও বেড়ে যায় এবং তাদের সুখ শান্তি ও মান মর্যাদা নষ্ট হতে থাকে। শহর-নগর-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ও শহরের উপকণ্ঠে সর্বত্র নানা প্রকার কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে যা মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে, বরং বলা যায় গায়রুল্লাহর আনুগত্য তাকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। মানুষের মনগড়া এই সব ব্যবস্থার কারণে প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায় যে, ওলী ও দরবেশের আস্তানায় বা মাযারে ভেঁট-বেগার চড়ানো হয় এবং দেব-দেবীদের পূজার মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপনের দোহাই দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়।

এবারে আমরা একবার প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি নীতি ও অনুষ্ঠানাদির দিকে যদি তাকিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো প্রতি জাহেলী যুগের রীতি নীতি মোটামুটি এক ও অভিন্ন। সর্বকালেই দেখা গেছে মানুষ হয় আল্লাহর পথে চলেছে না হয় ত মানুষের তৈরি কোনো ব্যবস্থা মেনে চলেছে। এ উভয় ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রশ্নটি প্রধান এবং যে কথাটি সাধারণভাবে চালু রয়েছে তা হচ্ছে, কার হাতে শাসন ক্ষমতা থাকবে, কে চূড়ান্ত বিচার ফয়সালার মালিক হবে এবং কার হুকুমে দেশ ও জাতি চলবে? সেখানে কর্তৃত্ব কি শুধুমাত্র এক আল্লাহর হাতে থাকবে এবং শুধু কি আল্লাহর বিধান চালু থাকবে? না মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের মনগড়া ব্যবস্থাধীনে চলার ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে? যদি সে দ্বিতীয় কথাটি মেনে নেয়, তাহলে তাকে আনুষ্ঠানিক অনেক পূজা পার্বণ করতে হবে। আবার আরও চিন্তা করা যাক! মানুষের ওপর কে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এবং কে তার আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী? সে কি তারই মতো কোনো মানুষের সামনে মাথা নতো করবে, তার আইন মেনে নেবে এবং তার হুকুম মতো জীবন যাপন করবে? এইভাবে নিরংকুশ আনুগত্য, অর্থাৎ, কোনো প্রকার প্রশ্ন না করে এবং বিনা যুক্তিতে সে কি মানুষের আনুগত্য করতে পারে?

এক্ষেত্রে আল্লাহর কথা হচ্ছে, তিনি এই সব অনুষ্ঠানাদি তৈরী করেননি, মানুষ নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে তৈরী করে নিয়েছে। বাহীরা, সায়েবা, অসীলা ও হাম বলতে যে প্রথা চালু রয়েছে এগুলো কখনও তিনি তৈরী করেননি। তাহলে কাফেরদের জন্যে কে এগুলো তৈরী করে দিলো? এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী,

'বাহীরা, সায়েবা, অসীলা বা হামের কোনোটিকেই আল্লাহ তায়ালা বানিয়ে দেননি।' তাহলে নিশ্চয়ই, ধর্মের নামে পীর-পুরোহিত ও ধর্ম-যাজকরা এগুলো চালু করেছে।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক চালু না হয়ে অন্য কারো দ্বারা চালু পদ্ধতির অনুসরণ যারা করবে, তারাই কাফের। এসব কাফের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলে। কখনও তারা নিজেরা মনগড়া কিছু তৈরী করে নিয়ে বলে, এটাই আল্লাহ্র বিধান। আবার কখনও বলে, আমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন কানুন আমরাই তৈরী করে নেবো এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবন বিধান নির্মাণে আল্লাহর কোনো দখল নেই, এতে নাফরমানী হবে কেন? আমরা তো তাঁকে অস্বীকার করছি না? -এসব কথা তারা যাই বলুক না কেন, এসবই আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ- এবিষয়ে আল্লাহর বাণী:

'বরং যারা কুফরী করেছে, তারাই আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই বুঝে না এবং তাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।'

আরবের মোশরেকরা মনে করতো তারা ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের ওপর টিকে আছে, আর তিনি যেহেতু আল্লাহর কাছ থেকে (তাদের জন্যে) বিধান এনেছিলেন, কাজেই অবশ্যই তারা

আল্লাহকে অস্বীকার করছে না। বরং তারা তো আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে, স্বীকার করে তাঁর ক্ষমতা ও অধিকারকে এবং তিনি যে সৃষ্টির সব কিছুকে পরিচালনা করে চলেছেন অবশ্যই এটা তারা মানে। এতদসত্তেও তারা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্যে নিজেরা আইন তৈরী করে নিতো এবং মনে করতো ও বলতো যে, এগুলো আল্লাহরই বিধান। এই মন গড়া আইন মতো চলার কারণে আসলে তারা কাফের হয়ে গিয়েছিলো। সকল জাহেলী যুগে এই একই ভাবে মানুষ নিজের ইচ্ছা মতো চলতো, নিজেদের জন্যে আইন তৈরী করতো এবং দাবী করতো যে, তারা আল্লাহরই আইন মতো জীবন যাপন করে। এই ভাবে প্রত্যেক দেশে এবং জাহেলী যুগে মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা তৈরী করে চলেছে। কিন্তু, এটা অবশ্য জানতে হবে, মানুষের জন্যে মানুষ কোনো আইন তৈরী করার অধিকারী নয়। তার জন্যে একমাত্র তিনিই আইন দিতে পারেন যিনি তাদের সবার মালিক।

আল্লাহর বিধান তো তাই, যা তিনি তাঁর কেতাবের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং রসূল (স.) তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ আইন কোনো অস্পষ্ট কথা নয়, কোনো কথা এতে গোপনও রাখা হয়নি বা এতে অতিরিক্তও কিছু বলা হয়নি, যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ কিছু তৈরী করার সুযোগ পেতে পারে এবং মনে করতে পারে তাকে এ ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার দেয়া হয়েছে, যেমন প্রতি যামানায় এবং প্রতি দেশে মানুষ মনে করেছে। এ জন্যেই যারা এসব দাবী করছে তাদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালা কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং আরও জানিয়েছেন যে, তারা কিছুই বুঝে না ও বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। তারা যদি বুদ্ধিকে কাজেই লাগাতো, তাহলে কিছুতেই আল্লাহর ওপর এসমস্ত মিথ্যারোপ করতে পারত না। আর সত্যিই যদি তারা বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতো তাহলে কিছুতেই আল্লাহর ওপর এ সমস্ত মিথ্যারোপ করতে পারতো না। আর সত্যিই যদি তারা বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতো তাহলে কিছুতেই মনে করতো না যে, এই মিথ্যা টিকে থাকবে।

তারপর, তাদের কথাও কাজের মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হচ্ছে,

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর প্রেরিত জিনিসের দিকে এবং রসূলের দিকে, তখন ওরা বলে, না, না, আমরা বাপ দাদার আমল থেকে যা পেয়েছি, তাইই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তাহলে, তাদের বাপ দাদারা যদি অবুঝ থেকে থাকে অথবা সঠিক পথ না পেয়ে থাকে, সে অবস্থাতেও কি তারা তাদের বাপ-দাদার অন্ধ আনুগত্য করতে থাকবে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে আইন-কানুন দিয়েছেন তা সবই স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার মধ্যেই তাঁর কথাগুলো সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর বাস্তব জীবন ও জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম দ্বারা সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। আর এ কথাগুলো অবশ্যই যে কোনো অন্তরের কাছে ধরা পড়ে। অতএব, এই যুক্তি-(বুদ্ধিপূর্ণ কথা) যা বিবেকে সাড়া জাগায়, এটিই হচ্ছে সেই মূল কথা যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। একটি হচ্ছে কুফুর-এর পথ এবং অপরটি ঈমানের পথ। সুতরাং মানুষ আল কোরআনের আলোকে বা রসূল (স.)-এর হাদীসের বরাত দিয়ে আহবান জানালেই তার তাতে কান দেয়া দরকার। তাহলেই তারা হবে মুসলমান। আর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকলে যারা অস্বীকার করবে, তারাই হবে কাফের। এরা কিছুতেই কল্যাণ পথের যাত্রী হতে পারে না।

আর এদেরকেই যখন বলা হতো, এসো, সেই কথার দিকে যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন ওরা বলতো, 'আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে

আমরা যা পেয়েছি তাইই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। এইভাবে আল্লাহর নিকৃষ্ট গোলামরা যা কিছু বিধান চালু করেছে তাই তারা অনুসরণ করে চলেছিলো এবং পরিত্যাগ করেছিলো এই গোলামদের প্রভুর অবতীর্ণ কথাগুলোকে। অস্বীকার করেছিলো বান্দাদের বন্দেগী থেকে মুক্তি পাওয়ার আহবানকে এবং তারা গ্রহণ করেছিলো তাদের স্বাধীন বুদ্ধি বিবেকের কথা ও তাদের বাপ-দাদার অন্ধ আনুগত্যকে।

এরপর আল কোরআন জানাচ্ছে তাদের হঠকারিতা ও বুদ্ধিহীনতাপূর্ণ কার্যাবলীর অবশ্যম্ভাবী কঠিন পরিণতি সম্পর্কে।

'তাদের বাপ দাদারা যদি অবুঝ থেকে থাকে বা পথভ্রষ্ট থেকে থাকে, তবু কি তাদের আনুগত্য করতে হবে?'

অবশ্য একথার অর্থ এটাও নয় যে, জ্ঞানহীন ও হেদায়াতপ্রাপ্ত পিতামাতা যারা নয়, তাদের কোনো বিষয়েই আনুগত্য করা যাবে না। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেরা যদি জ্ঞানবান হতো, তাহলে তাদের জন্যে ওদের অনুসরণ করা অবশ্যই জায়েয হতো এবং তাতে আল্লাহর হুকুম ও রসূলের শিক্ষা পরিত্যাগ করা হতো না, যেহেতু সে অবস্থায় তারা তাদের বাপ-দাদাদের সেই সব হুকুম মানতো যেগুলোতে আল্লাহর না-ফরমানী করা হয় না)। এখানে পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের আনুগত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী লোকরাও এইভাবে তাদের বাপ দাদাদের অন্ধ আনুগত্য করতো এবং তাদের বাপ-দাদারা যে সব রীতি-নীতি তাদের শেখাতো, তাই তারা মেনে চলতো অথবা তারা নিজেদের তৈরী নিয়ম-কানুন মেনে চলতো। কিন্তু তারা কেউই নিজেদের বা তাদের বাপ দাদাদের আইনের প্রতি আস্থাশীল ছিলো না। অথচ তাদের সামনে আল্লাহর আইন ও রসূলের সুন্নত বর্তমান ছিলো। তবে, না জানার কারণে যদি কেউ হেদায়াতপ্রাপ্ত না হয়ে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা! এমতাবস্থায় সে নিজের সম্পর্কে যা বলে বলুক বা অন্য কেউ যা ইচ্ছা বলুক, তাতে কিছু আসে যায় না। যে তার জ্ঞানকে সঠিক পথে রাখবে, সেই হেদায়াত পাবে। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাই যে তাঁর নিজ কথায় সবার থেকে বেশী সত্যবাদী প্রতিটি বাস্তব অবস্থাই তার সাক্ষ্য দেয়। আর আল্লাহর আইনের সাথে যে ব্যক্তি মানুষের তৈরী আইনের তুলনা করে, তার থেকে বড় মূর্খ ও ভ্রান্ত আর কে আছে? উপরন্তু সে মিথ্যা সৃষ্টিকারী ও অকৃতজ্ঞও বটে।

মুসলমানদের পারস্পরিক সৌহার্দ ও সামষ্টিক দায়িত্ব

কাফেরদের অবস্থা ও কথা শেষ হওয়ার পর পরবর্তী আয়াতটিতে মোমেনদের প্রসংগ আসছে। কোন কোন কারণে কাফেরদের থেকে দূরে থাকতে হবে এবং কোন কোন খাসলাতের কারণে তাদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে রাখতে হবে এখানে তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে। তাদের দায়িত্ব ও কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, অন্যদের থেকে তাদের দৃষ্টিভংগির পার্থক্য কি, কোন পর্যন্ত গিয়ে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তার সীমানাও নির্ধারণ করে দেয়া হচ্ছে এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে আল্লাহর হিসাব গ্রহণ এবং তাঁর প্রতিদানের দিকে– দুনিয়ার কোনো মজুরি বা প্রতিফলের দিকে নয়। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, তোমাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করা দরকার। তোমরা যদি সত্য সঠিক পথে এগিয়ে আস, তাহলে ভ্রান্ত পথের পথিক (গোমরাহ লোকেরা) তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর কাছে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে, আর তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের অতীতের যাবতীয় কীর্তিকলাপ সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন।'

মোমেন ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর, গোটা মুসলিম জাতি একটি মাত্র জাতি হওয়ার কারণে তাদের পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ সহযোগিতা ও পরস্পরকে পরামর্শ ও উপদেশ দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে,

'হে ঈমানদাররা, নিজেদের হিসাব নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা সঠিক পথে চলতে শুরু করলে ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।'

সত্য পথের পথিক হওয়ার কারণে তোমরা অন্য সবার থেকে বিচ্ছিন্ন এক পৃথক জাতি। তোমরা পরস্পর সৌহার্দ সম্প্রীতি ও একে অপরের সাথে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং তোমরা নিজেদের আচরণ সম্পর্কে সচেতন হও এবং আত্মজিজ্ঞাসা করে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দূর করার চেষ্টা করো। নিজেদের ব্যবহারকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করো এবং অবশ্যই তোমাদের দলবদ্ধভাবে থাকা দরকার। সুতরাং দলীয় জীবনের ব্যাপারে সাবধান থেকো ও দলের সাথে অবশ্যই লেগে থেকো। এমন যেন কখনও না হয় যে, (তোমাদের) সত্য দ্বীন লাভ করার পর হেদায়াতপ্রাপ্তির পর তোমাদের বিরোধীরা তোমাদের বিপথগামী করে ফেলে। তোমরা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এক স্বতন্ত্র জাতি এবং তোমরা সংবেদশীল মন নিয়ে একে অপরের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্যে চেষ্টা করে যাও বলেই তো তোমরা পরস্পরের দরদী বন্ধু হতে পেরেছ। অন্যদের কারো সাথে তোমাদের এ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। তোমরা তাদের নও, তারাও তোমাদের নয়।

অবশ্যই এই আয়াত উম্মতে মোহাম্মদীর মৌলিক বৈশিষ্টটি তুলে ধরেছে এবং অন্যান্য জাতির সাথে তাদের পার্থক্য কোথায় তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে।

অবশ্যই উম্মতে মুসলিমাহ হচ্ছে আল্লাহর দল এবং বাকি সকল জাতি, সবাই মিলে তারা শয়তানের দল। আর এই কারণেই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা বা নিবিড় কোনো বন্ধন নেই। কারণ তাদের প্রত্যেক শ্রেণী আলাদা- বিশ্বাস পৃথক পৃথক। আর এ জন্যে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়ও ভিন্ন, আর এরই কারণে তাদের আনুগত্য ও তার প্রতিদানও ভিন্নতর।

মুসলিম উম্মাহর ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্যে দায়িত্ব অনুভব করে। পরস্পর উপদেশ দান করা ও সুপথে এগিয়ে দেয়াটাও তারা কর্তব্য বলে মনে করে এবং অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র এক অনন্য জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আল্লাহ প্রদত্ত পথই তারা অনুসরণ করে। তারপর যতোদিন সে হেদায়াতের পথে টিকে থাকে, ততোদিন আশ-পাশের লোকেরা যতো চেষ্টাই করুক না কেন তাকে আর ভুল পথে চালাতে পারে না।

কিন্তু একথার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, মুসলিম উম্মাহ শুধু নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, কারো সাথে যোগাযোগ করবে না, কাউকে ইসলামের দিকে আহবানও জানাবে না এবং সত্য-সঠিক পথে মানুষকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এটা কখনও হতে পারে না। পথ প্রদর্শনই তো তার প্রধান দায়িত্ব। এ কাজ তার জীবনের যাবতীয় কাজ ও ব্যবস্থার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অতএব, যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আল্লাহ প্রদত্ত এই জীবনব্যবস্থা বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে চালু হয়ে যাবে, তখন তার কর্তব্য হয়ে পড়বে বিশ্বের সকল মানুষকে এই মহান দ্বীনের দিকে আহবান জানানো, তাদেরকে হেদায়াতের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা এবং নিজেরা নিজেদের জীবনে ইসলামের পূর্ণাংগ শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে

অপর মানুষকে এই সুবিচারপূর্ণ দ্বীনের শিক্ষা দান করা, যাতে মানুষকে অন্য ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে এনে এই মহান দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করার উপকার তারা যথাযথভাবে বুঝতে পারে।

আদালতে আখেরাতে মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হবে। সঠিকভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার পর অন্যরা ভুল পথে চললে সে দায়িত্ব তাদের। সত্যের সাক্ষী হওয়ার মাধ্যমেই তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। অর্থাৎ নিজেরা আল্লাহর হুকুমগুলো ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বত্র পালন করার মাধ্যমে ইসলামকে জীবন্ত রূপে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। সর্ব প্রথম নিজেদের মধ্যেই ভালো কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করে অপরের সামনে 'আম্‌রুন বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের' দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে– এ দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হলে কিছুতেই আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তারপর তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে দ্বীনের দাওয়াত পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট পৌঁছানো সম্পর্কে। এক্ষেত্রে প্রথম যে জিনিসটি বুঝতে হবে তা হচ্ছে, সর্ব প্রথম নিজে ইসলামের দাবী মেনে নেয়া এবং তারপর আল্লাহর বিধান চালু করা, আর একথাও বুঝতে হবে যে, জাহেলী যামানার প্রথম অন্যায় কাজ কোনটি এবং কোনটি আল্লাহর ক্ষমতা ও আইন বিরোধী কাজ। এইভাবে সকল কিছু পর্যালোচনা করেই পর্যায়ক্রমে নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ জাহেলী যামানার বিধানগুলো প্রকৃতপক্ষে শয়তানী বিধান এবং আল্লাহদ্রোহিতা বলতে বুঝায় ওই সমস্ত নিয়ম কানুন যা আল্লাহর ক্ষমতা ও বিধানের বিপরীত। আর মুসলিমরা তো প্রথম নিজেদের ওপর পরিচালক। তারপর তারা পরিচালক গোটা মানবমন্ডলীর ওপর।

অতীতের অনেকের মতো আলোচ্য আয়াতের অর্থ করলে কিছুতেই দায়িত্ব পালনের হক আদায় হবে না। অবশ্য বর্তমানেও অনেকে এই ভাবে দায়িত্ব পালনের ভাসা ভাসা অর্থ বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে, আমর বিল মারূফ (ভালো কাজের নির্দেশ দান) এবং নাহী আনিল মুনকার (মন্দ কাজ বন্ধ করা বা মন্দ কাজ করতে মানুষকে নিষেধ করা)– এ বিষয়ে কোনো ব্যক্তি মোমেন (বা ব্যক্তিগতভাবে কোন মোমেন) দায়ী নয়, নিজে ভালো কাজ করলে এবং মন্দ থেকে দূরে থাকলেই যথেষ্ট হবে এবং তাকে আর পাকড়াও হতে হবে না এমন কখনও নয়; বরং মুসলিম উম্মাহ নিজেরা যদি ভাল কাজ করে, ভালো কাজের নির্দেশ দান জারি রাখে এবং অপরকে মন্দ থেকে বিরত রাখে, অর্থাৎ মন্দ কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়, তাহলেই তাদের দায়িত্ব পালন যথেষ্ট হতে পারে। তবে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মানুষ ভুল করলে ও ভুল পথে চললে মুসলিম উম্মাহর করার কিছুই নাই এটা মোটেই ঠিক নয়।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে অন্যায়ের প্রতিরোধে, গোমরাহীর মোকাবেলায় এবং আল্লাহদ্রোহিতা দমনে, ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে মুসলিম উম্মাহ দায়িত্বমুক্ত নয়। আর, আল্লাহর রাজ্যে সব থেকে বড় বিদ্রোহ হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। মুখে না বললেও তাঁর আইনকে বাদ দিয়ে যখন কোনো মানুষ নিজের বা অন্য কোন মানুষের আইন চালু করে, তখনই এটা বিদ্রোহ বলে গন্য হবে এবং আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করার শামিল হবে। আর আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে মানব রচিত কোনো আইন চালু করার মাধ্যমে মানুষের দাসত্ব করা– এ হচ্ছে এমন এক অন্যায় যার দ্বারা না কোনো ব্যক্তি-মানুষের উপকার হয়, না সমষ্টিগতভাবে গোটা জাতি উপকৃত হতে পারে। এ অন্যায় কাজ যেখানে চলতে থাকবে, সেখানে এর অনিষ্ট থেকে ব্যক্তি ও সমষ্টি কি ভাবে রেহাই পাবে?

বেশ কয়েকজন সাহাবা থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে জানা যায় যে, একদিন হযরত আবু বকর (রা.) খোতবা দিতে দাঁড়ালেন, অতপর তিনি আল্লাহর হামদ ও সানা করার পর বললেন, হে মানুষেরা, তোমরা অবশ্যই এই আয়াতটি পড়েছ,

‘হে ঈমানদাররা, তোমাদের আত্ম জিজ্ঞাসা করা দরকার, তোমরা যদি হেদায়াতের পথ অনুসরণ করো, তাহলে গোমরাহীতে নিমজ্জিত লোকেরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।’ কিন্তু তোমরা এর ভুল অর্থ করছো। অথচ আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন কোনো অন্যায় কাজ দেখবে, কিন্তু তা প্রতিরোধ করবে না, সে অবস্থায়, শীঘ্রই এমন সময় আসবে (আসার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে), যখন ওই অন্যায়ের শাস্তি উভয়কে (অন্যায়কারী ও নীরব দর্শককে) সমানভাবে গ্রাস করবে। এইভাবে প্রথম খলীফা এই আয়াত সম্পর্কে তাঁর সময়ে কিছু লোকের মধ্যে গড়ে ওঠা ভুল ধারণা দূর করেছেন। আজ আমাদের মধ্যে এই সংশোধনী বড় প্রয়োজন, কারণ কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সে অন্যায় দমন করা আজ বড়ই কঠিন হয়ে গেছে। এর কারণে দুর্বল লোকের জেহাদের দুঃখ-কষ্ট ও দুরূহতা এড়িয়ে চলছে এবং এর বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্যে এ আয়াতটির কি সহজ অর্থই না করে নিয়েছে!

না, আল্লাহর কসম, কিছুতেই এটি সঠিক অর্থ নয়! চরম প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সংগ্রাম ছাড়া কিছুতেই এ দ্বীন বিজীয় হবে না, হতে পারে না। সঠিক কাজ ও প্রতিরোধ প্রয়াস ছাড়া কোনো সংশোধনীও আসবে না। অবশ্যই জেহাদী মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই মানুষের গতি ফেরানোর জন্যে এগিয়ে আসতে হবে এবং মানুষকে বান্দাদের বন্দেগী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীতে আবদ্ধ করার জন্যে অবশ্যই একদল সংগ্রামী মানুষের প্রয়োজন, প্রয়োজন আল্লাহর যমীনে তাঁর প্রভুত্ব কায়েম করার জন্যে এবং যালেমদেরকে উৎখাত করে আল্লাহর আইন চালু করার মাধ্যমে তাঁর প্রভুত্ব কায়েমের জন্যে চূড়ান্ত জেহাদ। প্রয়োজন মানুষের জীবনে আল্লাহর বিধান চালু করার জন্যে এবং মানুষকে এই বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। যখন পথভ্রষ্ট এক সমাজের মানুষেরা ব্যক্তিগতভাবে গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রয়োজন সদগুণাবলী প্রকাশের মাধ্যমে বিপ্লব সৃষ্টি করার। আজ এই অন্ধকারাছন্ন সমাজকে হেদায়াতের শুভ্র সমুজ্জ্বল পথে এগিয়ে নেয়ার জন্যে প্রয়োজন আদর্শ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী এক দল লোকের, প্রয়োজন শক্তিশালী এক সংগঠনের। যখন মানুষকে হেদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও আল্লাহর আইন বিমুখ বানানোর জন্যে শক্তি প্রয়োগও করা হচ্ছে এবং তাদেরকে আল্লাহর আইন বিরোধী কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, তখন তার প্রতিরোধ করার জন্যে প্রয়োজন সত্যের পথে টিকে থাকা ও সত্যের পথে অপরকে এগিয়ে নেয়ার মনোবল সম্পন্ন এক অনমনীয় দলের।

এই সর্বাত্মক জেহাদের পরেই কেবল আসতে পারে পরিবর্তন, এর আগে কিছুতেই নয়। যখন ঈমানদারদের হাতে বাতিলপন্থীদের পরাজয় হবে, তখনই ওই সব ভ্রান্ত মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাদের উচিত সাজা পাবে। অবশেষে উভয় দলকেই আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

‘আল্লাহরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে অবশেষে, আর তখনই তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে তোমাদের অতীতের সকল আচরণ সম্পর্কে।’

মৃতব্যক্তির ওছীয়ত বাস্তবায়নের সাক্ষদান পদ্ধতি

এরপর এ সূরায় আলোচিত শরয়ী বিধানগুলোর শেষ বিধানটি বর্ণিত হচ্ছে। এ বিধানটি মুসলমানদের সামাজিক জীবন সম্পর্কিত। ভ্রমণরত অবস্থায় কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে তখন সে

তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ সম্পর্কে ওসীয়ত করবে এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে- এবিষয়ের ওপরই এখানে বিশেষভাবে আলোচনা হলেও অন্যান্য সামাজিক বিষয়েও কিছু কথা এসেছে। আরও আলোচনা এসেছে সেই সকল বিধান সম্পর্কে, যা পাওনাদারের পাওনাকে নিশ্চিত করতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, সফরে থাকাকালে তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে যে ওসীয়ত করবে, তাতে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ঈমান-ইনসাফওয়ালা লোকের সাক্ষ্য অথবা, (এমন লোক না পেলে) তোমাদের ছাড়া অন্য কোনো দু'জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। কোনো নামায বাদ এ সাক্ষীদ্বয়কে ....এবং আল্লাহ তায়ালা অপরাধী জাতিকে হেদায়াত করেন না।' (আয়াত ১০৬-১০৮)

আলোচ্য এ ৩টি আয়াতের মধ্যে যে বিধানটি এসেছে তা হচ্ছে, যখন কোনো ব্যক্তি গৃহে থাকাকালে বুঝতে পারবে, তার মৃত্যু আসন্ন, তখন সে তার পরিবারের জন্যে তার যে সহায় সম্পদ বর্তমান আছে, তা বিলি বন্টনের ব্যাপারে ওসীয়ত করে যাবে। এ সময়ে ইনসাফওয়ালা দু'জন মুসলিম ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে তাদের হাতেই সে যতোটা চায়, ওসীয়তকৃত তার সম্পদ সোপর্দ করবে, অন্য কারো হাতে নয়। আর যদি সে সফরে থাকে এবং সেখানে সাক্ষী হিসাবে অথবা ওসীয়তকৃত সম্পদ সোপর্দ করার জন্যে কোনো মুসলমান ব্যক্তিকে ওই এলাকায় উপস্থিত না পায়, তাহলে দু'জন অমুসলিম ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করবে।

তারপর যদি মুসলমানরা অথবা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা সাক্ষীদের সত্যবাদিতায় বা তাদের হাতে ন্যস্ত আমানতের মাল দান করায় কোনো প্রকার সন্দেহ করে, তাহলে তাদেরকে নামায বাদ অপেক্ষা করাবে, তখন তাদের আকীদা অনুযায়ী যেন তারা হলফ করে বলে যে তারা নিজেদের অথবা অন্য কারো স্বার্থে অথবা কোনো আত্মীয়তার খাতিরে বিলিবন্টনের মধ্যে কোনো হেরফের করবে না, কোনো কথা গোপনও করবে না, যদি করে তাহলে অবশ্যই সে অপরাধী হয়ে যাবে। এই হলফ অনুসারেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

এরপর কোনো সময়ে যদি তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, অথবা তারা ভুল কসম খেয়েছে বলে জানা যায়, অথবা যদি জানা যায় তারা আমানতের খেয়ানত করেছে, তো সে অবস্থায় মৃতের ওয়ারিসের মধ্য থেকে দুজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে হলফ করে বলবে যে, তাদের সাক্ষ্য প্রথম অন্য দু'জনের সাক্ষ্য থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য এবং একথাও তারা হলফ করে বলবে যে, তারা নিজেরাও কোনো অন্যায়কারী নয়- এবং এইভাবে পূর্ববর্তী দু'জনের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে আর পরবর্তীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

এরপর আল কোরআন জানাচ্ছে সঠিকভাবে সাক্ষ্য পাওয়ার ব্যাপারে সব থেকে নিরাপদ ব্যবস্থা এবং প্রথম দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য বাদ দেয়ার ব্যাপারেও এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এই পদ্ধতিই হচ্ছে সাক্ষ্য প্রমাণ সামনে হাযির করার ব্যাপারে নিকটতর এক পদ্ধতি, অথবা তাদের এ ভয় থাকবে যে, তাদের কসম খাওয়ার পর আরও কেউ কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে।'

আলোচনার এ প্রসংগটি শেষ হচ্ছে সবাইকে আল্লাহকে ভয় করার আহবান জানিয়ে এবং সতর্ক করে যে, তিনি সব কিছু তদারক করছেন। তাঁর ভীতি ও তাঁর যাবতীয় হুকুম পালনের দিকে

আহবান জানিয়ে প্রসংগের ইতি টানা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তিকে হেদায়াত ও কল্যাণের দিকে এগিয়ে দেন না যে অপরাধ করে তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। এরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং শোনো, আর আল্লাহ তায়ালা অপরাধী (ও অপরাধপ্রবণ) জাতিকে কিছুতেই হেদায়াত করেন না।

কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এই তিনটি আয়াতের শানে নুযুল বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, 'তামীম আদ্দারী এবং আদী ইবনে বাদ্দারের কারণে এই তিনটি আয়াত নাযিল হয়েছিলো এবং একথায় কোনো মতভেদ নাই বলেই আমি জানি। বোখারী, দারা কুতনী এবং আরও অনেকে ইবন আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন, তামীম আদ্দারী এবং আদী ইবনে বাদ্দা' মক্কায় যাওয়ার পথে কোন বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হলেন। তাদের সাথে বনী সাহমের এক যুবকও এই সফরে ছিলো ও ঘটনাক্রমে সে এমন এক এলাকায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো যেখানে কোনো মুসলমানের বসতি ছিলো না। এই জন্যে যুবকটি উক্ত মতভেদে লিপ্ত ব্যক্তিদ্বয়কেই তার সম্পদের ব্যাপারে ওসীয়ত করে যায়। এঁরা দু'জন যুবকটির পরিত্যক্ত মালামাল তার পরিবারের লোকদের কাছে পৌঁছে দিলেও তারা একটি স্বর্ণ-খচিত চাঁদির পেয়ালা গোপনে রেখে দেয়। তখন তাদেরকে রসূলুল্লাহ (স.) পেয়ালাটির বিষয়ে হলফ করে বলতে বললেন যে, তারা এ পেয়ালাটি গোপন করে রাখেনি অথবা তারা পেয়ালাটি সম্পর্কে কিছুই জানে না। এরপর মক্কার কোনো এক জায়গায় পেয়ালাটি পাওয়া যায়। সেখানকার লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানানো হয় যে, তারা পেয়ালাটি আদী ও তামীমের কাছ থেকে খরিদ করেছিলো। তারপর মৃত সাহমীর দু'জন ওয়ারিস এগিয়ে এসে হলফ করে দাবী করলো যে, পেয়ালাটি সাহমীরই এবং তারা আরও বললো যে, তাদের সাক্ষ্য পূর্ববর্তী সাক্ষীদ্বয় থেকে বেশী সঠিক ও গ্রহণযোগ্য এবং তারা মোটেই অন্যায় কথা বলছে না। রেওয়ায়াতকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) ওদের কাছ থেকে পেয়ালাটি নিয়ে নিলেন। এরপর তাদের সম্পর্কে উক্ত আয়াতটি নাযিল হলো (শব্দগুলো রয়েছে দারা কুতনী-তে)

একথাটি স্পষ্ট যে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো তা ছিলো খুবই জটিল এবং এই জটিলতা এবং এধরনের আরও যে সব জটিলতা সমাজ জীবনে সৃষ্টি হয়, সেগুলোর সমাধানের জন্যেই উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ জন্যেই সাক্ষ্য ও হলফ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর দেখুন, নামাযের পর পরই হলফ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে– এর তাৎপর্য হচ্ছে, যেন দ্বীনী আবেগ মহব্বত তাদেরকে সত্য কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদেরকে এই অনুভূতি দেয়া হচ্ছে যে, আমানতের খেয়ানত করে ও মিথ্যা বলার পর যখন সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে, তখন তারা সমাজের বুকে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য, যেন এ অনুভূতিও তাদের মধ্যে কার্যকর হয়। এ হলফ গ্রহণের ব্যবস্থা অবশ্যই এক বিশেষ সমাবেশেই গৃহীত হতে হবে।

বর্তমানকালে অবশ্য সত্য উদ্ঘাটনের আরও বহু পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং লেন দেনের ক্ষেত্রেও আরও বহু নিয়ম কানুন গড়ে উঠেছে। যেমন, লিখিত দলীল করে নেয়া, রেজিষ্ট্রি করা বা কোনো কিছু জমা রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে লেনদেনজনিত জটিলতা দূর করা যায়।

কিন্তু আজ বিশ্ব মানবের সমস্যা সমাধানের জন্যে এই আয়াতটিকে কতটুকু ব্যবহার করা হয়েছে?

আমরা অনেকেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধোকা খাই এবং আয়াতটির কার্যকারিতা না দেখে অনেক সময় ধারণা করে বসি যে, আয়াতটির কার্যকারিতা হয়তো বা শেষ হয়ে গেছে বা আধুনিক

জগতে এ আয়াতের দিকে তাকানোর কোনো প্রয়োজনই নেই এবং এ ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা বা হলফ নেয়ার পদ্ধতি– এগুলো হচ্ছে সেকেলে পদ্ধতি। আজকের যামানায় এগুলো অচল, কারণ আধুনিক জগতে বহু নতুন নতুন পদ্ধতি বেরিয়েছে।

তবে এটাই সত্য কথা যে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে আমরা অনেকেই আজ ধোকা খাচ্ছি এবং একথা ভুলে যাচ্ছি যে, আল্লাহর দেয়া এ জীবন ব্যবস্থা সর্বকালের সকল মানুষের জন্যেই এসেছে এবং বেশীর ভাগ মানুষই, জ্ঞানের প্রথম স্তরেই রয়েছে। আল্লাহর ব্যবস্থার সকল তাৎপর্য বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, এই ব্যবস্থার ক্রটি ধরার চেষ্টা না করে নিশ্চিন্ত মনে এ ব্যবস্থাকে চালু করার চেষ্টা করাই হবে তাদের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ। আর কেবল তখনই এ ব্যবস্থার সুফল তারা লাভ করতে পারবে এবং এ ব্যবস্থা অবলম্বনে তাদের জীবনের বর্তমান সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পাবে। শুধু তাই নয়, অনাগত ভবিষ্যতে যে সব সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোরও সমাধান এ ব্যবস্থার মধ্যে তারা দেখতে পাবে। সকল যামানায় এ ব্যবস্থার সমভাবে কার্যকারিতা এটিই এ জীবন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য– বরং বলা যায়, এটিই এর অলৌকিকতা। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, এগুলো আল্লাহর কাছে থেকে আগত আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং মহান সেই প্রভু-প্রতিপালকের ক্ষমতাধীনেই এর কার্যকারিতা সর্বকালের জন্যে বহাল রয়েছে।

আর একবার আমরা ধোকা খাই যখন চিন্তা করি, আধুনিক জগতে ওই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয় যা অতীতে হয়েছে এবং যে সব অবস্থায় এই আয়াতের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে সে অবস্থা আসারও এখন আর কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং প্রকৃত আদব রক্ষার দাবী এবং বুদ্ধিমানের কাজ এটাই হবে যে, মালিকের গোলাম হয়ে মালিকের দেয়া কোনো কিছুর সমালোচনা বা ক্রটি সন্ধান না করে নত মাথায় তাঁর যাবতীয় কথাকে আমাদের জন্যে উপকারী বলে মেনে নেয়া এবং সফরে অথবা বাড়ীতে যখন যেখানেই থাকা হোক না কেন, মেনে নেয়া। যে সর্বজ্ঞ ও মহা দয়াময় মালিক আমাদের জীবনের সার্বিক প্রয়োজনে এবং সকল সমস্যার সমাধান-কল্পে তাঁর বিধান দিয়েছেন, তা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। এইভাবে মেনে নেয়াই তার হক। আমরা যদি তাঁর হককে সত্যিকারে বুঝতে পারতাম ও তার যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে পারতাম, তাহলে তা আমাদের জন্যে কতোই ভালো হতো!

যেদিন আল্লাহ তায়ালা রসূলদেরকে একত্রিত করবেন (সেদিন তিনি তাদেরকে) বলবেন, তোমরা কেমন সাড়া পেয়েছো, অর্থাৎ তোমাদের দাওয়াতে জনগণ কিভাবে সাড়া দিয়েছে? তারা বলবে, হে আল্লাহ আমাদের কিছুই জানা নাই, অবশ্যই আপনি এবং একমাত্র আপনিই গায়েবের সব কিছু পুরোপুরিভাবে জানেন। ....আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুই-এর মধ্যস্থ সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۰۹﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ
عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تف تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى
الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ
تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا ۢ
بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ۚ
وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۰﴾ وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ
اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

রুকু ১৫

১০৯. যেদিন আল্লাহ তায়ালা সকল রসূলকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের (দাওয়াতের প্রতি মানুষদের পক্ষ থেকে) কিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছিলো; তারা বলবে, আমরা তো (তার) কিছুই জানি না; যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে তুমিই পরিজ্ঞাত। ১১০. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মাইরয়াম-পুত্র ঈসা, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দান করেছিলাম। যখন আমি পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি মানুষের সাথে (যেমনি) দোলনায় থাকতে কথা বলতে, (তেমনি বলতে) পরিণত বয়সেও, আমি যখন তোমাকে কেতাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাওরাত ও ইনজীল দান করেছিলাম, যখন তুমি আমারই হুকুমে কাঁচা মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি বানাতে অতপর তাতে ফুঁ দিতে, আর আমার আদেশক্রমেই তা পাখী হয়ে যেতো, আমারই হুকুমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দিতে, আমারই আদেশে তুমি মৃত দেহ থেকে জীবন বের করে আনতে, পরে যখন তুমি তাদের কাছে (নবুওতের) এসব নিদর্শন নিয়ে পৌছলে, তখন তাদের মধ্যে যারা (তোমাকে) অস্বীকার করেছিলো তারা বললো, এ নিদর্শনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমিই তোমার (কোনো অনিষ্ট সাধন) থেকে বনী ইসরাঈলদের নিবৃত্ত করে রেখেছিলাম। ১১১. (আরো স্মরণ করো,) যখন আমি হাওয়ারীদের (অন্তরে) এ প্রেরণা দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বললো (হে মালিক), আমরা (তোমার ওপর) ঈমান আনলাম, তুমি (এ কথার) সাক্ষ্য থেকো যে, আমরা তোমার অনুগত ছিলাম।

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا
نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ
عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا
مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ج وَارْزُقْنَا
وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ
مِنْكُمْ فَاِنِّيْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾ وَاِذْ قَالَ
اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ق

১১২. (অতপর) যখন এই হাওয়ারীদের দল বললো, হে মারইয়াম-পুত্র ঈসা! তোমার মালিক কি আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল আমাদের জন্যে পাঠাতে পারেন? ঈসা জবাব দিলো, (সত্যিই) যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো তাহলে (কোনো অহেতুক দাবী পেশ করার ব্যাপারে) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। ১১৩. তারা বললো, আমরা (শুধু এটুকুই) চাই যে, আল্লাহর পাঠানো সেই টেবিল থেকে (কিছু) খাবার খেতে, এতে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে, (তাছাড়া এতে করে) আমরা এও জানতে পারবো তুমি আমাদের কাছে সঠিক কথা বলেছো, আমরা নিজেরা এ সত্যের পক্ষে সাক্ষী হয়ে থাকতে চাই। ১১৪. মারইয়াম-পুত্র ঈসা (আল্লাহর দরবারে) বললো, হে আল্লাহ, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল পাঠাও, এ হবে আমাদের জন্যে, আমাদের পূর্ববর্তী ও আমাদের পরবর্তীদের জন্যে তোমার কাছ থেকে (পাঠানো) একটি আনন্দোৎসব; (সর্বোপরি এটা) হবে তোমার (কুদরতের) নিদর্শন, তুমি আমাদের রেযেক দাও, কেননা তুমিই হচ্ছো উত্তম রেযেকদাতা। ১১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ, আমি তোমাদের কাছে তা (অচিরেই) পাঠাচ্ছি, তবে এরপরও যদি তোমাদের কেউ (আমার ক্ষমতা) অস্বীকার করে তাহলে তাকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো, যা আমি সৃষ্টিকুলের কাউকেই আর দেবো না।

রুকু ১৬

১১৬. যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি কখনো (তোমার) লোকদের (একথা) বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে 'ইলাহ' বানিয়ে নাও! (এ কথার উত্তরে) সে বলবে (হে আল্লাহ), সমগ্র পবিত্রতা তোমার জন্যে, এমন কোনো কথা আমার পক্ষে শোভা পেতো না, যে কথা বলার আমার কোনো

بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

অধিকারই ছিলো না, যদি আমি তাদের এমন কোনো কথা বলতামই, তাহলে তুমি তো অবশ্যই তা জানতে; নিশ্চয়ই তুমি তো জানো আমার মনে যা কিছু আছে, কিন্তু আমি তো জানি না তোমার মনে কি আছে; যাবতীয় গোপন বিষয় অবশ্যই তুমি সম্যক জ্ঞাত আছো। ১১৭. তুমি আমাকে যা কিছু বলতে হুকুম করেছো আমি তো তাদের তাছাড়া (অন্য) কিছুই বলিনি (আর সে কথা ছিলো), তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, যিনি আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক, আমি যতোদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততোদিন তো আমি (নিজেই তাদের কার্যকলাপের) সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের ওপর একক নেগাহবান, যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের তুমিই ছিলে একক খবরদার। ১১৮. (আজ) তাদের অপরাধের জন্যে তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও (দিতে পারো), কারণ তারা তো তোমারই বান্দা, আর তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও (তাও তোমার মর্জি), তুমিই হচ্ছো বিপুল ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাময়। ১১৯. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (হাঁ), এ হচ্ছে সেদিন, যেদিন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিরা তাদের সততার জন্যে (প্রচুর) কল্যাণ লাভ করবে; (আর সে কল্যাণ হচ্ছে) তাদের জন্যে এমন সুরম্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে, যার তলদেশ দিয়ে অমীয় ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে এক মহাসাফল্য। ১২০. আকাশমালা ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমগ্র সৃষ্টিলোকের বাদশাহী তো আল্লাহর জন্যেই এবং তিনিই সব কিছুর ওপর শক্তিমান।

তাফসীর

আয়াত ১০৯-১২০

ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের পর খৃষ্টান বলে পরিচিত তার উম্মতের মধ্যে যে ভুল আকীদা বিশ্বাস গড়ে উঠেছিলো, তা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সংশোধনের জন্যে বর্তমান পাঠটি অতি চমৎকার ভূমিকা পালন করেছে। এসব নাসারা মূল যে ইনজীল কেতাব আসমান থেকে নাযিল হয়েছিলো তার মৌলিক কথাগুলোর সাথে মনগড়া বেশ কিছু কথা যোগ করে দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। অন্যান্য সকল কেতাবের মতো এ কেতাবের মধ্যে বর্ণিত তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব এবং একচ্ছত্র আধিপত্য)-এর সাথে তারা বহু প্রকার শেরেক যোগ করে নিয়েছিলো, যার সাথে আল্লাহর দ্বীনের কোনো সম্পর্কই ছিলো না।

এই কারণেই বর্তমান পাঠে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব ও বান্দার বন্দেগীর সেই তাৎপর্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পেশ করা হয়েছে, যা ইসলামের আকীদার অন্তর্গত। এই মূল আকীদার পাশাপাশি, ঐ নাসারারা সমাজের বুকে যে কঠিন কথাটি ছড়িয়ে রেখেছিলো তা ছিলো ঈসা (আ.) সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং তাঁর মাও এই সর্বক্ষমতার অংশীদার। ঈসা (আ.) বহু নবীর সামনে পরিষ্কার করে একথাটিকে অস্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর জাতি ও সমগ্র মানবমন্ডলীর কাছে একথাটিকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি কখনও একথা বলেননি এবং এ নির্জলা শেরেকের কথা বলা তাঁর পক্ষে কিছুতেই শোভা পায় না।

কেয়ামতের বিভিন্ন আলামত ও দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসংগক্রমে এখানে কোরআনুল কারীম এ সত্যটিকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ও খুবই প্রভাবপূর্ণ ভংগিতে তুলে ধরেছে। যখন কেউ এই অংশটি অধ্যয়ন করে, তখন তার গোটা শরীরে এমন অনুভূতি সৃষ্টি হয় যেন বাস্তবে সে ওই ভয়ানক দিনে ঈসা (আ.)-কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখছে, তাঁর কথাগুলো শুনছে এবং এর ফলে তার জীবনের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে।

প্রত্যেক রসূলই তার জাতি সম্পর্কে সাক্ষ দেবেন

আমরা যখন এই আয়াতগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করি, তখন আমাদের কাছে মনে হয় যে আমরা কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

‘যেদিন আল্লাহ তায়ালা রসূলদেরকে একত্রিত করবেন, তাদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদেরকে কী জওয়াব দেয়া হয়েছিলো? তাঁরা বলবেন, আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, অবশ্যই আপনি গায়েবের সব খবর রাখেন।’

সেই ভয়ংকর দিনে বিভিন্ন সময়ে আগত রসূলদেরকে আল্লাহ তায়ালা একত্রিত করবেন, যাদেরকে তিনি পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনার্থে বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন। এই নবীদের প্রত্যেকে স্ব-স্ব জাতির কাছে গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির কাছে এক ও অভিন্ন দাওয়াতই দেয়া হয়েছে। অবশেষে এলেন শেষ নবী মোহাম্মদ (স.) সেই একই দাওয়াত নিয়ে, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল জাতির কাছে, সকল সম্প্রদায় ও বর্ণের মানুষের কাছে।

এসব রসূল আগমন করলেন নানা জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক স্থান ও সময়ে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তো তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তিনিই তাদেরকে পুনরায় একত্রিত করবেন শেষ বিচারের দিনে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা সবার জওয়াব শুনবেন এবং কে কী উদ্দেশ্যে কী করেছে প্রত্যেককে তা বলার সুযোগ দেবেন। যাদেরকে জওয়াব দানের এ সুযোগ দেয়া হবে, তারা হচ্ছেন

পৃথিবীর জীবনে মানবমন্ডলীর দলীয় নেতৃবৃন্দ। এদের মধ্যে আল্লাহর রসূলরাও তাঁদের বিভিন্ন আশা আকাংখা নিয়ে হাযির থাকবেন। এদের ছাড়া অন্যদের সমস্যাও পেশ হবে এবং সেই মহা সমাবেশে আল্লাহর সামনেই এসব শুনানি হবে।

তারপর এমন এক দৃশ্যের বর্ণনা আসছে যা মানুষের ধমনীর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে।

'আল্লাহ তায়ালা রসূলদের একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের আহবানে কি সাড়া পেয়েছো?'

'তোমরা কি সাড়া পেয়েছো?' দুনিয়ার জীবন ক্ষেত্রে যে ফসলের চাষ করা হয়েছে সেদিন সে ফসল কাটা হবে, বিক্ষিপ্ত সব কিছুকে একত্রিত করা হবে এবং রসূলরা ও তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্বের রিপোর্ট পেশ করবেন। আর তারপর এসব কিছুর ফলাফল সবার সামনেই প্রকাশ করা হবে।

'তোমাদেরকে কি জওয়াব দেয়া হয়েছিলো' বা জনগণের কাছ থেকে তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে। রসূলরা তো মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে নির্বাচিত মানুষ। উপস্থিত ও প্রকাশ্য বিষয়গুলোই তাঁরা জানেন, তাঁরা গোপনীয় কোনো কিছুর খবর রাখেন না। তারা তাদের জাতিদেরকে হেদায়াতের (বা সত্য সঠিক পথের) দিকে ডেকেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে এডাকে সাড়া দিয়েছে আর অনেকে সাড়া দেয়নি, তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। রসূলদের পক্ষে শেষোক্ত দলের অস্বীকৃতির কারণ বুঝা সম্ভব হলেও হেদায়াত গ্রহণকারীদের সত্য-গ্রহণ করার কারণ বুঝা সম্ভব ছিলো না। কারণ তারা তো প্রকাশ্য জ্ঞানের খবর রাখেন। অপ্রকাশ্য বা গোপন জ্ঞানের কথা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আর তাদের সাহাবাদের সবাই আল্লাহর সামনে রয়েছে বলেই নিজেদেরকে মনে করে এবং তাঁকে ভালোভাবে চিনতে পেরেছে বলেই ইসলাম গ্রহণ করতে পেরেছে। আর তারা ভালো ভাবেই তাঁর আযাব সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরেছে বলেই সে কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্যে দুনিয়ার কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সত্যকে আলিংগন করতে পেরেছে। আর যেহেতু তারা জানে যে, আল্লাহ তায়ালাই সকল জ্ঞানের আধার এবং একমাত্র তিনিই সব কিছু জানেন, এজন্যে তারা যতোটুকু জ্ঞান রাখে তা লজ্জায় আল্লাহর সামনে প্রকাশ করতে চায় না।

সেই মহা বিচারের দিন মানব জাতির নেতাদেরকে সকল মানুষের সামনে ভয়াবহ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এসব প্রশ্নের জওয়াব চাওয়া হবে এবং মানুষ তাদের রসূলদের মাধ্যমেই জওয়াব দিক এটাই হবে আল্লাহর উদ্দেশ্য। যারা রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বানানোর চেষ্টা করেছিলো সেই মিথ্যাবাদীদের মোকাবেলা করতে হবে ওই ভয়ংকর বিচারদিনে, যাতে করে সকল গোপন রহস্য উদ্ঘাটনের সেই দিনে এবং সেই স্থানে একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া যায় যে, সম্মানিত রসূলরা সবাই আল্লাহর কাছ থেকেই তাঁর প্রেরিত দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) নিয়ে এসেছিলেন। আর এই জন্যেই তো তাঁদেরকে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনেই তাঁদের জাতিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

রসূলরাও সেদিন ঘোষণা দেবেন যে, যাবতীয় সত্য জ্ঞানের অধিকারী তো আল্লাহ তায়ালাই (আর কেউ নয়) আর তাঁদের যে সামান্য জ্ঞান তা সকল জ্ঞানের মালিক আল্লাহর সামনে মোটেই প্রকাশের যোগ্য নয়– আদব ও লজ্জার কারণেই তাঁরা এভাবে কথা বলবেন। তাদের কথাগুলোকে আল কোরআনে এভাবে উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

'তারা বলবে, আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, অবশ্যই আপনি গায়েবের সকল জ্ঞানের অধিকারী।'

ভ্রান্ত খৃষ্টবাদ ও ঈসা (আ.)-এর সঠিক ঘটনা

ঈসা (আ.) ছাড়া অন্য সকল রসূলকে যারা সত্যবাদী বলে বুঝেছে তারা তাঁদের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে, আর যারা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে চেয়েছে তাদের নাফরমানীর মাধ্যমে তাঁদেরকে তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। তাদের ব্যাপারটি উপরোক্ত পূর্ণাংগ জওয়াবের মাধ্যমে সমাপ্ত হলো। আর বেশী বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে তাঁর উম্মতরা খুবই কঠিন পরীক্ষায় পড়ে গিয়েছিলো বলেই একমাত্র তাদের সম্পর্কে ঈসা (আ.)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে আলোচ্য আয়াতটির অবতারণা করা হয়েছে। তাঁর জন্ম, তাঁর গুণাবলী, তাঁর প্রতিপালন, তাঁর অন্তর্ধান ইত্যাদি ছিলো খুবই রহস্যাবৃত যা মানুষকে সন্দেহের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলো আর এজন্যেই নানা প্রকার আন্দাজ অনুমান করার সুযোগ পেয়েছিলো, সুযোগ পেয়েছিলো নানা প্রকার কল্পকাহিনী তৈরী করার।

তাই আয়াতটিতে নাসারাদের নেতৃবৃন্দের জ্ঞাতার্থে মারিয়াম পুত্র ঈসা (আ.)-কে সম্বোধন করা হচ্ছে, যেহেতু ওই নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাঁকে সর্বময় ক্ষমতার প্রকৃত মালিক বানিয়েছিলো, আবার কেউ কেউ বলেছিলো তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। এসব বিভিন্ন প্রকার আখ্যা দিয়ে তারা গোটা পরিবেশকে ঘোলাটে করে ফেলেছিলো এবং তার মাকে নানা প্রকার জটিলতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো। নানা প্রকার সন্দেহের বেড়াজালে এই মহীয়সী মরিয়ামকে জড়িয়ে ফেলে দেয়ার কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন জানাচ্ছেন যে, 'তাঁর নেয়ামত ঈসা ও তাঁর মায়ের ওপর বর্ষিত হয়েছে।' এরপর, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে মোজেযাগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলোকে এক এক করে বর্ণনা করছেন, যাতে করে মানুষ তাঁর রেসালাতকে সত্য বলে বুঝতে পারে এবং সত্যায়িত করতে পারে। এরপরও যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈসা (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে বদ্ধপরিকর ছিলো, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বানানোর চেষ্টায় রতো থাকলো এবং তাকে বদনাম করতে থাকলো। পরীক্ষাস্বরূপ যে আয়াতগুলো তাদের কাছে এসেছিলো, সেগুলোর অর্থ গ্রহণ না করে তারা এক বিপজ্জনক পরীক্ষায় পতিত হলো। তাকে প্রদত্ত বিভিন্ন মোজেযার ভুল অর্থ করে তারা আল্লাহর ক্ষমতায় তাঁকেও অংশীদার বানিয়ে ফেললো। প্রকৃতপক্ষে এসব মোজেযা ঈসা (আ.) নিজে নিজেই অর্জন করেননি, এসব কিছু আল্লাহরই দেয়া, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং সাহায্য ও সমর্থন দিয়েছেন ওই মোজেযাসমূহের দ্বারা। এরশাদ হচ্ছে,

(স্মরণ করে দেখো) ওই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মারিয়াম পুত্র ঈসা, স্মরণ করো আমার দেয়া সেই নেয়ামতের কথা, যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে সেই সময় দিয়েছি যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) দ্বারা সাহায্য করেছিলোম, তুমি দোলনাতে থাকাবস্থাতেই কথা বলতে শুরু করেছিলে এবং ....আর স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা যখন আমি ওহী নাযিল করে হাওয়ারীদেরকে বলেছিলাম, 'ঈমান আনো আমার ও আমার রসূলের ওপর।' তখন তারা বলেছিলো, আমরা ঈমান এনেছি এবং সাক্ষী থাকুন হে আল্লাহ, যে আমরা মুসলমান।

এই হচ্ছে সেইসব নেয়ামতের বিবরণ যা মারিয়াম পুত্র ঈসা ও তাঁর মাকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন। এসব নেয়ামতের মধ্যে এও ছিলো যে, পবিত্র আত্মা জিবরাঈল (আ.) দ্বারা তাকে সেই সময় সমর্থন দেয়া হয়েছিলো যখন তিনি দোলনায় শায়িত দুধের বাচ্চা ছিলেন এবং তখন তিনি সম্পূর্ণ অভাবনীয় রূপে মানুষের সাথে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নযির বিহীন (বিনা বাপে) জন্মগ্রহণজনিত যাবতীয় সন্দেহ থেকে তাঁকে মুক্ত

করেছিলেন। তারপর, যুবক বয়সে তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে গিয়েও বলিষ্ঠভাবে কথা বলেছিলেন। এসময়ে পবিত্র আত্মা জিবরাঈল (আ.) তাকে উক্ত উভয় অবস্থায় সহায়তা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু ছিলো (আল্লাহর) কেতাব ও তাঁর বিজ্ঞানময় কথা সম্পর্কে মানুষকে অবহিতকরণ। তিনি পৃথিবীতে যখন এসেছিলেন তখন তার কোনো জ্ঞানই ছিলো না, তখন তাকে আল্লাহ তায়ালা লেখাপড়া এবং জীবনের কাজ কর্মগুলো সম্পাদনের বিদ্যা শেখালেন। এর সাথে তাঁকে সেই তাওরাত কেতাবও শেখালেন যা তাঁর আগমনকালে বনী ইসরাইলদের মধ্যে বর্তমান ছিলো। আরও শেখালেন ইনজীল কেতাব যা উপস্থিত তাওরাত কেতাবের সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছিলো।

এরপর আরও দেখতে হবে, তাকে প্রদত্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে এমন কিছু অলৌকিক জিনিস যা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো মানুষ তৈরী করতে পারে না। যেমন, তিনি আল্লাহর হুকুমে মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতির মতোই এক জীব তৈরী করতেন। এরপর তিনি ফুঁক দিলে তা জলজ্যান্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যেতো। এটা কিভাবে হতো তা আমরা বুঝতে অক্ষম। কারণ আজও আমরা বুঝতে পারিনি আল্লাহ তায়ালা কিভাবে জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং কিভাবে এজীবের প্রসার ঘটিয়ে চলেছেন।

ঈসা (আ.) আল্লাহর হুকুমে সেই সময়ে জন্মান্ধের চিকিৎসা করতেন যখন তৎকালীন চরম উন্নতমানের চিকিৎসকগণ এভাবে জন্মান্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়ার কথা চিন্তাই করতে পারতো না। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যে কোনো অন্ধ ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তাঁরই হুকুমে কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করা সম্ভব হয়েছে। এটা কোন ওষুধ দ্বারা নয়। যদিও ওষুধও রোগ মুক্তির জন্যে ওসীলা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে রোগমুক্তি তো আসে আল্লাহর হুকুমে এবং সেই আরোগ্য দানকারী মহান আল্লাহ ওষুধের ওসীলা ছাড়াও যে আরও কোনো জিনিসের মাধ্যমে আরোগ্য দান করতে পারেন সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ঈসা (আ.)-কে এই বিশেষ ক্ষমতা দানের মাধ্যমে। এমনকি কোনো প্রকার ওসীলা ছাড়াও তিনি আরোগ্য করতে যে সক্ষম এ প্রসংগে তাও জানাতে চেয়েছেন। আবার যিনি জীবন দানকারী, তিনি জীবন কেড়ে নেয়ার পর তা পুনরায় ফিরিয়ে দিতেও সক্ষম।

হাওয়ারীদের ঘটনা

এরপর আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন বনী ইসরাইলদের সাহায্যে তাঁর অপার নেয়ামত বর্ষণের কথা। এসব নেয়ামত নিয়ে যখন ঈসা (আ.)-এর আগমন ঘটলো, তখন ওই হতভাগারা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো এবং ধারণা ও প্রচার করতে লাগলো যে, এসব অলৌকিক জিনিস পরিষ্কার জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জাদু বলার কারণ ছিলো এই যে, এসব মোজেযার কারণে বাস্তবে যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হচ্ছিলো তা অস্বীকার করার কোনোই উপায় ছিলো না। যেহেতু হাজারো লোক এগুলো দেখছিলো। আর হিংসা ও অহংকারের কারণে এ বাস্তবতাকে তাদের পক্ষে মেনে নেয়াও সম্ভব ছিলো না। অবশ্য তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের সহায়তাও ঈসা (আ.) পেয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ওরা তাকে হত্যা করা বা শূলে চড়ানো কোনোটাই করতে পারেনি। বরং তাঁকে তো আল্লাহ তায়ালা সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তুলে নিয়েছিলেন উর্ধাকাশে তাঁর নিজের কাছে। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা হাওয়ারীদেরকে তাঁর ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার জন্যে এলহামের মাধ্যমে নির্দেশ দান দ্বারা তাঁর প্রতি নেয়ামত বর্ষণ করেছিলেন, যার ফলে তারা সংগে সংগে সাড়া দিয়েছিলো এবং তাঁর সকল কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলো এবং পুরোপুরি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তাঁদের ঈমান আনার কথা প্রকাশ করে তাঁর যাবতীয় হুকুম মানার অংগীকার (ইসলাম গ্রহণ) করেছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন আমি হাওয়ারীদেরকে ওহীর মাধ্যমে জানালাম, আমার এবং আমার রসূলের ওপর ঈমান আনো, ওরা বললো, 'হাঁ, আমরা ঈমান আনলাম এবং সাক্ষী থাকুন যে, আমরা ইসলামও গ্রহণ (আনুগত্যের ওয়াদা) করলাম। অর্থাৎ, আমরা পুরোপুরি আত্মসমর্পণকারী হয়ে গেলাম।'

এই হচ্ছে সেই নেয়ামত যা আল্লাহ তায়ালা মারিয়াম পুত্র ঈসা (আ.)-কে দিয়েছিলেন যাতে করে তার জন্যে সাক্ষ্যদান ও প্রমাণ দানের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু এরপর তাঁর অনেক অনুসারী বাঁকা পথ ধরলো এবং আশপাশের মিথ্যা ও ভুল জিনিসের প্রলোভনে পড়ে পথহারা হয়ে গেলো। সেই কঠিন সময় ঈসা (আ.)-কেই তাঁর সময়ের নেতৃবৃন্দের সামনে এবং অন্য সকল মানুষের সামনে হাযির করে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে সময়ে তাদের মধ্যে তাঁর জাতির সেই সব মানুষও উপস্থিত থাকবে যারা খুবই পরাক্রমশালী ছিলো, যেন তারা সবাই শুনতে ও দেখতে পায় এবং বিশ্বের সকল মানুষের সামনে যেন তাদের অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হতে হয়। আরও জানানো হচ্ছে যে, পূর্বেকার যে কোনো সময় থেকে সে অপমান হবে আরও বেদনাদায়ক এবং আরও লজ্জাকর।

ঈসা (আ.) ও তার মাকে যে নেয়ামত দান করা হয়েছিলো তার পুনরুল্লেখ করতে গিয়ে এ বিষয়ও জানানো হচ্ছে যে, তাঁকে যে সব মোজেযা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছিলো সেগুলো তার জাতির জন্যেও প্রকারান্তরে ছিলো এক বিরাট নেয়ামত- এটা তার জাতি ও হাওয়ারীরা সবাই প্রত্যক্ষ করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন হাওয়ারীরা বললো, হে মারিয়াম পুত্র ঈসা, তোমার রব কি আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্য খাবার পরিবেশিত দস্তরখান নাযিল করতে পারেন? সে বললো, ... আল্লাহকে ভয় করো, যদি প্রকৃতপক্ষেই তোমরা মোমেন হয়ে থাকো। তখন ওরা বললো, আমরা সেই দস্তরখান থেকে খেতে চাই এবং .... তোমাদের (মায়েদা অর্থাৎ খাদ্যভর্তি দস্তরখান) পাঠাচ্ছি, কিন্তু (জেনে রেখো) এ নেয়ামত পাঠানোর পর যে না-শোকরি করবে (যথাযথ মর্যাদা দেবে না, অপচয় করবে এবং আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ পূর্ণ আনুগত্য দেবে না) তাকে আমি এতো শাস্তি দেবো যা সারা বিশ্বের অন্য কাউকে কোনো দিন দেই নাই, আর কোনো দিন দেবোও না।

এই হাওয়ারীরা, তাদের এই সব কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ঈসা (আ.)-এর জাতির প্রকৃতি তুলে ধরেছিলো। ওই জাতির মধ্যে যারা আন্তরিকতাপূর্ণ ও নিষ্ঠাবান ছিলো তাদেরকেই হাওয়ারী বলা হতো। তবে তাদের ও আমাদের রসূল (স.)-এর সাহাবাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

হাওয়ারীদেরকে তো আল্লাহ তায়ালা নিজে এলহাম (গায়েবী নির্দেশনা) দ্বারা ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁর রসূল ঈসা (আ.) দ্বারা তাদেরকে সরাসরি পরিচালনা করেছিলেন, যার ফলে তারা ঈমান এনেছিলো, আর ঈসা (আ.)-ও তাদের ইসলাম গ্রহণ করার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। উপরন্তু এরপর তারা ঈসা (আ.)-এর সেই মোজেযাও দেখেছিলেন যা তাঁকে সাধারণ মানুষের উর্ধের মানুষ বলে বুঝতে সাহায্য করেছিলো, এসব জিনিসের মাধ্যমে তাদের মন পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং তারা সন্দেহাতীত ভাবে বুঝে গিয়েছিলো যে, তিনি তাদের কাছে সত্য কথাই বলছেন। আর এই কারণেই তারা ঈসা (আ.)-এর পক্ষে অন্যদের কাছে নির্দ্বিধায় এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পেরেছিলেন।

অপরদিকে, মোহাম্মদ (স.)-এর সাহাবাদের অবস্থান কী ছিলো? তারা ইসলাম গ্রহণের পর রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে একটি মোজেযাও পেশ করার দাবী করেননি। তারা সর্বান্তকরণে ঈমান

কবুল করেছেন এবং ঈমানের মাধুর্য লাভ করে তাদের হৃদয়গুলো নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলো। তারা রসূলের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার পর এর জন্যে আর কোনো দলীল প্রমাণ দাবী করেননি। আর অবশ্যই এটা সত্য কথা যে, এই পবিত্র কোরআন ব্যতীত রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে তারা অন্য কোনো মোজেযাই দেখেননি। এটিই হচ্ছে ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী ও মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। তাদের ছিলো এক অবস্থা আর মোহাম্মদ (স.)-এর সাহাবাদের হচ্ছে আর এক অবস্থা। এটিই প্রকৃত মুসলমান ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য। পরিপূর্ণভাবে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর ইচ্ছার গোলাম বানিয়ে নিয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন, এদেরকেও কবুল করেছেন। কিন্তু এতদসত্তেও এই দুই দলের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য, যা আল্লাহ তায়ালা এখানে বলতে চেয়েছেন।

'মায়েদা' নাযিল হওয়ার এই ঘটনাটি আল কোরআনে যেভাবে এসেছে, নাসারাদের কোনো কেতাবে তা অস্বীকার করা হয়নি। ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের বহুদিন পর পরবর্তী লোকেরা যে নতুন সংস্করণগুলো রচনা করেছে, সেগুলোর মধ্যে 'মায়েদা' সম্পর্কিত ঘটনাটির উল্লেখ নাই। বস্তুত এসব লোকেরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল কথাকে বিশ্বাসও করে না এবং বর্তমান সংস্করণের এই কেতাবগুলো খৃষ্ট ধর্মযাজকদের রচিত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত কিছু কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ঈসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ আসমানী কেতাবই নয়, যার নাম আল্লাহ তায়ালা ইনজীল রেখেছিলেন।

কিন্তু এসব নতুন সংস্করণের কেতাবগুলোতে 'মায়েদা'র ঘটনাটিকে অন্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মথি' কর্তৃক রচিত ইনজীল গ্রন্থের পঞ্চদশ সংস্করণে বর্ণিত হয়েছে, যীশু তার ছাত্রদের ডেকে বললো, আমি এক জনসমষ্টির ব্যাপারে ভীত। কারণ তাদের জন্যে নির্ধারিত মেয়াদের মাত্র তিন দিন বাকি রয়ে গেছে। এ কয়দিন তারা আমার সাথে চলতে থাকবে, কিন্তু তাদের খাবার মতো কোনো খাদ্য থাকবে না। আর তাদেরকে আমি রোযা রাখতেও বলিনি। কারণ তাদের সফরে বিরতি দেয়ার অনুমতিও আমি তাদেরকে দেই নাই। এমতাবস্থায় তাঁর ছাত্ররা তাকে বললো, এই শুকনা বিয়াবানে আমরা কোথেকে রুটি (খাদ্য) পাবো? কেউ কেউ বললো, আমাদের কাছে মাত্র সাতখানা রুটি এবং ছোট ছোট সামান্য কিছু মাছ আছে। তখন কাফেলাকে ওই এলাকাতেই অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হলো। তারপর ঈসা (আ.) সেই সাতটি রুটি ও মাছগুলো নিয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন এবং এসব খাবার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। ছাত্ররাও আবার এগুলো উপস্থিত পুরো জনতার মধ্যে ভাগ করে দিলো। তখন উপস্থিত সবাই এগুলো খেয়ে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হয়ে গেলো। তারপর অবশিষ্ট খাদ্যগুলোকে সাতটি বাক্সভর্তি করে তুলে নেয়া হলো। এসব খানেওয়ালাদের সংখ্যা ছিলো নারী ও শিশু বাদেই হাজার চারেক। নতুন সংস্করণের সকল গ্রন্থগুলোতে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মোজাহেদ ও হাসান প্রমুখ তাবেঈর মতে 'মায়েদা' আদৌ নাযিল হয়নি। কারণ হাওয়ারীরা যখন আল্লাহর একথাগুলো শুনলেন, 'অবশ্যই আমি পাঠাচ্ছি (পাঠাতে যাচ্ছি) তোমাদের কাছে এই খাদ্যভর্তি দস্তরখান, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ না-শোকরি করলে আমি তাকে এমন আযাব দেবো যা আগে কখনও কাউকে দেয়নি, তখন তারা এতো ভীত হয়ে গেলো যে, পুনরায় তারা আর এ মায়েদার কথা বলে নাই।

ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, 'লায়স ইবনে আবি সুলাইম মোজাহেদ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা এই মায়েদা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি

এই ধরনের কোন কিছু নাযিল করেননি। (ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে জারীরও এভাবে রেওয়ায়াত করেছেন) তারপর ইবনে জারীর মোজাহেদের বরাত দিয়ে বলেছেন, খাদ্যভর্তি মায়েদা ঠিকই অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু না-শোকরী করলে, আযাব নাযিল হবে এই হুমকিপূর্ণ আয়াতটি শুনে ওরা ওই খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলো। তাদের কাছে এ খাবার নাযিল হোক এটাও তারা আর চায়নি। হাসানের বরাত দিয়ে আর একটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, 'মায়েদা নাযিলই হয়নি। কাতাদা রেওয়ায়েত করেছেন যে, হাসান বলতেন, যখন তাদেরকে বলা হলো, '(এই মায়েদা নাযিল হলে) যদি কেউ না-শোকরি করে, তাহলে তাকে এমন কঠিন আযাব দেয়া হবে যা এর আগে আর কাউকে দেয়া হয়নি, তখন ওরা বলে উঠলো, না আমাদের আর এই খাবারের প্রয়োজন নেই, যার কারণে আর মায়েদা নাযিল হয়নি।

কিন্তু প্রথম যুগের অধিকাংশ মনীষীর মতে মায়েদা ঠিকই নাযিল হয়েছিলো যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন, 'আমি নাযিল করতে যাচ্ছি বা আমি নাযিল করছি।' এটা তো আল্লাহর স্পষ্ট ওয়াদা এবং আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। আর মায়েদা সম্পর্কে কোরআনে কারীমে যা কিছু এসেছে আমরা তাইই দেখবো ও তার ওপর নির্ভর করেই বুঝানোর চেষ্টা করবো। অন্য কিছুর প্রতি আমরা ভ্রূক্ষেপ করবো না।

নিশ্চয়ই কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে ঈসা (আ.) যখন তাঁর জাতির মুখোমুখি দাঁড়াবেন, তখন তাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই মেহেরবানীর কথাটি স্মরণ করাবেন। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন হাওয়ারীরা বললো, হে মারিয়াম পুত্র ঈসা, তোমার রব কি আমাদের কাছে আসমান থেকে খাদ্যভর্তি দস্তরখান (বা খাঞ্চা) নাযিল করতে পারেন?'

অবশ্যই হাওয়ারীরা তো ঈসা (আ.)-এর সেই প্রিয় ছাত্র ও অতি নিকট সংগী। ঈসা (আ.) সম্পর্কে তারা ভালোভাবেই জানতো যে, তিনি একজন মানুষ নবী ও মারিয়ামের ছেলে। যে ভাবে তাকে তারা জানতো, সেভাবেই তাকে ডাকতো। তারা জানতো তিনি রব বা কারো প্রতিপালক নন, তিনি একজন মানুষ। তার জীবন আল্লাহরই প্রতিপালনাধীন। তিনি কখনও আল্লাহর পুত্র নন। তিনি মরীয়মের গর্ভজাত সন্তান এবং আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। এইভাবে তারা এটাও জানতো যে, রব একমাত্র তিনি, যিনি সকল মোজেযা বানিয়েছেন এবং তাঁর নবীকে তিনি এই অলৌকিক ক্ষমতাগুলো দান করেছেন। নবী নিজে ওই ক্ষমতাগুলো হাসিল করেননি অথবা তার নিজের কোনোই ক্ষমতা নাই। সুতরাং তার কাছে, আকাশ থেকে তারা 'মায়েদা' নিয়ে আসার দাবী জানায়নি। কারণ তারা জানতো যে, তিনি নিজের ইচ্ছামত এই ধরনের কোনো ঐশী ক্ষমতার অধিকারী হন নাই। তাই তারা তার কাছে না চেয়ে তার কাছে জিজ্ঞাসা করেছে,

'হে মারিয়াম পুত্র ঈসা, তোমার রব কি আমাদের জন্যে আসমান থেকে মায়েদা আনতে পারবেন?'

তাদের এই যে প্রশ্ন, 'তোমার রব কি পারবেন'- তাদের এ কথার ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে এসেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কেমন করে এইভাবে প্রশ্ন করলো? তারা তো সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বিশ্বাস করেছিলো এবং ঈসা (আ.)-এর নবুওতের প্রতি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। আবার কেউ বলেছেন, এ কথার অর্থ আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা মায়েদা প্রেরণ করতে চাইবেন কি? আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ, 'তুমি যখন আল্লাহর মায়েদা নাযিল করার জন্যে দোয়া করবে, তখন তিনি কি তা কবুল করবেন?' আবার কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতটি এইভাবে পড়বে, 'হাল তাস্তাত্বিউ

রব্বাকা' অর্থাৎ, 'তুমি কি আমাদের জন্যে আকাশ থেকে মায়েদা নাযিল করার ব্যাপারে তোমার রবের কাছে দোয়া করতে পারবে?' আয়াতটিকে যেভাবেই পড়া হোক বা এর অর্থ যাই করা হোক না কেন, এ ধরনের অলৌকিক জিনিসের জন্যে আবেদন জানানো ঠিক নয় বলে ঈসা (আ.) তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন এবং তাদের কথাকে রদ করে দিলেন। কারণ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী যারা, তারা অস্বাভাবিক কোনো কিছুর জন্যে আল্লাহর কাছে আব্দার করে না বা অলৌকিক কোনো কিছু ঘটিয়ে দেয়ার জন্যে দোয়া করে না। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে জওয়াব দেয়া হয়েছে, 'আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো।'

কিন্তু এর পরও হাওয়ারীরা বারবার আবেদন নিবেদন করতে থাকলো এবং এজন্যে নানা প্রকার কারণ প্রদর্শন, ওজুহাত ও যৌক্তিকতা তুলে ধরতে লাগলো। তারা বললো,

'আমরা মায়েদা থেকে খেতে চাই, অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে চাই, বুঝতে চাই যে, আপনি সত্যই বলেছেন এবং আমরা এ অলৌকিক জিনিসের ব্যাপারে সাক্ষীও হয়ে যেতে চাই।'

ওরা তো একাধারে এই অভিনব খাবার খেতে চায়, যার কোনো নযির পৃথিবীতে নাই। এই অলৌকিক জিনিস চোখের সামনে দেখে চোখ জুড়াতে চায় এবং নিশ্চিতভাবে বুঝতে চায় যে, প্রকৃত ঈসা (আ.) তাদের কাছে সত্য কথা বলেছেন, আর সর্বশেষে তাদের অন্যান্য লোকদের কাছে এই মোজেযা দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিতে চায়।

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, এর সবগুলোই এমন কিছু জিনিস যার কারণে তাদের সাথে মোহাম্মাদ (স.)-এর সাহাবাদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তাদের দাবীর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তারা উপরে যে কথাগুলো বলেছে, সেইগুলো দ্বারাতেই উম্মতদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে।

এই কথাগুলোর পরই ঈসা (আ.) তাঁর পরওয়ারদেগারের কাছে আরযি পেশ করতে গিয়ে বললেন,

'মারিয়াম পুত্র ঈসা বললো, হে আল্লাহ, আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাবার সজ্জিত ....

আবার দেখুন ঈসা ইবনে মরিয়মের দোয়ার মধ্যে একজন ভক্ত অনুরক্ত বান্দার তার মনিবের সাথে আদবপূর্ণ ব্যবহারের চমৎকার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। আল্লাহর বাছাই করা এ বান্দা তার মালিককে যে চিনতে পেরেছে তাও তার ব্যবহারে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে বলে আলোচ্য প্রসংগে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। তিনি তাঁর রবকে কি কাতরভাবেই না ডাকছেন, একবার খেয়াল করে দেখুন, 'ইয়া আল্লাহ, আমাদের পরওয়ারদেগার! আমি মিনতি করে বলছি আপনাকে হে আমার রব, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাবার সজ্জিত এমন একটি বিছানা পাঠিয়ে দিন, যার মধ্যে থাকবে ঈদের খুশীর মতোই প্রাচুর্য ও খুশীর লহর, এ খুশী শুধু আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং আমাদের প্রথম যুগের মানুষ যেমন এর থেকে খুশী অনুভব করবে, যারা পরবর্তীতে আসবে তারাও যেন এর থেকে একইভাবে খুশী পেতে পারে। আর আপনার এই দান হবে আপনারই দেয়া রেযেকের একটি বহিঃপ্রকাশ। অতএব, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন আপনিই মেটানোর ব্যবস্থা করে দিন। অবশ্যই আপনি উত্তম রেযেকদানকারী।' তাঁর এ কথাতেই তার অনুভূতি বুঝা যাচ্ছে যে, অবশ্যই তিনি নিজেকে আল্লাহর গোলাম মনে করেন এবং ভালোভাবেই বুঝেন যে, আল্লাহ তায়ালাই তার রব। অবশেষে তার এই স্বীকারোক্তি বিশ্ব মানবের সেই সমাবেশে প্রকাশ পাবে, যখন তিনি তার জাতির মুখোমুখি দাঁড়াবেন আর এ সম্মেলন হবে মানুষের জন্যে সর্ববৃহৎ মহাসম্মেলন।

এরপরই দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার নেক বান্দা ঈসা ইবনে মারিয়ামের দোয়া কবুল করছেন। কিন্তু তার আত্মসম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বের ভারত্বও প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর জওয়াবী ভাষায়। ওরা যে আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা দেখার আকাংখা প্রকাশ করেছিলো তার জওয়াব দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, তাঁর এ মহান নেয়ামত এসে যাওয়ার পর কেউ যদি এ নেয়ামতের শোকরগোযারি না করে এবং আনুগত্যের মাধ্যমে দাসত্বের সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে তিনি তাদেরকে এমন কঠিন আযাব দেবেন যার কোনো নযির পৃথিবীতে নাই আর কখনও থাকবেও না। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা বললেন, বেশ আমি তোমাদের ওপর তোমাদের কাংখিত মায়েদা নাযিল করছি, কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এ নেয়ামতের না-শোকরি করে, তাহলে আমি তাকে এমন আযাব দেবো যা সারা বিশ্বের আর কাউকে দেইনি বা দেবোও না।

এটিই হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহর মর্যাদার উপযোগী কথা। এর ফলে কারো সান্ত্বনা লাভ বা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার জন্যে, আর কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দেখার সখ থাকবে না এবং আল্লাহর ক্ষমতার এই নিদর্শন পরিষ্কারভাবে দেখার পর তাঁকে অস্বীকার করার বা তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আর কোনো সুযোগ থাকে না। এদতসত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে থাকে, তাহলে তার ভাগ্যে কঠিন শাস্তি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

ইতিপূর্বে যে সব জাতির কাছে আল্লাহর মোজেযা (অলৌকিক ক্ষমতা) এসেছে এবং এরপরও যখন তারা রসূলদেরকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করেছে, তখন তাদের ওপর অবশ্য অবশ্যই আযাব নাযিল হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় বুঝা যাচ্ছে– এ আযাব দুনিয়াতেও হতে পারে বা আখেরাতেও আসতে পারে।

কেয়ামতের দিন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্য

আল্লাহর (মায়েদা নাযিলের) ওয়াদা এবং ধমকের কথা নাযিল হওয়ার পর প্রসংগটিকে এখানেই শেষ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে কি হলো সে বিষয়ে আল কোরআন নীরব হয়ে গেছে যাতে করে মূল বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হতে পারে, আর তা হচ্ছে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব প্রতিপালন ক্ষমতা........ আর এই বিষয়টিই আলোচ্য সমগ্র পাঠটির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। আসুন, আমরা অবশ্যম্ভাবী সেই মহা সমাবেশের দিকে আবার একবার তাকাই এবং আবারও ঈসা ইবনে মারিয়াম ও তার মায়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বিষয়টিকে সরাসরি পর্যালোচনা করে দেখি। যারা তাকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক মনে করে পূজা করে, তাদের এহেন ভুল কাজের জন্যে তাদেরকেই এর যৌক্তিকতা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যাতে করে এ কথা শুনে তারা চিন্তা করার সুযোগ পায়। তাই তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, যে কথাটি ঈসা (আ.) নিজে দাবী করেননি সেই কথাটি তাঁর ওপর আরোপ করার জন্যে অবশ্যই তারা নিজেরা দায়ী হবে। কারণ কেয়ামতের দিন তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক (ইলাহ) হওয়ার দাবীকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে অস্বীকার করবেন। তিনি বলবেন, তার নামে একটি মনগড়া মিথ্যা তৈরী করে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সব অবান্তর কথার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'একবার স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.)-কে ডেকে বলবেন, হে মারিয়াম পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষকে একথা বলেছো, আমাকে ও আমার মা-কে পূজনীয় ব্যক্তি (সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী) বলে গ্রহণ করো? সে বলবে, মহা পবিত্র আপনি .... তা আপনি করতে পারেন যেহেতু আপনিই মহাশক্তিমান– মহাবিজ্ঞানময়।'

আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন জনগণকে ঈসা (আ.) কী বলেছিলেন। তবু ওই ভয়ানক ও কঠিন দিনে এই ভীতিজনক প্রশ্ন তিনি অবশ্যই করবেন। প্রশ্ন তাকে করা হলেও আসলে তিনি তো এসব বিষয়ে দায়ী নন। তবু তাকেই প্রশ্ন করার অর্থ হবে প্রকৃতপক্ষে এ অন্যায় কাজের জন্যে যারা দায়ী এবং তিনি তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধজনক শেরক করতে বলেছেন বলে যারা তার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, তাদের সামনে যেন পরিষ্কার জওয়াব এসে যায়, অবশ্য এতে এই সম্মানিত নেক বান্দাকে কোনোই দুর্নামের ভাগী হতে হবে না। এতো এমন এক ভয়ানক অপরাধ, যা জেনে বুঝে কেউ করলে তার পক্ষে এ অপরাধের শাস্তি থেকে বাঁচা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় এক দৃঢ়সংকল্প নবী কেমন করে এ কথা বলতে পারেন? কেমন করে মারিয়ামের ছেলে ঈসা একথা উচ্চারণ করবেন? অবশ্য তাঁকে রসূল বানানোর পূর্বে ও পরে এ নেয়ামতগুলো আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেছেন, এর পর আল্লাহর সত্যপন্থী এই নেক বান্দা মানুষের কাছে এতো বড় অপরাধজনক দাবী কি করে করতে পারেন?

এ জন্যেই এই অনুগত বান্দার ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠের কম্পমান জওয়াব বেরিয়ে আসবে, যার মধ্যে আল্লাহর পবিত্রতার কথা এবং তার যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত হওয়ার কথা ঘোষিত হবে। সে বলবে হে পবিত্র মালিক আমার, মহা পবিত্র আপনি এসব শেরক থেকে।

জিজ্ঞাসিত হওয়ার সাথে সাথেই ওই দোষ স্খলনপূর্ণ বলিষ্ঠ জওয়াব তাঁর কম্পমান কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসবে,

'না, হে আমার মালিক, যে বিষয়ে আমার কোনো অধিকার নেই, সে কথা আমি কিছুতেই বলতে পারি না, আমার পক্ষে তা কোনো ভাবেই বলা শোভা পায় না।'

তার দোষমুক্তির কথা ঘোষণা করতে গিয়ে আল্লাহকেই তিনি সাক্ষীরূপে গ্রহণ করবেন। অবশ্য নিজেকে দোষমুক্ত করতে গিয়ে তিনি আল্লাহর সামনে বড়ই কাঁচুমাচু হয়ে যাবেন এবং তিনি বান্দা হওয়ার কারণে তার দুর্বলতাসমূহ ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরবেন। বলবেন,

'আমি যদি তা বলেই থাকি, তাহলে অবশ্যই তা আপনি জেনেছেন, আমার মনে কি আছে তা তো আপনি ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু আপনার মধ্যে কী আছে তা আমার কিছুই জানা নেই। আপনি অবশ্যই গায়েবের সব খবর সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।'

আর একমাত্র তখনই এবং তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর দীর্ঘ তাসবীহ করার পর তিনি তার যুক্তি তুলে ধরতে সাহস করবেন এবং বলবেন তাই, যা তিনি বলেছিলেন এবং যা বলেননি, তা তিনি অস্বীকার করবেন। অতপর এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তিনি নিজেকে বরাবর আল্লাহর গোলাম মনে করেছেন এবং অপর সবাইও যে একমাত্র তারই গোলাম এ কথা বলেছেন এবং সবাইকেই তাঁর গোলামী করার আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহর বাণীতে এই কথাই জানানো হচ্ছে,

'আমি তাদেরকে তাই বলেছি যার নির্দেশ আপনি আমাকে দিয়েছেন। সে নির্দেশ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহরই শর্তহীন আনুগত্য করো, যিনি আমার ও তোমাদের রব।

এরপর তার অন্তর্ধানের পর ওই অন্যায় কথাগুলো আরোপকারী ব্যক্তিদের থেকে তিনি নিজেকে সম্পর্কমুক্ত করে নেবেন। আল কোরআনের আয়াতগুলো থেকে বাহিক্যভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ঈসা ইবনে মরিয়মকে ওফাত দান করেছিলেন এবং পরে তিনি তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে জানা যায় যে, তিনি আল্লাহর কাছে আজও জীবন্ত অবস্থায়ই আছেন। আমার মতে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'দুনিয়ার জীবন থেকে ওফাত দান করে নিয়ে গেলেন' এবং 'তাঁর কাছেই তিনি যিন্দা আছেন' এ দুই-এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই বা কোনো সংকটও আমি অনুভব করি না। শহীদদেরকেও তো দুনিয়ার জীবন থেকে তুলে নেয়া

হয়েছে কিন্তু তারাও আল্লাহর কাছে জীবিত আছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর কাছে এদের জীবিতাবস্থাটির রূপ কি, তাও আমাদের জানা নেই! ঈসা (আ.)-এর জীবন্ত থাকাটাও এই রকমই। আর তিনি সেখানে তার রবকে বলবেন, আমি জানি না আমার ওফাতের পর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক কি করেছে।

'আর যতোদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততোদিন তাদের অবস্থা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তারপর আপনি যখন আমাকে ওফাত দান করলেন, তখন আপনিই তাদের তদারককারী হয়ে গেলেন এবং আপনি সব কিছু দেখছেন এবং সব কিছুর ব্যাপারে আপনিই তো চূড়ান্ত সাক্ষী।

ওইসব লোককে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তাদের প্রসংগে আলোচনা এখানে শেষ করা হচ্ছে। এখানকার বক্তব্যে উল্লেখিত হয়েছে যে, 'আল্লাহর ক্ষমা করার অথবা শাস্তি দানের উভয় ক্ষমতাই তাঁর রয়েছে এবং তাদেরকে প্রতিদানে ক্ষমা ও শাস্তি দানের তাৎপর্য কি, সে বিষয়েও চূড়ান্ত কথা এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তো তারা আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে আপনি ক্ষমা করেন, সেটাও আপনার খুশী, যেহেতু আপনি মহা শক্তিমান মহাবিজ্ঞানময়।'

সুতরাং এই কঠিন অবস্থায় আল্লাহর ওই নেক বান্দার কী হবে!

আর কিই বা তাদের অবস্থা হবে যারা আল্লাহর বান্দা ঈসা (আ.)-এর ওপর এসব মিথ্যা দোষারোপ করেছিলো, যার থেকে এই পবিত্র বান্দা নিজের সম্পর্কমুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং তিনি পরিপূর্ণ আনুগত্য বোধ নিয়ে তার পরওয়ারদেগারের কাছে তাদের জন্যে মাগফেরাত বা শাস্তি দানের জন্যে সোপর্দ করবেন। তাদেরকে যা তিনি দিতে চান দেবেন, এর ভার তাঁর ওপরই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।

ওই নাফরমানদের অবস্থাই বা ওই ভয়ানক বিচার দিনে কী হবে, তাদের স্থানই বা কোথায় হবে? এ আলোচনার প্রসংগটি তাদের কোনো অবস্থাকেই নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করছে না। সম্ভবত তারা অপমান ও লজ্জার সাথে একে অপরকে সেদিন দোষারোপ করতে থাকবে। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে আমাদেরও সেইভাবে নীরবতা অবলম্বন করা ভালো মনে করছি, যেমন এ প্রসংগে তাদের সম্পর্কে খুব নিশ্চিত করে কিছু বলা হয়নি। আসুন, আমরা দেখি কি আশ্চর্যভাবে ওই মহাসমাবেশে জিজ্ঞাসাবাদ হবে!

'আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এই হচ্ছে সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্য ভাষণ উপকৃত করবে। তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতের সেই সব বাগ বাগিচা যার নীচু দিয়ে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। এটাই সব থেকে বড় সাফল্য।'

এই দিনটিতেই সততা সত্যবাদিতা সত্যবাদীদের উপকারে আসবে। একইভাবে সেই সব মিথ্যাবাদীরা উপযুক্ত শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং মিথ্যাচারের উচিত বদলা পাবে, যারা নবী করীম (স.)-এর ওপর মারাত্মক মিথ্যা দোষারোপ করেছিলো। আর তা হচ্ছে সেই সার্বভৌমত্ব ও নিঃশর্ত আনুগত্যের প্রশ্ন, যা সব থেকে মারাত্মক ও কঠিন বিষয়। আর এই প্রশ্নই সৃষ্টির সব কিছুর মূলে কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে বিরাজমান অকল্যাণ ও যারা এই অকল্যাণকর কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের সব কিছুর মূলে রয়েছে এই যুলুমপূর্ণ আকীদা। এই দিনেই সত্যবাদীদের সততা তাদের কাজে লাগবে এটা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কথা। একথা পেশ করা হবে ওই কঠিন বিশ্ব সমাবেশে উপস্থিত জনগণের সামনে আর এটিই হবে ওই সমাবেশের শেষ ও চূড়ান্ত কথা। সকল বিষয়ের অকাট্য কথা এটিই। আর এই সাথেই থাকবে সত্যবাদীদের উপযুক্ত প্রতিদান।

'তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতসমূহ যার নীচু দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।'

'চিরদিন থাকবে তারা সেখানে।'

'তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট থাকবেন।'

'তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে।'

তাদের মর্যাদার কথা পর্যায়ক্রমে বলা হয়েছে। প্রথমে তাদেরকে জান্নাত দানের কথা, তারপর সেখানে চিরন্তন জীবনের আশ্বাস, এরপর আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে যে সম্মান দান করা হবে তাতে তাদের সন্তুষ্ট হওয়ার কথা।

'এটিই মহাসাফল্য।'

কোরআনুল কারীমের অনবদ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে আমরা ওই মহাসমাবেশের দৃশ্য যেন দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি যেন সেই শেষ ও চূড়ান্ত কথাগুলো। এইভাবে শোনা ও দেখার পর ওই দিন সম্পর্কে আমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না, এগুলো কোনো ভবিষ্যতের জিনিস মনে হয় না যার অপেক্ষা করা প্রয়োজন হয়। এ বর্ণনাধারা এমন কোনো দিক ছাড়েনি যা চোখ দেখে নাই বা কান শোনে নাই। এ বর্ণনা-ধারা চেতনাসমূহকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয় এবং অনাগত ঘটনা প্রবাহকে মূর্ত করে তোলে যেন চোখগুলো এখনই সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে এবং কানগুলো তখনকার কথা শুনতে পাচ্ছে।

এতদসত্তেও এসব ঘটনাকে কল্পনার চোখেই দেখতে হবে। আমরা মানুষ, পর্দার আড়ালেই রয়েছি আমরা এবং ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য বিচার দিনের অপেক্ষা করছি। আল্লাহর জ্ঞান সাগরের মধ্য থেকে আমরা আন্দাজ অনুমান দ্বারা কিছু চয়ন করতে পারি। যে সব জিনিস আমাদের সামনে বাস্তবে রয়েছে এবং যা ঘটে চলেছে, সেগুলোকে দেখে আমরা ভবিষ্যতের অনেক কিছু বুঝতে পারি। মহাকাল ও তার পর্দার আড়ালে যা লুকিয়ে রয়েছে এসবকেই দেখতে হয় কল্পনার চোখে। কারণ আমরা তো নশ্বর জগতে ধ্বংসশীল মানুষ– আজ আছি, কাল নেই। সুতরাং মহাকালের সীমা পাড়ি দেয়া আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

এই দারস (পাঠ)-এর পরিসমাপ্তিতে এবং ঈসা (আ.) সম্পর্কে তার পরবর্তী লোকদের তৈরী করা ডাহা মিথ্যার মোকাবেলার জন্যে সব থেকে বড় যে হাতিয়ার, তা হচ্ছে রসূল (স.)-এর পূর্ণাংগ অনুসরণ। ঈসা (আ.)-এর ওপর যে নির্জলা মিথ্যার জাল বোনা হয়েছে তা হচ্ছে, তিনি নিজেই মহান ও সর্বশক্তিমান বিধাতা। তার প্রতি এ মিথ্যা আরোপ করেছে। তার অনুসারীরাই এই সর্বশক্তিমান হওয়ার আরোপিত মিথ্যা দাবীকে ঈসা (আ.) নিজেই প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে, তার জাতির কাছে তিনি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার হুকুমপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল মাত্র।

এই মিথ্যার মোকাবেলায় এবং বিচার দিনের মহাসমাবেশে অনুষ্ঠিতব্য প্রশ্নোত্তর সম্বলিত দারস শেষে সমাপ্তিকর বিষয়টি আসছে। আর তা হচ্ছে, আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এ দুই-এর মাঝে অবস্থিত সব কিছুর মালিক যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং সকল ক্ষমতার তিনিই মালিক এর ঘোষণা দান। তাই এরশাদ হচ্ছে,

আল্লাহ তায়ালাই আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এ দুই-এর মাঝে অবস্থিত সব কিছুর বাদশাহ আর তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম।

একেবারে শেষের কথাগুলো ওই মহা সমাবেশ দিবসে ঈসা (আ.)-এর ওপর আরোপিত চরম মিথ্যা সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এসব কিছুর সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, ওই বিচার দিন কবে আসবে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। একমাত্র তিনিই

সর্বশক্তিমান। সকল রসূল তাঁরই কাছে ফিরে যাবে, সকল বিষয়ের ফয়সালার ভার রসূলরা তাঁকেই দেবেন এবং সেই মহাশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছে ঈসা (আ.) তার নিজের ও তার জাতির বিষয়গুলো সোপর্দ করবেন, যেহেতু তিনিই আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এ দুই-এর মধ্যস্থিত সকল জিনিসের অধিপতি, আর তিনিই সকল কিছু করতে সক্ষম।

শেষের একথাগুলোর সাথে, সূরার মধ্যে আলোচিত 'আদ-দ্বীন' একমাত্র জীবন ব্যবস্থা এ বিষয়টিও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কথাগুলো আসছে এইভাবে যে, একমাত্র আল্লাহরই আইন মেনে চলতে হবে সারা জীবনে, এই আইনকেই সর্বত্র চালু করতে হবে এবং যে হুকুম কোরআনুল কারীমে নাযিল হয়েছে সেই অনুসারেই সকল বিষয়ের ফয়সালা করতে হবে– অন্য কারো মন মতো নয়। যেহেতু তিনিই একমাত্র মালিক, যাঁর হাতে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এ দুই-এর মধবর্তী স্থানে যা কিছু বর্তমান, সে সব কিছুর বাদশাহী একমাত্র তাঁর। এমন মালিক তিনি, যিনি সব সমস্যার সমাধান দেন।

'আল্লাহর হুকুম মতো যারা বিচার ফয়সালা করে না। তারাই হচ্ছে কাফের।'

এসব কিছু নিয়ে সকল বিষয় একটিই, আর তা হচ্ছে, সার্বভৌমত্ব, তাওহীদ (একত্ব) এবং আল্লাহর কেতাব অনুযায়ী বিচার ফয়সালা হতে হবে, ...যাতে তাঁরই সার্বভৌমত্ব কায়েম হয় এবং সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

সূরা আল হুজুরাত
সূরা ক্বাফ
সূরা আয যারিয়াত
সূরা আত তূর
সূরা আন নাজম
সূরা আল ক্বামার

২০তম খন্ড

সূরা আর রাহমান
সূরা আল ওয়াক্বেয়া
সূরা আল হাদীদ
সূরা আল মোজাদালাহ
সূরা আল হাশর
সূরা আল মোমতাহেনা
সূরা আস সাফ
সূরা আল জুমুয়া
সূরা আল মোনাফেকুন
সূরা আত তাগাবুন
সূরা আত তালাক্ব
সূরা আত তাহ্রীম

২১তম খন্ড

সূরা আল মুলক
সূরা আল ক্বালাম
সূরা আল হাক্বাহ
সূরা আল মায়ারেজ
সূরা নূহ
সূরা আল জ্বিন
সূরা আল মোযযাম্মেল
সূরা আল মোদ্দাসসের
সূরা আল ক্বেয়ামাহ
সূরা আদ দাহর
সূরা আল মোরসালাত

২২তম খন্ড

সূরা আন নাবা
সূরা আন নাযেয়াত
সূরা আবাসা
সূরা আত তাকওয়ীর
সূরা আল এনফেতার
সূরা মোতাফ্ফেফীন
সূরা আল এনশেক্বাক
সূরা আল বুরুজ
সূরা আত তারেক
সূরা আল আ'লা
সূরা আল গাশিয়া
সূরা আল ফজর
সূরা আল বালাদ
সূরা আশ শামস
সূরা আল লায়ল
সূরা আদ দোহা
সূরা আল এনশেরাহ
সূরা আত তীন
সূরা আল আলাক্ব
সূরা আল ক্বদর
সূরা আল বাইয়্যেনাহ
সূরা আয যেলযাল
সূরা আল আদিয়াত
সূরা আল ক্বারিয়াহ
সূরা আত তাকাসুর
সূরা আল আসর
সূরা আল হুমাযাহ
সূরা আল ফীল
সূরা কোরায়শ
সূরা আল মাউন
সূরা আল কাওসার
সূরা আল কাফেরূন
সূরা আন নাসর
সূরা লাহাব
সূরা আল এখলাস
সূরা আল ফালাক্ব
সূরা আন নাস